Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ১ম সংখ্যা। } ১লা মাঘ, সোমবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 14th January, 1929. { অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, পুরাতন বর্ষ বিদায় দিয়া যেমন নববর্ষ আনিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নববিধানের নবব্রহ্মোৎসবও ত আরম্ভ করিলে। নববর্ষারম্ভে পুরাতন দিন মাস বার তিথি সকলই পরিবর্ত্তিত হইল, তেমন যাহা কিছু পুরাতন, সকলই পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিবার জন্যই নববিধান আনিয়াছ। নিত্য নূতনত্ব-বিধান, নব নব জীবনের নব নব উন্নতি, নব নব সাধনা, নব নব আনন্দ, নব নব উৎসবে আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্যই নববিধান দিয়াছ। তাই নববর্ষ দিন হইতেই আমাদিগকে নব নব সাধনা দিয়া উৎসবের জন্য স্বয়ং প্রস্তুত করিতে নিরত হইয়াছ। এ বিধান তোমার বিধান, আমাদের হাতে ত নয়। হাজার আমরা পুরাতন-ভাব-পরতন্ত্র, জড় নির্জ্জীব, নিরুৎসাহী, মৃত-ভাবাপন্ন হই না কেন, তুমি আমাদিগকে ত ছাড়িবে না। তুমি যে এবার মা হইয়া আমাদের সব ভার লইয়াছ, সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লইয়া, নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া, নব উদ্যমে নব উৎসাহে নববিধানের নব উৎসব দিয়া, নবভক্তের সঙ্গে নবভক্তি নবযোগ নবজ্ঞান নবজীবনে মাতাইয়া, তোমার নবশিশুদল যে আমরা, তাহা দেখাইবে ও স্বর্গস্থ অমরাত্মাদের সঙ্গে মিলাইয়া তোমার নববিধানের জয় প্রতিষ্ঠা করিবে; তাই কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—:—

নবব্রহ্মোৎসব।

নববর্ষাগমে মা নববিধান-বিধায়িনী স্বয়ং তাঁহার পবিত্রাত্মার দ্বারা আমাদিগকে নবব্রহ্মোৎসব সাধনে আহ্বান করিয়াছেন।

আদিতে একদিন আমরা ব্রহ্মোৎসব করিতাম। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ-রস-পান করিবার আকাঙ্ক্ষায়, আমরা আমাদের ধর্ম্ম-পিতামহ ও ধর্ম্ম-পিতার অনুপ্রাণনায় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণার্থ ১১ই মাঘের মাঘোৎসব করিতাম। সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ করা হইত। কিন্তু সে উৎসব হইতে যখন ব্রহ্মানন্দ-হৃদয়ে নবভক্তি উৎসারিত হইল, তখন আর তাহা কেবল একদিনে নিবদ্ধ রহিল না। সেই ব্রহ্মজ্ঞান-সম্ভূত ব্রহ্মোৎসবের উপাসনা হইতে সংকীর্ত্তন এবং সংকীর্ত্তনেতে শতধা সাধনা সংযুক্ত হইয়া মাসব্যাপী, বৎসরব্যাপী মহোৎসব এবং ক্রমে তাহাই নিত্য নব নব আনন্দদায়ক নবব্রহ্মোৎসব রূপ ধারণ করিল। তাই নববিধানের

উৎসব কেবল পুরাণো ব্রহ্মোৎসব নয়, ইহা নবব্রহ্মোৎসব, ইহা নব মাতৃ-উৎসব, নব দুর্গোৎসব এবং যত ধর্ম্মের যত উৎসব আছে বা হইতে পারে, কি আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক, নৈতিক, সামাজিক বা পারিবারিক, সকলই ইহাতে একাধারে সমন্বিত।

নববর্ষের আরম্ভ দিন হইতেই এই নবব্রহ্মোৎসব আরম্ভ। প্রথম দিন নবদেবালয়-স্থাপনের উৎসব দিন, সুতরাং নববিধানের প্রারম্ভিক মহোৎসব নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার উৎসব। নবদেবালয় সত্যই নবদেবালয়, কেন না ইহা কেবল প্রাচীন দেবালয় নয়, ইহা নবভক্তের মক্কা, জেরুজালম, কাশী, বৃন্দাবন, ঈশাস্থান, মুষাস্থান, সর্ব্বতীর্থের মহামিলন-স্থান। ইহা কেবল একটি পারিবারিক দেবালয় নয়, ইহা দ্বারা বাড়ীর, পাড়ার, সহরের, সমগ্র জগতের কল্যাণ হইবে এবং সর্ব্বমানব এখানে আসিয়া ঈশ্বর-অদর্শনের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ মাতৃদর্শন-লাভে ধন্য হইবে, ইহাই ব্রহ্মানন্দের বিশ্বাসপূর্ণ বাণী। বাস্তবিক আমরা যদি বিশ্বাস ভক্তির সহিত ব্রহ্মানন্দের আত্মার সহযোগে এখানে মাতৃ-পূজা করি, তবে এই নবদেবালয়ে উপাসনা ও সাধনার দ্বারা নববিধানের নিত্য নব নব আধ্যাত্মিক জীবন-লাভে ধন্য হই এবং নব নব উৎসবানন্দে আনন্দিত হই।

নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদিগের ধর্ম্ম-পিতামহ রাজর্ষি রামমোহন এবং ধর্ম্ম-পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট আমাদিগের আধ্যাত্মিক ঋণ স্মরণে কৃতজ্ঞতা-দানের উৎসব হয়।

একজন এদেশের পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া নিরাকার ব্রহ্মপূজার বীজ বপন করিলেন, আর একজন তাহাতে জল-সিঞ্চন করিয়া এক অপৌত্তলিক হিন্দু-সমাজ গঠন করিলেন, এই জন্যই ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপিতামহ ও ধর্ম্মপিতারূপে বরণ করিতে আমরা আদিষ্ট। ইঁহাদের সুবন্দোবস্ত এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইয়া আমাদিগকে যে আধ্যাত্মিক সম্বল দান করিয়াছে, তাহা স্মরণ করা এবং স্বীকার করা আমাদিগের বিশেষ সাধন। আমাদের ধর্ম্মপিতামহ ও ধর্ম্ম[illegible] প্রতি তাই কৃতজ্ঞতা-প্রদান আমাদিগের উৎসবে[illegible] অঙ্গ।

[illegible] পর নববিধানের মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া, নববিধান-প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ প্রেরিতবর্গের দ্বারা আমরা কত উপকৃত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ করা আমাদিগের উৎসবের প্রধান ও সর্ব্বোচ্চ সাধন।

মাতৃভূমির নিকট আমাদের ঋণ ও কর্ত্তব্যতা স্বীকার ও তৎপালনে শিক্ষা-সাধন আমাদের উৎসবের আর এক প্রধান সাধন। এই উপলক্ষে রাজার কল্যাণ ও স্বদেশের কল্যাণ উভয়ই কামনা করা হয় এবং মাতৃভূমির পুণ্য-গৌরব-স্মরণে যাহাতে তাঁহার উপযুক্ত সেবা করিতে পারি, তৎসাধনে কৃতসংকল্প হইতে হয়।

"গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন" ইহা স্মরণপূর্ব্বক বিশেষ ভাবে গৃহোৎসব হয়। গৃহের প্রত্যেক পদার্থ যে ঈশ্বরের, প্রত্যেক পরিজন সন্তান-সন্ততি যে ঈশ্বর-প্রেরিত এবং ইহার সকল প্রকার কর্ত্তব্যই যে ধর্ম্ম-সাধন, ইহা স্মরণ ও সাধন করাই এই দিনকার উৎসব।

পরদিন শিশুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন ও শিশু-সেবার উৎসব হয়। নববিধানের প্রবর্ত্তক নবভক্ত আপনাকে মার নবশিশু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং নবশিশুদল হওয়াই নববিধান-বিশ্বাসীদিগের সাধন। এই শিশু উৎসব তাই আমাদিগের মহা আনন্দের উৎসব।

পরে ভৃত্যসেবার উৎসব। ভৃত্যের প্রতি কর্ত্তব্য এবং ভৃত্যদের সম্মান-সাধন এই উৎসবের বিশেষ লক্ষণ। ভৃত্যগণের যথাযথ সেবা এবং তাঁহাদের অনুসরণে সেবাব্রত-শিক্ষা এই উৎসবের বিশেষ উদ্দেশ্য।

দীনতা অকিঞ্চনতা শিক্ষা ও দীন দরিদ্রদিগের সেবা সাধনার দ্বারা দয়া-সাধন দীনোৎসবের বিশেষ লক্ষণ।

তাহার পর আচার্য্যের স্বর্গারোহণ-উৎসব নববিধান-বিশ্বাসীদিগের মহানির্ব্বাণ সাধনোৎসব এবং মহা উজ্জীবন-লাভের মহামহোৎসব। গম্ভীর ধ্যানযোগ-সহকারে এই মহাদিন-যাপন এই দিনের বিশেষ সাধন।

ভক্তবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি অর্পণ এক বিশেষ উৎসব। নবভক্তের সহিত নবভক্তি-লাভ এই দিনের বিশেষ সাধন। ভক্তের প্রতি ভক্তি-সাধনেই ভক্তি-লাভ হয়, তাই নববিধানে ভক্ত-গ্রহণ প্রধান সাধন।

আবার কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভক্তগণের প্রতি ভক্তি-অর্পণেই সাধন পূর্ণ হয় না, যাঁহারা হিতকর কর্ম্ম সাধন

করিতে, জ্ঞানহিতে জীবন মন উৎসর্গ করিয়া, জনহিতৈষণা ব্রত সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ এবং তাঁহাদের অনুগমনে জন সেবা-সাধন আমাদিগের বিশেষ উৎসব।

তাহার পর যাঁহাদিগের দ্বারা আমরা ব্যক্তিগত ভাবে নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, সেই সকল বন্ধুদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ আমাদের উৎসবের এক প্রধান সাধন।

আবার অপকারী বিরোধী যাঁরা, তাঁহারাও এক ভাবে ছদ্মবেশে উপকারী জানিয়া, তাঁহাদের বিরোধিতার দ্বারায় আমাদের যে আধ্যাত্মিক উপকার হয় তাহা স্মরণ করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইব এবং কদাপি কাহারও প্রতি শত্রুতা করিয়া আমরা বৈর-নির্য্যাতন-অপরাধে অপরাধী না হই, তৎসম্বন্ধে কৃতসঙ্কল্প হওয়াও আমাদের উৎসবের সাধন।

তাহার পর চিত্তশুদ্ধি-সাধন এবং আত্মার আত্মস্থ হইতে সাধন করিয়া আমরা মহামহোৎসবের জন্য প্রস্তুত হই।

আধ্যাত্মিক-ভাবে আরতি-যোগে মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ-ভাবে দর্শন করিয়া, আমরা মহোৎসব-সাধনে উদ্বুদ্ধ হই। ব্রহ্মকে মাতৃরূপে দর্শন না করিলে কেমনে নববিধানের নবভক্তির উৎসব হইবে।

আর্য্যনারীদিগের দ্বারায় নববিধানের নিশান-বরণ বা পরিবার মধ্যে নববিধান-প্রতিষ্ঠার উৎসব অতি আধ্যাত্মিক উৎসব।

এইরূপ মঙ্গলবাড়ী-প্রতিষ্ঠার উৎসব, প্রচার-আশ্রমের উৎসব, শ্রীদরবারের উৎসব, নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। চারিদিকে নববিধান-প্রচারের উৎসব। ১১ই মাঘের উৎসব, সমস্তদিনব্যাপী মহা মহোৎসব, মহা কীর্ত্তনোৎসব, নববিধান-ঘোষণার উৎসব, আনন্দ বাজারের উৎসব এবং যোগসাধনার দ্বারায় শক্তিবাচনের উৎসব, নবব্রহ্মোৎসবের এক একটি বিশেষ অঙ্গ।

এই ভাবে এক এক দিন এক এক নূতন উৎসব সাধন করিয়া আমরা নবব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন করি এবং তদ্দ্বারা আমরা নববিধানের নিত্য নব নব উৎসব সাধনে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জন করি। এই উৎসব দেশকালগত উৎসব নয়, ইহা যে বিচিত্র সর্ব্বাঙ্গীন মহোৎসব, ইহা কে না স্বীকার করিবে। ব্রহ্ম-কৃপায় এবং স্বর্গস্থ ও নরলোকস্থ সকল ভক্ত আত্মার সহায়তায় ও নববিধানের নব ভক্তের সহযোগে, যাহাতে আমরা এই মহোৎসব-সাধনে সপরিবারে সশরীরে যথার্থ স্বর্গ-সম্ভোগ করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা নববিধানকে পূর্ণ-ভাবে গৌরবান্বিত করিতে পারি, মা আনন্দময়ী জননী আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

উপাসনার অন্তরায়।

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার নিকট বসাই উপাসনা। তাঁহার নিকট বসিলেই তাঁহার স্বরূপের প্রভাব উপাসককে উদ্বুদ্ধ এবং তাঁহার স্বরূপগত জীবনে সঞ্জীবিত ও সমুন্নত করে। উপাসককে নিজে কিছু করিতে হয় না, কেবল আপন অভাব-বোধে তৃষিত ও পিপাসিত হইয়া, ব্যাকুল অন্তরে স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় মার প্রসাদ-লাভের প্রার্থী হইলেই হয়। সাধক যদি নিজে জ্ঞান বুদ্ধি বিচারের ভাব মনে আনেন, কিম্বা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কোন ব্যক্তি নিকটে আছেন ইহা মনেও করেন, তাহা হইলেই উপাস্য দেবতা অন্তর্হিত হন। এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও তুষ্টি-সাধন করিতে গেলেই যথার্থ উপাসনা হয় না।

নববিধানের উদারতা।

নববিধানাচার্য্য বলেন, "এই নববিধানকে টানিতে গেলে জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্য-বিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইহা বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম কুসংস্কার অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধতা স্থান পাইবে না।" সুতরাং নব-বিধানের মধ্যে নাই, এমন কিছুই নাই। কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক, কি বৈষয়িক, সকল ব্যাপারই ইঁহার অন্তর্গত; তবে যাহা ভ্রান্তি-উদ্দীপক, কুসংস্কার-সম্পন্ন বা কোন প্রকার নীতি-বিরুদ্ধ, তাহাকে ইনি প্রশ্রয় দেন না। তদ্ভিন্ন ইঁহার উদার বক্ষে সকলেরই স্থান রহিয়াছে। নববিধান বলিয়া এই বিধান যে আধুনিক, পূর্ব্বে নববিধান ছিল না, তাহা নহে। আচার্য্যদেব বলেন, "যখন বেদ, বাইবেল ছিল না, তখনও নববিধান ছিল, এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না, যখন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে, তখনও ইহা থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত, তাহাই নববিধান।" নববিধান সকল বিধানকে নবজীবন দান করিবার জন্য সমাগত এবং

প্রত্যেক বিধানের ভিতরে যেখানে নূতন জীবন, সেই থানেই নববিধান বিরাজিত। আচার্য্যদেব বলেন, "নববিধান সকল বিধানের চাবি।"

—•—

ভারতীয় মহিলা-সম্মেলন।

সভানেত্রীর অভিভাষণ

প্রতিনিধি ও বন্ধুগণ,

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন আমি এই সম্মিলনের নেত্রীর পদগ্রহণে অনুরুদ্ধা হইয়াছিলাম, তখন যে কেবল সম্মানিতা হইয়াছিলাম তাহাই নহে, আমার রাজ্যের জন্যও গৌরববোধ করিয়াছিলাম; কেন না, আমার রাজ্য ও কোচিন রাজ্য স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণতঃ অন্য সকল বিষয়েই অত্যধিক অগ্রসর।

প্রতীচ্যে নারীর অবস্থা

আমি এখানে নারীর অবস্থার ইতিহাসের আলোচনা করিতে চাহি না, কেবল সামান্য দুই চারি কথা বলিতে চাহি মাত্র এবং তাহা এই যে, কয়েকটি বিখ্যাত মহিলা ব্যতীত শতাব্দীকাল পূর্ব্বে প্রতীচ্যখণ্ডেও নারীর অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। আইনে তাঁহাদের অধিকার স্বীকৃত হইত না, সম্পত্তির উপরও তাঁহাদের বিশেষ কোন অধিকার ছিল না, বহু সংগ্রাম করিয়া নারীজাতিকে অল্পে অল্পে অধিকার অর্জ্জন করিতে হইতেছে। আমি কেবল আপনাদিগকে নারী আন্দোলন, মিসেস প্যাঙ্কহারষ্টের প্রচেষ্টা প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইহার ফলে রাজনীতি ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রতীচ্য নারীসমাজ কিছু অধিকার লাভ করিয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীজাতির অধিকার পুরুষদের সমান বলিয়া পরিগণিত হইত না। ম্যাডাম কুরিয়র আবিষ্কার সত্বেও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয় নাই। জর্জ্জ ইলিয়ট, মিসেস ব্রাউনিং প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিলেও স্ত্রীজাতির সাহিত্যরচনার ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। কেবল গত মহাযুদ্ধের ফলে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মাত্র। তখন হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রীদিগকে পুরুষদিগের সমান অধিকার দেওয়া হইতেছে।

বৈদিক যুগে নারী

এ দেশের নারী আন্দোলনের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বেদ উপনিষদের যুগে হিন্দু সমাজে স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান ছিল। অনেক বৈদিকমন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন নারী। সেকালে সম্পত্তিতেও স্ত্রীলোকদের অধিকার পুরুষদের সমান ছিল। আধুনিক আইনেই কেবল তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানকালেও আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে সম্পত্তির উপর স্ত্রীলোকের একটা অধিকার স্বীকৃত হয়, ইউরোপে তাহাও হয় না। আমার নিজ দেশে কেবল সমাজে স্ত্রীজাতি সংসারের কর্ত্রী। তাঁহারা সম্পত্তিরক্ষায় এবং তাহার উন্নতিসাধনে ও পরিচালনে সমর্থা। ভারতীয় মহিলারা রাজ্যশাসনেও সুদক্ষা ছিলেন।

ইসলামে নারীর স্থান

ইসলামসমাজে সম্পত্তির উপর স্ত্রীর সমান অধিকার আছে। ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ বহু বিবাহ কিম্বা অবরোধ-প্রথার সমর্থন করেন নাই। মহম্মদের পূর্ব্বে আরব-সমাজে বহুসংখ্যক স্ত্রীগ্রহণের প্রথা ছিল। তাহা একেবারে রহিত করা সম্ভবপর বা সঙ্গত নহে বুঝিয়া, যতদূর সম্ভব সংযত করিবার জন্য, মহম্মদ ৪টি স্ত্রী-গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। এই উপায়ে ক্রমে বহু-বিবাহ রহিত করিয়া একপত্নীত্ব স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

অবরোধপ্রথা

পর্দ্দাপ্রথা যে সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে সমাজের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল থাকায়, হয়ত তাহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহা অনিবার্য্য প্রথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দুসমাজেও ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। এখনকার সামাজিক অবস্থায় পর্দ্দাপ্রথার আর প্রয়োজনীয়তা না থাকায়, এই প্রথা এখন স্ত্রীসমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

জননীর কর্ত্তব্য

নারীজাতি শিশু সন্তানদের প্রধান শিক্ষা-বিধাত্রী। সকল দেশেই শিশুরা জননীদের নিকট হইতে তাহাদের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা লাভ করে এবং সেই শিক্ষার প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়। কিন্তু এই গুরুকর্ত্তব্য পালনের উপযোগী শিক্ষা তাঁহারা নিজেরাই লাভ করিবার সুযোগ পান না, সেই জন্য সম্যকরূপে এই কার্য্যের যোগ্যতা অর্জ্জনও করিতে পারেন না। ভবিষ্যৎ জাতিকে মনুষ্যত্বে ঐশ্বর্য্যশালী করিতে হইলে, জাতি-গঠনের উপযোগী ভাবে জননীদের প্রস্তুত করিতে হইবে। কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নহে—সেরূপ শিক্ষা বহু পর্দ্দানশীন মহিলাই পাইয়া থাকেন—মনুষ্যত্ব-শিক্ষা, জাগতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার উপযোগী শিক্ষা তাঁহাদের লাভ করা কর্ত্তব্য। এই শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ভারতীয় নারীসমাজ আজ পর্দ্দাপ্রথা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতে উদ্যতা হইয়াছেন। সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা মাত্রকেই অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমার নিজ দেশে পর্দ্দাপ্রথা ত নাই-ই, অধিকন্তু স্ত্রীলোকদের এমন অনেক অধিকার আছে, ভারতের অপর কুত্রাপি নাই।

বাল্য বিবাহ ও বাল-বৈধব্য

বাল্যবিবাহ ও বাল-বৈধব্য ভারতীয় সমাজের এক শোচনীয় দৃশ্য। বালবিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা না থাকায় সমাজে বিধবার সংখ্যা অত্যধিক। বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া সমাজে

মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। যে সমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, তাহারাও মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় বিধবাদের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত ; এবং এমন কি, হিন্দু দেখা মুসলমান সমাজেও ইহা ক্রমশঃ আদৃত হইতে চলিয়াছে। সুপ্রজননবিদ্যার কথা না তুলিয়াও স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, এই প্রথা সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে।

ভারতের প্রতি দশ হাজারে বিধবার মধ্যে ৪১ জনেরই বয়স ১৫ হইতে কুড়ির মধ্যে, ৭১ জনের বয়স ২০ হইতে ২৫ এর মধ্যে, ১৪৮ জনের বয়স ২৫ এবং ৩৫ এর মধ্যে, ৩২৫ জনের বয়স ৩৫ এবং ৪০ এর মধ্যে, অথচ ইংলণ্ডে উহা যথাক্রমে ১, ১৩ এবং ৫০, ১ এবং ৫ বৎসরের মধ্যেও এখানে প্রতি দশ হাজারের সাত জন এবং ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে ৪৫ জন বিধবা হইয়া থাকে।

বাল্যবিবাহই প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী। যে সমাজে ১ এবং ৫ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে বৈধব্য-দশায় থাকিতে হয়, এবং যে সমাজে ১ হইতে ৫ বৎসরের মধ্য বয়স্ক ৭০ হাজার বিধবা বিদ্যমান, সে সমাজ-ব্যবস্থার নিশ্চয়ই যে কোন গুরুতর দোষ রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রই ইহার সমর্থন করিতে পারে না, যে ব্যবস্থার ইহা পরিণতি, তাহাকে নিন্দা করিবার উপযুক্ত ভাষাও নাই। বাল্য-বিবাহের ফলে জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, এই অবস্থার জন্য শুধু পুরুষেরা নহেন, নারীরাও দায়ী ; সন্তান-সন্ততির বয়স বৃদ্ধির জন্য এবং বাল্য বৈধব্যের প্রতিকারের নিমিত্ত নারী-সমাজকেও জাগ্রত হইতে হইবে। পণপ্রথা আজকাল একটি বিষম সামাজিক পাপে পরিণত হইয়াছে। এই সম্পর্কে সঙ্কীর্ণতা এবং গোঁড়ামী পরিহার করিতে হইবে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা নিজেদের পরিবারের মধ্যে ঐ বিষয়ে সংস্কার সাধন করিলে, জনসাধারণের উপর তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ বিস্তার করিবে। জনমত ব্যক্তি মাত্রেরই সমষ্টিগত পরিণতি মাত্র।

কাজে ও কথায়

আমরা যাহা অন্তরে বিশ্বাস করি, কাজে তাহা করি না। বিশ্বাস এবং কার্য্যের মধ্যে এই অসামঞ্জস্যই ভারতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। অনেক আগ্রহশীল সমাজ-সংস্কারক মুখে সমাজ-সংস্কারের বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু কাজের বেলাতেই তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম ক্ষীণ হইয়া আসে ; তাঁহারা তাঁহাদের ঐ দুর্ব্বলতার অপরাধ প্রধানতঃ তাঁহাদের স্ত্রী মাতা, কিংবা পিতামহীর উপর চাপাইয়া থাকেন ; সুতরাং আমরা ভগিনী মাতা, মাতামহী, পিতামহী, আমাদিগকেই এসব বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইতে হইবে এবং উন্নতির অন্তরায় ক্ষেত্রে ঐ ভাবে আমাদের নাম ব্যবহার অসম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। কি উপায়ে ইহা করা সম্ভব ? উত্তর হইল, নারী-সমাজে শিক্ষার প্রচার।

শিক্ষায় নারী

আমাদিগকে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে যে সব বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সংখ্যা দশ লক্ষের সামান্য কিছু বেশী। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮৬ জনই আপার প্রাইমারী স্কুল পর্য্যন্ত পড়িয়াই লেখাপড়া শেষ করে। পর্দ্দাপ্রথা এবং বাল্য-বিবাহ বালিকাদিগের শিক্ষার পক্ষে প্রধান বাধা।

সুখের বিষয় যে, বাধা বিঘ্ন ক্রমেই অতিক্রান্ত হইতেছে। ভারত মহিলা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, ইহা নহে ; তাঁহারা অনেকে ভাল চিকিৎসক হইয়াছেন, শিক্ষক হইতেছেন এবং কয়েকজন ব্যবহার-জীবীর বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ব্যতীত ত্বরিত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

পুরুষ ও নারী

নারীরা যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ সম্ভব নহে। নারী পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট—এই ধারণা পুরুষদিগকে দূর করিতে হইবে এবং নারীদের নিজেদের অন্তর হইতেও ঐ ধারণা দূর করিতে হইবে। শিক্ষার বিস্তারই ইহার একমাত্র উপায়।

("বাঙ্গালার কথা" হইতে উদ্ধৃত)

—•—

ময়ূরভঞ্জের শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব।

রামায়ণে যে শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যায়িকা আছে, তাহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা মাত্র। তাহার ভিতর ঐতিহাসিক সত্য কতটা জানি না, কিন্তু বর্ত্তমান সুধর্ম্ম-বর্দ্ধন-রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগের প্রত্যক্ষ পরিচিত।

মৌরভঞ্জাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে সে রামচন্দ্রের মহত্ব, দেবত্ব যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত। রাজর্ষি জনকেরও জীবনাদর্শ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত। বাস্তবিক রাজা হইয়াও প্রকৃত ঋষির ন্যায়ই তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন। স্বয়ং বলিয়াছেন, বৈরাগ্যেই আমার জীবন গঠিত

অতি শৈশবে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। বালক রাজকুমার দুশ্চরিত্র দুর্নীতি-পরায়ণ ভৃত্যদের দ্বারাই সদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও তাঁহার চরিত্র কেমন সুন্দর নীতি-পূর্ণ ছিল।

যৌবনে তিনি একজন সহৃদয় উন্নত-চরিত্র ইংরাজ শিক্ষকের শিক্ষাধীনে থাকিয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনে সক্ষম হন। কলেজে যখন পাঠ করেন, দরিদ্র ছাত্রদের সঙ্গে দরিদ্র-ভাবেই শিক্ষাগ্রহণ করিতেন। রাজপুত্রের অহমিকা কখনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কলেজে বি, এ অবধি শিক্ষা হয়। কিন্তু কখনই তাঁহার শিক্ষালাভের পিপাসা যায় নাই। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় সকল প্রকার দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। এমন কি, সমস্ত দিন রাজকার্য্য করিয়াও প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পণ্ডিত-দিগকে লইয়া হিন্দু-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেন।

রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া আপনাকে প্রজাবর্গের নিয়োজিত সেবক বা কর্ম্মচারী মনে করিয়া, অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের ন্যায়ই কার্য্য করিতেন। তিনি আমাদিগের নিকট বার বার বলিয়াছেন, "এ রাজ্যের অন্যান্য কর্ম্মচারী যেমন, আমিও সেইরূপ প্রজাগণের সেবার জন্য নিযুক্ত। তবে অপর কর্ম্মচারীদিগের সহিত আমার পার্থক্য এই যে, উঁহাদের মাঝে মাঝে ছুটী আছে, আমার আর ছুটী নাই।"

বাস্তবিক অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তিনি রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ যেমন বেতন পাইতেন, তেমনি মাত্র আপনার নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট মাসহারা লইতেন। এবং তাহারই ভিতর আপনার ও মহারাণীর পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

বিলাসিতা কাহাকে বলে, তিনি একেবারেই জানিতেন না। অনেক সময় সামান্য ছিন্নবসন পরিয়াও রাজকার্য্য করিতেন। অতি দীনাত্মা ছিলেন। দীন দরিদ্র যে কেহ আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে অবাধে সকলের সহিত আলাপ করিতেন এবং অভাব অভিযোগাদি শুনিয়া তাহা মোচনে চেষ্টা করিতেন। আমরা তাঁহাকে পত্র লিখিলে স্বাক্ষরে উত্তর দিতেন। একবার কোন সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী তাঁহার কাছে কোন প্রকার অর্থাভাব জানাইয়া অর্থ-সাহায্য ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁহাকে সরলভাবে লিখিয়া বলেন, "আপনার অবস্থা যেমন, আমারও অবস্থা এখন তাই। পরে অর্থ-স্বাচ্ছল্য হইলে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।"

অকিঞ্চনতা শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। যখন কলিকাতায় খিদিরপুরে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা হয়, প্রাসাদের নাম কি রাখা হইবে, আমরা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন, "অকিঞ্চন কুটীর।"

একবার কোন সামান্য রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহার বাটীতে উপাসনায় যোগ দিবার জন্য মহারাজাকে নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজার জন্য একখানি আসনও স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। সকলে উপাসনায় বসিলে তাঁর একটু আসিতে বিলম্ব হয়। বসিবার স্থান অন্যান্য উপাসকদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার জন্য রক্ষিত স্বতন্ত্র আসনে না বসিয়া, ভূমিতে তৃণের উপরেই বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনায় যোগদান করেন।

একবার হাবড়া ষ্টেশনে স্বয়ং টিকিট কিনিতেছেন দেখিয়া কটকের কোন শিক্ষিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি যে এখানে নিজে টিকিট কিনছেন, আপনার লোক কোথায়?" তদুত্তরে মহারাজা বলিলেন, "আপনি নিজে এখানে টিকিট কিনছেন কেন? আপনার সব লোকজন কোথায়?" শিক্ষিত ব্যক্তি বলিলেন, "আমি সামান্য লোক, আমি নিজে টিকিট কিনবো না ত কি। আপনি রাজা, কত বড়, আপনি নিজে কেন কিনছেন? আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়?" মহারাজা বলিলেন, "আমি রাজার ঔরষে আকাস্মক জন্মেছি বলে রাজা হয়েছি। আপনি নিজের মেধা-বলে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বড়। আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়?" কি তাঁর দীনতা!

প্রজানুরঞ্জন করা তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল। আত্ম-ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবর্গের অনুরঞ্জন করিতেই প্রথম বিবাহ করেন। প্রথমা রাজমহিষী পরলোক গমন করিলে, একদিকে বিবেকের ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রেরণা, আর একদিকে প্রজাদিগের মনস্তুষ্টি-সাধন, এই উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বাবস্থার প্রজানুরঞ্জনকারিতা অপেক্ষা বিবেক ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রাধান্য হৃদয়ে অনুভব করিয়া, মহারাণী সুচারু দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। ইহার ফলে ধর্ম্মের জয়ে সকল প্রতিবন্ধকই পরাজিত হয়।

এই উদ্বাহের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার প্রাণের উদারতা ও ধর্ম্ম-জীবনের প্রসারতা কতই বৃদ্ধি হইল। তিনি জগতের সকল প্রধান দেশ ভ্রমণ করিয়া, মহারাণীর সহিত বিলাতে সম্রাট পরিবারেও ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়া, স্বরাজ্যের সমীচীন উন্নতি-সাধনে নিরত হন। প্রথম হইতেই ব্রিটিশ রাজ্যশাসন-প্রণালী অবলম্বনে রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া রাজ্যের কতই উন্নতি করেন। যে রাজ্য এক সময় জঙ্গলের মধ্যে অপরিচিত ছিল, তাহাকে নবরাজ্যে পরিণত করিয়া, বংশানুক্রমে মহারাজপদে সম্রাট্কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হন।

রাজকার্য্য হইতে কিছু দিনের জন্য যখন অবসর লইয়া, গবর্ণরজেনারেলের প্রতিনিধির হস্তে রাজ্য-পরিদর্শনের ভার অর্পণ করিয়া, জগৎ ভ্রমণে গমন করেন, তখন তাঁহার সেক্রেটারী মহাশয়কে বলিয়া যান, "আমি এমন কিছুই করি নাই, যার জন্যে আমাকে লজ্জা পাইতে হইবে।" ইহা সামান্য মহত্ত্বের পরিচয় নয়। এক কেশবচন্দ্র ভিন্ন এমন সাহসের কথা আর কাহাকেও আমরা বলিতে শুনি নাই।

সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

স্বর্গীয় রাজকুমার চন্দ রায়

(শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠপুত্র কর্তৃক পঠিত)

আমাদের স্বর্গগত পরম পূজনীয় পিতৃদেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত মীরপুর গ্রামে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের পিতৃপুরুষগণ এই গ্রামে বংশানুক্রমে অতিসঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি প্রায় সমুদয় পূজা পার্ব্বণই আমাদের দেশস্থ বাটীতে অনুষ্ঠিত হইত। পিতৃদেবের শিশু অবস্থাতেই আমাদের পিতামহ ৺রামকুমার রায় মহাশয় পরলোকে গমন করেন এবং পিতার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺প্রসন্নকুমার রায় আমাদের পিতার এবং তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার অভিভাবক হইয়া থাকেন। পিতামহ নিজের পরিশ্রমবলে পার্থিব ধন সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি করিয়া যান। সম্পদের ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াও বংশানুক্রমিক ধর্ম্মভাবের আবহাওয়ায় তাঁহার ক্ষুদ্র প্রাণকে পূর্ণ করিয়া রাখিত।

প্রাচীন সমাজের ধর্ম্মভাবের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন তাঁহার হৃদয়কে এমনি উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাহাতে পতিত হইয়া অতি সহজেই বিকশিত হইতে পারিয়াছিল এবং তাহার ফুল ও ফলের সৌরভে জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

শৈশবে তিনি গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। পরে ভবানীপুরে থাকিয়া তৎকালীন South Suburban School এ শিক্ষালাভ করেন। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি তাঁহার স্বভাবের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য অথচ সহজ সরল ভাব অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। বালক-সুলভ চপলতা কদাচিৎ তাঁহার ভিতরে দেখা যাইত। শুনিয়াছি, শৈশবে আমাদের গৃহে পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে যখন নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হইত, তখন তিনি তাঁহার ছোট ঘরটিতে তাঁহার সহাধ্যায়ী এবং আজন্ম সুহৃৎ রায় সাহেব মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সাথে বসিয়া, কি করিয়া জীবন উন্নত করিবেন ও দেশের উপকার করিবেন, ইহাই আলোচনা করিতেন। যাহা কিছু অন্যায় বা নীতি-বিরুদ্ধ, তাঁহার হৃদয় কখনই তাহাতে সায় দিত না। এই জন্যই তিনি বালক অবস্থা হইতেই প্রচলিত সামাজিক অনুষ্ঠান গুলির নীতি-বিরুদ্ধ অংশগুলিতে কখনই যোগদান করিতেন না। এই সব কারণে তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুদের কাছে অনেক প্রকার বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছে। ভক্ত বিশ্বাসী সন্তান এমনি করিয়া শিশুকাল হইতেই জীবনের পবিত্রতার আভাস দিতেন।

কলিকাতায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া তিনি পুনরায় ঢাকা স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতেই Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে Inspector of Schools পরলোকগত ফণিভূষণ মুখার্জ্জী, ৺রায় বাহাদুর কুমুদিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায় সাহেব মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

ইংরাজী ও সংস্কৃতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। তাঁহার সহাধ্যায়ী ৺ফণিভূষণ মুখার্জ্জি মহাশয় যখন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গমন করেন, তখন তাঁহার উৎসাহপূর্ণ হৃদয় বিলাত যাত্রা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, নানা কারণে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই; কিন্তু মঙ্গলময় শ্রীহরি তাঁহাকে যে শ্রেষ্ঠ ধন সম্পদের অধিকারী করিবেন বলিয়া বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কাছে পার্থিব সম্পদ নিতান্তই তুচ্ছ। তিনি তাঁহার বিধানই মাথা নত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদেশ-যাত্রা করিলে হয়ত সাংসারিক দিক দিয়া সংসার-যাত্রার পথ সহজ হইতে পারিত, কিন্তু সে অবস্থায় হয়ত আনন্দময়ী পরম জননীর প্রেমের আহ্বান তাঁহাকে এমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারিত না। তাঁহার সেই প্রেমময়ী জননীর স্পর্শেই তিনি সারা জীবন রোগ, শোক, অভাব, অভিযোগ হাসিমুখে বরণ করিয়া, তাঁহারই হস্তে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, আবার সেই স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। জয় জয় তাঁহারই জয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু ইংরাজীতে তাঁহার আশ্চর্য্য মেধা ছিল। এই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের আকুল আহ্বান তাঁহার নিকট পৌঁছায়। পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা ধর্ম্ম-পুস্তকগুলিই তাঁহার অধ্যয়নের অধিক আদরের সামগ্রী ছিল। আচার্য্যের উপদেশ ও প্রার্থনা, প্রতাপচন্দ্রের Oriental Christ, Spirit of God প্রভৃতি ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি তিনি নিরন্তর অধ্যয়ন করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার বাণী তাঁহার প্রাণের ভিতর এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। যৌবনের সমস্ত আবেগ লইয়া তিনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্ত বিশ্বাসী ৺বঙ্গচন্দ্র রায়, ৺ব্রজ সুন্দর মিত্র প্রভৃতির নিকট হইতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরণা পাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে প্রাচীন প্রথানুসারে আত্মীয়বর্গ তাঁহাদের দুই ভ্রাতার একই সময়ে বিবাহ দেন।

২৩ বৎসর বয়সে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা-কার্য্য গ্রহণ করিয়া বাবা ফরিদপুরে চলিয়া আসেন। দেশের অবস্থা তখন আমাদের খুবই সচ্ছল ছিল; জমীদারীর আয়ও নিতান্ত কম ছিল না; বাবার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সংসারের কোন প্রকার প্রলোভন, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা তাঁহার মুক্ত হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ফরিদপুর জিলা স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ৺ভুবন মোহন সেন মহাশয়ের গৃহে আসিয়া

উপস্থিত হন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের যথার্থ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। একদিকে নূতন ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন করিবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে বিরাট আয়োজন এবং অপরদিকে আত্মীয় স্বজনের বিষম আপত্তি, আক্ষেপ, স্নেহময়ী জননীর আকুল ক্রন্দন ও পৈত্রিক সম্পত্তির প্রলোভন। দেশে সংবাদ পৌঁছিল, রাজকুমার ফরিদপুরে গিয়া ব্রাহ্ম হইয়া গিয়াছেন। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। পরামর্শ হইল, কোন প্রকারে তাঁহাকে দেশে আনিয়া ফেলিতে পারিলে, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মাতা গৃহে ছিলেন, অনেক অনুনয় করিয়া আমার জ্যেষ্ঠতাত প্রসন্নকুমার তাঁহাকে বাড়ীতে আসিবার জন্য চিঠি লিখিলেন; কোন ফল হইল না। তাহার পর মাতার অসুখ বলিয়া Telegram করা হইল, বাবা তাহা বিশ্বাস করিলেন না; লিখিয়া জানাইলেন, মহেন্দ্র যদি নিজে আমাকে জানায়, তবে আমি যাইব। রায় সাহেব মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার আজন্ম সুহৃদ এবং পরম বিশ্বাস-ভাজন। পরিশেষে মহেন্দ্র বাবু মায়ের অসুখের সংবাদ দিয়া "তার" করিয়া দেশে লইয়া যান। প্রায় এক বৎসর কাল তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশে তাঁহাকে প্রায় বন্দী জীবন যাপন করিতে হয়। পরে যখন আমাদের জ্যাঠা মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন, তখনই বাবা তাঁহার নিজের অভিভাবক হন। তাঁহার স্বভাবের এমন একটা মধুরতা ছিল যে, অন্যের প্রাণে ব্যথা না দিয়াও নিজের প্রাণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন; তাই জ্যাঠা মহাশয়ের মৃত্যুর পর সমস্ত দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া আবার ফরিদপুর আসিয়া কার্য্যে যোগদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-বন্ধুদের সাথে মিলিত হন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, স্বভাবের মাধুর্য্য ও নম্রতা দেখিয়া আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে আর কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু এখানেই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের সংগ্রাম শেষ হয় নাই। নূতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় তিনি পৈতৃক ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে সমুদয় বিষয় সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামে লিখিয়া দেন। অধুনা এইরূপ দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। স্বেচ্ছায় দৈন্যকে বরণ করিয়া লইয়া, যাহাতে সৎপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার জন্য শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার পর সারা-জীবন ধরিয়া সাংসারিক অস্বচ্ছলতা, দৈন্য, অভাব, অভিযোগ নীরবে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া গিয়াছেন; একদিনের জন্যও এই সব প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে চঞ্চল হইতে দেখি নাই। ইহার মূলে ছিল, তাঁহার সেই আশ্চর্য্য অটুট প্রাণধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম তাঁহার যৌবনের প্রথম উন্মেষেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকের ছটায় প্লাবিত ও বিকশিত হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের খোজ রাখিতেন না, তাঁহারাও তাঁর সৌম্য প্রকৃতি, স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন।

ফরিদপুরে বাবা কর্ম্ম-জীবনের ১৮ বৎসর অতিবাহিত করেন। অতি সামান্য আয় লইয়া, ঘোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, আমাদের এতগুলি ভাই ভগিনীকে তিনি শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। একবার ফরিদপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী এক উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী বাবার এই দরিদ্রতা দেখিয়া কালেক্টরীতে একটা কাজের যোগাড় করিয়া দিতে চান; কিন্তু তাহাতে অন্যায়-পথে যাইবার নানা প্রলোভন আছে মনে করিয়া, তিনি দ্বিধা-শূন্য হইয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার প্রিয় শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত করিয়া লন। আমাদের জ্যাঠা মহাশয় ৺গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত বাবার সাংসারিক জীবনে অভিভাবকের ন্যায় ছিলেন। এবং ৺দেবীপ্রসন্ন রায় মহাশয় তাঁহার অতি সুহৃদ্ ও পরামর্শ-দাতা ছিলেন। সামান্য শিক্ষক হইয়া বাহিরে ছিন্ন কন্থা পরিলেও, তাঁহার হৃদয় বিরাট ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ থাকিত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই ফরিদপুরে বাৎসরিক মেলার কার্য্যকরী সভায়, মেলার অভ্যন্তরে কতকগুলি কলুষিত আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জেলা জজ ও মেজিষ্ট্রেটের সামনে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই দরিদ্র শিক্ষকের দৃঢ়তা দেখিয়া পরদিন মেজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "রাজকুমার বাবু, আপনি এই সকল নিকৃষ্ট আমোদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যে সৎ সাহস দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমি সত্যই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আগামী বৎসর হইতে এই মেলাতে আমার বর্ত্তমানে আর কুৎসিত আমোদ হইতে পারিবে না।" এই সময়ে তিনি ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত উপাসনা করিতেন এবং বড় বড় সভা সমিতিতে ইংরাজী ও বাংলাতে সুন্দর বক্তৃতা দিতেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাবা ফরিদপুর হইতে ভাগলপুরে বদলী হইয়া, আমাদিগকে লইয়া কয়েকদিন ৺নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন এবং পরে ভক্তবিশ্বাসী ৺হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে নিজের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লন। এই সব সাধু জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ভাগলপুর স্থানটী তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। বাঁকীপুরে যাইয়া ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের আবাসে কয়েকদিন কাটাইয়া তাঁহার সহিত গভীর যোগে যুক্ত হইয়াছিলেন। ৺নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার একজন বিশেষ ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন; নগেন্দ্র বাবু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। এই সব ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের সহবাসে তিনি আনন্দেই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্মের ভিতরে ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রাণ সর্ব্বদাই ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া মনে হইত।

ভাল হইবার জন্য তিনি কখনও আমাদের মৌখিক উপদেশ

দেন নাই, আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমাদিগকে বিপথে যাইতে দেখিলে তিনি অন্তরে নীরবে যে যাতনা অনুভব করিতেন, তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়া অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। পাছে তাঁহার কষ্টের কারণ হই, ইহাই ছিল আমাদিগের কঠোর শাসন। তাঁহার সাধুতা-পূর্ণ অন্তরের ইঙ্গিত দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরিচালিত করিতেন। এই বিশিষ্টতা লইয়াই তিনি সকলকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ অবধি আমরা ভাগলপুরে বাস করি। সেই বৎসর ভাগলপুরে ভীষণ আকারে প্লেগ দেখা দেয়। সৌভাগ্য ক্রমে বাবা সেই বৎসরই উত্তরপাড়া স্কুলে বদলী হইয়া আসেন, এবং এই ঘটনা ভগবানের মঙ্গল বিধান বলিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করেন। Uttarpara Govt. School এ কিছুদিন Asst. Head Masterর কাজ করিয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে Govt. র কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন শিক্ষকতা করিয়া শুধু পার্থিব বিদ্যা শিখাইয়াই নীরব থাকিতেন না, ছাত্রদিগকে জ্ঞানে ও চরিত্রে সমভাবে বলবান্ করিতে চেষ্টা করিতেন। পরবর্ত্তী কালে কত ছাত্র কর্ম্ম-জীবনে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার পদধূলি লইয়া যাইতেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া, কিছুদিন সাধু-সঙ্গমে কাটাইলেন এবং তাহাতেই পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন ; কিন্তু কলিকাতার জনকোলাহল হইতে দূরে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তা করিবার জন্য এবং তাঁহারই সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; তাই মাঝে মাঝে গিরিধিতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। গিরিধির নববিধান সমাজের আশ্রম বাড়ীটী তাঁহার সাধনার পক্ষে বড়ই অনুকূল ছিল। গিরিধিতে দুই সমাজেই তিনি উপাসনা করিতেন।

কলিকাতায় থাকিতেও তিনি বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। যেখানে ভগবানের নামকীর্ত্তন হইত, ভাবাবেশে সেখানেই ছুটিয়া যাইতেন। ৺প্রতাপচন্দ্র, কান্তি চন্দ্র, প্রকাশ চন্দ্র, ব্রজগোপাল ও হরিসুন্দর বসু প্রভৃতি বিশ্বাসী ভক্তদলের সহিত তাঁহার আত্মার পরিচয় হইয়াছিল ; সেই পরিচয় রোগশয্যায় আরও বিকশিত হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটস্থ বালীবন, বাগনান হরিনাভী, কোন্নগর প্রভৃতি স্থানে যেখানে মায়ের নাম হইবে শুনিতে পাইতেন, অশক্ত দেহেও ব্যাকুল প্রাণে সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। তাহা ছাড়া তিনি একবার যাঁহার সহিত পরিচয় করিয়াছেন, গভীর প্রেমের বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিতেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার অতি উদার ভাব ছিল ; সকল সাধু ভক্তদের সহিত তাঁহার সমান যোগ ছিল ; তাই আমাদের পরিবারের মধ্যে এ বিষয়ে কোন বিরোধ জাগে নাই। আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির হইতে আসিলেই, কি উপদেশ হইয়াছে, সমুদয় সংবাদ লইতেন।

একদিকে বিধান-বিশ্বাসী ভক্তদলের সঙ্গে যেমন গভীর আত্মিক যোগ ছিল, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখা-মণ্ডলীর সাধুভক্তদের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অকপট মিলন ছিল। ধর্ম্মের রাজ্যে বিরোধ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না।

তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর ক্রমে ক্রমে অপটু হইয়া আসিতেছিল। রোগের প্রথম অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই নীরব সাধনায় মগ্ন থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিতেন। "মা" নাম সাধন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের রোগ-যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা ভগবানের নিকট ভক্তের বিশ্বাসের পরীক্ষা মাত্র। তিন মাস পূর্ব্বে তিনি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়েন এবং দিন দিন জীবনী-শক্তি ক্ষয় হইতে থাকে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার মায়ের ঘরে যাইবার জন্য বড় আগ্রহ করিয়াছিলেন, তাই মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে এ ছোট ঘর হইতে বড় বাড়ীতে নিয়ে চল, একটুর জন্যও আর বেঁধে রেখো না"। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে রোগ-শয্যার পার্শ্বে যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়াছি, চিরদিন তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এতো মৃত্যুর দৃশ্য নয়, এ যে মহোৎসব। কত ভক্ত, কত ধর্ম্ম-বন্ধু, কত ছাত্র, কত আত্মীয় আসিলেন। কি শান্ত তাঁহার মুখশ্রী! বলিলেন, "কোন কষ্ট নাই, শান্তিতে যাচ্ছি।" ধর্ম্মবন্ধুরা মায়ের নামগানে তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিলেন। ইহকাল ও পরকালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। ১৩ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, বেলা ৫টার সময় তিনি আস্তে আস্তে তাঁহার মায়ের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

—০—

মুঙ্গের নববিধান-ভক্তিতীর্থোৎসব।

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমার সোনার মুঙ্গের, আমার প্রাণের মুঙ্গের" ভ্রাতৃগণ, করযোড়ে মিনতি করি, * * একবার লুটাইয়া মুঙ্গেরের ভূমিতে পড়।"

বিগত কয়েক বৎসর এই ভক্তিতীর্থের উৎসব খুব ধুমধামের সহিত হইয়াছিল। এবৎসর যাত্রিগণের সমাগম তেমন হয় নাই। তবে নিতান্ত প্রাণের টানে ৫।৬টী বিদেশী পিপাসু প্রাণ এই ভক্তিতীর্থে মার প্রসাদ পাবার আশায় এসে উৎসবানন্দ সম্ভোগে ধন্য হয়েছেন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর, ৪ঠা পৌষ, এখানকার ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এ সেবক দ্বারা সায়ংকালে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার ভাবে প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সকাতর প্রার্থনা হইয়াছিল। ২০শে

ডিসেম্বর সায়ংকালে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। ২১শে ডিসেম্বর প্রাতে স্বর্গীয় বিধান-প্রচারক ভাই আশুতোষ রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, সায়ংকালে হিন্দিভজন, সঙ্গীত ও পাঠ হয়। ২২শে ডিসেম্বর ৭ই পৌষ, প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা, সায়ংকালে হিন্দিভজন ও সঙ্গীত এবং সংক্ষেপে প্রার্থনা হয়। অদ্যই সায়ংকালে ভাগলপুর হইতে ভগিনী নির্ম্মলা বসু কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যাসহ আগমন করেন। ২৩শে ডিসেম্বর, রবিবার, প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনে ক্রমে উৎসব জমাট হইতে থাকে। ভগিনী নির্ম্মলা দেবী যাত্রিগণের সেবার সুব্যবস্থার ভার লইলেন। অল্পমাত্র যাত্রী আমরা, এই তীর্থভূমিতেই সেবাদির ব্যবস্থা হইল। ঐ দিন প্রাতে মিলিত উপাসনার প্রথমাঙ্গ এসেবক কর্ত্তৃক সমাপন হইলে শেষাংশ ভাই প্রিয়নাথ করেন। অদ্য সায়ংকালীন রবিবাসরীয় উপাসনায় ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা বেশ ভক্তিভাবে হয়। পাটনা হইতে ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ সরকার অদ্য আসিয়া সঙ্গীত করেন। ২৪শে প্রাতের উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়, মোহনের অনুতাপের বিষয়ে প্রার্থনাদি হয়। অদ্য সায়ংকালে শ্রীমান্ গোবিন্দলাল দের বিশেষ উৎসাহে সমাধিগুলি ও ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় পরিশোভিত হইলে আরতি হয়। এই ব্রহ্ম-আরতিতে এখানকার বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও বিহারী আর্য্যসমাজের সভ্যগণ অতি ভক্তিভাবে যোগদান করেন। আরতির সংকীর্ত্তন ও মাতৃস্তোত্র পাঠ হয়, মাঘোৎসবের আরতির প্রার্থনা ভাই প্রিয়নাথ ভক্তিভাবে পাঠ করেন। ২৫শে ডিসেম্বর সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। আজ জগতের মহাসৌভাগ্যের দিন, ব্রহ্মপুত্র মহর্ষি ঈশার শুভ জন্মোৎসব; বেলা প্রায় ৯॥০টায় সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, পবিত্র বেদী হইতে ভাই প্রিয়নাথ ভক্তি ব্যাকুলতার সহিত উপাসনা করেন। মহর্ষি ঈশার শুভজন্মের অর্থ, অধম মানবদিগের দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি, অর্থাৎ পাপীর নবজন্ম বিষয়ে সুন্দর উপদেশ প্রদত্ত হয়। ভগিনী সুনীতিবালা ঘোষের অর্থ-সাহায্যে মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজনের আয়োজন হওয়ায়, তীর্থযাত্রীদের সহিত স্থানীয় বাঙ্গালী, বিহারী বন্ধুগণ একত্রে ভোজন করেন। ভোজনান্তে আর্য্যসমাজের বিহারী বন্ধুগণ ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব ও মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহারা কতকগুলি কূট প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া শেষে নিজেরাই কোন কোন বিষয়ে উত্তর দানে অক্ষম হয়েন; কিন্তু নববিধানের সর্ব্বোচ্চ মত ও সার্ব্বভৌমিক উদার প্রেমের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। যাহা হউক, এই তর্ক বিতর্কের মধ্যে তাঁদের বেশ ধর্ম্মপিপাসা লক্ষিত হইয়াছিল। জামালপুর হইতে খ্রীষ্টীয় বন্ধু আর, পি, চৌধুরী আসিয়া এই উৎসবে ও আলোচনায় যোগদান এবং প্রীতি ভোজন করেন। অদ্য অপরাহ্নে এই মুঙ্গের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার একটি অধিবেশনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সভাপতির কার্য্য করেন। এই তীর্থের কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের নির্দ্ধারণ হইয়াছে। সায়ংকালে ভজন ও সঙ্গীত এবং উপাসনা হয়; ভাই প্রিয়নাথই বেদীর কার্য্য করেন এবং ঈশার দ্বিজত্ব ব্রহ্মানন্দের নবশিশুত্বেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে আত্ম-নিবেদন করিয়া ছিলেন। এবেলার উপাসনাও খুব হৃদয়-গ্রাহী ও ব্যাকুলতাপূর্ণ হইয়াছিল।

২৬শে ডিসেম্বর, প্রাতে আচার্য্য-পত্নী জগন্মোহিনী দেবীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথই উপাসনা ও ব্রহ্মনন্দিনীর জন্মে যে নারীর নবজন্ম ও সতীত্ব প্রতিষ্ঠিত, ইহাই বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন। উপাসনার শেষাংশে বৃদ্ধবন্ধু গোপালচন্দ্র দের স্বর্গীয় মাতৃদেবী শ্রীমতী গোলাপ কামিনী দের স্মৃতি-স্বরূপ যে একটী কূপ এই ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে খনিত হইয়াছিল, ঐ কূপপার্শ্বে একটী স্মৃতি-প্রস্তর-ফলক স্থাপন ও প্রার্থনা হয়। অদ্য অপরাহ্নে এখানকার "মোরিয়ট" ক্লাবে নববিধানের নবভক্তি বিষয়ে ভাই প্রিয়নাথ বক্তৃতা করেন। নববিধানের নিরাকারকে ব্যক্তিরূপে দর্শনে ভক্তি অর্পণ করা, ইহাই নবভক্তির মূলকথা। জীবন্তভাবে ঈশ্বর-দর্শন ও তাঁর বাণী-শ্রবণ ব্যতীত নবভক্তি লাভ হয় না, এই অমূল্যতত্ত্ব বেশ সুন্দর ও ভক্তিভাবে ব্যাখ্যার সহিত, তাঁর নিজের জীবনের ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ করুণার ২।৩টী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন। এই বক্তৃতায় অনেকগুলি বাঙ্গালী ও দুই একটী বিহারী বন্ধু যোগ দেন এবং শেষে আহ্লাদ প্রকাশ করেন। অদ্য সায়ং ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে মাতাদিগের উৎসব, ভগিনী নির্ম্মলা দেবী উপাসনা করেন ও উপদেশে একটী আখ্যায়িকা বলিয়া পাপীর পরিত্রাণের সহজ উপায় বর্ণনা করেন। ভগিনী সুনীতি ঘোষ কিছু পাঠ ও সঙ্গীত করেন। এই মহিলা উৎসবে ২।৩টী হিন্দু খৃষ্টান মহিলা যোগ দেন। অদ্য রাত্রিতেই ভাই প্রিয়নাথ বাগনান যাত্রা করেন।

২৭শে ডিসেম্বর মিস্ মণিকা চাটার্জ্জির প্রবাস-ভবনে উপাসনা ও প্রীতিভোজন; উপাসনা সংক্ষেপে হইল বটে, কিন্তু ভোজনের প্রচুর আয়োজনে আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। অদ্যই সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে শান্তিবাচন। আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে "ভ্রাতৃত্বে একত্ব" বিষয়টী পাঠান্তে, ঐ বিষয়ে সরল ভাবে সমস্ত জগতের সহিত যে আমরা এক ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া প্রার্থনা করা হয়। স্থানীয় কয়েকটী সুগায়ক শেষে মধুর-স্বরে সঙ্গীত করিয়া খুব জমাট করিয়াছিলেন। এই শান্তিবাচন-সম্মেলনে এখানকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। শেষে তাঁদের জলযোগ করান হয়। অদ্য শান্তিবাচনের ব্যয়-ভার মিস্ শান্তিপ্রভা মল্লিক বহন করেন। মার বিশেষ কৃপায়, এবার স্থানীয় বিহারী আর্য্যসমাজের এবং হিন্দু বাঙ্গালী ও খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের যোগদানে, সুমধুর সঙ্গীত ও মিষ্ট বাদ্যরবে উৎসব জমাট

হইয়াছিল। এই সঙ্গীত বিষয়ে ভ্রাতা অবিনাশ চন্দ্র দাস কয়েকদিন মার হস্তে ব্যবহৃত হয়েন। মার কৃপায় এবার নূতন ভাবে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভক্তিতীর্থের প্রধান পাণ্ডা শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ লাল শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই উৎসবে যোগদান করিতে না পারায়, তাঁর অভাবে আমরাও মনে মনে, বড়ই কষ্ট পাইয়াছি এখন মার ইচ্ছায় পূর্ণ হউক। ইতি

মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দির, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৮। সেবক শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়।

ভারতবর্ষীয়-ব্রহ্মমন্দির।

গত ৬ই জানুয়ারী রবিবার মাঘোৎসবের প্রস্তুতির "ভৃত্য-সেবা"র দিন সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-কালে বেদী হইতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ যে আত্ম-নিবেদন করেন, তাহার মর্ম্ম :—

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ, শ্রদ্ধেয়া মাতৃগণ, ভগ্নীগণ! আজ মাঘোৎসবের প্রস্তুতি উপলক্ষে ভৃত্য-সেবার দিন। ভৃত্যদিগের সেবা স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন, তাহাদের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিবার দিন। এটা কত উচ্চ প্রীতি ভক্তির ব্যাপার। যে উচ্চ ভক্তি প্রীতির দৃষ্টি ও ভাবের ভিতর দিয়া চাকর চাকরাণী, মেথর মেথরাণীর জীবনে আমরা দেবত্ব দর্শন করিতে পারি এবং তাহাদের সেবার উচ্চ দিক্ দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাদের সেবাজনিত আমাদের ঋণ স্বীকার করিয়া তাহাদের চরণে প্রণত হইতে পারি, আমাদের জীবনে ভক্তি প্রীতির সে উচ্চ সাধন কোথায়? যিনি আমাদের মধ্যে নববিধানের উচ্চ আদর্শে মাঘোৎসবের প্রস্তুতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তিত করিলেন, সেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবনে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর-প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজন, সৎসাধক, সহধর্ম্মী প্রভৃতি সকলের সঙ্গে এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানা ভাবে ছোট, বড়, দূর, নিকট, যাহার সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক, সেই সম্পর্কগুলিকে ভক্তি প্রীতির উচ্চ স্বর্গীয় দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া, সে সকলের সঙ্গে নবনব ভাবে ভক্তি প্রীতির স্বর্গীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন; তাই সকলকে সেই উচ্চ ভাবে স্বীকার করিয়া ছিলেন, গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোথায় তাঁহার জীবন, কোথায় আমাদের জীবন; কোথায় তাঁহার জীবনের সাধনা, কোথায় আমাদের জীবনের সাধনা!

আমাদের জীবনের অবস্থা স্তরে স্তরে একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি। সর্ব্বোপরি মহান্ যিনি, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর যিনি, প্রথমে দেখি, তাঁহার প্রতি আমাদের যেরূপ ভক্তিমান হওয়া উচিত, তাঁহার পূজা বন্দনায়, তাঁহার সুধামাখা নামগুণ ও যশঃকীর্ত্তনে আমাদের যেরূপ অনুরাগী, যেরূপ প্রমত্ত হওয়া উচিত, কোথায় আমাদের জীবনে সে ভক্তি সে অনুরাগ, কোথায় সে প্রমত্ততা? নবযুগে এই যে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই উপাসনা স্বর্গের কি জীবন্ত পরিত্রাণপ্রদ ব্যাপার! এই উপাসনায় সমস্ত বঙ্গ ভারত উচ্চ গতি লাভ করিবে, সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার পাইবে, সেই পবিত্র পরিত্রাণ-প্রদ উপাসনার প্রতি কোথায় আমাদের তেমন আদর? কোথায় বঙ্গ এবং ভারতের নানা শ্রেণীর নরনারী দ্বারা এই উপাসনা-গৃহ ক্রমে পূর্ণ হইতেছে? নবধর্ম্মের নামে, নববিধানের নামে যে কয়েকটী মুষ্টিমেয় লোক আমরা মণ্ডলী-বদ্ধ হইয়াছি, আমাদেরই বা সেই উপাসনার প্রতি তেমন আকর্ষণ ও উপাস্য দেবতার প্রতি তেমন অনুরাগ ভক্তি কোথায়? যদি সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি প্রীতির এইরূপ অভাব হইল, তাঁহার প্রেরিত অতীতের এবং বর্ত্তমানের সাধু ভক্তমহাজনদিগের প্রতি আমাদের ভক্তি অনুরাগ এবং ভক্তি অনুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জীবনে গ্রহণ ও তাঁহাদের ঋণ-স্বীকার তবে আমাদের জীবনে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সকল দেব-ভাবের উৎস যিনি, তাঁহার প্রতি যদি ভক্তি অনুরাগের অভাব হয়, তাঁহার সঙ্গে যদি জীবনের অকাট্য মধুময় সম্পর্ক স্থাপিত না হয়, তবে পৃথিবীর নিম্নভূমিতে সংসারে, পরিবারে, সামাজিক ও মণ্ডলীগত জীবনে যাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক কিরূপে স্বর্গের ভূমিতে স্বর্গীয় ভাবে সংস্থাপিত হইতে পারে? এ অবস্থায় সে সব সম্পর্ক নিতান্ত সাংসারিক ভাবে নীচ স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

তাইতো এখন দেখিতে পাই, পুত্রকন্যাগণ পিতামাতার ঋণ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আর তেমন ভক্তিমান ভক্তিমতী থাকিতে পারেন না, পিতামাতাও সন্তানদের প্রতি তেমন সরস ভাব রক্ষা করিতে পারেন না। প্রাচীন সমাজে পারিবারিক যে উচ্চ আদর্শ ছিল, ব্রাহ্মসমাজে, নববিধান-পরিবারে কোথায় সে আদর্শ আরও উচ্চতর ভাবে গৃহীত ও রক্ষিত হইবে, না এখন আমরা কার্য্যতঃ সে আদর্শ হইতে কত নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছি। পিতামাতার প্রতি পুত্র কন্যার, পুত্র কন্যার প্রতি পিতামাতার ব্যবহারে সে উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতেছে না, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণে সে উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতেছে না, ভাই ভগ্নীর প্রতি ভাই ভগ্নীর ব্যবহারে সে উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতেছেনা। পরিবার মধ্যে তেমন আর ভক্তি প্রীতির মিষ্ট আদান প্রদান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের সামাজিক জীবনও ক্রমে হীন হইয়া পড়িতেছে। মণ্ডলীর সৎসাধক, সৎ-উপাসকদিগের মধ্যে কি তেমন স্বর্গীয় প্রীতির বন্ধন আছে? সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া, খুটিনাটি উপলক্ষ্য করিয়া, আমাদের মধ্যে কেমন বিরোধ বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতেছে। এই বিরোধ বিচ্ছেদের ফলে, মনে হয়, ব্রহ্ম-মন্দিরের কতগুলি বেঞ্চ এই উপাসনা-

কালে থালি পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আর কি মনে করিতে পারি, গৃহ পরিবার মধ্যে যাহাদের সঙ্গে অতি নিম্নস্তরের সম্পর্ক, সেই চাকর চাকরাণী, মেথর মেথরাণীর প্রতি আমরা নববিধানের উচ্চ স্বর্গীয় প্রেম ভক্তি অনুরাগ মাখা মধুর সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইতে পারি, না, সে উচ্চ আদর্শ অনুসারে স্বর্গীয় সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া তাহাদের সেবার উচ্চ দিক্ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারি, এবং সেই সেবাজনিত ঋণ স্বীকার করিয়া তাহাদের চরণে প্রণত হইতে পারি? গৃহে গৃহে, পরিবারে পরিবারে অনেক সময় চাকর চাকরাণী, মেথর মেথরাণীদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছল্যের ব্যবহারই হইয়া থাকে।

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের অবস্থা সাধারণতঃ যাহাই হউক না কেন, মাঘোৎসব উপলক্ষে নববিধানের প্রস্তুতির ভিতর দিয়া এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা ও ভাবের ভিতর দিয়া, ব্রহ্ম-কৃপাগুণে আমাদের অন্তর এখন এ বিষয়ে অনেকটা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাই অদ্যকার দিন স্মরণ করিয়া, ব্রহ্মানন্দ-জীবনের সেই উচ্চভাবের সহিত মিলিত হইয়া, আমরা সকল ভৃত্য শ্রেণীর নিকট আমাদের কত ঋণ তাহা স্মরণ করি, স্বীকার করি ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাদের চরণে প্রণাম করি। এই দীর্ঘ জীবনে কত চাকর চাকরাণীর, কত ভৃত্য শ্রেণীর লোকের সেবা গ্রহণ করিলাম, সেই সেবায় জীবন রক্ষিত হইল, স্মরণ করিয়া সকলের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র কন্যা জানিয়া তাহাদিগকে সম্মান করি।

আচার্য্যদেব-কৃত ভৃত্য-সেবা বিষয়ে প্রার্থনার অপর অংশে শুনিলাম, আমরা প্রতি জনই ভৃত্য। আমাদের প্রত্তিজনকে প্রকৃত ভৃত্য হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। নববিধান-ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রণী যাঁহারা ছিলেন, শুনিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভক্ত হনুমানের জীবনকে আদর্শ করিয়া ভৃত্যব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ভক্ত হনুমান আদর্শ সেবক, আদর্শ ভৃত্য ছিলেন। কথিত আছে, রাবণ-বধের পর শ্রীরামচন্দ্র সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া যখন গৃহে আসিলেন, সীতা-উদ্ধারে হনুমানের অমানুষিক কার্য্য ও বিশ্বস্ততা স্মরণ করিয়া সীতাদেবী হনুমানকে আপনার গলার বহুমূল্য হার প্রদান করিলেন। হনুমান আপনার গলায় সোনার সেই বহুমূল্য হার দেখিয়া, তাহা যেন বানর-সুলভ স্বভাবের ভাবে দন্তে চিবাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। উপস্থিত সকলে ইহা দেখিয়া হনুমানকে ভর্ৎসনা-বাক্যে বলিল, জগন্মাতা সীতাদেবী তোমাকে আদর করিয়া এই বহুমূল্য হার দান করিলেন, আর তুমি তাহা তুচ্ছ বোধে দন্তদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া সীতা-দেবীর অসম্মান করিলে! ভক্ত হনুমান ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনার বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখ আমার হৃদয়-সিংহাসনে আমার প্রাণের প্রিয়তম উপাস্য দেবতা, জীবন্ত রাম সীতা বিরাজমান। আমি আমার পূজনীয়া মাতা সীতাদেবীর অসম্মান করিব?

হায়! আমরা কি আমাদের উপাস্য দেবতাকে প্রাণের অতি প্রিয়তম জানিয়া সেই ভাবে হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং নিত্য ভক্তি প্রীতির উপহারে পূজা করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য প্রাণপণে সাধন জন্য তেমনই রিয়া প্রস্তুত হইতে পারিয়াছি?

সত্যই যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত, তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক। তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারেন। তাঁহারাই পৃথিবীর নরনারীদিগকে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র কন্যা জানিয়া প্রাণগত যত্নে তাঁহাদের সেবা করিতে পারেন। আমরা তো আমাদের পরম উপাস্য যিনি, তাঁহাকে প্রাণ-সিংহাসনে বসাইয়া তেমন করিয়া তাঁহার পূজা বন্দনা করিতে পারি নাই, তেমন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন জন্য এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়া তাঁহার প্রিয় পুত্র কন্যাদিগের সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই। আসুন, আজ সকলে আমাদের নিজ নিজ জীবনের ত্রুটী স্বীকার করিয়া, অনুতপ্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, এবং ভৃত্যভাবে এই নববিধান-ক্ষেত্রে বিবিধ আকারে তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনে প্রস্তুতি-লাভ জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করি।

সংবাদ।

একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলন—গত ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় সিটি কলেজ হলে, ভারতীয় একেশ্বর-বাদীদিগের সম্মিলন হয়। আমেরিকার মীডভীল Theological স্কুলের প্রেসিডেণ্ট Dr. F C. Southworth M. A., D. D., L L D. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কার্য্য করেন। ২৭শে প্রাতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এবং ২৮শে প্রাতে Dr. Southworth ইংরেজীতে উপাসনা করেন। ২৭শে সন্ধ্যা ৬টায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ হয়; ২৮শে সন্ধ্যা ৬টায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়।

উৎসব—কলিকাতার অন্তর্গত উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৩শে ডিসেম্বর, রবিবার, প্রাতে ৮॥০ টায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী-ভোজন হয়। ২৪শে, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়, প্রাতে ৭টায় নগরকীর্ত্তন, ৮॥০টায় উপাসনা শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করেন, ১০॥ টায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক নারায়ণ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় কানাই লাল সেনের স্মৃতি-সভা হয়; মাধ্যাহ্নিক প্রীতিভোজনান্তে অপরাহ্ণ ২॥০ টায় বার্ষিক সভা, ৪টায় সংকীর্ত্তন, ৫টায় শাস্ত্রপাঠ হইয়া সন্ধ্যা ৬টায় উপাসনা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ করেন। ২৫শে, মঙ্গলবার, প্রাতে ৮টায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন, অপরাহ্ণ ৪টায় বালক বালিকাদের উৎসব হয়, সন্ধ্যা ৬টায় আলোকচিত্রযোগে শ্রীযুক্ত অনাথ কৃষ্ণ শীল বক্তৃতা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক, ২০শে মাঘ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬৪ ভাগ। ২।৩ সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ।
29th January & 13th February, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে অনন্ত উৎসবের অনন্ত উৎস! বাহ্য জগতে যেমন বৎসরের মধ্যে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বর্ষার আগমন হয়, আকাশ হইতে অজস্র বাহিরের বৃষ্টির অগণ্য অসংখ্য ধারার আকারে তোমারই কৃপার ধারা বর্ষিত হইয়া পৃথিবীর বক্ষকে প্লাবিত করে, সরস করে, সুন্দর করে, ফল ফুলে শোভিত করে, শস্য-শ্যামলা করে, কত নূতন সাজে সজ্জিত করে, নূতন রঙ্গে রঞ্জিত করে, তেমনই বৎসরের বিশেষ সময়ে এই মাঘোৎসবে আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তোমার কৃপার মহাবর্ষার সমাগম হয়। তোমার অনন্ত মহোচ্চ চিদাকাশ হইতে অজস্র কৃপার বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে তোমার অগণ্য অসংখ্য পুত্র কন্যাদিগের চিত্ত-ভূমিকে কতই সরস কর, সুন্দর কর, নব নব ফল শস্যের উদ্‌গমে প্রিয় পুত্র কন্যার মন, প্রাণ, হৃদয়, আত্মাকে কত স্বর্গের সাজে সজ্জিত কর, স্বর্গের কত দিব্য বর্ণে অনুরঞ্জিত কর, কত পূর্ণতা দান কর; তোমার বিশ্বাসী অনুরাগী ভক্তগণ সে কৃপা লাভ করিয়া, সে কৃপার সাক্ষ্য দান করিতে করিতে তোমার যশোগানে মত্ত হইয়া বলেন, তোমারই জয়, তোমারই জয়, তোমার ভক্ত বৃন্দের জয়, তোমার স্বর্গীয় নব নব বিধানের জয়। তুমি এবারও এই পবিত্র মাঘোৎসবে কত কৃপা বর্ষণ করিলে, তোমার প্রিয় পুত্র কন্যাদের প্রাণে স্বর্গের কত অমৃত সুধা ঢালিয়া তাঁহাদের জীবনকে সরস করিলে, সুন্দর করিলে, স্বর্গের নব নব ফল শস্যের উদ্‌গম-ক্ষেত্র করিয়া সকলের প্রাণ আশা উৎসাহে পূর্ণ করিলে; তোমার লীলা-তত্ত্বের বিচিত্র কাহিনী কত নব নব ভাবে শুনাইলে, কত দর্শন-তত্ত্ব, শ্রবণ-তত্ত্ব, ইচ্ছাপালন-তত্ত্ব, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের বিচিত্র ব্যাখ্যা দান করিলে; সাধুভক্তদিগের জীবন-গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে জীবনে লইয়া তোমার পূজা বন্দনার কত মহিমা কীর্ত্তন করিলে. সে পূজা বন্দনার কত প্রসাদ দান করিলে, কত মৃত জীবনে নবজীবনের সঞ্চার করিলে, কত মোহাচ্ছন্ন প্রাণে স্বর্গের আলোক ঢালিলে, কত ভক্তি-অনুরাগবিহীন চিত্তে ভক্তি অনুরাগের বারিধারা ঢালিয়া সে সকল চিত্তকে সরস করিলে, উর্ব্বর করিলে। তোমার এ কৃপার জন্য সর্ব্বাগ্রে তোমার চরণে বিনীত অন্তরে, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-হৃদয়ে প্রণাম করি, এবং প্রার্থনা করি, তোমার এই কৃপা বক্ষে লইয়া যেন সম্মুখের সমস্ত বৎসর তোমার পবিত্র নববিধান-ধর্ম্ম সাধন ও পালনে ধন্য হই, কৃতার্থ হই, তোমার বিধি-নির্দ্দিষ্ট পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—:—

গতি পূর্ণতার দিকে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই আপনার ক্রন্দন দ্বারা তাহার প্রাণের ক্রিয়ার সাক্ষ্য দান করে, এবং সংবাদ প্রচার করে, তাহার ভিতরের অভাব পূর্ণ করিতেই হইবে। তাহার প্রথম ক্রন্দন ঘোষণা করে, তাহার জীবনী-শক্তি বর্ত্তমান এবং সে জীবনী-শক্তির গতি পূর্ণতার দিকে। অভাব লইয়া কোন জীবন থাকিতে চায়না, অভাব পূর্ণ করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া জীবনের কার্য্য। ক্রমে শিশুর ছোট বড় হস্তপদ সঞ্চালন, অন্তর বাহিরের প্রত্যেক প্রচেষ্টা প্রকাশ করে, প্রমাণ করে, পূর্ণতার দিকে তাহার গতি। পৃথিবীর পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন শিশুর অভাব পূরণ করিয়া পূর্ণতার দিকে তাহার গতি-ক্রিয়া অবাধে পরিচালনা করিতে সহায়তা করেন, সে পথে নানা প্রকার আয়োজন যোগাইতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। বাহ্য জগতে, কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি জাতীয় জীবনে, কি সমগ্র মানবমণ্ডলীর অখণ্ড জীবনে, শিক্ষা, সভ্যতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্যেক বিভাগের গতিক্রিয়া সাক্ষ্য দান করে, সকলেরই গতি পূর্ণতার দিকে। কিন্তু মানবজীবনের যথার্থ পূর্ণতা আত্মিক জীবনের ভিতর দিয়া। আত্মিক জীবনের পূর্ণতার অনুভূতিতেই পূর্ণতার সম্পর্কে সাক্ষাৎ এবং সত্য অনুভূতি উপস্থিত হয়। মানুষের আত্মময় জীবন তো সুধু পৃথিবীর যাহা, পার্থিব যাহা, সেই সকল বিষয় লইয়া, সেই সকল সুখ সম্পদ লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাইতো আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, ধর্ম্মহীন ধনীর গৃহেও সুখ নাই, শান্তি নাই; শিক্ষায়, সভ্যতায় মণ্ডিত, ধর্ম্মহীন জ্ঞানী, মানী জীবনেও সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। এই সকল অবস্থা সাক্ষ্য দান করে, পৃথিবীর শিক্ষা সভ্যতা, ধন সম্পদ নিত্য কালের জন্য নয়, কিন্তু আত্মময় জীবন নিত্য কালের সামগ্রী; সে নিত্যকালের জন্য সুখ সম্পদ, ধন ঐশ্বর্য্য এবং শিক্ষা সভ্যতা চায়। তাহা সর্ব্বমূলাধার একমাত্র ঈশ্বর হইতেই সম্ভবে। পার্থিব, অপার্থিব যে কোন বিষয়ে, ঈশ্বর হইতে যে শিক্ষা সভ্যতা, ধন ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহাতেই মানব-জীবনের পার্থিব, অপার্থিব, সাংসারিক, পারিবারিক সকল বিষয়ে কল্যাণ, সকল বিষয়ে তৃপ্তি, সকল বিষয়ে শান্তি। মানবজীবনের সকল প্রকার উন্নতি ও পূর্ণতার মূলে ঈশ্বর ও আত্মিক জীবন। তাই ঈশ্বরের পরিচয়, ঈশ্বরের জ্ঞান যে অবস্থার ভিতর দিয়া লাভ হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সম্পর্ক নানাবিধ ভাবে যে উপায় ও যে অবস্থার ভিতর দিয়া স্থাপিত হয়, স্বর্গীয় মিলন সংসাধিত হয়, সেই উপায় ও অবস্থার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তাই ঋষিগণ প্রচার করিলেন, "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পাথারে পড়িয়া মানুষ হাবু ডুবু খাইয়া, শত চেষ্টার পর যদি পায়ের নীচে ভূমি পায়, তখন তাহার প্রাণ স্বীকার করে, প্রাণকে বাঁচাইবার জন্য এখন আশ্রয় পাইলাম, একটা অবলম্বন পাইলাম। তেমনই এই অনিত্য বিষয়ের মধ্যে, অনিত্য বিষয় ব্যাপারের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে, যখন মানুষ ঈশ্বরের সন্ধান পায়, ঈশ্বরকে জীবনের পরমাশ্রয় বলিয়া চিনিতে পারে, জানিতে পারে, পরমাশ্রয় বলিয়া ধরিতে পারে, তখন তাহার জীবনের নিয়তি খুলিয়া যায়; তখন সে বুঝিতে পারে, আমি সুধু এই পৃথিবীর জন্য নই, সুধু পার্থিব বিষয় লইয়া থাকিতে আসি নাই; তখন সে বুঝিতে পারে, আমার জীবনের যথার্থ উন্নতি ঈশ্বরকে লইয়া, ঐশ্বরিক ব্যাপার লইয়া, আমার জীবনের যথার্থ গতি ঈশ্বরের দিকে, আমার জীবনের যথার্থ পূর্ণতা ঐশ্বরিক সম্পদে। শ্রীঈশা বলিলেন, "Be perfect as your Father is perfect." পরম পিতা ঈশ্বর যেরূপ পূর্ণ, তেমনই তোমরা পূর্ণ হও। নববিধানের ব্রহ্ম-দর্শন, ব্রহ্মানুভূতিতে এই পূর্ণতার দিক আমাদের বিভিন্ন জীবনে কত ভাবেই খুলিতেছে। ঈশ্বর সকল প্রকার পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার প্রস্রবণ, ইহা নব বিধানের সহজ ঈশ্বরানুভূতির ভিতর দিয়া নিত্য জীবনে প্রত্যক্ষ ব্যাপারের বিষয় হয়। অন্তরে সাক্ষাৎ ঈশ্বরানুভূতি দ্বারা পরিষ্কার প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহা হইতে আত্মা স্বর্গীয় বল প্রভাব লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, আবার আত্মার প্রভাব হৃদয় মনে পৌঁছিয়া হৃদয় মনকে প্রভাবান্বিত করে, আত্মার প্রভাব হৃদয় মনের ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া

আবার দৈহিক জীবনকেও শক্তি সামর্থ দান করে। ঈশ্বরের কৃপা-স্পর্শে মানব অন্তরে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার হয়, সে ভক্তি প্রীতি হৃদয় মনকে কেমন সরস করে, সুন্দর করে, শরীরকেও সরস করে, সুন্দর করে, পবিত্র করে, স্বর্গের রঙ্গে অনুরঞ্জিত করে। প্রতি জীবনে যেমন আত্মার সঙ্গে হৃদয় মন ও শরীরের নূতন সম্পর্ক খুলিয়া যায়, তেমনই প্রত্যক্ষ হয়, শরীর মন, হৃদয় আত্মা সকলই মানব জীবনকে দেব জীবনে পরিণত করিয়া পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। কেহ আর কাহারও শত্রু নয়, পরস্পর পরস্পরের মিত্র। পরস্পর মিত্রভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের আদেশ ও ইঙ্গিতে মানব জীবনকে ক্রমে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। নববিধানের শিক্ষাতে দেহ, মন, হৃদয়, আত্মার মিলনে যেমন পূর্ণতার দিকে মানব জীবনের গতি প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি নববিধানের শিক্ষাতে গৃহ-পরিবারে, বিস্তৃত মানব সমাজে, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিবশেষে, স্বদেশ-বিদেশ-নির্বিবশেষে, সকলের সঙ্গে ক্রমে আত্মিক মিলন উপস্থিত হয়, কেহ আর তখন কাহারও পর থাকিতে পারে না, কাহাকেও আর পর ভাবিয়া কেহ হৃদয় মন হইতে দূরে রাখিতে পারেনা। বাহিরে নিতান্ত শত্রুভাবে যে উপস্থিত হইতেছে, সেও যে ঈশ্বর-সন্তান এবং সেও আমার সাধন-পথে সহায়তা করিতে প্রেরিত, সেও আমার পরিত্রাণের সহায়, সেও আমার নিত্য কালের প্রাণের বন্ধু, তাহারও সঙ্গে আমার জীবনের গূঢ় মিলন রহিয়াছে। জীবনে এ উচ্চ আলোক যে পর্য্যন্ত না পৌঁছছে, জীবনে পরম গুরুর শিক্ষা ও সহায়তায় এ সিদ্ধান্তে যে পর্য্যন্ত উপস্থিত না হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত আমার আত্মার শান্তি নাই, আরাম নাই, তৃপ্তি নাই, বিশ্রাম নাই। নববিধানের দেবতা সুধু অতীতের, বর্ত্তমানের, ইহকালের, পরকালের সাধু ভক্তদিগকে আমাদের জীবনের সহায় করিয়া, জীবনের পূর্ণতার দিকে গতি-ক্রিয়ার বিধান জন্য তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের জীবনকে মিলিত করিয়া ক্ষান্ত হননা; কিন্তু ক্রমে দেখিতে পাই, পাপী তাপী শত্রু মিত্র নির্বিবশেষে সকলের সঙ্গে আত্মিক মিলনে মিলিত করিয়া দেখাইয়া দেন, একটী জীবনকেও দূরে রাখিলে চলিবেনা, অন্যে পর ভাবিলেও তাহাকে আমার আত্মার পর ভাবিলে চলিবে না, ইহলোকের পরলোকের ছোট বড় সকলের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অমিলন, শত্রুতা বিনাশ করিয়া, গূঢ় আধ্যাত্মিক মিলন-সাধনে, আমার পরিত্রাণ, আমার শান্তি সুখ, আনন্দ ও তৃপ্তি, সকলের সঙ্গে মিলনে আমার জীবনের পূর্ণতা হইতে পরিপূর্ণতার দিকে গতি।

এবারকার মাঘোৎসব আমাদিগকে বিশেষ করিয়া, নূতন সময়ে, নূতন অবস্থার ভিতর দিয়া, নূতন করিয়া শিখাইলেন, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন এবং সেই মিলনের ভিতর দিয়া, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা যোগে তাঁহার পুত্র কন্যা সকলের সঙ্গে মিলন। এই মিলন সাধন ও সিদ্ধির ভিতর দিয়া আমাদের প্রতি জীবনের পূর্ণতা হইতে পরিপূর্ণতার দিকে গতি। ভক্ত কবি সত্যই গাহিলেন, "অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার" "যত তোমায় পাব, আরও পেতে চাব, ততই বাড়িবে বাসনা আমার।"

মাঘোৎসবের প্রস্তুতি হইতে শেষ শান্তি-বাচন পর্য্যন্ত নববিধানের জীবন্ত জাগ্রত দেবতা পরম পিতা, স্নেহময়ী জননীরূপে, পরম-গুরুরূপে, পবিত্রাত্মারূপে, কত রূপে, কতভাবেই শিক্ষা দিলেন, "আমার সহিত মিলিত হও, আমার পুত্র কন্যাদিগের সহিত মিলিত হও।" এ মিলন বাহিরের অবস্থার ভিতর দিয়া নহে, এ মিলন ভিতরের আত্মিক অবস্থার ভিতর দিয়া বিশেষভাবে। বাহিরে অমিলনের সহস্র কারণ সত্ত্বেও পবিত্রাত্মার শিক্ষা ও সহায়তার ভিতর দিয়া, ভিতরে সত্য মিলন, অকাট্য স্বর্গীয় মিলন সাধন করিতেই হইবে। নবযুগে নববিধানে মহাত্মা রাম মোহন এই মিলনেরই সূচনা গাইলেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে এই মিলন-ক্ষেত্রেই, তাঁহার বিধি-নির্দ্দিষ্ট জীবনের অভিনয় করিয়া, নিজের ও সকলের পূর্ণতার দিকে গতি-ক্রিয়ার সহায় হইলেন। তৎপর আসিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সদলে মিলনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে। নবযুগে নববিধান-রূপে এই মহামিলনের সুসংবাদ স্বর্গ হইতে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের ভিতর আসিল। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—ব্রহ্মানন্দ আপনি এই মিলনের ধর্ম্ম পবিত্রাত্মা যোগে সাধন করিলেন, আচরণে অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করিলেন, স্বর্গের নবলীলা নব ভাগবতরূপে এই মিলন-তত্ত্ব-কাহিনী নববিধানের ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন, বিবিধ ব্যাখ্যা, উপদেশ ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া তাহা প্রচার করিলেন, জগতের

জন্য রাখিয়া গেলেন। মাঘোৎসবের বিবিধ উপাসনা, অনুষ্ঠান, পাঠ, প্রসঙ্গ, আলোচনা, ধ্যান, চিন্তনের ভিতর দিয়া পবিত্রাত্মা কেবল এই শিক্ষা দিলেন, এই মহামিলনের পথে জীবনের পূর্ণতার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হও, এখনও কিছুই তোমাদের হয় নাই বলিলেই হয়, সামান্য হইয়াছে, অসামান্য সম্মুখে, ভয় নাই, অগ্রসর হও; অগ্রসর হও, আর দেখ, পূর্ণতার পর পূর্ণতা, ক্রমাগত পূর্ণতা, ধারে নয়, নগদ; দেখ, এই পূর্ণতার পর পূর্ণতার ভিতরে কত তৃপ্তি, কত সম্ভোগ, কত অমৃত, কত সুখ, কত শান্তি, কত আনন্দ, কত অমর জীবন তোমাদের জন্য রাখিয়াছি; দিব্য-অনুভূতির ভিতর দিয়া সম্ভোগ কর, প্রত্যক্ষ কর, আর অগ্রসর হও।

এবার এই মাঘোৎসবের আয়োজনের ব্যাপারে বাহিরে কি অমিলন নাই? ভিন্নতা নাই, বিচ্ছেদ নাই? কিন্তু এই বাহ্য অমিলন, ভিন্নতা ও বিচ্ছেদের ব্যাপারকে মিলনের আয়োজনরূপে পরিণত করিয়া, ক্রমাগত গূঢ় অন্তরের স্থায়ী নিত্য-মিলন-বার্ত্তা ঘোষণা করিবার এবং স্থায়ী অন্তরের মিলন শিক্ষা দিবার জন্য এবার মাঘোৎসবের আগমন। ধন্য লীলাময়ী জননী, ধন্য তাঁর জীবন্ত লীলা, ধন্য তাঁর নববিধান।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের প্রেম।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলেন, "নববিধান আর কি? প্রেম।" বাস্তবিক নববিধান যার প্রেম-স্বরূপ। সার্ব্বজনীন প্রেম, সর্ব্বজনকে প্রেম, ইহাই নববিধান। আপনার জনকে প্রেম করা, সেতো পুরাতন কথা। পশুরাও আপনার পরিজনকে প্রেম করে, ভালবাসে। আপনার পরিবার, আপনার দল, আপনার জাতি, আপনার দেশকে সকলে প্রেম করে, ভালবাসে, কিন্তু পরকে আপনার বলা, জগৎকে ভালবাসা, সকল সম্প্রদায়কে উদারভাবে প্রেমে নিবদ্ধ করা, ইহাই নববিধান।

দেওয়া ধন।

যে বস্তু উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহাতে আর আমার অধিকার নাই। যে প্রাণ প্রাণপতিকে দেওয়া হয়, তাহাতে কি আর আমার কোন অধিকার আছে? তাহার উপর অন্য কাহারও আধিপত্য চলে না, সেই একজনেরই আধিপত্য তাহার উপরে। তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া যদি অন্য কাহারও মন যোগাইতে প্রাণ দিই, তাহাতে ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হই।

উদ্বাহ।

উদ্বাহের প্রকৃত অর্থ উর্দ্ধে বহন করা। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে উচ্চ জীবন যাপনে সমুন্নত করিবেন, ইহার নাম উদ্বাহ। বিবাহের উদ্দেশ্য নরনারীর দৈহিক মিলন বা সাংসারিক চুক্তি বন্ধন নয়। উভয়ে উভয়কে উচ্চতর জীবন-লাভে সহায়তা করিবেন বলিয়াই স্বয়ং বিধাতা তাঁহাদিগকে উদ্বাহিত বা মিলিত করেন। এই নিমিত্ত স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিত করা হয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পর এক ধর্ম্ম অবলম্বনে, এক ধর্ম্ম-সাধন উদ্দেশ্যেই সংসার-সাধন করিবেন। উভয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় করিয়া,ব্রহ্মেতে তাঁহাদের মিলিত হৃদয় সমর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহারই ইচ্ছা বুঝিয়া, তাঁহারই অভিপ্রায় সাধনের জন্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। পতি পত্নীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র, স্বর্গীয়; সতী যেমন দেহ মন প্রাণ সকলই পতিকে অর্পণ করেন, একমাত্র পরমপতির প্রতিমূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার অনুগামিনী হন, তেমনি পতিও সতীকে সেই পরম প্রকৃতির প্রতিমা জানিয়া তাঁহার সেবা করিবেন এবং পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম-রক্ষায় সহায় হইবেন। কেবল নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য পরস্পরকে গ্রহণ করিবেন না। বাস্তবিক পৃথিবীতে প্রেম-পরিবার, সুখী পরিবার, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই উদ্বাহ।

ব্রহ্মাগ্নি।

অগ্নি আছে, অথচ তাহার দাহিকা-শক্তি নাই, কিম্বা তাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয় না, ইহা যেমন অস্বাভাবিক, ব্রহ্ম আছেন, অথচ তাঁহার পূজায় জীবনে তাঁহার প্রভাব সঞ্চারিত হয় না, তাঁহার জ্যোতি আত্মায় প্রতিফলিত হয় না, ইহাও তেমনি অপ্রাকৃত। ব্রহ্ম আছেন, জীবন্তরূপে ইহা বিশ্বাস করিলে, তাঁহার সমীপস্থ হইলে, তাঁহার স্বরূপ জীবনে প্রতিবিম্বিত হইবেই হইবে।

স্বর্গীয়া দেবী নরেশনন্দিনী পাল।

(গত ১৪ই মাঘ, বাঁকীপুরে, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী কলিকাতায় ঝামাপুকুর-নিবাসী স্বর্গীয় দীননাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা ছিলেন। ১২৮০ সালে, ১৫ চৈত্র, কোন্নগরে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয় ও শৈশবাবস্থায় সেখানেই ছিলেন। বাল্যাবস্থায় কলিকাতায় ঝামাপুকুরের বাড়ীতে আনীত হন ও দাদামহাশয়ের বাড়ীতে একটী মিশনারী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। লেখা পড়ার দিকে মার বরাবরই খুব ঝোঁক ছিল। আজীবন অবসর সময়ে নানাসদ্‌গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকাদি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁর এই ঐকান্তিক আগ্রহই আমাদের সব ভাইবোনদের উচ্চশিক্ষালাভে উৎসাহিত করিয়াছে।

১২৯২ সালে, বৈশাখমাসে, ২৪ পরগণায় অন্তর্গত বেলসিংহার সুবিখ্যাত পালবংশে তাঁহার বিবাহ হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয় ইহার পূর্ব্বেই

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোকামায় বাস করিতেছিলেন। আমাদের পিতৃদেব তাঁহারই নিকট থাকিতেন। বিবাহের পর প্রায় ২ বৎসর তিনি কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মাত্র এই ৩ বৎসর মা পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তার পরই মাকে মোকামায় আনা হয়। ইহার পর হইতে আর কখনও তিনি বাবা, মার কাছে গিয়া থাকিবার সুযোগ পান নাই। এমন কি, তাঁহাদের শেষ সময়ও তিনি উপস্থিত থাকিতে পান নাই।

ইংরাজি ১৮৮৮ সালে, বাবা বাঁকিপুরে আসিয়া প্রথম ব্যবসায় আরম্ভ করেন। নিতান্ত সম্বলহীন অবস্থায় ব্যবসায়টী আরম্ভ করা হয়। সে সময়ে মার অতি অল্প স্বল্প যা গহনা ছিল, সবই তিনি সানন্দে বাবার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মার সেই গহনা বন্ধক রেখেই এই ব্যবসায়ের প্রথম আরম্ভ হয়।

মায়ের ১৮ বৎসর বয়সে বাবা ও মা দুজনে একসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রচারক স্বর্গীয় অমৃত লাল বসু মহাশয়ের নিকট নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হয়েন। সেই সময় থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন দৈনিক উপাসনা করতেন। মার সৌভাগ্যবশতঃ এখানে এসে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগ হয়। তিনি ও তাঁর সহধর্ম্মিণী মাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। তাঁদের সঙ্গে থাকাতে সেই অল্প বয়সেই মার মনে বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও বিলাসিতাকে ঘৃণা করতে শেখেন। সেবা ও কর্ম্মকুশলতার জন্য প্রথম থেকেই তিনি সকলের খুব প্রিয়পাত্রী হতে পেরেছিলেন।

মাতুলালয়ে ও পিত্রালয়ে মাকে কখনও সংসারের কোনও কাজ করতে হয় নাই। অথচ মোকামায় আসিবার পরই তিনি সেখানে সংসারের প্রত্যেকটী কাজই একে একে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ছিলেন। তিনি এমন সুন্দর নিখুঁৎভাবে প্রত্যেকটী কাজ করতেন যে, কেউ কোন দিনই বুঝ্‌তেই পারেননি, যে এর আগে তিনি কখনও ঐ সমস্ত কাজ করেননি। অল্প আয়ে নিজের পরিশ্রম ও কর্ম্মকুশলতার গুণেই মা বরাবর আমাদের এই বৃহৎ পরিবারের সকলকে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যের পথে রাখ্‌তে পেরেছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে প্রকাশ পেত। যতদিন মার শক্তি ছিল, বাড়ীখানিকে ছবির মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোরে সাজিয়ে রাখতেন।

খুব ছোটবেলায় ও কোলে ছোট ছেলেমেয়ে থাকা সত্বেও প্রতি রবিবারে নিয়মিতভাবে সামাজিক উপাসনায় ও উৎসবের সময়েও প্রতি উপাসনায় যোগ দিতেন। আগে যখন বাঁকিপুরে অল্প কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবার ছিলেন, তখন উৎসবের সময় দিনব্যাপী উৎসবের দিন প্রায় প্রত্যেক পরিবার থেকে এক এক রকম তরকারী রাঁধিয়া আনা হইত। মা প্রত্যেক বারেই পায়েস ও একটী ব্যঞ্জন রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। মায়ের হাতের রান্না বড় চমৎকার ছিল। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয় অসুস্থাবস্থায় মায়ের হাতের শুক্তানী ও পানিফলের ডালনা খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন। শ্রদ্ধেয় প্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় মায়ের হাতের দই ও অন্যান্য রান্নাও খেতে খুব ভাল বাসতেন। যখনই তিনি এখানে আসতেন, মা প্রত্যেকদিন তাঁর জন্য দই ও কোন না কোন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া পাঠাইতেন।

নববিধানের আদর্শে গৃহস্থ সাধিকার মতই মা প্রত্যেক বিষয়ে দৃষ্টি রেখে চলতেন। আমাদের পারিবারিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানে নববিধানের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চেষ্টা কোরতেন। তিনি পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া নিয়মিতভাবে প্রত্যূষে নামপাঠ ও সন্ধ্যায় গান ও প্রার্থনা করিতেন। রোগে, দারিদ্র্যে ও সন্তান-শোকেও তিনি কখনও ভগবানে বিশ্বাস হারান নাই। বরং সন্তানের পীড়ার সময় আরও বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সঙ্গে ভগবানের হাতেই তাদের ভার দিয়ে প্রাণপণে সেবা করতেন। চারিটী সন্তানকে ভগবানের হাতে তুলে দিয়েই তাঁর পরলোকে বিশ্বাস ও ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস আরও গভীর হয়।

ঋণকে তিনি বড় বেশী ভয় করতেন। তাই আমাদেরও বরাবরই সাদাসিধা ভাবে রাখ্‌তেন ও থাকতে বলতেন। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় মা কখনও করেন নাই। অথচ অল্প আয়ের মধ্যেই প্রত্যেক পারিবারিক অনুষ্ঠানে এমন যত্ন ও পারিপাট্যের সহিত আহারের ব্যবস্থা করিতেন যে, নিমন্ত্রিতেরা তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন ও তাঁর রান্নার প্রশংসা করতেন।

সেবা মায়ের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল। এমন প্রাণ ঢেলে অন্যের সেবা করতে খুব কম লোকেই পারে। বাঁকিপুরে আসবার পরই, মাত্র ১৫।১৬ বৎসর বয়সে, অনাহুত ভাবে, আগ্রহের সঙ্গে, স্বর্গীয় প্রবোধ চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্ত্রীর সেবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি যক্ষ্মা রোগে পীড়িতা ছিলেন; কিন্তু তা সত্বেও মা একটুও ভয় পান নাই। মার এই সেবাপরায়ণতা ও নির্ভীকতা দেখে স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁকে "ব্রহ্মসেনা" নাম দেন। তারপরে বরাবরই তিনি পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করে এসেছেন।

আমাদের পূজনীয়া জ্যাঠাইমা শেষ সময়ে পীড়িতাবস্থায় মার কাছেই ছিলেন। তিনিও মার নিপুণ সেবা যত্নে খুবই তৃপ্তি লাভ করতেন ও শেষ সময়ে মার কোলেই মাথা রেখে "মা" "মা" বলতে বলতে পরম জননীর কোলে আশ্রয় লাভ করেন। আমাদের পূজনীয় জ্যেঠামহাশয় শেষ অবস্থায় প্রায় ৩.৪ বৎসর শিশুর মত অবুঝ হোয়ে পড়েছিলেন। তিনি রোগ-শয্যায় যখন শুয়ে থাকতেন, সেই সময়ে ও অন্যান্য সময়েও নানারকমের আবদার করতেন। মা সংসারের সকল কাজ করেও জ্যাঠামহাশয়ের সকল রকম আবদার সহ্য ও পালন

করতেন ও পীড়ার সময় ছোট শিশুকে যেমন ভাবে সেবা শুশ্রূষা করা হয়, ঠিক তেমনি করেই তাঁর সেবা করতেন।

পাড়ার এবং আমাদের পরিচিত ব্রাহ্মপরিবারের কাহারও সন্তান হইলে, সে সময়ে নিকটে থাকিয়া মা সকল বিষয়ে খুব সাহায্য করতেন। মা বরাবরই তাঁর ছোট বোনদের খুব খোঁজখবর নিয়েছেন। যখনই তাঁদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হোয়ে পড়তেন, মার কাছে এসে থাকতেন ও মার সেবা যত্নে সুস্থ হোয়ে ফিরে যেতেন।

আমরা ভাইবোনেরা লেখাপড়া ও কাজ কর্ম্মের দরুণ প্রায়ই বিদেশে থাকতাম। সে সময়ে মা আমাদের যে সব ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ণ চিঠি লিখতেন ও যে ভাবে প্রত্যেক চিঠিতে লিখতেন, "তোমাদের ভার আমি মা জননীর ওপর দিয়েই তোমাদের দূরে রেখেও নিশ্চিন্ত রয়েছি," তা পড়ে আমাদেরও মনে ভক্তি ও বিশ্বাসের সঞ্চার হোত। মনে হোত, যেন সকল সময়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ আমাদের ঘিরে রেখেছে।

গত ৭।।০ বৎসর থেকে মার শরীর অসুস্থ ছিল। ১৯২১ সালে আগষ্ট মাসে তিনি প্রথম এই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েন। কিন্তু খুব বেশী পীড়িতাবস্থা ছাড়া কখনও বিছানায় শুইয়া থাকিতেন না। নিজের কাজ নিজেই করবার চেষ্টা করতেন। রোগের সময়ও নিয়মিত ভাবে উপাসনা করতেন। ভগবানে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের জোরে রোগে শোকে কখনও বেশী কাতর হইতেন না। এমন অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করতেন যে, আমরাও অনেক সময় মার যন্ত্রণা সম্যক উপলব্ধি করতে পারতাম না।

বাঁকিপুরের তৎকালীন প্রাচীন যে কয়েকটি ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ হোয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ স্বর্গলোকবাসী। যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের পূজনীয় শ্রদ্ধেয় গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই নিদারুণ শোক-সংবাদ পেয়ে আমাদের পিতৃদেবকে যে চিঠি দিয়েছেন, তা আপনাদের কাছে নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

NAMKUM P.O.
RANCHI
January 21, 1929.

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ!

আজ্ আমাদিগের নিকট কোন নিদারুণ সংবাদ আসিল! আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী আর এ পৃথিবীতে নাই! প্রাচীন বাঁকিপুর ভগিনী-সমিতির এক মহান্ স্তম্ভ খসিয়া পড়িল! এক পুত্রকন্যা-সমন্বিত বিশ্বাসী পরিবার হইতে মহীয়সী জননী দেবী চলিয়া গেলেন! এক সন্তান-পালন-ব্রতে চিরব্রতা কর্ত্তব্য-পরায়ণা আদর্শ মাতা তাঁহার পুত্রকন্যা ও চিরভক্তিমান্ স্বামীর সমক্ষে পৃথিবীর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন! বাঁকিপুর ব্রাহ্মপরিবার এক বর্ষীয়সী জননীকে হারাইলেন! আজ আমাদিগের সম্মুখে সেই প্রাচীন স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। তাঁহার সেই উপাসনা-প্রিয়তা, তাঁহার সেই একাগ্রতা ও তাঁহার সেই বিশ্বাসের অটলতা এখনও আমাদিগের সম্মুখে জীবন্ত চিত্রের ন্যায় জাগিয়া উঠিতেছে। সেই যে কিঞ্চিদূন ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদিগের সহযাত্রী রূপে কন্যা অমরবালা ও শিশু পুত্রকে লইয়া ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠ অপূর্ব্ব কৃষ্ণের সহিত কটক গমন করিয়াছিলেন এবং আমাদিগের পূর্ণ দলের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের বেলাভূমি, খণ্ডগিরির উচ্চপর্ব্বত, বৌদ্ধ মন্দির, চিল্কার তট এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহার উদাম ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন, সে স্মৃতি আজ আমাদিগের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিতেছে!

পৃথিবীর কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া ভগিনী আজ বিশ্রামলাভ করিলেন। আজ স্বর্গবাসী দেবদেবীগণ স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। নববিধান তাঁহার জীবনে পূর্ণ হইল। আজ আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে আপনাদিগের নিকট সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা সেই শান্তিদাতা শ্রীহরির চরণে সেই প্রেত ও প্রস্থিত ভগিনীর আত্মার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করি।

শোক-সন্তপ্ত—
গৌরী প্রসাদ মজুমদার
ও পরিবারবর্গ।

মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র।

(পৌষের—১৩৩৫, "বসুধারা" হইতে উদ্ধৃত)

মুসলমান-সাম্রাজ্যের অবসানের পর বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলায় একটা প্রবল ভাবের বিপ্লব আসিয়াছিল। একটা জাতির অধঃপতনের যত কিছু কারণ হইতে পারে, সব একে একে আসিয়া জুটিয়াছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বলতা ও হীনতার বিষবীজ শুধু উপ্ত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—অঙ্কুরোদ্গত বৃক্ষরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহার হাওয়ায় অবসন্ন বাঙ্গালী জাতি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল; আবার সেই মুমূর্ষু জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল তরুণ উন্নত পাশ্চাত্য জাতি। বাণিজ্য-ব্যপদেশে সে ভারে ভারে তাহার জীবনীশক্তির রস-সম্ভার লইয়া—তাড়িৎ-প্রবাহের মত আসিয়া—এই মুমূর্ষু জাতিকে চমকিত করিয়াছিল। এই নূতন রস-প্রবাহ—তাহার দেহে সঞ্চারিত হইয়া এই মুমূর্ষু জাতি নবযৌবনাশায় জাগ্রত হইয়াছিল। সেই নবযৌবনের প্রথম উষার উন্মেষ হয় রাজা রামমোহনে—অরুণরাগ-রঞ্জিত হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে—আর অরুণরশ্মি সঞ্চারিত হয় কেশবচন্দ্রে।—আজ দুঃখের বিষয়, আমরা ইঁহাদের ভুলিতে বসিয়াছি। এই তিন মহাপুরুষের সাধনালব্ধ ভাবের ত্রিবেণী-ধারায় যে নূতন বাংলা

গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি?—স্বাধীনতা-প্রয়াসী হইয়া আমরা "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলিগ" স্থাপন করিবার আগে রাজা রামমোহনের "Independent India —Friend of the united kingdom of Great Britain and Ireland" ইত্যাদি আদর্শের কথা কেহ কি স্মরণ করি? যখন আমরা পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় সভ্যতার মোহে অভিভূত হইয়া বিজাতীয় সংস্কারের অনুকরণ করিতে যাই, তখন নীরব সাধক দেবেন্দ্রনাথের "ব্রহ্মবাণী" ও "ব্রহ্ম-বিহারের" আদর্শ কি আমরা ধ্যান করি? যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীর ধর্ম্মকলহে আমরা প্রবৃত্ত হই, তখন কি আমরা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধনা ও ধর্ম্মবাণী উপলব্ধি করিবার চিন্তা করি? —ভারতের "বাণী" ভারতের "স্বাতন্ত্র্য"—কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিতে সর্ব্বপ্রথমে গিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে কেশব চন্দ্র পাশ্চাত্য-জাতির সহিত ভারতের একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সাগরপারে গিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয়তা-বোধকে সুস্পষ্ট ভাবে কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র শুধু একজন সংস্কারক ছিলেন না। রাজা রাম-মোহন "বেদান্ত-প্রতিপাদিত সত্যধর্ম্ম" প্রচার করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে সকল ধর্ম্মের ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম-মোহনের পর কেশবচন্দ্র সকল ধর্ম্মের উপাসনা-প্রণালীর একটা সমন্বয় করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন।

রামমোহন যেমন বাংলা গদ্যের আকার দিয়াছিলেন—কেশবচন্দ্র তেমনি তাহাতে প্রকৃতপক্ষে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। রামমোহনের পর বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের বাংলা গদ্য রচনাই সরল সরস প্রাঞ্জল ভাবে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত দেখিতে পাই। তাঁহার প্রার্থনার ভাষা, তাঁহার বাংলা বক্তৃতার ভাষা, তাঁহার "সেবকের নিবেদনের" উচ্ছ্বাস খাঁটী বাঙ্গালীর হৃদয়স্পর্শী ভাষা। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা কেশবচন্দ্রের এই দান একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি যে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা বাংলা গদ্যের অনুবাদ-শাখা গঠন করিয়া—অন্য ভাষার ভাব-সম্পদের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি যে বাংলা ভাষাকে ভাবপূর্ণ সতেজ ও প্রাণময় করিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তরের নিগূঢ়ভাবের বাহন করিয়াছিলেন বাংলা ভাষাকে, একথা আমরা বাংলা ভাষার আলোচনা করিতে কোনও সাহিত্যিক অধিবেশনে কোথাও একবার বলি না। রামমোহনের ভাষায় সংস্কৃত ও ফারশীর প্রভাব ছিল—কেশবচন্দ্রে তাহা আদৌ ছিল না।—কেশবচন্দ্রের ছোট-ছোট কথা ভাব ও কবিত্বে পরিপূর্ণ।

"সুখ কি পেয়েছি? তোমার সিঁদুরের মত ঠোঁট দেখে আমার কালো ঠোঁট সিঁদুর হয়ে গেল। হাসিতে কেঁপে উঠলে, একি হয়েছে? আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব।—"

"আমি যে শুক্‌নো পাতা কুড়ায়ে মরিতাম—আমার কি হইল? ভক্তিতে মাতিলাম? খুব মাতাও—ভারত মাতিবে, জগৎ মাতিবে।"

"হিন্দুস্থানকে আমার ভালবাসিবার আর একটী হেতু আছে। সেইটি এই হিন্দুস্থান—গোপাল-পূজার স্থান। এই পূজার মহিমা অন্যত্র নাই।"

"কিন্তু ভক্তের জীবনে এমন অবস্থা আছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি ঈশ্বরকে একটী ছেলের মত করিয়া, প্রাণের পুতুল করিয়া বক্ষে রাখিতে পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই তাঁহার প্রাণ শীতল হয় না। যেমন কোমল শিশু আদরের বস্তু, সেইরূপ সুকোমল ঈশ্বর ভক্তের আদরের ধন। দুইটি হাতে তুলিয়া লইয়া বারংবার শিশুর মুখ চুম্বন করিলে কি সুখ হয় এবং সেই শিশুর কোমল মুখ দর্শন করিতে করিতে যখন চক্ষু হইতে বাৎসল্যের অশ্রু পড়ে, তখন কি শোভা হয়, পৃথিবীর পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা কর। সেই মুগ্ধ অবস্থায় পিতামাতার জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। ছেলের প্রতি আদরের কথা কি শুন নাই? পিতামাতা যাই ইচ্ছা তাই করেন শিশুকে লইয়া। সেই পাগলের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহা স্বর্গের সৌন্দর্য্য, কেন না সেই ব্যবহারে আত্ম-বিস্মৃত হওয়া যায়।"

"আমার ইচ্ছা, আমার বিনীত অনুরোধ, ব্রাহ্ম-ভক্তেরা এইরূপ বাৎসল্য-ভাবে ব্রহ্মপূজা করেন। যে ভাবে পিতামাতা আপনাদিগের শিশু-সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা কি হয় না সেইরূপ বাৎসল্য ভাবে আদর করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি—প্রাণের মধ্যে রাখি, ঈশ্বরকে এইরূপ আদর করা কি স্বাভাবিক নহে? গোপাল আসেন পৃথিবীতে খেলা করিতে। আমাদিগের ঈশ্বর খেলা করিতে ভালবাসেন।"

"জগতের কর্ত্তা গম্ভীর-প্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া গম্ভীরভাবে পূজা করিব; কিন্তু যখন সেই আদিপুরাণপুরুষ মহেশ্বর দুই পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় হইয়া আসিবেন, তখন কি করিব? সেই সময় যদি উপনিষদ পাঠ অথবা স্তবস্তুতি করি, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন, ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকট ঐ সকল চাই না, আমি আজ শিশু-প্রকৃতি লইয়া বাল্যভাবে তোমার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছি।"

"বৃদ্ধ-ব্রহ্ম পূজা করিয়াছি, এখন আমি শিশু-ব্রহ্মের পূজা করিব। আমার এমন কি সৌভাগ্য যে ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিবেন। এত বড় যিনি, তিনি ছোটছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেলা করিতে আসিয়াছেন। এমন সুমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়া করিব। ছাদের উপর গিয়া ছোট গাড়ীর মধ্যে সেই ছোট শিশুকে বসাইয়া সেই গাড়ী টানিব।"

"আমি গোপালের শিশু ভাব দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম। হরির মুখ দেখিয়া হরিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া গেলাম, আর উঠিতে পারিলাম না। হরিকে কোথায় রাখিব জানি না। সুকোমল ব্রহ্মকে প্রাণের ভিতর রাখি, বুকের মধ্যে রাখি, মস্তকের উপর রাখি, স্কন্ধে রাখি। জগৎ, তুমি আমাকে গোপনে এই কাজ করিতে দাও।"

"ঈশ্বর—পিতা, রাজা, গুরু, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি আকার ধরিয়া আমার ঘরে অনেকবার আসিয়াছেন; আজ বালক হইয়া আসিয়াছেন, এই সোণার পুতুলকে কোথায় রাখিব? কেমন করিয়া তাঁহাকে এরূপ পরিতুষ্ট করিব যে বারবার তিনি আমার বাড়ীতে আসিতে ভালবাসিবেন। তিনি বলিলেন যে, সে বড় ছেলেমানুষ, আমার সঙ্গে খেলা করিতে ভালবাসে।"

"বৃহৎ ব্রহ্মকে শিশুর ন্যায় দেখিব। খেলার ঘর বান্ধি। দশজন বিদ্রূপ করিবে? কি করি, পাঁচ দিন উপহাস করিবে। কিন্তু, আমি যে অনন্তকালের সঙ্গী পাইব। ছেলেবেলা ছোট ছোট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা করিতাম। এখন আবার ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হাঁড়িতে রান্ধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইব, ছোট দুধের বাটিতে তাঁহাকে দুধ দিব। পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল ভক্তির নিগূঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তুমি কি বলিতে কি বুঝবে? আদরের ঈশ্বর সকলের আদরের ধন হউন, এইভাবে আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।"

উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে—এই গদ্যে সংস্কৃতের প্রভাব নাই, একেবারে সাধকের প্রাণের ভাষা—স্থানে স্থানে ইংরাজী ভাষার প্রভাব আছে। "পৃথিবী,—তোমার কাছে" ইত্যাদি, "আদরের ঈশ্বর—," "পৃথিবীর পিতা মাতা" "পাগলের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত।" প্রভৃতি শব্দে, বাক্যে বা পদে একটু ইংরাজী গন্ধ আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও কেশবের প্রতিভায় তাহা খাঁটী বাঙালীর ন্যায় প্রয়োগ হইয়াছে।—

কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কাব্যের মাধুর্য্য মিষ্টিক ভাবসম্ভারের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন—কথিত চলিত ভাষাকে সুন্দর ছাঁদে সাজাইয়াছেন—সতেজ প্রাণময় গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"তোমার প্রেমখানা ভারি কোমল, ফুলগুলোও টিপ্‌লে বোধ হয় যেন পাথর—তোমার প্রেমের তুলনায়।"

"হে পুণ্যময় জগদীশ, ইচ্ছা করে দৌড়ে গিয়ে গায়ে হাত দি তোমার! কেন এমন সুন্দর হয়ে এলে? আপনার মুখ আপনি আঁক; এ বেদেও নাই—কোরাণেও নাই।"

"আমি ও-মুখ খুব ভাল করে দেখ্‌ব—এই যে কাছে আসছি, আর গা দিয়ে কি খ'সে যাচ্ছে—খোলসের মত পড়ে যাচ্ছে। ঐ যে জ্যোৎস্না গায়ে পড়্‌ল, চামড়া মলা শুদ্ধ পড়ে গেল। একটা কি প্রকাণ্ড চামড়া! আমার প্রাণটা হালকা হয়ে যাচ্ছে। এত কাছে এয়েছ তুমি—তোমার সুন্দর যে মূর্ত্তি—শেষে খুব সুন্দর হয়ে উঠ্‌লে তুমি—এটা কথার দোষ—ছিলেই তুমি সুন্দর। আমার এই পোড়া চক্ষুটা দেখ্‌তে পাচ্ছে—সব রংগুলি মিলে কি সুন্দর হ'ল!"

"যাদের মুখ দেখ্‌লে পৃথিবীর লোকের ঘৃণা হয়—তুমি তাদের মুখ দর্শন করতে চাও। পোড়ামুখে কেমন করে সোণার দৃষ্টি পড়ে বল দেখি?"

"তাকাইয়া আছ, পদ্মফুলের ন্যায় চক্ষু ফুটিয়াই আছে। কি দেখছ? তোমার কাছ থেকে টাকাকড়ি চুরি করে নিয়ে কত অস্ত্র কিনেছি—তাই দেখছ? একবার রাগ্‌লে না। একবারও না? রাগাবার জন্য এত করলাম—ঘাট হয়েছে, তুমি স্নেহময়!"

"কোথায় সূর্য্য, কোথায় পিঁপড়ে। একটা সাধু একটা পাতকী—দুই তোমাকে ডাক্‌ছে। কে আগে তোমার গান ধরে—কে আগে তোমার স্তব করে? নদী আগে ধ্যান করবে, না ফুল আগে ধ্যান করবে? কে আগে নমস্কার করবে? হুড়াহুড়ি লেগেছে। আমি জান্‌তাম—আমরাই ব্রহ্মজ্ঞানী,—এখন দেখি, ব্রহ্মাণ্ডটাই কেমন যোড়হাতে তোমার পূজাটি করে।"

"এই ত ঘাট, এই তো সেই পরলোক সমুদ্রের ঘাট, ইহলোক ছাড়িয়া এই ঘাটে আসিলাম। সাম্‌নে পরলোক। অনন্ত কাল-সাগর ধূ ধূ করিতেছে।"

রাজা রামমোহনের বাংলা-গদ্য হইতে, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমারের বাংলা গদ্য হইতেও কেশবচন্দ্রের গদ্যের প্রকৃতি যথেষ্ট বিভিন্ন। গদ্যের কবি ছিলেন কেশবচন্দ্র—কেশবচন্দ্রের গদ্যের পর বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ।

"হিমালয়ের গাত্রোত্থান," "বাগ্‌দেবী" প্রভৃতির ভাষা যেমন ওজস্বিনী, তেমন ভাবময়ী।

কেশবচন্দ্র—সাধক, দ্রষ্টা, ঋষি ছিলেন। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া খৃষ্টীয় প্রভাবান্বিত নৈষ্ঠিক নীতিবাদী—কেশব আধ্যাত্মিক জগতে অনেক প্রত্যক্ষ অনুভূতি করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ২২ শে আগষ্ট রবিবার একাদশ ভাদ্রোৎসবে জলন্ত ভাষায় কেশব তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা বলিয়াছেন—

"আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি মাকে কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করি নাই। মার স্বরূপ-সম্পর্কে আমি যে সকল বর্ণনা করিয়াছি, সে সমস্ত সত্য—অভ্রান্ত সত্য। সে সকল বর্ণনাতে ভ্রান্তি ভ্রম কিছুই নাই। মার রূপ ঠিক যেমন দেখিয়াছি, সেইরূপ বলিয়াছি। মার মুখে যাহা শুনিয়াছি, ঠিক তাহাই বলিয়াছি। আমার নিজের কল্পিত কথা কিছুই নাই। তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যাঁহাকে ব্রাহ্মেরা এক বলেন, আমি তাঁহাকে তেত্রিশ কোটী বলিয়াছি। আমি এককে বহু কল্পনা করিয়াছি। আমি এখনও বলিতেছি, যদিও আমার মা এক, তাঁহার রূপ গুণ অসংখ্য ও অগণ্য। যদি মার কোটী রূপের কথা বলিয়া থাকি, সে এই জন্য যে, অনেকগুলি রূপই স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"যে তাঁহার এক রূপ অথবা এক বর্ণ বলিবে, সে অসত্য-কথন-দোষে অপরাধী হইবে। অপরাধ আমার নহে, যে মার অসংখ্য রূপ অস্বীকার করে—তাহার।"

কেশবচন্দ্র কি জলন্ত ভাষায় অরূপের রূপ—নিরাকারের

রূপবর্ণনা করিয়াছেন—তাহা তাঁহার রচিত বক্তৃতাবলী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। কেশবচন্দ্র বলিতেছেন—

"কে বলে মার রূপ নাই? ইহা কেবল ফাঁকি দিবার কথা। তোমরা কি মার রূপ দেখিবার জন্য এতদিন আকুল হইয়াছিলে? এতদিন জননীর বিচিত্র রূপ তোমাদের কাছে কেন প্রচ্ছন্ন ছিল?"

বৈষ্ণব-বংশোদ্ভূত কেশবচন্দ্র জলদগম্ভীরস্বরে আবেগময়ী ভাষায় শ্রীচৈতন্যকে প্রচার করিয়াছিলেন—রাধা-কৃষ্ণকে প্রচার করিয়াছিলেন।—তিনি নরনারীর প্রকৃতির প্রতীক স্বরূপ রাধাকৃষ্ণকে দেখিতেন—আর অনুভব করিতেন সেই নরনারী-প্রকৃতির সমন্বয় হইয়াছে—শ্রীচৈতন্যে। সাহিত্যে ইহা খাঁটী বৈজ্ঞানিক সত্য। কেশবচন্দ্র এই নূতন বাণী—নবীন ভারতকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন। বাংলার এই খাঁটী নিজস্ব আদর্শ—আমরা তাঁহার ভাষায় বলি, "তোমরা যে বহুদিন হইতে মহাপুরুষ স্বীকার করিয়াছ, কিন্তু ভাগবত পর্য্যন্ত মানিয়া কেন থামিলে? চৈতন্যচরিতামৃত কেন গ্রহণ করিলে না? নবীন হিন্দুস্থান! তোমার রাধাকৃষ্ণ—এখন মথুরা-বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ নহেন। তোমার রাধাকৃষ্ণ এখন যুগলমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকাশিত। এখন একাধারে দেবদেবী—উভয় প্রকৃতি, নরনারী—উভয়প্রকৃতি। এখন রাধা ও কৃষ্ণ স্বতন্ত্র নহেন, দুই-ই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছেন।—"

কেশবচন্দ্র তাঁহার সাধক-দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানবের মধ্যে শাশ্বত নরনারী প্রকৃতি দেখিয়াছেন। কেশবচন্দ্র বলিতেছেন—

"চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন; নরের প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর প্রতি নরের প্রেমকে তিনি বিশুদ্ধ করিলেন।"

গৃহস্থ-কেশব, ব্রাহ্ম-কেশব, পণ্ডিত-কেশব বৈরাগ্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি বৈরাগ্যের মধ্যে—প্রেমসমন্বয় অনুভব করিতেন। যাঁহারা বলেন যে, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার আদর্শ পূর্ণাদর্শ নহে—বৈরাগ্যপ্রবণ ধর্ম্ম পূর্ণ-ধর্ম্ম নহে—তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কেশবচন্দ্র বলিতেছেন—

"অজ্ঞলোকে বলে চৈতন্যের ধর্ম্ম অপূর্ণ, কেননা তিনি নারী-প্রকৃতিকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু জ্ঞানী বৈষ্ণব বলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাহিরের মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছাড়িয়া নিজের হৃদয়ের মধ্যে নর-নারীকে এক করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগল্ভা ভক্তিই তাঁহার শ্রীরাধিকা—তাঁহার নারীপ্রকৃতি। তাঁহার প্রাণের মধ্যে কৃষ্ণভাব রাধাভাব উভয়ই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—তাঁহার জীবনে একাধারে দেবদেবী দুই অবতার। তাঁহার পূর্ব্বে যুগে যুগে একাধারে এক এক ব্রহ্মগুণের অবতরণ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার জীবনে নর-নারীর মিলন হইল। তিনি একাধারে রাধাকৃষ্ণের মিলন, যোগভক্তির মিলন, প্রেম পুণ্যের প্রবাহ, নর নারীর যোগ, অনুরাগ বৈরাগ্যের সম্মিলন!"

তিনি যখন হিন্দুসমাজে প্রচলিত পদ্ধতির মূর্ত্তির মধ্যে ভাবময় চিন্ময়রূপের প্রচার করিলেন—তখন তাঁহার শিষ্যস্থানীয় অনেক ব্রাহ্ম-ভক্তেরা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কেশব তদুত্তরে তাঁহার "বাগ্‌দেবী" বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"যাহারা একপ্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া দুষ্টবুদ্ধি-সহকারে ব্রাহ্মসমাজে আর একপ্রকার পৌত্তলিকতা আনয়ন করিতেছে, সামান্য মূর্ত্তি-উপাসকদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। যাহারা মুখে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু চলে না, বলে না, নড়ে না,—জীবনের লক্ষণ দেখায় না, এমন এক কল্পিত দেবছায়া পূজা করে।"

"তোমরা যে বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছ—সেই এক পুরাতন জীর্ণ কল্পিত ব্রহ্মরূপ প্রত্যহ দেখিবে। তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এক মৃত মাকে গ্রহণ করিলে। কিন্তু আমার মা সেই আদ্যাশক্তি—জীবন্তশক্তি, মৃত নহেন, তিনি প্রতিদিন নবনব রূপ ধরেন এবং নবজীবন দান করেন।"

"একবার ভাবের ঘরে প্রবেশ কর, দেখা হইবে"

"মার নিমন্ত্রণ পাইয়া, মধুময় কল্যাণকর আহ্বানধ্বনি শুনিয়া মার নিকটে যাও, সেই বিচিত্র-রূপধারিণী উজ্জ্বলবর্ণা মাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক কর—তাঁহার স্নেহে বশীভূত হও।"

ব্রাহ্মদিগকে সম্বোধন করিয়া কেশবচন্দ্র আবার বলিতেছেন—

"জগজ্জনের প্রতি প্রশস্ত প্রেম ভিন্ন ভক্ত বৈরাগীর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। হিন্দুস্থানে রাধাকৃষ্ণ প্রেম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ নর-নারীদিগের মধ্যে প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ নাম শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা এই দুটি নামের প্রতি কি ব্রাহ্মদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই? যাঁহাদিগের নামে সমস্ত ভারতে এত প্রেমানুরাগ, ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের প্রতি কেন শ্রদ্ধাবিহীন? যে সকল ব্রাহ্ম যথার্থ ভক্তি-সাধন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই দুইটী নাম বিশেষ আদরণীয় কেন না হইবে? ব্রাহ্মেরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনে ব্রহ্মের কত রূপ দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কি কোন দেবভাব দৃষ্ট হয় না? কেবল কৃষ্ণ, কেবল রাধা নহে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণসংযুক্ত নাম প্রায় সর্ব্বদাই একত্র উচ্চারিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ—নরপ্রকৃতি এবং নারী-প্রকৃতির মিলন। ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার জন্য প্রথমে নারীর নাম রাখা হইয়াছে। আগে রাধিকা পরে কৃষ্ণ। রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে হিন্দুস্থানে এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্ত্তন ও ঘোষণা করে।"

বলিতে বলিতে কেশব তাঁহার অননুকরণীয় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় সমগ্র ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"হিন্দুস্থানের বৈষ্ণবেরা অনেক শতাব্দী রাধাকৃষ্ণকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছে। কিন্তু হে হিন্দুস্থান, তুমি কি জান না যে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তোমার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে? চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ গ্রামে এক সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থান! তোমার ব্যবহারে বোধ হয় যেন তোমার ইতিহাস-পুস্তকের দশবার পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমার এই একটি দোষ হইয়াছে যে তুমি ইতিহাসকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করিলে, কিন্তু হে হিন্দুস্থান, এত বড় ঘটনা,—শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহর লীলা কেন তুমি অস্বীকার করিলে? যদি তুমি পূর্ণ-ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও, তবে ধর্ম্ম জগতের প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা স্বীকার করিতে হইবে।"

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের প্রভাবে বুঝিলেন, জাতীয় ভাবে জাতীয় ধর্ম্মের উপর ভিত্তি গড়িয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। নববিধানের পরিচয়প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"আমাদিগের নববিধান একদিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক, আর একদিকে জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত। ইহা একদিকে সমুদায় সাধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া একগোত্র, একজাতি, একবর্ণ হইয়া গিয়াছে—আবার ইহা আপনার বিশেষ-বিশেষ ভাব প্রচার করিবার জন্য আপনার জাতীয় স্বভাব জাতীয় লক্ষণ রক্ষা করিতেছে। ইহা দেশীয় বিদেশীয় সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে স্কন্ধে রাখিয়া তাঁহাদের যশঃকীর্ত্তন করে, কিন্তু ইহার বক্ষে হিন্দুশোণিত প্রবাহিত। অপর ধর্ম্মের বিজাতীয় বেশ পরিধান করাইয়া ঈশ্বর এই নববিধানকে প্রেরণ করেন নাই, ইহাকে তিনি জাতীয় বেশে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বরদত্ত এই বেশ আমরা চিরদিন রক্ষা করিব। এই হিন্দুজাতীয় বৃক্ষ হিন্দুস্থানে খুব বদ্ধমূল হইলে, হিন্দুরক্তে খুব পরিপুষ্ট হইলে, তবে চারিদিকে ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইবে। আমরা ঈশা, মুসা, মহম্মদ—সকলেরই প্রণত ভক্ত, কিন্তু জাতিতে আমরা চিরদিন হিন্দু থাকিব।"

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিজাতীয় আদর্শ ও ভাবের অনুকরণ দেখিয়া, কেশবচন্দ্র ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন—

"হে ব্রাহ্ম, যতই তুমি হিন্দুর প্রকৃত ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, কোমলতা, ভক্তি প্রভৃতি বিবিধ রসে অভিষিক্ত হইবে, ততই তোমার ধর্ম্ম জগতে আদৃত হইবে; যতই তুমি তোমার স্বজাতীয় আর্য্য-ঋষিগণের ন্যায় ধ্যান-পরায়ণ যোগী হইবে, শাক্যের ন্যায় নির্ব্বিকার নির্ব্বাণপ্রিয় হইবে, চৈতন্যের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হইবে, ততই আগ্রহের সহিত আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, তাতার প্রভৃতি সমুদায় দেশ তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। যতই তুমি স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবে, ততই নববিধান জাতীয় গৌরব ও বিক্রম লইয়া দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইবে।"

"স্বাধীনতা"র বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র তাঁহার অগ্নিময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন—

"হে দয়াময়! হে স্বাধীন পুরুষ! মহামন্ত্র স্বাধীনতা কি আশ্চর্য্য মন্ত্র! দয়া করিয়া যদি আমাকে এই মন্ত্র দীক্ষিত করিবে, তবে আমার ও আমার ভাই ভগ্নীর মঙ্গলের জন্য আমাদিগের সকলের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি করিয়া দাও।"

কেশবচন্দ্র কাতরকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"অধীনতা মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছে। স্বাধীনতা-প্রদাতা কোথায় রহিলে? মানুষ কেন এত কষ্ট পাইতেছে? অধীনতা ভাবের সঙ্গে একবার যুদ্ধ আরম্ভ হউক। মা শক্তিরূপা! হুঙ্কারে শত্রুদল তাড়াও। আর পরের দাসত্ব করিব না। বুঝিতেছি মা! অধীনতা দাসত্ব ভয়ানক নরক।"

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

—•—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

(ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত টাউনহলে কেশবচন্দ্রের বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত)

যাঁহাদের অটুট বিশ্বাস, অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ, জীবন-ব্যাপী তপস্যা ও অফুরন্ত ধর্ম্মোৎসাহের ফলে ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে, সেই সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন অন্যতম। এক একটী সত্যবিধানের পশ্চাতে জ্ঞানময়, লীলাময় ভগবানের মহতী ইচ্ছা যে কার্য্য করে, এই সব কীর্ত্তিমান পুরুষের অভ্যুদয় তাহার একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেশবচন্দ্র অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন অসীম প্রতিভাশালী পুরুষ যদি সেই সময় এই ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ না দিতেন, ইহার নায়কত্ব গ্রহণ না করিতেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়, যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবার মধ্যেই এই নবধর্ম্ম কিছুদিন মাত্র আবদ্ধ থাকিয়া মানব-স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া যাইত। ভগবান্ নিতান্ত প্রয়োজন-বোধেই এক একটী ব্যক্তিকে এক একটী বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য উপযোগী করিয়া এ জগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে অসাধারণ পুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কেশবের কার্য্য যে তাঁহা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত—দুইজনের চরিত্র ও মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, এইরূপ প্রত্যয় সহজে মনে স্থান পায় না। মহর্ষিও একজন অতি ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু সমাজকে নানা বিষয়ে দ্রুত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে যে অপরাজিত সাহস ও অদম্য উৎসাহের প্রয়োজন, তাহা মহর্ষির ছিল না। মহর্ষি ধর্ম্মের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন সত্য, সাকার-বাদ পরিত্যাগ করিয়া পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক ভাবে করিতে যাইয়া স্বজনগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিপীড়িতও হইয়াছিলেন; কিন্তু সত্যানুরোধে তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে, নূতনকে সমগ্রভাবে বরণ করিয়া লইবার

সাহস তাঁহাতে যথেষ্ট ছিলনা। ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন-চিন্তার পরিচয় দিতে পারিলেও সামাজিক বিষয়ে তিনি পুরাতন মত বা সংস্কারেরই অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কেশবের সময় হইতে ভারতে যে যুগের সূত্রপাত হয়, সে যুগের নবীনদল কেবল ধর্ম্মে নয়, সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অন্ধ সংস্কারের পাশ হইতে মুক্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা কোন প্রকার কৃত্রিম ভেদ-নীতির প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মানুষ আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিতে পারে যেমন সাংসারিক কার্য্য ও বিষয় লইয়া, তেমনই বিব্রত থাকিতে পারে ধর্ম্মবিষয়ে শুধু আপনার তৃপ্তি লইয়া। নবীনদলের দৃষ্টি কিন্তু আরও অনেক উদার ছিল। কেহ কোনও বিষয়ে কাহারও birthright বা জন্মসত্ব হইতে বঞ্চিত থাকে, এ তাঁহাদের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্দীপিত প্রাণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। এই নবীন দলের নায়ক বা মুখপাত্র ছিলেন কেশবচন্দ্র। বলিতে গেলে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যদলই সর্ব্বপ্রথম এই নবভারতে জনসেবার ভাব প্রচার করেন। স্ত্রী-পুরুষ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য তাঁহারা যেরূপ ভাবে ভাবিতেন ও করিতেন, আজও কোন সম্প্রদায়ই নানা প্রকার সেবাকার্য্যে ব্রতী থাকিলেও, তাঁহাদের মত সেইরূপ উদার-ভাবে জন-সেবা করিতে পারিতেছেন না। মহাত্মা বুদ্ধ ও চৈতন্যের পর আবার নূতন করিয়া, "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার" এই অপূর্ব্ব উদার ভাব প্রচারিত হইয়াছিল—কেশবচন্দ্রের উন্নত উপদেশ ও শিক্ষার ফলে। পিতার চরণে আসিয়া সকলে এক হইলে যে একতা স্থাপিত হয়, সে একতা সহজে টুটে না, সেই অচ্ছেদ্য একতায় আবদ্ধ হইবার জন্য কেশবচন্দ্রই এদেশবাসীকে সর্ব্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেন। আমরা সেই ধর্ম্মের ভাবে উদ্দীপিত না হইয়া, সাংসারিক কোন ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে যখনই একত্রিত হইতে চেষ্টা করি, সে চেষ্টা যে তেমন সার্থক হয় না, আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদিগকে বারম্বার তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। এই দেশ নানা ধর্ম্মসাধনার সিদ্ধিস্থল। বিধাতা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়কে আনিয়া এদেশের অধিবাসী করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে একান্ত গোঁড়ামী থাকিলে, কখনই ভারতের এই ভিন্ন-মতাবলম্বী লোক সকল একত্রে সুখ শান্তিতে প্রীতির সহিত বাস করিতে পারিবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া—যাহাতে পরস্পরের মধ্যে বৈরভাব দূরীভূত হয়, কেশবচন্দ্র এজন্য সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ও সাধু-সমাগম-নামধেয় যে দুই অপূর্ব্ব দান আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম যদি যথার্থরূপে বুঝিতে ও আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে উৎসুক হই—আমরা দেখিব—আমরা আমাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য না হারাইয়াও অনায়াসে পরস্পরের সহিত মহামিলন-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি। রাম-মোহনের প্রকৃত শিষ্যরূপে তিনি তাঁহার অনুশিষ্যদিগকে সকল ধর্ম্মের সাধুদিগের প্রতি ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উদার শিক্ষার ফলেই ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Oriental Christ, গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় কোরাণের অনুবাদ ও তাপসমালা নামক মুসলমান সাধুগণের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী সংগ্রহ ও সাধু অঘোরনাথ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বজন-বোধ্য করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে তাঁহার ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ ও বক্তৃতা সর্ব্বপ্রধান উল্লেখ-যোগ্য বিষয়। তাঁহার একদিকে যেমন দর্শন ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, অপরদিকে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মানুষকে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে কেবল মাত্র পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা-শক্তিতে কুলায় না, আর একটী বস্তুর প্রয়োজন, সেটিকে বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম-যোগযুক্ত নির্ম্মল জীবন। সকল উদ্দীপনার যিনি প্রস্রবণ, সেই ভগবানের সহিত একাত্ম হইয়া, তাঁহার ভাবের ভাবুক হইয়া, ভক্ত যে ভাষাতেই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করুন না কেন, মানুষ সেই ভক্তমুখ-নিঃসৃত কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। শুধু যে মুগ্ধ হয় তাহা নয়, তাহার মনের গতি, জীবনের উদ্দেশ্যও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মানবের মনোরাজ্যে বিপ্লব আনিবার এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল কেশবচন্দ্রের। তাঁহার মনের পবিত্রতা, হৃদয়ের ভক্তিভাব এমন স্পষ্ট ভাবেই তাঁহার মুখাবয়বে, তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণীতে প্রতিফলিত হইত, ভগবান্ যে তাঁহাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইত না। এইজন্যই দেখা যায়, তাঁহার সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশের জনসাধারণের মধ্যে অধিক প্রচারিত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহোদয়গণের মত অনেকগুলি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি একই দিনে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। জীবন্ত মানুষ বলিতে যাহা বুঝায়, বাস্তবিক কেশব ছিলেন তাহাই। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ভক্ত কেশবের অমৃতনিষ্যন্দিনী বঙ্গভাষায় এমনই বিমুগ্ধ ছিলেন, উপাসনায় যোগ দিবার জন্য যত নয়—তাঁহার সেই সুললিত ভাষাটি শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতেন। কেশবচন্দ্রের নিকট দেশ ও ব্রাহ্মসমাজ পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে আর একটী জিনিষের জন্য বিশেষ ভাবে ঋণী, সেটি ব্রহ্মসঙ্গীত। যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সাধনার প্রভাব তদীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপর পতিত হওয়ায় তাঁহার লেখনী হইতে অপূর্ব্ব ব্রহ্মসঙ্গীত সকল নিঃসৃত হইয়াছে, তদ্রূপ কেশবচন্দ্রের জীবনের সংস্পর্শে আসায় ও তাঁহার প্রাণপ্রদ উপাসনা ও প্রার্থনাময় আবহাওয়ার

মধ্যে থাকিয়া ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের ন্যায় একজন সামান্য ব্যক্তিও এমন সব উচ্চ ভাবপূর্ণ ব্রহ্মসঙ্গীত সকল রচনা করিয়াছেন, যাহা ভগবৎপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই যারপর নাই আদরের বস্তু হইয়াছে। যিনি আর কোন প্রকারে ভগবানের স্তব স্তুতি করিতে অসমর্থ, যদি প্রাণ খুলিয়া ভাবভক্তি-সহকারে কেবলমাত্র এই সঙ্গীতগুলি গাহিতে পারেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসা বহুল পরিমাণে তৃপ্ত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রের আর এক দান—ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী। আদিব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালী প্রচলিত আছে, সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা অবলম্বন করা তেমন সুবিধাজনক নয়; বিশেষতঃ ভগবানকে পিতারূপে, উপাস্য দেবতারূপে আপনার সন্নিধানে উপস্থিত জানিয়া সাক্ষাৎভাবে পূজা করিতে হইলে যে ভাবে উপাসনা করা দরকার ও স্বাভাবিক, কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই প্রকার উপাসনা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—তাঁহার অমূল্য দেবভাবপূর্ণ জীবন. তাঁহার সেই অপূর্ব্ব জীবনের চিরমধুময় স্মৃতি। এ স্মৃতির সৌরভ ও উন্মাদিনী শক্তি কোন দিনই হ্রাস পাইবার নয়। ইঁহার ন্যায় সাধু মহাপুরুষগণ দেহে ও বিদেহে সমভাবে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। আজও তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-সমূহের কথা যখনই স্মৃতপটে উদিত হয়, মন গৌরবে কত স্ফীত হয়। এই বলিয়া মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, তিনি এই ব্রাহ্মসমাজের লোক, তিনি এই বঙ্গদেশেরই লোক। ধন্য আমরা—তাঁহারই এই জন্মভূমিতে, যে দেশের জলবায়ুতে আকাশে বাতাসে তাঁহার প্রাণবায়ু মিশিয়া গিয়াছে—সেই পবিত্র স্থানে আমাদেরও জন্ম! যখন আমরা কখনও কোন প্রকারে আদর্শচ্যুত হই, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, তাঁহার নাম স্মরণ হইবা মাত্র, প্রার্থনারত তাঁহার প্রতিকৃতিখানা দেখিবা মাত্র, পুনরায় আমরা সতর্কিত হই, জীবনের চরমলক্ষ্য আবার বুঝিয়া লই। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহার এই প্রিয় পুত্র তাঁহার উৎসর্গীকৃত জীবন দ্বারা যে দৃষ্টান্ত আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা যেন আমরা কখনও না ভুলি, যে কর্ত্তব্যপথ আমাদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে পথেই অনুদিন চলি। যাঁহার ধ্যানে, যাঁহার কার্য্যে তিনি অপার আনন্দ পাইতেন বলিয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদর করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম যেন আমাদেরও চিরধ্যেয় ও চিরসেব্য হইয়া রহেন। তাঁহার দর্শন-লালসায় যেন আমাদের চিত্তও সদা উৎসুক হইয়া থাকে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত।

উৎসবের প্রাস্তুতিক সাধন।

মাতৃনাম-স্মরণে নববর্ষারম্ভে রাত্রি ১২ টার তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যদেবের কমলকুটীরের ছাদে আচার্য্য-পুত্র সরলচন্দ্র সেন ভক্তিভাবে নববিধানের সমন্বয় পতাকা উত্তোলন করেন। এবার শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সুদূর বিলাত প্রবাস হইতে কয়েকটী অতি সুন্দর নূতন নিশান পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সকাল ৬॥ টায় কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদেবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক, নববিধান-নিশান হস্তে ধারণ করিয়া, ভাই প্রিয় নাথ নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। আচার্য্য-পরিবারস্থ মৌরভঞ্জের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুচারুদেবী ও ভ্রাতা ভগ্নীগণ এবং মণ্ডলীর কয়েকজন এই অনুষ্ঠানে ভক্তিপূর্ব্বক যোগদান করেন। ভ্রাতা নির্ম্মল চন্দ্র সস্ত্রীক বিলাত হইতে আগমন করিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বেলা ৯টার সময় নবদেবালয়ে ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণের উৎসব সাধনার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনার প্রথমাংশ সম্পাদন করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ পাঠ ও শান্তিবাচনের প্রার্থনা করেন। আচার্য্য যে বলিলেন, "আমার মা তোদের বড় ভালবাসেন।" তাই নবভক্তির মহাসমন্বয় তীর্থ এই নবদেবালয় মা ভালবেসেই আমাদেরই জন্য নবভক্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে যেন নবভক্ত সঙ্গে তাঁর মাকে দেখে আমরা অদর্শন-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। ধর্ম্মপিতামহ যে নববিধানের বীজ বপন করলেন, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ যে তাহাতে জলসিঞ্চন করলেন, তাই তাহা আজ ফলফুলে শোভিত নববিধানরূপ কল্পতরুতে পরিণত। আমরা তাহারই ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে নিত্য নবজীবন লাভের সৌভাগ্য পেয়েছি। এ জন্যে ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে তাঁদের চরণে কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ করি। মা দয়া করে আমাদিগের হৃদয়ে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দান করুন, এই ভাবেই শান্তিবাচনের প্রার্থনা হয়। এই দিন সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতা ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ ইংরাজীতে উপাসনা করেন। উপদেশের বিষয় ছিল "The faith that endures" (প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম)। উপদেশের মর্ম্ম এইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে—

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়বাদী ও সাংখ্যবাদীরা বিশ্বজগতে দুইটি ব্যাপারের নির্দ্দেশ করেন। তাঁরা বলেন যে, সর্ব্বত্র যোগ (integration) ও বিয়োগ (differentiation) দেখা যায়। আদিতে নীহারিকার মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহাদির সৃষ্টি হয়। আবার গ্রহ উপগ্রহাদির সংযোগভাবে সৌর জগতের সৃষ্টি হয়। তারকাজগতেও তাঁরা এই ক্রিয়া বর্ত্তমান বলেন। প্রকৃতিতেও এই যোগ বিয়োগ প্রণালী সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। মানুষের সমাজেও ঐ দুই ক্রিয়া সমানভাবে চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও উভয় ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। সমাজে ও ধর্ম্মসমাজে মানুষ বিয়োগ বলে মুক্তি চায় ও পায়, আর যোগ শক্তিতে একতা ও ঐক্য স্থাপন করে। রাজা রামমোহন পুরাতন হিন্দুসমাজ ও

হিন্দুধর্ম্ম থেকে মুক্তি (emancipation) চেয়ে, একেশ্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনায় নূতন একতা (unification), নূতন ঐক্য (solidarity) জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে পেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ প্রচলিত শাস্ত্র ও প্রচলিত বুদ্ধিবাদ (rationalism) থেকে মুক্তি খুঁজে—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও অধ্যাত্মবাদে নূতন ঐক্য ও একতা সাধন করলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রও নূতন মুক্তি ও নূতন একতা সাধন করলেন। কিন্তু তাঁর সাধনে বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা ছিল। তিনি যে মুক্তি চাইলেন—সে মুক্তিতে ত্যাগ বা বর্জ্জন-নীতি ছিল না, যা থেকে মুক্ত হতে চাইলেন—তা কোনও বিশেষ সমাজ বা বিশেষ ধর্ম্ম নয়। তিনি চাইলেন, খণ্ডভাব থেকে মুক্তি (emancipation from partialness)। কাজেই কোনও সমাজ বা ধর্ম্মকে ত্যাগ করার প্রয়োজন হ'ল না। নূতনকে গ্রহণ করে, পুরাতনকে রেখে, দুয়েরই সমন্বয় করে, তিনি নূতন একতা ও ঐক্য পেলেন। এই একতা ও ঐক্যকে "একাত্মতা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই নববিধানের সাধনে "মুক্তি" ও "একতা"—যোগ ও বিয়োগ একই প্রণালীর দুই দিক। এখানে যোগ মানেই বিয়োগ, আর বিয়োগ মানেই যোগ। সত্য পুরাতনই হোক, আর নূতনই হোক, সত্য কখনও বর্জ্জনীয় হতে পারে না। সত্যে সত্যে মিল করে—সত্য সমন্বয় করে যে ধর্ম্মমত অগ্রসর হয়—সেই মতই স্থায়ী হয়। নববিধানের প্রণালীতে সাধন ক'রে সর্ববিধানের আদর্শে অগ্রসর হ'লে—প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম লাভ হয়।

২রা জানুয়ারী, নববিধানের প্রতি আনুগত্য সাধনের জন্য নবদেবালয়ে উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ সম্পাদন করেন। নববিধান-মূর্ত্তিমান যিনি, তাঁহার সহযোগে এবং নববিধানের প্রেরিতদল ও নববিধান-মণ্ডলীর সহিত একাত্মতা-সাধনে যাহাতে আমরা নববিধানকে জীবনে গৌরবান্বিত করিতে পারি, ইহাই বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনাদি হয়। নববিধানের জন্য কৃতজ্ঞতা দান হয়। গানের পর ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ "নববিধান" পাঠ করেন।

৩রা জানুয়ারী, মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য বিশেষ উপাসনা নবদেবালয়ে ভ্রাতা প্রেমেন্দ্র নাথ রায় করেন, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ করেন। মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি অর্পণে, ভারতেশ্বর ও তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের প্রতি এবং স্বদেশ-সেবক যাঁরা, সমভাবে তাঁহাদেরও প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করা হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনাদি হয়। স্থির হয় যে, আচার্য্যের "মাতৃভূমি" প্রার্থনা মুদ্রিত করিয়া ৮ই জানুয়ারী বিতরণ করা হোক।

৪ঠা জানুয়ারী, গৃহ-সাধন দিনে নবদেবালয়ে ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ব্রহ্মানন্দের আশ্রম মার আশ্রম। মার আশ্রম-বাসে গৃহধর্ম্ম যেন সত্যই আমাদের পরমসাধন হয় এবং সকল গৃহই যেন মার নবশিশু ব্রহ্মানন্দের আশ্রম হয়।

৫ই জানুয়ারী শিশু-সেবার দিনে নবদেবালয়ে নবশিশু সঙ্গে উপাসন-যোগে ভাই প্রিয়নাথ শিশুত্ব সাধন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে পল্লীস্থ সকল সমবিশ্বাসীদিগের শিশুদিগকে সমবেত করিয়া প্রার্থনা ও নবশিশুর গল্প বলিয়া জলযোগ করান হয়। রমনাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ প্রায় ৪০টী বালক বালিকাকেও সন্দেশ ও কমলালেবু দিয়া সেবা করা হয়।

৬ই জানুয়ারী, ভৃত্য-সেবার দিনেও ভৃত্যত্ব-সাধন ও ভৃত্যদের সেবা ও জলযোগ করান হয়। ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তাঁর উপদেশের মর্ম্ম গতবারে প্রকাশিত হইয়াছে।

৭ই জানুয়ারী, দীনসেবার দিনে দীনাত্মতা-লাভের জন্য ও জীবগণের প্রতি দয়াসাধন দ্বারা যাহাতে আমরা ব্রহ্মসন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হইতে পারি, তাহার জন্য প্রার্থনা করা হয়। এই দিন শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণের পূর্ব্বদিন। নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া আপনাদের নিরাশ্রয়তা স্মরণ করা এই দিনের বিশেষ সাধন। ঈশার ক্রুশারোহণের পূর্ব্ব রজনীতে যেমন তাঁহার শিষ্যগণ অনুতাপ ও রাত্রিজাগরণ করিয়া ভক্তের মহাপ্রয়াণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি আচার্য্য-পরিবারস্থ ও সাধকগণের অনেকে এই রাত্রে কমলকুটীরে মহাপ্রয়াণ-প্রকোষ্ঠে রাত্রি-জাগরণ, আত্মচিন্তা, পাঠ ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। এবারও ভাই প্রিয়নাথ দীনভাবে এখানে সেইরূপ সাধনায় রাত্রি যাপন করেন। ভীষণ অমানিশার গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া সেই প্রাণবিদারক আর্ত্তনাদ "বাবা বাবা মা মা মা মা" ধ্বনির প্রতিধ্বনি প্রাণে অনুভব হয়। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, স্বদেশীয়, স্বজাতীয় এবং সমগ্রজাগতিক পাপ অপরাধের বেদনা অখণ্ড বিশ্বমানবের প্রাণের এই আর্ত্তনাদে নিনাদিত হইতেছে, ইহাই অনুভব করিয়া যোগ ধ্যান করা হয়।

৮ই জানুয়ারী, উষার আলোক বাহির হইতে না হইতে, মহাসমাধিকক্ষস্থ শয্যার চারিপার্শ্বে ভক্তাত্মাগণ দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীমৎ আচার্য্য-দেবের দেহ ঘিরিয়া যেমন তাঁহার সঙ্গে শেষ ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবারেও তেমনি পরিবারস্থ ও মণ্ডলীস্থ সাধক সাধিকাগণ নামোচ্চারণ করেন। তাহার ভিতর যেন আচার্য্য ও প্রেরিতবর্গের আত্মিক স্বরধ্বনি অনুভূত হয়।

বেলা ৯টার সময় নবদেবালয়ে এই দিনকার বিশেষ উপাসনা হয়। অদ্যকার মহাপ্রয়াণদিনে অবাক হয়ে আত্মচিন্তাযোগেই দিন যাপন করা আমাদের স্বাভাবিক সাধন; কিন্তু মার বিশেষ বিধানে ভাই প্রিয়নাথকে ভাই ভগ্নীদিগের সেবা-সাধনার্থ এই দিন উপাসনা করিতে হয়। যাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধে মা বাঁধিয়াছেন জানিনা—পিতা, মাতা, বন্ধু, নেতা, না ভাই, প্রাণের রক্ত বা কি বলিব, এই সকল সম্বন্ধে আমরা যাঁর সঙ্গে সংবদ্ধ—তাঁর দেহত্যাগে আমাদেরও যে দেহ শক্তিহীন, মণ্ডলী দেশ জাতি সবই যেন মৃত, আজ তাহাইত অনুভূত হইতেছে; তবে আজ সেখানেই যাই,

যেখানে গেলেন তিনি। এই ভাবে উদ্বোধন হইয়া নিম্নোক্তরূপে আরাধনা হয় ;—

সত্যই যিনি প্রাণ দিলেন আমার তরে, তাঁকে ছেড়ে কি এ প্রাণ বাঁচে? হে প্রাণের প্রাণ, তোমাগত প্রাণে আমাদের যে প্রাণ, তাই উপলব্ধি করাবার জন্যইত দিলেন প্রাণ তিনি; তাইত তাঁর প্রাণেই পেয়েছি এ প্রাণে তোমাকে। আর চিনলাম যাঁ হতে তোমাকে, চিনে রাখবো আজ তাকে। তুমি যে সহজে দেখা শুনার বস্তু হয়েছ সেই চক্ষে, সেই দৃষ্টি বিনা কি দেখা শুনা যায় তোমায়? অনন্ত তুমি, কোথায় আমার 'আমি'? সে নাই, তোমাতে 'আমি' নাই। তোমার কোলে 'মা মা' বলে উঠে, তোমার নিত্যপ্রেমে তোমাকে ভালবেসে, সকলকে ভালবেসে. এই যে সকলই দিলেন আমাদের তরে; কি না দিলেন? তোমাকে আমার করে দিলেন। তোমাতে সব পেলাম। এক অদ্বিতীয় তুমি, এক অদ্বিতীয় তোমার মানবসন্তান। আর কি আমার স্বতন্ত্র 'আমি' থাকে? পুণ্যময় হরি, হরি নিলে আমার 'আমি', হয়ে যাই তাঁর 'আমি', তোমার 'আমি'। এইত যোগানন্দ, এই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ, সেই আনন্দ দিলে তুমি পৃথিবীতে। তোমার বক্ষে আজ তুলে নিয়ে তাই মৃত দেহেও মধুর হাসি ফুটালে। হাস্যময়ী, আনন্দময়ী, বড় ভাল মা যে তুমি। তুমি যা কর, তাই ভাল; তাই তোমাকেই আমরা আজ জড়াইয়া ধরি, তোমারই চরণে লুণ্ঠিত হয়ে সবে মিলে বারবার প্রণাম করি।

গভীর ধ্যানান্তে ঠিক ৯-৪৫ মিনিটের ঘণ্টা বাজিলে সমবেত প্রার্থনা হয়। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের যোগের প্রার্থনান্তে শান্তিবাচনে এই প্রার্থনা হয়, "একদিন, মা, ক্রুশাহত তোমার তনয় দস্যুকেও বলেছিলেন, আজই তুমি আমার সহিত স্বর্গে মিলিত হইবে। আজ অখণ্ড মানবের মহাপ্রয়াণ-দিনে আমারও 'আমি'কে ক্রুশাহত মৃত কর। এই আমিত্বই ত মহাদস্যু, তোমার ধর্ম্মের ঘরেও ত কতই চুরি করিতেছে। যদি তোমার নবভক্ত নিজদেহে আমারও মত দস্যুকে গাঁথিলেন, তবে তাঁহার দেহপাতে আমারও 'আমি'র নিপাত হউক; তাহলেই আমি তাঁর সঙ্গে একযোগে তোমার স্বর্গে তেমনি তেমনি করে হাসিতে হাসিতে আরোহণ করিতে পারিব। তাঁর সঙ্গে 'বাবা' 'বাবা' 'মামা' বলে ক্রন্দন করি। যদি আপনার পাপের জন্য, জগতের পাপের জন্য অনুতাপের অশ্রুতে ভাসালে, তবে আজ সত্যই যিনি প্রাণ দিলেন আমার তরে, তাঁর সঙ্গে 'আমি' নাই হয়ে, তোমার 'আমি' তাঁর 'আমি' হয়ে, সপরিবারে সদলে সমস্ত মানবসঙ্গে একাঙ্গ হয়ে, সশরীরে স্বর্গারোহণ করি, তোমার নববিধান পূর্ণ করি, এমন আশীর্ব্বাদ কর।"

এই দিন মধ্যাহ্নে নবদেবালয়ের পশ্চাতে হবিষ্যান্ন ব্রহ্মানন্দ-অন্নভোজন হয়। অপরাহ্নে আলবার্ট হলে স্মৃতি-সভা হয়। ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ দানের সময় বলেন যে, মনুষ্যসমাজে যে দুই প্রণালী বর্ত্তমান দেখা যায়—(Emancipation) মুক্তি বা বিয়োগ এবং একতা বা যোগ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিজের সাধনে ঐ দুই প্রণালীর সমাধান করে, নূতন যোগের, নূতন মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। এই সপ্তাহকাল পূর্ব্বে নগরের চারিদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দুইটি কথা শোনা যাচ্ছিল—Independence বা স্বাধীনতা, আর Dominion Status বা সাম্রাজ্য-সংস্রব। একদল চাহিলেন, বিজাতীয়ের শাসন থেকে মুক্তি—আর একদল চাহিলেন, বিজাতীয়ের সংস্রবে স্বরাজ। অধীনতা থেকে মুক্তি—আর সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে অন্যান্য জাতির সঙ্গে যোগ, এ দুয়ের সমাধান, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় আচার্য্যের আদর্শেই হ'তে পারে। Dominion Status আর Federation of states দুয়েরই মূলকথা "সহ-স্বাধীনতা"। এই "সহ-স্বাধীনতা" কেশবের ভাবের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়। সে ভাবের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ত্যাগ বা বর্জ্জন আমাদের নীতি হতে পারে না। গ্রহণই একমাত্র নীতি। গ্রহণেই মুক্তি, গ্রহণেই একতা যাতে হয়, সেই রকম গ্রহণ আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

৯ই জানুয়ারী, সাধুভক্তগণের প্রতি ভক্তি-অর্পণ সাধন হয়। সকল সাধুভক্তকে জীবনে যিনি একাধারে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সহিত একাত্মতার সর্ব্বভক্তগ্রহণ যেন জীবনের অন্নপান হয়।

১০ই জানুয়ারী, জনহিতৈষিগণের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ-সাধন হয়। ভক্তগণ ধর্ম্মসাধনে সহায়; কিন্তু নববিধানে কেবল ধর্ম্মসাধনেই পূর্ণসাধন হয়না; তাই যাঁহারা কর্ম্মসাধন দ্বারা জগতের হিত-সাধনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, তাঁহাদিগকেও প্রাণে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মসাধনাতেও যেন নিরত হই, এবং তদ্দ্বারা নববিধানকে পূর্ণ করিতে পারি। এই দুইদিনই নবদেবালয়ে ভ্রাতা প্রেমেন্দ্র নাথ উপাসনা করেন।

১১ই জানুয়ারী, উপকারীর উপকারস্মরণ-সাধন। নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই দেহ মন প্রাণ ও আধ্যাত্মিক জীবন যাঁহার যাঁহার উপকার দ্বারা রক্ষিত, সকলকেই স্মরণপূর্ব্বক ভক্তিঅর্পণ করা হয়।

১২ই জানুয়ারী, বিরোধিগণের স্মরণীয় দিনে তাঁহাদের বিরোধিতার ভিতর উপকারিতাস্মরণে প্রণাম করা হয় এবং তাঁহাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা হয়।

১৩ই জানুয়ারী, আত্মার আত্মস্থ হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনলাভে প্রকৃত নবব্রহ্মোৎসব সাধনের জন্য প্রস্তুতি ভিক্ষা করা হয়। অদ্য সন্ধ্যা ৬॥০ টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। "আত্মার জন্য" ভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা পাঠ করিয়া তদবলম্বনে এই ভাবে নিবেদন করা হয়:—

নববিধানের উৎসব মহামিলনোৎসব। এ মিলন দেশকালগত মিলন নয়, দেশকালের অতীত নিরাকার চিন্ময় আত্মায় আত্মায় অনন্ত মিলন। আমি কে? ব্রহ্মসন্তান। ভাইবোন সকল

নরনারী কে? ব্রহ্মসন্তান। অমর ব্রহ্মসন্তানগণের মিলনে নববিধানের নবব্রহ্মোৎসব। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সাধনের দ্বারা আত্মিক যোগসাধন করিতে করিতে অদ্য মহাযোগে বিলীন হইয়া, নবপ্রকৃতিবিশিষ্ট নবকুমার—যাঁহার নাম শ্রীঅদ্ভুত, যিনি ইহাঁর পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গকর্ত্তৃক আদৃত, এই আত্মা সকল নীচতা পরিহার করিয়া স্বর্গীয় জীবন লাভ করিবে, এবং মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবে, এই নবজাগরণ-লাভই প্রাস্তাতিক সাধন-সিদ্ধ ফল।

নবনবতিতম মাঘোৎসবে

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

১৫ই মাঘ, ১৩৩৫ সাল, সোমবার।

তেওট।

ব্রহ্মানন্দে এক হয়ে, সুরে সুর মিলাইয়ে,
এস সবে মার নাম গাই।
ধর্ম্মরাজ্যে প্রেমরাজ্যে, সবে ভাই ভাই।
হৃদয় খুলে প্রেমে গ'লে, মায়ের চরণ-তলে,
এস মা জননী বলে, আনন্দে লুটাই।
বলি জয় অভয়ার জয়, যাচি এস বরাভয়,
দেখি রাঙ্গা পদে স্থান পাই কি না পাই।

দশকুশী।

ওই শোন, ওই শোন, গাইতেছে সুরগণ,
প্রেমানন্দে মত্ত সবাই;
(আনন্দ ধরেনা ধরেনা)—(সকলের প্রাণে আজ)
যোগী ঋষি ভক্তগণ, করে নাম সঙ্কীর্ত্তন,
মুখে মা নাম বিনা কিছু নাই। (আহা মরি মরি রে)
মধুর ললিত তানে, বিভোল অমরগণে,
ঈশা মহম্মদ গৌর নিতাই; (তারা সবে এক হ'য়ে)
মহাযোগ-সম্মিলনে, মিলে সবে প্রাণে প্রাণে,
আমরাও মার গুণ গাই। (সবে নেচে নেচে রে)
(প্রেমানন্দে বাহু তুলে)
সবার হৃদয় মাঝে, সাজি নব নব সাজে,
করেন লীলা জগত-জননী; (নব নব রূপে)
হ'ল প্রাণ আলোকিত, অন্ধকার তিরোহিত,
প্রকাশিত জ্ঞান-রূপিণী। (আঁধার ঘুচাইয়ে রে)
হের হের হৃদি মাঝে, মা যে সদা বিরাজে,
ঘুরে ঘুরে কেন খুঁজে মরি; (দেশ বিদেশে)
হ'য়ে সবে একপ্রাণ, ভক্তি জলে করি স্নান,
হেরি মার রূপের মাধুরী। (আজ প্রাণ ভরে রে)

একতালা।

নববৃন্দাবনে, হরি দরশনে,
কে যাবি রে ভাই আয়।
(এসো) ব্রহ্মানন্দ সনে, ল'য়ে ভক্তগণে,
হেরি লীলা-রসময়॥ (হৃদয় মাঝে)
(কিবা) যুগল মুরতি, পুরুষ প্রকৃতি,
একাধারে শোভা পায়। (আহা মরি মরি)
(সেথা) নাহি জটিলতা, নাহি কুটিলতা,
নাহি জাতি কুল ভয়॥ (সেই স্বর্গধামে)
(সেথায়) যোগী ঋষিগণ, ধ্যানে নিমগন,
ভক্তে হরিগুণ গায়। (একতন্ত্রী ল'য়ে)
ঈশা মহম্মদ, গৌরাঙ্গ নারদ,
মিলেছেন সবে সেথায়॥ (নববৃন্দাবনে)
হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়। (নব বিধি মতে)
তন্ত্র বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ,
গায় একই হরির জয়॥ (কিবা একই সুরে)
(আজ) স্বর্গে মর্ত্তে সবে, বলে ভীম রবে,
জয় অরূপ চিন্ময়। (প্রেমানন্দে বলে)
এ মহামিলন, নূতন বিধান,
দেখাইল এ ধরায়॥ (বিবাদ ঘুচাইয়ে)
সুরামর বৃন্দ, হ'য়ে সদানন্দ,
বলে জয় দয়াময়। (তারা নেচে নেচে)
শোক দুঃখ তাপ, বিষাদ বিলাপ,
কাঁদিয়ে ভয়ে পলায়॥ (নিত্যানন্দ হেরে)
শান্তি-নিকেতনে, শান্তি-সমীরণে,
ত্রিতাপ জ্বালা জুড়ায়।
(সেথা) কেবলি আনন্দ, নাহি নিরানন্দ,
আনন্দে আনন্দময়॥ (নব বৃন্দাবনে)

খয়রা।

এস এস করি সবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন রে।
নামৈব পরমা গতি বলেন সাধুগণ রে॥
উড়ায়ে নববিধান বিজয় নিশান রে।
বলি জয় জয় দয়াময়, পতিত-পাবন রে॥ (সবে নেচে নেচে)
অহঙ্কার পরিহরি, জপি হরি নাম রে। (ভেদাভেদ ভুলে রে)
সমর্পিয়ে হরিপদে, ধন জন মান রে॥ (যা কিছু সব)
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে শ্রীহরি-চরণ রে।
পাইতে হইত কত, কষ্ট পরিশ্রম রে॥ (বিজনে গহনে) (কত)
কলিতে সে সব কষ্টের, নাহি প্রয়োজন রে।
হরি বোলে নেচে গেয়ে (হব) পূর্ণমনস্কাম রে॥ (আমরা সবে)

ত্রিতাপের জ্বালা হবে, নামেতে নির্ব্বাণ রে।
(শোক তাপ আর রবেনা)
মৃত্যুভয় দূরে যাবে, পলাবে শমন রে॥ (হরি নামের গুণে)
মিনতি করি সকলের ধরিয়ে চরণ রে।
একটিবার হরিনাম কর উচ্চারণ রে॥ (মনে প্রাণে এক হ'য়ে)
খাম্বাজ।
প্রেমানন্দে সদানন্দে হরি বল ভাই।
ঘুচিল জীবের যত বিবাদ বালাই॥
এক ধর্ম্ম এক হরি, নাহিরে ভাই দুই হরি;
এক বই দ্বিতীয় হরি, খুঁজে নাহি পাই। (কোন শাস্ত্রে)
একই হরি পিতা মাতা, একই হরি পরিত্রাতা;
একই হরি মুক্তিদাতা, বলিহারি যাই। (সব দেখে শুনে)
ধ্যান জ্ঞান ভক্তি মুক্তি, ধর্ম্ম কর্ম্ম বল শক্তি;
ইহ পরকালের গতি, হরি বই কেউ নাই। (এই জগতে)
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান, শিখ্ শৈব খ্রীষ্টিয়ান;
একই হরির সন্তান, তারাও সবাই। (ভাই ভাই সবে রে)
নদী রূপে ধর্ম্ম মত, বহিল ধরায় যত;
বিধান-সাগরে তাঁরা মিলিল সবাই। (সব এক হ'য়ে)
ভবিষ্যতে আবার যত, বহিবেরে ধর্ম্ম-স্রোত;
মিলিবে নববিধানে, সন্দেহ যে নাই। (নিশ্চয় নিশ্চয় রে)
এ নবসমুদ্র-তলে, কিবা পরশমণি জ্বলে;
কাঞ্চন যে হয় লৌহ পরশন পাই॥ (মণি পরশনে)
অমৃতের খনি আছে, বিধান-জলধি মাঝে;
যত্নে তুলে করি পান, (আর) জগতে বিলাই।
(সবে এস এস ভাই)

বিধান-ভাগবত।

(১৪ই মাঘ, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব দিনে প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত)

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, মাতৃগণ ও কন্যাগণ! আজ মহোৎসবের দিনে কোন্ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিব, যাহা শ্রবণ করিয়া আপনারা তৃপ্ত হইবেন? কোন্ বেদ উচ্চারণ করিব, যাহা মৃত প্রাণে চৈতন্যের সঞ্চার করিবে? শাস্ত্র-ব্যাখ্যা অপেক্ষা শাস্ত্রের অনুপ্রাণন বড় কথা। বেদ উচ্চারণ অপেক্ষা ব্রহ্মদর্শন মহৎ। যৌবনের উষা-কালে এই ব্রহ্মমন্দিরের সিঁড়ির এক পার্শ্বে আসিয়া কৌতুক-পরবশ হইয়া দাঁড়াইলাম। পায়ে জুতা নাই, অঙ্গে জামা নাই, পরিধানে কেবল একখানি ধুতি মাত্র। সে বেশে ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। এক সৌম্য-মূর্ত্তি পুরুষ বেদীতে বসিয়া বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, আর শ্রোতৃবর্গ অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় স্থির ও অচঞ্চল হইয়া নিমীলিত-নেত্রে শ্রবণ করিতেছেন। অপর দিকে গানের ঘর হইতে যেন স্বর্গের অমৃত-ধারা সঙ্গীতরূপে ঝরিয়া পড়িতেছে! আমি যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া সেই দিব্য পুরুষের দিকে তাকাইলাম। মনে হইল, কোন শুভক্ষণে যেন ধরাতলে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। এই অভূত-পূর্ব্ব স্বর্গের ছবিখানি বুকে লইয়া গৃহে ফিরিলাম, ভূতলে দেবদর্শন কি অলৌকিক ব্যাপার! আর আজ এই ৫৫.৫৬ বৎসর পরে সেই প্রাচীন দর্শন যেন প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে, আপনাদের মুখকমলে সেই প্রাচীন দর্শন যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে, আপনাদের মুখকান্তিতে সেই ব্রহ্মরূপ যেন কোটী সূর্য্যের আলোকের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাই বলিতে ইচ্ছা করে, শাস্ত্র বড় না দর্শন বড়? আজকার দিনে বিধান-ভাগবতের দুই একটী চিত্র, যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, তাহাই নিবেদন করি। রোগ-তাপ-ক্লিষ্ট ও দুঃখ-দৈন্যে জর্জ্জরিত মানব-জীবনও জীবন্ত বিধান-ভাগবত শ্রবণ করিলে প্রাণে সান্ত্বনা পাইবে, এই আমাদিগের একমাত্র আশা।

সে আজ দুহাজার বৎসরের কথা, যে দিন মহর্ষি ঈশা জর্ডন নদীর তীরে সাধু জনের দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন, সেই তাঁহার নিকট স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, যেন ব্রহ্ম কৃপা সাক্ষাৎ রূপে তাঁহার মস্তকে অবতীর্ণ হইল। আর যে দিন ব্রহ্মানন্দ বিধান-চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে, এক নূতন আলোক ফলে ফুলে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সেই আলোক খেলা করিতেছে, ধর্ম্মে কর্ম্মে শিক্ষায় সমাজে সেই আলোক আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে, ব্যবসায় বাণিজ্যে শিক্ষা ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে সেই আলোকের জয়-নিনাদ বাজিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিদিগের হিংসা বিদ্বেষের হলাহলের ভিতর এবং শাণিত খড়্গের ঝন্‌ঝনার মধ্যে সেই আলোক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি-সংস্থাপনের জন্য অভিনব নিয়ম-তন্ত্র প্রণয়ন করিতেছে। ধর্ম্ম-সমাজে সেই আলোক কখনও (Parliament of religions) ধর্ম্ম-মহামণ্ডল নামে, কখন (Convention of religions) ধর্ম্মমহাসভা-রূপে, কখন বিশ্ব-ভারতী রূপে, কখন সার্ব্বজনীন উৎসব রূপে, কখন মহাধর্ম্ম-সঙ্ঘের নামে দেশে বিদেশে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর সেই আলোক ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডি ভেদ করিয়া এবং ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া, সমস্ত এসিয়া ও ইয়ুরোপে আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে। ইহাই নূতন বিধানের নূতন আলোক! নূতন বিধান এই পঞ্চাশ বৎসরে বিশাল রাজ্য অধিকার করিয়া পৃথিবীতে এক মহা ধর্ম্মমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যাহা সত্য, তাহা আকাশে বিচরণ করে, তাহা গণ্ডী ভাঙ্গিয়া পৃথিবী ও স্বর্গকে অধিকার করে। বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া, নূতন বিধানের নূতন রাজ্য দর্শন করিয়া, আজ আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছি।

কথিত আছে যে, মহর্ষি ঈশা যখন শিষ্যগণকে লইয়া পাহাড়ে উপদেশ দিতেন, তখন তাঁহার মুখকান্তি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিত এবং বস্ত্র সকল রজত-খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল রূপে শোভা প্রাপ্ত হইত। ইহা ইতিহাসের কথা, ইহা স্বচক্ষে দেখি নাই। কিন্তু শ্রীকেশবচন্দ্র যখন টাউনহলে এই নূতন আলোকের কথা বর্ণনা করিতেন, মনে হইত, যেন তাঁহার এক রসনা সহস্র রসনায় পরিণত হইয়াছে, মুখ যেন স্বর্গালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গের মত রসনা হইতে বেদ বেদান্ত যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। রক্ত মাংস যেন রূপান্তরিত হইয়াছে, যেন স্বর্গ হইতে কোন দিব্য মূর্ত্তি অপূর্ব্ব জ্যোতি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সে ছবি ভাষায় অঙ্কিত করিয়া কাহাকেও দেখাইবার সাধ্য নাই, তবে মধ্যে মধ্যে সে পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া আমার চক্ষু দিয়া যে অজস্র অশ্রু পতিত হয়, তাহাই আমার এক মাত্র সান্ত্বনা! এই অশ্রুজলের যদি ভাষা থাকে, তবে তাহা আপনাদের নিকট আজ সেই পবিত্র স্মৃতির একখানি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া যাইবে।

যে দিন শ্রীকেশবের হৃদয়-মরুতে ভক্তির মন্দাকিনী প্রথম প্রবাহিত হইল, সে দিন ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে এক নবযুগ উপস্থিত হইল। নির্গুণ বেদান্তবাদ সেই দিন বাঙ্গালার মাটীতে সগুণ ভক্তির আকার লইয়া নব জন্ম গ্রহণ করিল। অকর্ম্মক ভক্তি সে দিন সকর্ম্মক ভক্তির প্রসাদ লইয়া এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের কঠোর বৈরাগ্যকে রসাল ও মধুময় করিয়া, গৃহস্থের ঘরে ঘরে বিতরণ করিল। সন্ন্যাসী না হইয়াও গৃহস্থের নানা কর্ত্তব্যের ভিতর যে ভক্তির পবিত্র আস্বাদন ভোগ করা যায়, কেশবচন্দ্র তাহারই গূঢ়তত্ত্ব ব্রাহ্মসমাজকে দিয়া গেলেন। ভক্তির তীক্ষ্ণ শরাঘাতে যে দিন ব্রহ্মানন্দ সত্যং জ্ঞানং প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপের শুষ্ক পাষাণ ভেদ করিয়া ভক্তির সহস্র প্রস্রবণ আনয়ন করিলেন, সে দিন ব্রাহ্মসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইল। সেই নবযুগের কথা স্মরণ করিলে প্রতাপচন্দ্রের উপাসনার কথা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপিনীগণ যেমন গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ তাঁহার উপাসনা শুনিবার জন্য ব্রাহ্মযুবকেরাও ততোধিক আকৃষ্ট হইত। উপাসনা শুনিতে শুনিতে মনে হইত, যেন কোন লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছি। ত্রৈলোক্যনাথের সংগীত, ভাই অমৃতলালের অগ্নিময় উপাসনা, সাধু অঘোরনাথের যোগ, উপাধ্যায়ের গভীর পাণ্ডিত্য এক অলৌকিক ব্যাপার। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্পর্শ পাইয়া এক একটী জীবন যেন এক একটী বিধান-ভাগবতের নবনব অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই সকল জীবন-ভাগবত আমি পাঠ করিয়া ধন্য হইয়াছি। শ্রীকেশবচন্দ্র মুঙ্গেরে হরিনাম করিতে করিতে, যে দিন তাঁহার বাষ্প-বিগলিত অশ্রুজল গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া, বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া মুঙ্গেরের মাটীকে সিক্ত করিয়াছিল, যে দিন মুঙ্গেরের মাটীতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, সেই দিন মুঙ্গেরের ধুলিকণা যেন স্বর্ণ-রেণুতে পরিণত হইল। এই অপূর্ব্ব ভক্তির পবিত্র মূর্ত্তিখানি দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া ছিলেন, "আপনি কি সেই চৈতন্যদেব আবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন" ? তিনি নিরুত্তর, আপনার ভাবে আপনি প্রমত্ত! বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ বলেন যে, শ্রীভগবানের প্রেম একবার নবদ্বীপে আকার গ্রহণ করিয়াছিল, অব্যক্ত স্বর্গের প্রেম শ্রীচৈতন্যে ব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রেমের মাহাত্ম্য কি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? প্রেম কি একবার রূপধারণ করেন? প্রেম যে যুগে যুগে রূপ ধারণ করেন—যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম শ্রীকেশবে নব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

নববিধানের নূতন আলোক কি নির্ব্বাপিত হইয়াছে? আকাশের কালমেঘ কতক্ষণ সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? গঙ্গার ভাটা জোয়ারের প্লাবনকে কি বদ্ধ রাখিতে পারে? রাত্রির অবসাদ কি দিবসের ব্যস্ততাকে ক্ষীণ করিতে পারে? রাত্রির অন্ধকারের পর দিবসের আলোক বিধাতার অনিবার্য্য বিধি। মণ্ডলীর শিথিলতা ও অপরাধের জন্য যে অবসাদ আসিয়াছে, কালে তাহা চলিয়া যাইবে। আমাদের ব্যর্থ জীবন ও চেষ্টা ভবিষ্যতের সফলতাপূর্ণ জীবনকে প্রসব করিবে। বর্ষার অবসাদ প্রখর সূর্য্য-কিরণের অপেক্ষা করিতেছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমি বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করিতে বলিতেছি না। বর্ত্তমানকে অবহেলা করিয়া কোন দিন ভবিষ্যতের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইব না। বর্ত্তমানকে গৌরবময় করিয়া গড়িতে না পারিলে ভবিষ্যৎ গৌরবময় হইবে না। বর্ত্তমান গৌরবময় হইবে কিসে? নববিধানের আদর্শ লইয়া জীবন সাধন কর, জীবন ধন্য হইবে।

নববিধানের আদর্শ বলিতে গিয়া আমি আজ আপনাদের নিকট ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা বলিব না, সাধু সমন্বয়ের কথা বা শাস্ত্র-সমন্বয়ের কথাও বলিব না, অথবা জড় সভ্যতাকে আত্মিক সভ্যতা দ্বারা কিরূপে জয় করা যায়, তাহারও উল্লেখ করিব না। এ সকল বড় কথা। শ্রীকেশবচন্দ্র ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে যে ধূলাতে লুণ্ঠিত হইলেন, সেই ধূলিই নববিধানের আদর্শ! রাজসিংহাসন ছাড়িয়া যাঁহারা ধূলিতে নামিয়া আসিলেন, তাঁহারাই অজেয় হইলেন, অক্ষয় অমর হইলেন। পৃথিবী তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। সহস্র সহস্র রাজমুকুট তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইল! সমস্ত সৃষ্টির মূলতত্ত্ব ধূলি! এই ধূলি হইতে প্রকাণ্ড পৃথিবীর সৃষ্টি হইল—এই ধূলি হইতে এত বড় হিমালয় গাত্রোত্থান করিল। কাহার সাধ্য আছে যে, এই হিমালয়কে টলাইতে পারে? এই ধূলি হইতে প্রতিদিন কত নূতন নূতন সৃষ্টি হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব তৃণকে আদর্শ করে অকিঞ্চনা ভক্তি সাধন করিয়াছিলেন, আর নববিধান ধূলিকে আদর্শ করিয়া নবভক্তি সাধন করিলেন। তখন ধূলির মাহাত্ম্য বুঝিবার সময় হয় নাই, তখন ভক্ত তৃণকেই সর্ব্বাপেক্ষা নীচ মনে করিলেন। নববিধান বলিলেন, আমার আদর্শ ধূলি, যে তৃণেরও নীচে থাকে। সকলের নীচে থাকে বলিয়া সকলকে বুকে ধরে পোষণ করে। ধূলি

তৃণকে জন্ম দান করে। নিজের দেহ দিয়া সকলের দেহ নির্ম্মাণ করে, নিজের বক্ষ পাতিয়া নদ নদীকে ধারণ করে, জীবের তৃষ্ণা দূর করে। ধূলিই রত্নগর্ভা সমুদ্রকে ধারণ করিয়া আছে। একবার জ্ঞানের অভিমান, পদের অভিমান, অভিজাত্যের অভিমান, অভিজ্ঞতার অভিমান, ধনের অভিমান ত্যাগ করিয়া ধূলির সঙ্গে মিশে যাও; তোমার ভিতর থেকে নূতন সৃষ্টি উৎপন্ন হবে। ভেদাভেদে জগৎ শতধা বিভক্ত হয়েছে। ধূলির মধ্যে কোন ভেদ নাই, কোন আড়ম্বর নাই, কোন দ্বিধা নাই, কোন ভয় নাই, অথচ ইহার ভিতর অনন্ত শক্তি বিরাজ করিতেছে। যে ধূলি হইতে পৃথিবী গঠিত হইয়াছে, তোমার আমার শরীর গঠিত হয়েছে, সেই ধূলি হইতেই স্বর্গরাজ্য গঠিত হইবে। শ্রীবুদ্ধদেব যে দিন রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করে ধূলায় আসন পাতিলেন, রাজশয্যা ত্যাগ করে ধূলায় শয়ন করিলেন, সেই দিন ভারতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। যে বেদ বেদান্ত হাজার হাজার বৎসর ধরে আর্য্য অনার্য্যের, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদরেখা দূর করিতে পারিল না, শ্রীবুদ্ধের ধূলার আসন সে ভেদ দূর করিল। শক হুন ইরাণ আর্য্য সব মিলে এক অখণ্ড ধর্ম্ম-জাতি ভারতে সৃষ্টি করিল। এর চেয়ে ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত, মিলনের দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

মতে পৃথিবী জয় করা যায় না, মৈত্রীতে জয় করা যায়, প্রেমে জয় করা যায়। একটী ধূলিকণার সঙ্গে আর একটী কণা যখন মিলিত হয়, সে মিলনকে কেউ, পৃথিবীর কোন শক্তি পৃথক্ করিতে পারে না। কণায় কণায় মিলে, অণুতে অণুতে মিলেই বড় বড় দ্বীপ হয়, বড় বড় দেশ সৃষ্টি হয়, নূতন জগৎ গড়ে। ধূলির মত ছোট হয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধরে থাক, দেখ্‌বে, তোমরাই ভবিষ্যতে বড় হবে, তোমাদের মধ্য হতে নূতন জগৎ উৎপন্ন হবে। প্রকাণ্ড বেদ বেদান্ত যা শেখাতে পারে না, এক কণা ধূলি তা শেখাতে পারে।

হে বিধাতঃ, এই ধূলিতত্ত্বের ভিতর থেকে তুমি এবার নূতন বেদবেদান্ত লেখ, নূতন জাতি সৃষ্টি কর। ছোটর ভিতর যে অক্ষয় অনন্ত শক্তি আছে, তাই দিয়ে আমরা জগৎ জয় করিব। তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের সাধনা যেন সিদ্ধ হয়।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধ্বীর জীবন।

শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা সতী, পতিব্রতা দময়ন্তী ইত্যাদি প্রাচীন মহিলাকুলের চরিত্র এবং গুণ ভারতবর্ষে চিরবিদিত। কত কুমারী কন্যাগণ বিদ্যাজ্ঞানে শোভিত হইয়া, পবিত্র ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়া এই ভারতের মুক্ত আকাশকে উজ্জ্বল করেছেন। সে সকল স্মরণ করে আমরা কত গৌরবান্বিত হই। লীলাবতী, গার্গী প্রাচীন ভারতের নাম রেখে গেছেন তাহাই নয়, কিন্তু এই সময়ের যুগেও সেই নাম সেই স্থান অধিকার করতে কেহ কেহ অগ্রসর হচ্ছেন দেখে আশা করি, আরও কত বিদুষী বিদ্যাবতী কুমারীগণ পুণ্যের জ্যোতিতে ভারতকে ধন্য করবেন।

আজ ১লা জানুয়ারী, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, শুভদিনে যাঁর জীবনের কথা আমরা আলোচনা করছি, সেই গৃহলক্ষ্মী মাতৃদেবী ১২৫৬ সালের আষাঢ় মাসে, এই নারী-গৌরব-ময় ভারতের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নববিধানের প্রেরিত ভাই কেদার নাথ দের সহধর্ম্মিণী হয়ে সহসাধিকা ও চির অনুগামিনী হয়েছিলেন। তিনি শৈশব কাল হইতে বিশেষ ধর্ম্মালঙ্কৃতা ও অতিশয় উচ্চপ্রকৃতি-বিশিষ্টা ছিলেন। তাহার পরে সেই কোমল সরস ক্ষেত্রে নূতন ধর্ম্ম-বিধির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, এই জীবন-পুষ্পটী যে সৌরভে তাঁর স্বগৃহ-উদ্যানে ও নরনারীর মধ্যে সকল সামাজিকতার ভিতরে সকলকে আমোদিত করেছিলেন, তাহা গ্রহণযোগ্য।

মাতৃদেবী স্বর্ণলতা দেবী কোন্ গুণটীতে যে ভূষিত ছিলেন না, তাহা মনে পড়ে না। কোমলতা, পাতিব্রত্য, সামাজিক ব্যবহার, সন্তান-পালন, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর-শীলতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, উপাসনায় অনুরাগ, মনুষ্যমাত্রের প্রতি স্নেহ-শীলতা ও প্রেম অতুলনীয় ছিল। আশ্চর্য্য ধীশক্তি এবং স্মৃতিশক্তিও তাঁহার ছিল। সুগায়িকা ছিলেন। সেই জন্য আদিম ভারতের মহাভারতগ্রন্থ ও রামায়ণ গ্রামের সকলকে মিষ্টস্বরে গান করিয়া শুনাইতেন। আবার বহুপূর্ব্ব দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়গুলি এতই সুন্দর ও মনোরম করিয়া বিবৃত ও গল্প করিতেন, যাহা কখন কাহাকেও করিতে শুনি নাই।

আজ ১৫ বৎসর হইল, এই বিমলানন্দ ঊষাকালে আনন্দলোকে উত্থান করিয়াছেন। এই সাধ্বীর জীবন-সৌরভ টুকু গৃহে, সমাজে, দেশে প্রকাশিত হয়ে, ভারত-ললনার আর্য্য-রমণীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখুক।

সেবিকা
ভারত-ললনা।

—•—

সংবাদ

শুভ বিবাহ—গত ২৪ শে জানুয়ারী, কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাকের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র কুমার বসাকের সহিত, পাটনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বেচুনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী শোভনার শুভবিবাহ পাটনা নগরীতে সম্পন্ন হইয়াছে। বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সেন আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। এই উপলক্ষে বেচুনারায়ণ বাবু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৬ ইমাঘ, ২৯ শে জানুয়ারী, ৫৭ নং ল্যান্সডাইন রোডে,

গোপীনগর-নিবাসী স্বর্গীয় লালচাঁদ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র, জামসেদপুর টাটাক্যাক্টরীর ইঞ্জিনীয়ার, কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ বসুর সহিত, স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র রায়ের পৌত্রী, ব্যারিষ্টার সুবোধ চন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী সুজাতার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ১৯ শে মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ২৫৭নং নিউপার্কষ্ট্রীটে, শিলচরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিপুল চন্দ্র গুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বেণীমাধব গুপ্তের সহিত, রঙ্গপুর কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ ডি, এন্, মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী লীনার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

ভগবান্ নবদম্পতিদিগকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা জানুয়ারী, ৩২নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শান্তসাধক স্বর্গগত ভাই কেদার নাথ দের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা স্বর্ণলতা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমতী হেমলতাচন্দ ও শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী অশোকলতা দাস প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা এবং শ্রীমতী হেমলতা চন্দ মাঘোৎসবে ২৲টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১লা মাঘ, শিলচরে, সিভিলসার্জ্জন মেজর জ্যোতিলাল সেনের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে পিতৃদেব ভাই বিহারী লাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার-ভাণ্ডারে ২৲ টাকা, স্বর্গগত প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে ৩৲ টাকা এবং স্বর্গগত ভাই আশুতোষ রায়ের সহধর্ম্মিণীকে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২০ শে জানুয়ারী, বাগবাজারে, ১৩।১ বোসপাড়া লেনে, স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী চপলা মজুমদার ১৲,শ্রীমতী শরৎ কুমারী দেব ২টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ৩১ শে জানুয়ারী, উৎসবের শান্তিবাচনের দিনে, স্বর্গগত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা সুমঙ্গলা দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ১।৫ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন বিশেষ প্রার্থনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৫ই মাঘ (১৮ই জনুয়ারী) বাঁকিপুরে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দামোদর পালের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নরেশনন্দিনী দেবী বহুদিন রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, অবশেষে ভগ্ন নশ্বর দেহখানি ফেলিয়া, প্রেমময়ী জননীর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রিয়তম স্বামী, পাঁচপুত্র, সাত কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী, জামাতা প্রভৃতি বহু পরিজন সংসারে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শোক-সহানুভূতি জানাইতেছি।

গত ১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী), পাটনায় বাসভবনে তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সন্তানদের কর্ত্তৃক গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু শ্লোকপাঠে সাহায্য করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। সতী সাধ্বীর সুন্দর জীবনীও শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত হয়। তাহা স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

এই পবিত্র অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত, পরলোকগত আত্মার সম্মানার্থ এবং জনসমাজের উপকারার্থ নিম্নলিখিত দান উৎসর্গাকৃত হইয়াছে:—

বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দির ৫০৲, কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রম ও প্রচার কার্য্যালয় ৫০৲, কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ২৫৲, কলিকাতা নববিধান সমাজের Brahmo Relief Fund ২৫৲, শ্রদ্ধেয় প্রচারক প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থে ২০৲ কলিকাতা সাধনাশ্রম ২০৲ Victoria Institution for medal, ২০০৲,নববিধান কাগজ ২০৲,ভোজ্য দুটী ৩০৲, বেলাসিংহ M. E. School ১০৲,গিরিডি Girls High School ১০৲,ঢাকা নববিধান ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দির ১০৲, মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দির ১০৲, লাহেরিয়া সরাই বিনয়ভূষণ বালিকা-বিদ্যালয় ১০৲, শ্রীহট্ট ব্রহ্মমন্দির ১০৲, কাঙ্গালীবিদায় ৫০৲, ভাগলপুর মোক্ষদা বালিকা-বিদ্যালয় ১০৲, শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়দিগের জন্য ১২খানি বস্ত্র, ১২খানি গৈরিক ও ১২খানি আসন। ৪টী ঘটি।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে অনন্ত শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

স্মৃতিসভা—গত ৮ই জানুয়ারী, এলবার্টহলে, শ্রীমদ্ আচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণ দিনে বিরাট সভা হয়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সার সি, সি, ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যার নীলরতন সরকার মুদ্রিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা সভাস্থলে বিতরিত হয়। তৎপর Dr F. C. Southworth, জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা করেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ দান করেন। ময়মনসিংহ, শিলচর প্রভৃতি স্থানেও স্মৃতিসভা হইয়াছে। তাহার বিবরণ আগামীবারে দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

স্বদেশে প্রত্যাগমন—স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের দৌহিত্রী,ডাঃ হৃদয়চন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠাকন্যা কুমারী অনুপমাপ্রীতি দাস বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৮, প্রিয় জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গত ১লা জানুয়ারী কন্যার মাতামহীর সাম্বৎসরিক দিনে, কন্যার মাতৃদেবী শ্রীমতী অশোকলতা দাস মঙ্গলময় পিতামাতা ভগবানের চরণে কন্যার শুভাগমনে কৃতজ্ঞতা দান ও কন্যার মঙ্গলার্থ বিশেষ প্রার্থনা করেন। আমরাও ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, আমাদের মণ্ডলীর এই প্রিয়তমা কন্যা উত্তরোত্তর উচ্চশিক্ষা ও উচ্চ জীবন দ্বারা মণ্ডলীর ও পরিবারের গৌরব বর্দ্ধন করুন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী প্রচার ভাণ্ডারে ৫টাকা দান করেন।

দীক্ষা—গত ১লা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারী, নবদেবালয়ে ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী লীনা ও শিলচর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপুল চন্দ্র গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বেণীমাধব গুপ্ত নবসংহিতামতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমতী মহারাণী সুচারুদেবী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ভাই প্রিয় নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ নব দীক্ষিতদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

স্মৃতিরক্ষা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, শ্রীমদ্ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ও প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৈত্রিক বাসভূমি গরিফা গ্রামে তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য "গরিফা:কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা-সমিতি" বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন "কেশবচন্দ্র-স্মৃতি-মন্দির" নামে একটী মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের চিত্রাদি রক্ষা করা এবং "কেশবচন্দ্র পাঠাগার" নামে একটী পাঠাগার স্থাপন করা হইবে। "কেশব-পাঠশালা" ও "ধর্ম্মোৎসাহিনী" নামে যে সাপ্তাহিক সভা চলিয়া আসিতেছে, উহাদিগকেও ঐ মন্দিরের অন্তর্গত করা হইবে। উক্ত স্মৃতি মন্দিরের নিকটে আর একটী গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক "প্রতাপ চন্দ্র বালিকা-বিদ্যালয়" এবং "প্রতাপচন্দ্র নৈশ-বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইবে। "কেশবচন্দ্র স্মৃতিমন্দির"নির্ম্মাণে ৭০০০ টাকা,আসবাব ও পুস্তকাদি ৩০০০ টাকা, প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণে ৩০০০ টাকা, এবং আসবাবাদি ১০০০ টাকা, মোট ১৪০০০ টাকা আনুমানিক ব্যয় উক্ত সভাকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত সমিতি এই মহাআদ্বয়ের প্রতিভামুগ্ধ সর্ব্ব-সাধারণের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। সাহায্যকারিগণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহাদের দানের পরিমাণ প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানদ্বয়ে বিভাগ করিয়া দিবেন। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক অথবা এককালীন যথাসাধ্য চাঁদা মুক্তহস্তে প্রদান করিয়া সমিতির কর্ত্তব্যপালনে সকলে সানন্দে সহায়তা করিবেন, আশা করি। সমিতির কোষাধ্যক্ষ রায় সাহেব চুনিলাল রায়, ১২৪।৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, অথবা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বলরাম সেন ভাগবত-রত্ন, গরিফা, ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় দানের টাকা পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে। সমিতির নিয়মাবলী আদি কেহ পাইতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতিকে চিঠি লিখিলেই পাইবেন।

পুস্তক-পরিচয়।

মহাত্মা বিনয়েন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত। নববিধান ট্রষ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নববিধান-মণ্ডলীর বর্ত্তমান যুবক-দলের মধ্যে বিনয়েন্দ্র নাথ যে একজন নেতা ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। স্বর্গীয় মোহিত চন্দ্র, ভাই প্রমথ লাল এবং বিনয়েন্দ্র নাথ তিনজনই সহযোগী। কিন্তু বিনয়েন্দ্র নাথের জীবন কেবল নববিধান-মণ্ডলীতে নিবদ্ধ নয়। তিনি শিক্ষাবিভাগে শিক্ষা-ব্রত লইয়া শিক্ষক ও ছাত্রজীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বিশেষরূপে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক, পরীক্ষক, সদস্য এবং বক্তা কেমন হইতে হয়,এই সকল প্রকার জীবনেরই আদর্শ তাঁহার জীবন। শ্রীকেশবানুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের শিক্ষাধীনে বিনয়েন্দ্র নাথের বাল্য জীবন গঠিত হয়, তাঁহার এবং আচার্য্যদেবের অনুগমনে বিনয়েন্দ্র নাথ আপন জীবন সমুন্নত করেন। বাস্তবিক তাঁহার জীবনে দেশের, জাতির, মণ্ডলীর কতই আশা উদ্দীপিত হইয়াছিল। সকল আশা পূর্ণ হইতে না হইতেই যেন মা তাঁর সুসন্তানকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তথাপি যে জীবনাদর্শ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয় যুবা ও ছাত্রগণের বিশেষ অনুকরণীয়। পুস্তকখানি বেশ সুখপাঠ্য ও উপাদেয় হইয়াছে। লেখক বিনয়েন্দ্র নাথের সুন্দর পত্রাবলী প্রকাশ করিয়া ইহাকে আরো উপাদেয় করিয়াছেন। নববিধান ট্রষ্ট পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি।

(বঙ্গানুবাদ সহ)

দ্বাদশ-অধ্যায়-সমন্বিত সংস্কৃত শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি বঙ্গানুবাদ সহ অনুমান রয়েল ৮পেজি ৭০ কি ৭৫ ফর্ম্মায় তিন খণ্ডে শেষ হইতে পারে, আশা করা যায়। ভগবানের কৃপায় প্রথম চারি অধ্যায় প্রথমখণ্ডে অষ্টাদশ ফর্ম্মায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণের ও মুদ্রাঙ্কণের সুবিধার জন্য অগ্রিম গ্রাহকদিগকে বঙ্গানুবাদ সহ সমগ্র গ্রন্থখানি চারি টাকা মূল্যে (মূল গীতাপ্রপূর্ত্তির মূল্যে) দেওয়া যাইবে। যাঁহারা খণ্ডাকারে গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা প্রতিখণ্ড ডাকমাশুল ব্যতিরেকে ১॥০ দেড় টাকায় পাইবেন। যাঁহারা পশ্চাতে গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহাদের জন্য গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মূল্য স্থির করা গেল না। গ্রন্থপ্রাপ্তির ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল:—

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন

৩৫ নং বিধানপল্লী, পোঃ রমণা (ঢাকা)।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৭ই ফাল্গুন, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। ১৬ই ফাল্গুণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 28th February, 1929. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

মা উৎসবানন্দদায়িনি, উৎসব দিলে, আনন্দ দিলে, স্বর্গের বাতাস পৃথিবীতে প্রবাহিত করিলে, স্বর্গস্থ অমরাত্মাদিগের সঙ্গ সহবাস দানে সত্যই কৃতার্থ করিলে। তোমার প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণে তাঁহারা যেমন নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, উৎসবে আমাদের ন্যায় পাপী অধম সন্তানদিগকেও সেই দর্শন শ্রবণের উচ্চ অধিকার দিয়া, তাঁহাদের আনন্দ যে আমাদেরও সম্ভোগের বিষয় করিয়া দিলে, ইহাত আমরা কেহই অস্বীকার করিতে পারিনা। কিন্তু, মা! তাঁহারা যেমন নিত্য উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, আমাদিগের ভাগ্যে কেন তাহা হয়না? উৎসবের সময়, প্রকৃত উপাসনার সময় আমরা যে স্বর্গের আনন্দ সম্ভোগ করি, কেন তাহা চিরস্থায়ী হয় না? সে নেশা কেন ছুটিয়া যায়? কেন তাহা চিরতরে থাকে না? উৎসবের আনন্দ আসে, আবার যায় কেন? আবার কেন সংসারের অসার প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা, সাংসারিকতা, অহংকারিতা, জড়তা, পাপ, রাগ, দ্বেষ, হিংসা আসিয়া উৎসবোপার্জ্জিত পুণ্য শান্তি হরণ করিয়া লয়? মা! এমন কি কিছু করিতে পারনা, যাহাতে এই সকলের হাত হইতে একেবারে আমরা মুক্ত হইয়া, তোমার অমরাত্মা ভক্তদের ন্যায় নিত্য উৎসব-সম্ভোগে ধন্য হইতে পারি? তুমি, মা, বলিতেছ, "তাঁহারা দেহে মৃত হইয়া আমিত্ব হইতেও মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই, নিত্য উৎসবানন্দ-সম্ভোগের অধিকারী হইয়াছেন; তোমরাও যতদিন না সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব-মুক্ত হইবে, ততদিন উত্থান পতনের সম্ভাবনা যাইবে না।" মা, তবে আমাদিগকেও তেমনি এদেহে থাকিতে থাকিতে আমিত্ব-মুক্ত করিয়া নিত্য উৎসবানন্দ সম্ভোগের উপযুক্ত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—•—

নববিধানের মহোৎসব-সাধন।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান। ইহার সাধন ভজন, উপাসনা উৎসব যাহা কিছু, সকলই বিধাতার বিধান। মানুষের হাতে কিছুই নয়। মানুষের হাত যেখানে, নববিধান নাই সেখানে।

সময় ছিল, যখন মানুষ সাধন করিত, ভজন করিত, উপাসনা করিত, তপস্যা করিত; কষ্ট কল্পনা কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিত। পাঁচজনে বিচার বুদ্ধি করিয়া, তর্ক যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত। প্রাচীন বিধানে তাহাই উচ্চনীতি বলিয়া আদৃত হইত, ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই কর্ত্তব্য নীতি বলিয়া আচরিত হইত; কিন্তু নববিধানে মানুষের হাতে বিধাতা

কিছুই রাখেন নাই।

ঝড় যখন বয়, তখন কি আর হাত পাখা, টানা পাখা বা বৈদ্যুতিক পাখার আবশ্যকতা থাকে? দিবসে সূর্য্যের আলোকে যখন চারিদিক আলোকিত, তখন কি আর প্রদীপের আলোক, বা বৈদ্যুতিক আলোকের প্রয়োজন হয়? তেমনি নববিধানে যাহা কিছু সকলই জীবন্ত ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে সম্পন্ন হয়। মানুষ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেই নষ্ট হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়।

নববিধানের উপাসনা মানুষ করে না, পবিত্রাত্মা করান। নববিধানের উৎসবও তেমনি স্বর্গের ঝড়। আকাশের ব্রহ্মবাণী "আমি আছি" "আমি আছি" "আমি এসেছি, আমি এসেছি," যখন ঝড়ের রূপ ধারিয়া, বিদ্যুতের তেজ প্রকাশ করিয়া, মানবের প্রাণে, মণ্ডলীর পরিবারের হৃদয়ে আঘাত করে, আলোকিত আন্দোলিত করে, তখনই যথার্থ নববিধানের উৎসব হয়।

তাই আচার্য্যদেব বলিলেন,"উৎসবের ঝড় উঠিয়াছে। ঝড় কি, প্রত্যাদেশ, ব্রহ্মমুখবাণী এই ঝড়। এ ব্রহ্মের কথা ভারতে ঘুরিতেছে; আমার কাণে লাগিতেছে। প্রত্যাদেশ ঘনীভূত হইয়াছে এই ঝড়ে। কোন্‌দিক হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কে বারণ করিতে পারে? ব্রহ্ম কথা কহিতেছেন। পৃথিবীর উপদেষ্টারা চুপ করুন, ক্ষান্ত হউন। এখন মানুষের শাস্ত্র-প্রচারের সময় আর নাই। এ যে উৎসব। ঝড় আসছে, ৪০ হাজার বেদ বেদান্ত তার সঙ্গে ছুটছে। জীবন্ত ঠাকুর এসেছেন। 'আমি এয়েছি, আমি এয়েছি' এই শব্দ আরো জাঁকিয়ে আসুক। 'আমি আছি' 'আমি আছি' 'আমি আছি' 'আমি আছি' এই ব্রহ্মের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া ঝড় হইয়া আসুক। আমার মার মিষ্ট কথাগুলি এখন বজ্রধ্বনিতে আসছে। এ শব্দ কি আর না শুনে থাক্‌তে পারি? পৃথিবী চুপ। আর অবিশ্বাসী নাস্তিক নির্জ্জীব যেন কেহ না থাকে। ঐ শব্দ আমাদের পথের নেতা হউক। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নববিধানের উৎসবের স্থানে উপস্থিত হইব। ভাই বন্ধুকে নিয়ে চল। সকলে মিলে ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠধামে যাই। শুনি আর আরও পবিত্র হই। প্রত্যাদেশের যে এই প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া শুনি, স্পর্শ করি, দেখি, নবজীবন লাভ করি।"

ইহাই যথার্থ নববিধানের উৎসব। সুতরাং নববিধানের উৎসব মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হইবার নয়, ইহার বিধি ব্যবস্থাও মানুষের হাতে নয়।

প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট পরিচালিত হইয়া উৎসবের স্থানে গমন এবং সশরীরে সদলে বৈকুণ্ঠধাম সম্ভোগ বা ব্রহ্মদর্শন শ্রবণ দ্বারা প্রণোদিত পরিচালিত হইয়া স্বর্গের দেবাত্মাদের সঙ্গ সহবাসে পবিত্র উচ্ছ্বসিত আনন্দ-সম্ভোগই যথার্থ নববিধানের মহোৎসব।

ব্রহ্ম স্বয়ং দর্শন দিয়া, প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া, যে বিশুদ্ধ আনন্দদানে উন্মত্ত করেন, তাহা কেমন করিয়া মানুষের সাধ্যসাধনা বা মানুষের বিধি ব্যবস্থা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে?

প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-দর্শন না করিয়া, তাঁহার বাণী না শুনিয়া, তাঁহার পবিত্র প্রেরণা অনুভব না করিয়া, মানবীয় চেষ্টা দ্বারা বা মানুষের ইচ্ছা রুচির অধীন হইয়া, আমরা কি কখনও নববিধানের মহোৎসব সম্ভোগ করিতে পারি? ব্রহ্মের কথা যেখানে, মানুষের কথা কি চলে সেখানে?

বাস্তবিক নববিধান জীবন্ত ব্রহ্মের অবতারণা ও প্রত্যক্ষ পরিচালনা। তাহাই বিশেষ ভাবে উচ্ছ্বসিতভাবে দর্শন শ্রবণ সম্ভোগই নববিধানের উৎসব। মহামহোচ্চ স্বরে ব্রহ্ম স্বয়ং বলিতেছেন, "আমি আছি" "আমি এয়েছি" তাঁর কথা শুনাইতে। তাহা না শুনিয়া কি উৎসব হয়? এখানে কি মানুষের হাতে কিছু থাকিতে পারে? তাইত আচার্য্য বলিলেন, "পৃথিবী চুপ্। এখন মানুষের শাস্ত্রপ্রচারের সময় আর নাই।"

তিনি আরও একস্থানে বলিলেন, "রাত্রি হইল। হঠাৎ দেখিলাম, তোমার আসনে মানুষ বসিয়া উপদেশ দিতেছে। তোমার শিষ্যেরা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মানুষকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতেছে, দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলাম। আমার সে দেবতা কোথায়? মানুষ আসিয়া সে আসন লইয়াছে। এই কৃত্রিম ধর্ম্ম দূর করিয়া সনাতন নববিধান আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। যে ধর্ম্মে মানুষের কিছু বলিবার নাই, তোমার কথা শুনিয়া সব করিতে হয়, সেই ধর্ম্ম আন। মানুষকে গুরু করিলে, আপন আপন ধর্ম্ম নববিধান বলিয়া প্রচার করিলে, দুঃখের আর শেষ থাকিবেনা। এবারকার ধর্ম্মের নিয়ম এই, তোমাকে লইয়া আমরা থাকিব। আবার সকলকে

নূতন নববিধানে দীক্ষিত কর।"

অতএব নববিধানের সাধনা, নববিধানের উপাসনা, নববিধানের উৎসব কিছুই মানুষ গুরুর অধীনতায় নয় বা মানুষের নিজের হাতেও নয়, ইহারই যেন সাক্ষ্যদান আমরা করিতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শুদ্ধতায় সুখ, পাপে দুঃখ।

যে যার হয়, সেই যার সুখ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের অধিকারী হয়। যে তাঁর নয়, সে কেমনে তাঁর সুখ ঐশ্বর্য্য পাইবে? যার হওয়ার অর্থ যার বাধ্য বা ইচ্ছার অধীন হওয়া, শুদ্ধমনা হওয়া; তাহা হইলেই মা যে সুখ, আনন্দ ও যোগের ঐশ্বর্য্য দিতে চান, তাহাই সম্ভোগের অধিকারী হই। তাঁর না হইয়া যদি পাপের অধীন, মোহের অধীন, আমিত্বের অধীন, মানুষের অধীন হই, দুঃখ ও নিরানন্দ ভোগ করিয়া মরি।

নববিধানের উৎসবের ফল।

প্রায় সকল লোকেই নিজ নিজ ধর্ম্ম-সাধনে, উৎসব-সাধনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে মনেরও সুখ হয়। কিন্তু কেবল আত্মপ্রসাদ-লাভ বা সুখ-সম্ভোগই নববিধানের উৎসব-সম্ভোগের প্রসাদ নয়; জীবনের পরিবর্ত্তন ও চরিত্রের সমুন্নতি-লাভই নববিধানের উপাসনা ও উৎসবের প্রত্যক্ষ ফল। কেননা, সে উপাসনা উৎসব যে পবিত্রাত্মার প্রভাবে হয়। তাই তাহাতে শুদ্ধতা ও সুখ দুইই লাভ হইয়া থাকে।

পাপ ও অবিশ্বাস।

পতিতজন কেহ কখনই পতিত-পাবনের পরিত্যক্ত হয়না। পতিত ব্যক্তি সরল-প্রাণে অনুতাপ করিলেই, পতিত-পাবন তাহাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু হাড়শক্ত অবিশ্বাসী যে, সে অবিশ্বাসের অস্ত্রে আপনাকে হত্যা করে, ঈশ্বর ও তাঁহার বিধানকে পরিত্যাগ করে, সে অনুতাপও করেনা, গৃহীত হইতে চায়ও না, সুতরাং হয়ও না। এই জন্য পাপ অপেক্ষা অবিশ্বাস অধিকতর ভয়ঙ্কর।

২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর।

ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশার শুভ জন্মদিনই জগতে এতদিন বড়দিন বলিয়া সাধিত হইয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক মানব-সন্তান যে ব্রহ্মসন্তান, শ্রীঈশার শুভজন্ম-গ্রহণেই প্রথম মানবের এই আত্মজ্ঞান লাভ হইল, সুতরাং সেদিন নিশ্চয়ই জগতের পক্ষে বড়দিন। কিন্তু একা নরের দ্বিজত্ব-লাভে ধর্ম্মবিধান পূর্ণ হয় না। যদি না নারীও ব্রহ্মনন্দিনী বলিয়া আত্মপরিচিতা হন। এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে নারীর বেদে পর্য্যন্ত অধিকার ছিল না, তাঁহার আত্মা আছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয় ছিল। ধন্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান, যে বিধানে নরনারী অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং সতী পতির মিলনে ধর্ম্মের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই যেমন ব্রহ্মনন্দনের জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন, বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে ২৬শে ডিসেম্বর ব্রহ্মনন্দিনীর জন্মদিন বলিয়া আরো বড়-দিন। শ্রীব্রহ্মানন্দের সহধর্ম্মিণীকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মনন্দিনী নামেঅভিহিত করেন। এই দিনের মাহাত্ম্যও প্রতিষ্ঠিত হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান।

"ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া আহ্বান বা "দয়াল এসহে" বলিয়া সম্বোধন প্রাচীন বিধান বা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সাধন। নববিধানে কিন্তু তিনি স্বয়ং "আমি আছি" "আমি এয়েছি" বলিয়া সাধককে ডাকিয়া আনিয়া আপনার কাছে বসান ও আপনিই গুরু হইয়া আত্মজ্ঞান দিয়া দর্শন দান করেন; কেননা, অনন্ত তাঁর প্রেম, উচ্ছ্বসিত তাঁর মাতৃস্নেহ। তিনি জানেন, আমরা কিছুই নই, কিছুই আমাদের শক্তি নাই, তিনিই আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা; তাই তিনি স্বয়ং আমাদের পাপ হরণ, মন হরণ, মোহকৃত আমিত্ব হরণ করিয়া, তাঁর উদ্বেলিত আনন্দ ভরিয়া দিতে ব্যস্ত। ফোয়ারার জল যেমন বাধা পাইলে আরো জোরে উদ্গত হয়, তেমনি তাঁহার প্রাণভরা আনন্দ না চাহিলেও তিনি ভরিয়া দেন। পূর্ব্বে মানুষ যেমন পাপের জালে জড়াইয়া, বিষয়-রোগের বিষে জর্জ্জর হইয়া, সহস্র চেষ্টাতে, সাধ্য সাধনাতেও তাহার হাত এড়াইতে পারিত না, নববিধানে তেমনি অনন্ত প্রেমের জাল, পুণ্যের বল এমনই আত্মাকে জড়াইয়া ধরে যে, তাহার হাত এড়ান যায় না। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন অবস্থা, পবিত্রাত্ম-গ্রস্ত ব্যক্তিরও ঠিক সেই অবস্থা হয়। এ অবস্থা সাধন সাপেক্ষ নয়, কেবল নববিধানের সহজ বিশ্বাসে অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

নারী-শক্তি

(শান্তি-কুটীরে, ১০ই মাঘ, ১৩৩৫ সন, বাল্মিকাউৎসবে নিবেদনের সারমর্ম্ম)

মাতাগণ ও কন্যাগণ! আজ উৎসবের দিনে আপনাদের নিকট আর কি নিবেদন করিব? প্রাচীন ভারতে নারী-শক্তির উদ্বোধন যেরূপ সার্থক হইয়াছিল, কি ধর্ম্ম-জগতে, কি মানব-সমাজে নারী আপনার যে স্থান অধিকার করিয়া ছিল, তাহারই দু একটী কথা আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করিতে চাই। ভগবান্ যখন মানুষকে সৃষ্টি করিলেন, তখন তিনি আপনাকে দ্বিধা

বিভক্ত করিলেন। সৃষ্টির মধ্যে একটী পৌরুষ ভাবের স্পর্শ দিয়া পুরুষের হৃদয় গঠন করিলেন, আর একটী মাতৃ-ভাবের সঞ্জীবনী-শক্তি দিয়া নারীর হৃদয় গঠন করিলেন। নারী বিনা পুরুষ যেমন অসম্পূর্ণ, সেইরূপ পুরুষ বিনা নারীও অসম্পূর্ণ। প্রাচীন ভারতের আদর্শ হর-গৌরীর মিলন। দৃঢ় সংকল্প, বীর্য্য, সৎসাহস, কর্ম্মপটুতা ও জ্ঞান-প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় যেমন একদিকে মানব সমাজকে নানা বাধা-বিঘ্নের ভিতর নূতন সৃষ্টির পথে সঞ্চালিত করিবে, অপর দিকে স্নেহ, মায়া, প্রেম, পবিত্রতা, শৃঙ্খলা ও সদাচার সেইরূপ নূতন সৃষ্টিকে শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিবে। বৈদিক যুগে পুরুষের ন্যায় নারীও ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিমাচল হইতে ভাগিরথী অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে যেমন শস্য-শালিনী করিয়াছেন, জীবের তৃষ্ণা দূর করিয়াছেন, সেইরূপ পুরুষের কঠোর সংকল্প ও উদ্যত বজ্রের ন্যায় নির্ম্মম কর্ম্ম-শক্তিকে নারীর কোমলতা ও মাতৃস্নেহের অমৃত-সিঞ্চনে পৃথিবীকে মিষ্ট ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। নারী মানবের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে, ভগিনী হইয়া তাহার সহকর্ম্মিণী হইয়াছে, মাতা হইয়া তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছে, সেবিকা হইয়া রোগ-শোকে শুশ্রূষা করিয়াছে, সতী হইয়া দাম্পত্য-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছে। প্রাচীন ভারতে নারী যে কেবল গৃহিণী হইয়া গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, অথবা নিরাশ্রয় শিশুদের প্রতি-পালন করিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নয়, পরন্তু উচ্চ ব্রহ্ম-জ্ঞান সাধন করিয়া, বেদ ও দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, গণিতের কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া, প্রাচীন ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ-ভারতেও নারীর স্থান কম নহে। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া বৌদ্ধ যুগে যে ধর্ম্ম-রাজ্য গঠিত হইল, সে গঠন-কার্য্যে নারী আপনার অমূল্য শোণিত দিয়া সেই বিশাল সাম্রাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম প্রচার যেমন মানবের ঘরে ঘরে নূতন ধর্ম্মের আলোক ও আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া পৃথিবীতে নির্ব্বাণের মহামন্ত্র দান করিয়াছে, অপর দিকে ভিক্ষুণীদিগের অসামান্য উৎসাহ, অবিচলিত বৈরাগ্য, অলৌকিক নিষ্ঠা ও গভীর জ্ঞান সূর্য্যকিরণের ন্যায় অন্ধকারে আবৃত মাঞ্চুরিয়ার অরণ্যকে আলোকিত করিয়াছিল, সুশীতল স্রোতস্বিনীর ন্যায় মধ্য এসিয়ার মরুভূমিকে সরস ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। একটী ভিক্ষুণীর আখ্যা-য়িকা শ্রবণ করিলে, তাঁহাদিগের জীবন চরিত্রের কি অদ্ভুত প্রতিভা মানব-সমাজকে উন্নত করিয়াছিল, তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

শ্রাবস্তি নগরে এক ধনবান্ বণিক বাস করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ-বয়সে দেবতার অনুগ্রহে এক কন্যারত্ন লাভ করেন। কন্যা বড় হইলে তাঁহার শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আনয়ন করিয়াছিলেন, কন্যা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইলেন। পিতামাতা বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, অবশেষে একটী সদ্বংশ-জাত সু-পাত্র ঠিক করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবার সংকল্প জানাইলেন। কন্যা পিতা মাতার কথা অগ্রাহ্য করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবকের গলে বরমাল্য দান করিলেন। দুটী পুত্র লাভ করিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার স্বামী জল আনিতে গিয়া, পাহাড় হইতে পড়িয়া, অকালে দেহলীলা সম্বরণ করিলেন। পুত্র দুইটীও কলেরা ও সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইলেন। অনন্যোপায় হইয়া কন্যা পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, ভূকম্পে তাঁহার পিতা মাতা মারা গিয়াছেন, পিতার বৃহৎ অট্টালিকা ভূতলে প্রোথিত হইয়াছে। কন্যা উন্মাদিনীর মত দিবারাত্র চিৎকার করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি শ্রীবুদ্ধের নিকট যাও, তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দিবেন। শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইলেন। নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত সেই নারী, কথিত আছে যে, যেখানে প্রচার করিতে গমন করিয়াছেন, সেই স্থানে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে শতসহস্র ভিক্ষুণী দিগের অলৌকিক শক্তিবলে শ্রীবুদ্ধের নূতন রাজ্য গঠিত হইল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও মধ্য এসিয়ার নানাস্থানে নূতন ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হইল, নূতন জ্ঞান বিস্তার লাভ করিল, নূতন শিল্পের অভ্যুদয় হইল, নূতন শাস্ত্র রচিত হইল, নূতন সভ্যতা এসিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার জয়-পতাকা উড্ডীন করিল। এই নূতন সাম্রাজ্য গঠন করিবার প্রধান সহায় নারী-শক্তি। নারী-শক্তি যদি বৈদিকযুগে কিম্বা বৌদ্ধ-যুগে জাগ্রত না হইত, তবে প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তিস্তম্ভ এরূপে গ্রীবা উচ্চ করিয়া, কালের অনিবার্য্য, ধ্বংসকে অতিক্রম করিয়া, অক্ষয় জীবন ধারণ করিত না।

অতদ্ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের যুগেও নারী-শক্তির উদ্বোধনে মৃতপ্রায় বৈষ্ণব সাধনা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। অদ্বৈত প্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রী সীতাদেবীর অদ্ভুত শক্তিবলে বৈষ্ণব সাধনা আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের গৃহে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। আর্য্য অনার্য্যের ভিতর যে ভেদরেখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভিতর যে বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ভক্তির অমৃত-সিঞ্চনে তাহা নির্ব্বাপিত হইল। যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদেরই অদম্য উৎসাহে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সিদ্ধির মূলে নারী-শক্তি বর্ত্তমান আছে। নারী চিরদিন আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া কার্য্য করেন। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা যেমন ইহার প্রমাণ পাই, তেমনি সমাজের ছোট বড় সকল কর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিলে, তাহার

সিদ্ধির অন্তরালে নারী-শক্তির একনিষ্ঠ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয়ে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সাধকগণ এই নারী-শক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যথার্থ স্থান মণ্ডলীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝিতে পারি যে, সে শক্তি এখনও মণ্ডলীতে জাগ্রৎ হয় নাই, বরং বিপথে চালিত হইয়া নূতন সৃষ্টি করিয়াও প্রলয় সংঘটন করিতেছে। শ্রীকেশবচন্দ্র দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, নর নারীর শক্তির সমন্বয়ে নূতন ভারত গঠিত হইবে। অতএব নারী-সমাজের ভিতর যে সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাকে পরিস্ফুট করা প্রয়োজন; তাহাকে পরিস্ফুট করিতে হইলে তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও বিশেষ সাধনার দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে হইবে, তাহার কোমল বৃত্তিগুলিকে আস্তে আস্তে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, পৌরুষ ভাবের অনুশীলন দ্বারা বা কঠোর কর্ত্তব্যের যন্ত্রে ফেলিয়া তাহার কোমল বৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষণ করিলে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না, নারীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে না এবং সৃষ্টির মহৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু আমরা সে দিকে একপদও অগ্রসর হইতে পারি নাই। পশ্চিমের সংগ্রামপ্রিয় জাতির ভিতর পৌরুষ ভাবের উপাসনা পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষা ও দীক্ষায় নারী পুরুষের অনুকরণ করিতেছে। আহার, পরিধান, ব্যায়াম, আচার, ব্যবহারে নারী পুরুষের প্রতিযোগিনী হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই হাওয়া এদেশেও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। নারীর সহিত পুরুষের কোন দ্বন্দ্ব নাই, নারী পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়। এক অন্যের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ নর নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ সাবধান হইয়া অগ্রসর হউন! ব্রাহ্মগণ, নারীকে পুরুষ গঠন করিও না, তাঁহার বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিও না। বিধাতার সৃষ্টিতে প্রলয়কে ডাকিয়া আনিও না। হর-গৌরীর মিলন, এই প্রাচীন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন কর, নর নারীর সমন্বয় সাধন কর। এই সমন্বয়-সাধনের ভিতর নূতন মণ্ডলী গঠিত হইবে, নূতন জগৎ প্রসূত হইবে, নূতন স্বর্গরাজ্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে। কন্যাগণ, আপন আপন বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোল এবং বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ কর। ভগবান্ তোমাদের সহায় হউন।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নববিধানের নূতন কথা ও নূতন ভাব।

(১২ই মাঘ, ব্রহ্ম-মন্দিরে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতার মর্ম্ম)

নববিধানের কথা বিশেষ ক'রে বলিবার দিন আজ। নববিধানের নূতন কথা আলোচনা করবার দিন আজ। পৃথিবীতে আমরা অনেক সম্প্রদায়, অনেক ধর্ম্ম দেখতে পাই। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিচার করতে ব'সে—আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত এই হয়—যে আমার নিজের ধর্ম্মই সত্য, আর অন্য সকলধর্ম্ম মিথ্যা। এ বিশ্বাস আমাদের সকলেরই হয়—কিম্বা এক সময় থাকে। অর্থাৎ আমি যে সত্য পেয়েছি—আমার কাছে যা সত্য—তাত আমি ছেড়ে দিতে পারি না—ফেলে দিতেও পারি না—তবে অন্যের কাছে যা আছে, তা বুঝতে না পেরে, তাকে গ্রহণ করতে না পেরে, তাকে মিথ্যা বলেই সাব্যস্ত করি। কিন্তু সত্যের সন্ধানে, সত্যের সেবায় থাকলে, ক্রমেই দেখতে পাই যে, অন্যান্য ধর্ম্মেও সত্য আছে। তবে আমার ধর্ম্ম খাঁটি সত্য, আর অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যামেশান। তখন প্রশ্ন ওঠে, ঐ সত্য তারা কোথা পেলে? রোমাণকাথলিক পাদরীরা এদেশে এসে, হিন্দুমন্দিরের আরতি ইত্যাদি দেখে ভাবলেন যে, শয়তান হিন্দুজাতকে খৃষ্টের কাছে না যেতে দেবার জন্য, একটা নকল খৃষ্টধর্ম্ম—একটা উপধর্ম্ম হিন্দুদের দেশে প্রচলিত করে দিয়েছে। হিন্দুর দোষ নয়, দোষ শয়তানের। আজকাল আবার উপধর্ম্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে—এদেশে ওদেশে চুরীর "থিওরি"—চুরীর অপবাদের সৃষ্টি হয়েছে। খৃষ্টধর্ম্ম থেকে গীতায় শিক্ষা চুরী করা হয়েছে, কিম্বা গীতা থেকে খৃষ্ট ও খৃষ্টানেরা চুরী করেছেন। সত্য চুরী করার অপবাদ যখন একজন মিশনরী কেশবকে দেন, তার উত্তর কেশব দিয়াছিলেন যে, সত্য মাত্রই ভগবানের—ভগবানের জিনিষ নেওয়া যদি চুরী করা হয়, তাহলে চুরী ভিন্ন উপায় নাই! বাস্তবিক দেখতে গেলে বলতে হয় যে, সত্য গ্রহণ করবার সামর্থ ভিতরে না এলে, কোন সত্যই গ্রহন করা যায় না। চোখের সামনে রেখে দিলেও সত্যকে ধরা যায় না। প্রকৃত ব্যাপারটি এই যে, সত্যকে গ্রহণ করাই অধ্যাত্ম রাজ্যের নিয়ম, আর ভগবানের সত্য আশে পাশে চারিদিকে ছড়ান রয়েছে। তাই কেশবচন্দ্র ধরলেন যে, ভগবান্ অনবরত সত্য দিয়ে আস্ছেন, দিচ্ছেন পৃথিবীকে, আর সেই সত্যবৃষ্টির সত্যধারার শেষ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মই ভগবান্ স্বয়ংই বিধান করেছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। এই হ'ল নববিধান। এই কথারই ভেতরে অনেক নূতন শিক্ষা, নূতন ব্যাপার আছে। সেগুলিকে পরিস্কার করে জানা, পরিস্কার করে ধরাই নববিধান-সাধন।

(১) এতদিন সবদেশেই বিশ্বজনীন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা হয়ে এসেছে। আর সবদেশেই এই ধারণা যে, পৃথিবীর সব ধর্ম্ম মুছে গিয়ে এককালে আমার ধর্ম্ম বা আমাদের ধর্ম্ম পৃথিবীব্যাপী হয়ে থেকে যাবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও একথা বড় বড় করে লেখেন, আর প্রচার করেন। কিন্তু নববিধানের আলোকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম (universal religion) ব্যাপারটিকে অন্যরকম দেখায়। প্রত্যেক ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন। প্রত্যেক ধর্ম্মই আমার

জন্য, কারণ সত্যমাত্রই আমার জন্য। ভগবান্ হিন্দুধর্ম্ম শুধু হিন্দুর জন্য পাঠান নাই, খৃষ্টানের জন্য, মুসলমানের জন্যও পাঠিয়েছেন, জগতের জন্য পাঠিয়েছেন। খৃষ্টধর্ম্ম শুধু খৃষ্টানের জন্য নয়, আমার জন্য, তোমার জন্য। ইস্‌লাম শুধু আরবের জন্য নয়, সমস্ত মনুষ্যজাতির ধর্ম্ম। বিশ্বজনীন ধর্ম্মের এই নূতন ব্যাখ্যা নববিধান দিচ্ছেন।

(২) প্রত্যেক ধর্ম্মকে গ্রহণ করা আমার অধ্যাত্ম জীবনের উদ্দেশ্য। সত্যে সত্যে সামঞ্জস্য হবেই হবে। সত্যে মিথ্যায় মেলেনা। মিথ্যায় মিথ্যায়ও মেলেনা, মিল খায় না। সত্যে সত্যে মিলন হবেই হবে। তাই কোনও সত্যকে গ্রহণ করতে ভয় নাই। ইসলামকে নিতে হ'লে তাকে ছেঁটে ছুঁটে—বাদসাদ দিয়ে নিলে চলবে না। তার যা বুঝতে পারছি না—তাকে মিথ্যা বলে ফেলে না দিয়ে—যাতে তাকে গ্রহণ করতে পারি, তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, সাধন করতে হবে। গত শতাব্দীতে ইয়ুরোপে একদল উদারধর্ম্মী (eclectic) হয়েছিলেন। তাঁদের উদারতা এই ছিল যে, সকল ধর্ম্ম থেকে সত্যগুলি বেছে নিয়ে পৃথিবীর জন্য নূতন ধর্ম্ম গড়ে তুল্‌তে হ'বে। কেশবচন্দ্র এঁদেরই প্রতিবাদ বিশেষ ক'রে করেছিলেন। এঁদের মতের গোড়ার কথা এই যে, মানুষ বুদ্ধি বিচারে ধর্ম্ম সৃজন করেছে, আর বুদ্ধির ভ্রমে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বিধানের কথা এই যে, ভগবান্ প্রত্যেক ধর্ম্ম পাঠিয়েছেন, আর ভগবান্ প্রত্যেককে বল্‌ছেন যে, সব ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সব ধর্ম্ম সমন্বয় করতে করতে অগ্রসর হও। মনে করুন, আমি যদি মহর্ষি ঈশার কথা বুঝতে না পেরে, তাঁর যেটুকু বুঝেছি সেই টুকু গ্রহণ করি, তাহলে কতটুকুই বা গ্রহণ করা হ'ল? ধর্ম্মে ধর্ম্মে যদি H. C. F. বা L. C. M. কষে সত্য সঞ্চয় করি, তাহলে কত টুকুই বা পাওয়া যায়। ঈশার অভিজ্ঞতা প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে যায়, আমার যে টুকু তাই থেকে যায়। তার পর আমি যা বাদ দেবো, তুমি তা দিতে চাইবে না। এ নিয়েও কত বাদ বিসংবাদ বিরোধের সৃষ্টি হবে। আবার সত্যে সত্যে যে যোগ, সেটা Organic, অঙ্গাঙ্গী ভাবের যোগ। আমার হাত, তোমার পা, অন্যের মাথা নিয়ে জোড়া দিয়ে যেমন নূতন জীব হয় না, তেমনি এখানে খানিকটা ভেঙ্গে নিয়ে, ওখানে খানিকটা কেটে নিয়ে, জোড়াতাড়া দিয়ে, সত্যের সমন্বয়, ধর্ম্মের সমন্বয় হয় না।

(৩) এখন প্রশ্ন এই যে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সত্যে সত্যে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ তাদের অসম্পূর্ণতায়, প্রভেদ তাদের খণ্ডভাবে। অধ্যাত্মজীবনের উদ্দেশ্য সমগ্র-দর্শন, সমগ্র-গ্রহণ। প্রত্যেক বিধান খণ্ডবিধান, আংশিক ভাবে সত্য। পূর্ণ সত্য পেতে হলে, প্রত্যেক খণ্ডকে গ্রহণ করে নিয়ে, সকলকে মিলিয়ে নিয়ে, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর সত্য পেতে হবে। গ্রহণ করতে করতেই পূর্ণতর বিধান আসে। বাস্তবিকইত আমাদের মনকে ধুয়ে মুছে, clean state করে, পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে, নূতনকে কখনও পাওয়া যায় না। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সামঞ্জস্য করতে হয়, যোগসাধন করতে হয়। সত্য কখনও মিথ্যা হয়ে যায় না। মিথ্যাও সত্য হয় না। খণ্ড সত্যকে আমরা যখন পূর্ণসত্য বলে ধরে নিই—তখনই ভুল ভ্রান্ত আসে—তখনই অন্যত্র যা সত্য আছে, তাকে মিথ্যা বল্‌তে উদ্যত হই। খণ্ডকে খণ্ড বলে স্বীকার করে নিলে, অংশকে অংশ জেনে তাদের সেই অপূর্ণভাবকে পূর্ণ করে নিতে গিয়ে, আমরা নূতন সত্য পাই, নূতন জ্ঞান পাই, নূতন চেতনা পাই, নূতন জীবন পাই। সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করা, আর খণ্ডকে খণ্ড বলে মেনে নেওয়া—এই হলে নববিধানের সাধন আরম্ভ হল।

(৪) সত্যপ্রিয় হলে, সত্যকাম সত্যনিষ্ঠ হলে, জীবনে নূতন ভাব আসে। আমার যা সত্য আছে—তাত আছেই। আমার চাই—তোমার কাছে কি এসেছে। তোমার কাছ থেকে তা পেয়ে—তবে আমার সত্য বাড়বে। তোমাকে গ্রহণ করলে তবে আমার অধ্যাত্মজীবন অগ্রসর হবে। হিন্দু যদি তাঁর হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ না করে খৃষ্টধর্ম্ম ও ইসলাম গ্রহণ করেন—খৃষ্টান যদি খৃষ্টধর্ম্ম না ছেড়ে হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলামকে গ্রহণ করেন—মুসলমান যদি ইসলামকে রেখে নিয়ে হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন—তাহলে আপনা আপনি তিন সম্প্রদায়ের বিরোধ ঘুচে যায়, সুন্দর মিলন হয়। সংসারে, জগতে এই মিলন প্রতিষ্ঠার জন্যই নববিধান এসেছেন—নববিধানকে ভগবান্ পাঠিয়েছেন।

—:০:—

গাজীপুর নববিধান ব্রহ্মসমাজ।

উৎসব-বৃত্তান্ত।

ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র দাস সহ পাটনা হইতে নববিধান প্রচার জন্য বাহির হইয়া, ছাপরায় বাবু হাজারী লালের সহায়তায় তথায় চার দিন প্রচার-কার্য্য করিয়া, গত ২৭ শে নভেম্বর রাত্রিতে গাজীপুরের একনিষ্ঠ নববিধান-সাধক স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায়ের ভবনে উপস্থিত হইলে, পরদিন তাঁর সহধর্ম্মিণী দেবী গাজীপুরে ব্রহ্মোৎসবের প্রস্তাব করেন। তদনুসারে গাজীপুর নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের অষ্টপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য-প্রণালী সংক্ষেপে স্থির হয়। ২৯ শে নভেম্বর সায়ংকালে সংগীত হইয়া উৎসবের প্রারম্ভিক উপাসনা ব্রহ্মমন্দিরে সমাপন হয়। ৩০ শে নভেম্বর অপরাহ্নে গোরাবাজারে স্বর্গীয় নিত্যগোপাল বাবুর বাঙ্গালায় সংক্ষেপে উপাসনা ও তৎপরে যোগী ভক্ত স্বর্গীয় পওহারী বাবার আশ্রমে একটী হিন্দীভজন ও তাঁর সমাধিদর্শন; হিন্দীভজনে আশ্রমের প্রধান পাণ্ডা বড় আনন্দ প্রকাশ করেন। সায়ংকালে রায় বাহাদুর গগণচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাঙ্গালায়

সংগীত ও প্রার্থনা হয়। ১লা ডিসেম্বর সায়ংকালে স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের বাটীর দ্বিতলে মহিলা উৎসবে অনেকগুলি হিন্দুমহিলা উহাতে যোগ দেন; এ সেবকেই উপাসনা করিতে হয়, আর্য্যমহিলা মৈত্রেয়ী, দাক্ষায়ণী সতী, সাবিত্রী, ভক্তমাতা সুনীতির আদর্শে জীবনগঠন বিষয়ে আত্ম-নিবেদন হয়। ২রা ডিসেম্বর, রবিবার উৎসব; বেলা ১০ টা হইতে সঙ্গীত আরম্ভ ও পূর্ণাঙ্গ উপাসনা হয়, "ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং বিশাল মানব-মণ্ডলীর একতা" বিষয়ে আত্মনিবেদন করা হইয়াছিল। বেলা প্রায় ১২ টায় উপাসনাদি শেষ হয়, মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রামান্তে পুনরায় ৫টার সময় হিন্দীভজন ও সঙ্গীত হইলে, সন্ধ্যা ৬টায় উপাসনা আরম্ভ হয়; এবেলাও উপাসনা সরস এবং নববিধানের আদর্শ প্রেমরাজ্য বিষয়ে আত্মনিবেদন হইয়াছিল। অদ্য এদেশবাসী সেতার ও তবলা বাদক ৩টী বন্ধু ভ্রাতা অবিনাশের সহযোগে সংগীত ও হিন্দীভজনাদি করিয়া উৎসব জমাট করিয়া ছিলেন এবং কয়েকটী বাঙ্গালী যুবক ব্রহ্মমন্দির সাজাইয়া উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। অদ্য দুই বেলাই এসেবককে উপাসনার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে হয়। ৩রা ডিসেম্বর সায়ং ৬টার সময় স্বর্গীয় নিত্যগোপাল বাবুর গৃহে তাঁর স্মৃতি-সভা ও বন্ধু-সম্মিলন-সভা হয়। প্রথমে ২।৩টী হিন্দী ও বাঙ্গালা সঙ্গীত হইলে, আচার্য্যদেবের True Faithর হিন্দীঅনুবাদ "যথার্থ বিশ্বাস" পুস্তক হইতে, ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস দুইটী বিষয় পাঠ ও সেবকের নিবেদন হইতে "জীবনগ্রন্থ" বিষয়টীর কতকাংশ মাত্র পাঠ করিয়া স্বর্গীয় সাধক নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের উচ্চ আদর্শে সংসারধর্ম্ম ও নিজ ব্যবসায় ওকালতীতে সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও এদেশে নববিধানধর্ম্মপ্রচার ও সাধনবিষয়ে অকাতরে অর্থদান বিষয়ে এদাসকে কিছু বলিতে হয়। শেষেও ২।৩টী ভজন হইয়াছিল। এই সম্মিলনে কয়েকটী বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বন্ধু যোগদান করিয়াছিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর সায়ংকালে কালেক্টরের ঘাটে হিন্দীভজন ও প্রার্থনা হয়। ৫ই ডিসেম্বর সায়ংকালে ডাক্তার প্রিয়নাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়।

মা বিধানজননীর বিশেষ কৃপায় এই উৎসবে আমরা স্বর্গীয় আনন্দসম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর ঐকান্তিক ভক্তি অনুরাগে উৎসব সফল হইয়াছে। এক্ষণে স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের উইলের একজিকিউটারগণ এদেশে এই নববিধানের প্রচার কেন্দ্রটীকে জাগ্রত করিয়া, এখানকার সমাজের কার্য্য যাহাতে নিয়মিতরূপে চলিতে থাকে, তাহার সুব্যবস্থা করুন, এই আমাদিগের অনুরোধ। ইতি

বিনীতসেবক
শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়

নবনবতিতম মাঘোৎসব।

নববিধানের দেবতা অনন্ত আনন্দময়ী মায়ের বিশেষ কৃপায়, কলিকাতায় ভারতবর্ষীয়ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী নবনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। নববিধানের উৎসব দেশকালে বদ্ধ নহে; ইহ পরলোক লইয়া, সকল সাধুভক্তের সমাগমে, সকল নরনারীর পবিত্র প্রেমমিলনে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। নববিধানের মহামেলা নববিধানের মহামহোৎসব। তাই ভক্ত গাহিলেন :—

"নববিধানের মহামেলায় তোরা কে যাবিরে আয়।
যুগে যুগে কত লোকে গেছেরে যথায়।

ঈশা মুষা মহম্মদ, শাক্য গৌর ব্রহ্মানন্দ, (আগে আগে যায়রে, বিজয় নিশান ধরে, প্রেমানন্দে নেচে নেচে, হরি হরি হরি বলে, দেশনগর কাঁপাইয়ে, মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়ে, যুগযুগান্তর বাহি) সঙ্গে লয়ে শিষ্য-বৃন্দ প্রেমানন্দে যায়।

মিলে সব নরজাতি, মহাসংকীর্ত্তনে মাতি, (মরি কিবা শোভারে, আনন্দময়ীর ঘরে, একে একাকার হল, প্রাণে প্রাণে মিশে গেল) মহামিলনসঙ্গীত মহানন্দে গায়।

বিধান নিশান ধরি, হরি সঙ্কীর্ত্তন করি, (গোরা আগে আগে চলেরে, প্রেমমদে মাতোয়ারা, দলে দলে চলেরে, নর নারী সারি সারি, হরিপ্রেম-মহাতীর্থে, আনন্দে বিভোর হয়ে) নানাপথে নানামতে আগু পিছু যায়।

মিশে সেই মহাদলে, সবে হরি হরি বলে, (একাকার হ'য়েরে, হরিপ্রেমানলে গলে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে, জননীর পদতলে) যথা মহাসিন্ধুজলে তটিনী মিশায়।

মহাপ্রেমের প্রভাবে, ভেদাভেদ ঘুচে যাবে, (প্রেমবিনা গতি নাইরে) প্রেমের জয় হবেই হবে মায়ের কৃপায়।

মিশে কেশবের দলে, প্রেমদাস কেঁদে বলে, (কোথা দয়াময়ী গো, দীনজনে দয়া কর) রাখ তারে মহাদলে তব রাঙ্গা পায়।"

নববিধানের মহাদলে, কেশবের দলে মিশিয়া নববিধানের মহামেলায় যাবার জন্য ভক্তগণ তাই সকলকে আহ্বানকরছেন :—

"হেন শুভদিনে কে কোথা আছ ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।

ইহপরকালে ভেদাভেদ কিছু নাই, নরামর আত্মপর মিশে যাই এক ঠাঁই।

ঘেরি মায়ের অভয় চরণ, আনন্দে করি অর্চ্চন বন্দন, জয় জয় জয় রবে যশোগীত গাই।

যেখানে তাঁর নামে, মিলে দশজনে, একমনে তাঁরে চাই; তাহার ভিতরে, আনন্দময়ীরে, সহজে দেখিতে পাই; উৎসবমন্দিরে, নিরখি তাঁহারে, তাপিত প্রাণ জুড়াই; মা মা মাবলে, ভক্তি-রসে গলে, তাঁহার চরণে লুটাই।।"

এবারকার উৎসবের আয়োজন উদ্যোগ কিছুই ছিলনা। মফঃস্বল হইতেও বিশেষ কেহ আসতে পারেন নাই। মণ্ডলীর প্রিয় নালুদা শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ লাল সেনও অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। বাহিরের এই অভাব অভিযোগের ভিতরেও অনন্ত-স্নেহময়ী জননী তাঁর প্রেমধারা বর্ষণ করিতে কোন ক্রটী করেন নাই। তিনি তাঁর প্রচুর প্রসাদ বিতরণে সকল প্রাণকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁর অলৌকিক প্রেমবলে উৎসবকে সফল করিয়াছেন। আমাদের শত ক্রটী অপরাধ সত্ত্বেও তাঁহার প্রেমের জয় দেখিয়েছেন, সকল বাধা বিঘ্নকে অপসারিত করে তাঁর সাধ মিটাইয়াছেন। ধন্য মা আনন্দময়ী!

১লা মাঘ, সোমবার, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আরতি হইয়া উৎসব আরম্ভ হয়। মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, খোল-করতাল বাদ্য সহকারে, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে চল ভাই যাই সকলে" এই সঙ্গীতটী কিছুক্ষণ হওয়ার পর ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করা হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরেও এই সঙ্গীতটী জমাট ভাবে হয়। তৎপরে "জয় মাতঃ জয় মাতঃ" এই আরতির গান হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সকলে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই আরতিতে যোগদান করেন। একসুরে, একতানে, শত-কণ্ঠোত্থিত আরতির নামগানে দিগ্‌দিগন্তর প্রতি-ধ্বনিত করিয়া মায়ের জয়গান করা হইলে, ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ বেদীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ-কৃত আরতির প্রার্থনা ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে পাঠ করেন। তৎপর "তোমার আরতি করে নিখিল ভুবন" এই সঙ্গীতটী হইয়া অদ্যকার উৎসব শেষ হয়। ভেদাভেদ ভুলিয়া অনেক পিপাসু-প্রাণ নরনারী আরতির উৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হন।

২রা মাঘ, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণে গোলদীঘী প্রান্তরে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। "নববিধানের মহামেলায় তোরা কে যাবিরে আয়" এই সঙ্গীতান্তে ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করিয়া কিছু বলেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপে লেখা যেতে পারে :—

নববিধানের মহামেলায় যাবার জন্য মায়ের আহ্বান এসেছে। এবার কংগ্রেসে কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। পয়সা দিয়ে লোকেরা ভিতরে গিয়ে দেখছে। আবার যারা দাম দিয়ে কিনছে, জিনিসটা তাদের হচ্ছে। নূতন বিধানে ভগবান্ যে মহামেলা খুলেছেন, তাতে অতীত বর্ত্তমানের, স্বর্গ মর্ত্তের সত্য-জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যের প্রদর্শনী, ভক্ত-জীবনের প্রদর্শনী, সাধু সাধ্বীদিগের জীবনের প্রদর্শনী, স্বর্গীয় অমূল্য রত্ন-রাজির প্রদর্শনী খুলেছেন। এখানে পয়সা দিয়ে যেতে হয় না, বিনা মূল্যে যাওয়া যায় এবং পাওয়া যায়, যদি একটু ভক্তি থাকে,"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা।" শিল্প-প্রদর্শনী যেমন দেশের দশের জন্য প্রয়োজন, তেমনি এই মহামেলা আমাদের উপকারের জন্য বিধাতা খুলেছেন আলো, হাওয়া, জল, আকাশ যেমন শরীর-ধারণের জন্য প্রয়োজন, তেমনি আত্মিক কল্যাণের জন্য সাধুভক্তদের জীবন আমাদের প্রয়োজন; আলো হাওয়া বিনা যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি এসব ছাড়া আত্মিক জীবনের বিনাশ। ঈশার জন্ম আমাদের জন্য, ঈশার ক্রুশারোহণ আমাদের জন্য, বুদ্ধের রাজ্যত্যাগ, চৈতন্যের দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ আমাদেরই জন্য। তাঁদের অক্ষয় অমর জীবন এবং তাঁদের জীবনের ধর্ম্মভাব আলো হাওয়ার মত নিত্য প্রবাহিত। তাঁদের না হলে আমাদের জীবন চলেনা। নূতন বিধানের মহামেলায় সব সমন্বিত, একীভূত। সকল ভেদাভেদ দূরীভূত, দেশ কাল, ধর্ম্ম কর্ম্ম, জাতি বর্ণ, ইহ পরলোকের ভেদাভেদ এখানে নাই। চিন্ময় আকাশে সব নিত্য বিরাজিত। চিন্ময় জগতে নববিধানের উৎসব, সাধু-সমাগম, বিধাতার নিত্যপ্রদর্শনী। নরনারী সকলকে এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়।

স্বামী সত্যানন্দ অতঃপর আচার্য্য দেবের "মাতৃভূমি" বিষয়ক প্রার্থনা পাঠ করেন।

সন্ধ্যায় কমলকুটীরে মহিলাদিগের কর্তৃক নিশানবরণ হয়। গৃহে পরিবারে নববিধান-প্রতিষ্ঠাই—ইহার উদ্দেশ্য।

৩রা মাঘ, বুধবার, অপরাহ্ণে হেদুয়ার প্রান্তরে বক্তৃতা। কীর্ত্তনান্তে ভাই অক্ষয়কুমার প্রার্থনা করে বলেন, নববিধানের মহামেলায় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছে। মারোয়াড়ী প্রভৃতি বড় বড় লোকেরা মাঝে মাঝে বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, দেশের মঙ্গলের জন্য। নানা স্থান হইতে সাধু সন্ন্যাসীদের আহ্বান করে, তাঁদের হোতারূপে বরণ করে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে কয়দিন ধরে ঘৃতাহুতি দিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। নববিধানের বিধাতা নিত্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি ঈশা, মুষা, বুদ্ধ, চৈতন্য, জনক, নানক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ইহ পরলোকের, দূর নিকটের, অতীত বর্ত্তমানের ঋষি মহর্ষি সাধুভক্ত যোগী সন্ন্যাসীদের হোতারূপে নিযুক্ত করেছেন। অনন্তের মহাপ্রেমের অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে তাঁরা বসে, আপন আপন জীবনের সাধনার ফল প্রেমভক্তিরূপে আত্মাহুতি দান করছেন। এই যে মহাধর্ম্মযজ্ঞের মহাপ্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, তাহা কোনদিন নির্ব্বাপিত হওয়ার নয়, এই অনন্তযজ্ঞের নিত্য যজ্ঞের সমাপ্তিও নাই। প্রেমাগ্নিতে গলিয়া সকল নরনারীর জীবনের যে মিলন, তাহাই নববিধানের জীবন, মহাযজ্ঞের চরু, তাহাই মহাযজ্ঞের অমৃত। তুমি আমি ইহা গ্রহণ করলে নূতন জীবন হবে, এই অগ্নিস্পর্শে সব জড়তা দ্বেষ হিংসা পুড়ে ভস্মীভূত হবে; নূতন বিধানে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সাধন। আসুন সকলে, নববিধানের মহোৎসবে এই মহাযজ্ঞের প্রসাদ লাভ করে ধন্য হউন। নববিধানে কোন বাধা নাই "ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।"

তারপর স্বামী সত্যানন্দ ব্রহ্মানন্দের 'মাতৃ-ভূমি-বিষয়ক' প্রার্থনা পাঠান্তে নববিধানের মহা মিলনের কথা বলেন। তিনি বলেন,

আসল জীবন আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন। বাহিরে যত ভেদাভেদ পরমাত্ম-দর্শনে কোন ভেদাভেদ থাকে না। শুদ্ধি করে আপনার ধর্ম্মে অন্যকে এনে লাভ কি? আসল ধর্ম্মজীবন হলে কোন পার্থক্য থাকেনা। ভারতের গৌরব এই নববিধান। সকল অমিলন দূর করে, নববিধান মহামিলনের ধর্ম্ম ভারতে এনেছেন।

সন্ধ্যা ৬॥ টার ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে হিন্দীভজন হয় এবং শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় "স্বাধীনতা" বিষয়ে হিন্দীতে সুন্দর বক্তৃতা করেন।

৪ঠা মাঘ, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বীডন স্কোয়ার প্রান্তরে কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এইভাবে সংগৃহীত হইতে পারে :—

প্রায় একশত বৎসর হ'ল, পাপী তরাইতে, স্বর্গ হ'তে এক নূতন সংবাদ এসেছে। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি, কাটাকাটি, বিবাদ বিসম্বাদ, ঝগড়া কলহ এইই ছিল। কিন্তু এই নবধর্ম্ম উহার পরিবর্ত্তে শান্তি ও মিলনের সংবাদ ঘোষণা করিলেন, ভালবাসা ও ভ্রাতৃপ্রেমের নিশান উড়াইলেন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার সকল নরনারীকে এক অখণ্ড মানব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উপদেশ দিলেন। পুনরায় "অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাম্। উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" এই সত্যপ্রচার করিলেন। প্রায় ৪৮বৎসর পূর্ব্বে এই বিডন উদ্যান কম্পিত করিয়া, বজ্র-গম্ভীর স্বরে স্বর্গীয় আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র এই মিলনের কথা, এই ভ্রাতৃপ্রেমের কথা বলিয়াছিলেন। আপনারা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছেন, কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে এই মিলন-সাধনের ভাব, এই সম্মিলনের চেষ্টা খুব প্রবল। লোকে বিবাদ বিসম্বাদে জ্বলে, পুড়ে এত বিরক্ত হয়ে গেছে, যে আর কাটাকাটি, মারামারি চায়না। এক্ষণে আরাম চায়, ভ্রাতৃপ্রেম-সুধাসাগরে লীন হ'তে চায়। আপনারা যদি ভাল করে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ইউরোপের, বিশেষতঃ জার্ম্মাণীর ও আমেরিকার মনীষিগণ কেবল এই সম্মিলনের, এই সাম্যের অন্বেষণ করছেন। চারিদিকে সমন্বয়ের দুন্দুভি বেজে উঠেছে। আমরা তাহাই প্রচার করিতেছি। আমাদের ধর্ম্মে কেউ বাদ পড়্‌বেনা,আমরা কাহাকেও ছাড়্‌তে পারি না। We include all, we exclude none. আমরা যে কেবল মতের সম্মিলন প্রচার করি,তা নয়। প্রত্যেক মানব জীবনে, সকল সত্যের সমন্বয় হওয়া সম্ভব, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। যেমন রামধনুর সাত্‌টি রং মিশ্রিত হয়ে এক নূতন সাদা রং উৎপন্ন করে, তেমনি সকল সত্য ধর্ম্মের সমন্বয়ে এক অভিনব নবধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। যেমন সকল বাজনা মিলে এক নূতন Concert রচনা করে, তেমনি সকল শাস্ত্র মিলে এক নবশাস্ত্র রচিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি, এই সমন্বয়ের ধর্ম্ম, এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, এই মিলনের ধর্ম্ম, এই ভ্রাতৃপ্রেমের ধর্ম্ম, ভারতের সকলকে নিতে হবে। ভারতের এই নূতন বাণী সকলকে গ্রহণ করতে হবে। অভ্রভেদী, অত্যুচ্চ হিমালয়-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া ভারতের আর্য্যঋষিগণ জগতের উদ্ধার হেতু যে অমৃতময় সঞ্জীবনী বাণী শুনাইয়া ছিলেন এবং যাহাতে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতি ভারতের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল, আবার সেই ভারতেই এই অপূর্ব্ব স্বর্গের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে দেখিয়া, পুনরায় বিশ্বসংসার চমকিত হইবে, এবং তাহার এই নববাণী শুন্‌বার জন্য ব্যাকুল হবে। ভারত সামান্য দেশ নয়, এই দেশেই আবার জগতের উদ্ধারের জন্যে এক সত্য-ধর্ম্মের, এক নববিধানের উদয় হইয়াছে। তারি সুসংবাদ দিতে, আমরা আপনাদের নিকট উপস্থিত হয়েছি, আপনাদের দ্বারে এসেছি। (ইহার পরে "শুন হে, নূতন বিধি আনন্দের সমাচার" এই গানটি সমগ্র পাঠ ক'রে বক্তব্য শেষ করেন।)

তৎপর স্বামী সত্যানন্দ মাতৃভূমির প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যা ৬াটায় ব্রহ্মমন্দিরে Dr. B. C. Ghosh "The Great Liberation" সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন।

ক্রমশঃ

ভাগলপুর ব্রাহ্ম-সমাজ।

পঞ্চষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসব।

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত ভাগলপুরে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উৎসবের উপাসনাগুলি নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন করেনঃ—

২১শে সন্ধ্যায়, স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র ঘোষের গৃহে উদ্বোধনের উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু।

২২শে সন্ধ্যায়, স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে উপাসনা হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়।

২৩শে (১১ই ফাল্গুন) মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন; প্রাতে ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত এন, এন, দাসের গৃহে শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু গীতার ব্যাখ্যা করেন ও মহিলারা কয়েকটী সংগীত করেন।

২৪শে রবিবার,ব্রহ্ম-মন্দিরে দিনব্যাপী উৎসব। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা বসুর আগ্রহে রবিবার ও সোমবার ভোরে উষা কীর্ত্তনের দল পাড়ায় পাড়ায় ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করেন, দুইটী হিন্দুমহিলা ঐ দলে যোগদান করিয়া আনন্দ লভ করেন।

রবিবার প্রাতে উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। উপাসনান্তে সকলে একত্রে প্রীতিভোজন করেন। সন্ধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া ভাগবত ও গীতার সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা করেন। মন্দিরটী পত্রপুষ্পে ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়।

২৫শে, শ্রীযুক্ত হরিনাথ চাটার্জ্জির গৃহে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব সম্পন্ন হয়। উপাসনার স্থান বিচিত্র পত্রপুষ্পে সজ্জিত করিয়া মহিলাগণ করতাল ও হারমোনিয়াম যোগে সঙ্গীত করিলে উপাসনা আরম্ভ হয়, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করেন, কয়েকটী মহিলা ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থনা করেন, শ্রীযুক্তা দীনতারিণী মুখার্জ্জি মহাশয়ার প্রার্থনা অতি হৃদয়গ্রাহী হয়। প্রার্থনার সারাংশ, "আমরা এত মহামূল্য ধন লাভ করিয়াছি, ভগবান্ আমাদের তাঁহার অতুল ধনে ধনী করিলেন, আমরা আমাদের অন্যান্য ভগিনীদের এই ধন বিতরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আজকের দিনে তাই প্রার্থনা করি, দয়াময়, তুমি আমাদের হৃদয়ে আরও বল দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমাকে আমরা আরও ভাল করে চিনে নিয়ে অন্য ভগিনীদের তোমাকে চিনিয়ে দিতে পারি, তোমার অযোগ্য কন্যা হয়ে আর না থাকি। অনেক বছর হলো, যাঁরা এই ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপিত করেছিলেন, আজ সেই স্বর্গীয়-দের স্মরণ করিতেছি, তাঁদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।" কয়েকটী হিন্দু মহিলাও উপাসনায় যোগ দান করেন ও পরে সকলে একত্রে প্রীতি-ভোজন করেন।

২৬শে, প্রাতে ৮॥ ঘটিকায় মন্দিরে বালক-বালিকা-সম্মিলন হয়; তৎপরে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত এস, সি, মুখার্জ্জির আগ্রহে বালক, বালিকা ও ব্রাহ্মগণ প্রীতি-ভোজন করেন।

২৮শে, সন্ধ্যায় স্থানীয় ডাক্তার সুকুমার মিত্রের গৃহে শান্তি-বাচন হয়, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় প্রার্থনা করেন, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু তাঁহার পিতৃদেবের রচিত গীতগুলি ভক্তি-বিগলিত-হৃদয়ে গান করেন, মহিলাগণ তাঁহার রচিত গানটী (উঠিতে শ্রীহরি, বসিতে শ্রীহরি,) করতাল ও হারমোনিয়াম যোগে জমাট কীর্ত্তন করেন; তৎপরে শতাধিক হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম নর নারী প্রীতি-ভোজন করিয়া, উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন।

ভগবৎ-কৃপায় এখানকার উৎসব সুসম্পন্ন হইল, কিন্তু এখানকার প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলালের অনুপস্থিতি স্মরণ করিয়া মনে প্রাণে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিয়াছেন। ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা, তিনি তাঁহাকে এই কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া, আবার আমাদের তাঁহার সঙ্গে উৎসব করিবার সুযোগ দান করুন।

আদমপুর, ভাগলপুর সেবিকা:—
২৮।২।২৯ শ্রীনির্ম্মলা বসু

—:—

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র এবং পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে "বসুধারা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, যাহা গতবারের ধর্ম্মতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার উদার সত্যগ্রাহিতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের আচার্য্যদেবের উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া কেশবের ধর্মোন্মাদিনী ভাষার মাধুর্য্য এবং আধ্যাত্মিক ভাবের গাম্ভীর্য্য যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে সত্যই আমরা কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আচার্য্যের ভাষার নূতনত্ব ও প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার সাহিত্যিক গবেষণার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

ভাই প্রতাপ চন্দ্র একবার কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেশব, তুমি ত কখনও কোনও বাঙ্গালা বই পড় নাই, তুমি কোথা থেকে এমন বাঙ্গালা বলতে শিখ্‌লে? আমি ত কত বাঙ্গালা বই পড়েছি, তোমার মত ত আমি বাঙ্গালা বলতে পারি না।"

কেশব হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ! আমিও ত জানিনা, কেমন করে আমি বাঙ্গালা বলি। আমার যা আসে তাই বলি, তাতে ভাল বাঙ্গলা হয়, কি কি হয়, আমি ত কিছুই জানিনা।"

বাস্তবিক কেশব চন্দ্রের ভাষা দেবদত্ত মাতৃভাষা, তাই তাহা এত সহজ, এত প্রাঞ্জল, এত মধুর। বঙ্গসাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের সম্মুখে একদিন কেশবানুজ শ্রীকুঞ্জবিহারী সেনের বাটিতে বসিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মমন্দিরে কেশবের বাঙ্গালা ভাষা শিখতে যাই।" সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও কেশবের ভাষার অনুকরণেই গঠিত।

লেখক মহাশয় কেশবচন্দ্রকে "মহাপুরুষ" অভিধানে অভি-হিত করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু বলিয়াছেন, "জগতের মহাপুরুষদিগের শ্রেণীভুক্ত আমাকে যিনি করিবেন, তিনি অসত্য-কথন-দোষে দোষী হইবেন। তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল হইলেও একই ব্যবসায়।" অর্থাৎ ঈশা গৌরাঙ্গ যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগধর্ম্মবাহক, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের সমশ্রেণীভুক্ত না হইলেও, তিনি যে নবযুগধর্ম্মবাহক, ইহা তিনি বলিয়াছেন। এ বিধান নূতন বিধান, এই নূতন বিধানের নূতনত্ব এই যে, এই বিধানের বাহক জগতের সাধারণ মানবের সঙ্গে আপনাকে একাঙ্গীভূত করিয়া তাহাদের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কেননা তিনি বলিয়াছেন "কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে নব-বিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল; ইহাতে সকলের আশা হইবে।"

যাহাহউক, সেন মহাশয় কেশবচন্দ্রকে মহাপুরুষ বলিয়া

স্বীকার করিয়াও, কি জানি কেমনে বলিলেন, "রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া খৃষ্টীয় প্রভাবান্বিত নৈষ্ঠিক নীতিবাদী কেশব আধ্যাত্মিক জগতে অনেক প্রত্যক্ষ অনুভূতি করিয়াছিলেন।"

সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা মহান্ উচ্চ যিনি, যিনি ঈশ্বর-নিশ্বসিত, তিনিই ত মহাপুরুষ; সুতরাং কোন মহাপুরুষ কি স্বয়ং পরম পুরুষের স্পর্শ ছাড়া অন্য কাহারও "সংস্পর্শে আধ্যাত্মিক জগতে কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতি" লাভ করিতে পারেন?

সেন মহাশয় কেশবচন্দ্রের ভক্তিমাখা প্রত্যক্ষ অনুভূতি-সম্ভূত উক্তি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন—যথা, "হে পুণ্যময় জগদীশ, ইচ্ছা করে, দৌড়ে গিয়ে গায়ে হাত দি তোমার। কেন এমন সুন্দর হয়ে এলে?" ইহা যে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবের দেখা শুনা হইবার অনেক আগেকার উক্তি।

কেশবচন্দ্র নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন করেন, এই কথা শুনিয়াইত রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখিতে ও তাঁর-সহিত আলাপ পরিচয় করিতে প্রথম আগমন করেন। এবং তাহার পূর্ব্বেও, রামকৃষ্ণকে কেশব চন্দ্র দেখিবার চিনবার আগে, কেশবকে আদিব্রাহ্মসমাজের বেদিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণ তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "এই বাবুটীর ফাতনা ডুবেছে।" অর্থাৎ ইঁহার চিত্ত ভগবানে মগ্ন হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া অবধি, আদিব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী অনুমোদিত ঈশ্বরকে "তিনি" বলিয়া সম্বোধন ত্যাগ করিয়া, প্রত্যক্ষ দর্শন-সিদ্ধ "তুমি" বলিয়া সাধন প্রবর্ত্তন করেন।

আবার সেন মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের প্রভাবে বুঝিলেন, জাতীয় ভাবে জাতীয় ধর্ম্মের উপর ভিত্তি গাড়িয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে।" ইহা কেমনে বুঝিলেন?

কেশবচন্দ্র আজীবন জাতীয় ভাবে জাতীয় ধর্ম্মের উপর ভিত্তি গড়িয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতেই নিরত। রামকৃষ্ণের "প্রভাব" অনুভব করিবার সুযোগ হইবার বহু পূর্ব্বে যখন ইংরাজী ১৮৭০ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন, সেই বিলাতে গিয়াও ইংরাজ শ্রোতাদিগকে বলিয়াছিলেন, "I speak to you to-night as a *Hindu*, I call upon all as an humble representative of the Hindu race," "I for one protest against these foolish ideas and projects of *denationalising* Indian women."

"In India we are hopefully looking forward to the time when a grand *national organisation* will be effected amongst the 180000000 of the population."

• "এইরূপ বহু উক্তিতে, বহু উপদেশে ও আচরণে চিরদিনই তিনি হিন্দু জাতীয় ভাবই পোষণ ও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিতে আসিলে, কেশবচন্দ্র হিন্দুভাবে তাঁহাকে প্রণাম করেন। ইহা কি তাঁহার জাতীয়তার পরিচয় নয়? বস্তুতঃ কেশবচন্দ্র কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়া বা কাহারও প্রভাবাধীনে পড়িয়া কোন ভাব লাভ করিয়াছেন বা প্রচার করিয়াছেন, ইহা বলিলে তাঁহার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধার্পণ করা হয় না। তিনি যদিও শিষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন, "এ জীবনে কেহ কাছে আসিয়া কিছু না দিয়া চলিয়া যায় নাই। হৃদয়ের ভিতর ভগবান্ শক্তি দিয়াছেন, সাধুসঙ্গে বসিবামাত্র গুণ আকর্ষণ করিতে পারি। শূকরাদি পশুর নিকট হইতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হই।" আবার তেমনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন,"মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি। কিন্তু তাঁহাদিগকেও জীবনের আদর্শ করি না। কোন মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন।" সুতরাং কেশবচন্দ্র যে কোন মানব শিক্ষকের প্রভাবে কোন ধর্ম্ম-ভাব অর্জ্জন করেন নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

দীনসেবক।

সংবাদ।

সাম্বৎসরিক—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ময়ূরভঞ্জের রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে কলিকাতায় "রাজাবাগ" সমাধি মণ্ডপে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ শ্রীরামচন্দ্রের প্রেরিতত্ব ও উচ্চ চরিত্রের বিষয় স্মরণ করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী, আচার্য্য-কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী এবং শ্রীমতী হেমলতা চন্দ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কথকতা ও কীর্ত্তনাদি হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ লোকনাথ মল্লিকের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, স্বর্গগত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যালের সাম্বৎসরিক দিনে, উদ্যানসম্মিলনে, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে জামাতা শ্রীযুক্ত রাখাল দাস চক্রবর্ত্তী প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কেশব একাডেমীর হেড্ মাষ্টার শ্রীমান্ নির্ম্মল চন্দ্র সিংহের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, ৩৫।১ পোলিস হাসপাতাল-রোডে শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মজুমদারের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শরৎবাবু প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১লা ফাল্গুন, ১১এ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা

করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ভাই প্রমথ লাল সেনের সেবার্থ ৩৲ টাকা, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থ ১৲ টাকা, অনাথ আশ্রমে ১৲ টাকা এবং ধর্ম্মতত্ত্বের সাহায্যার্থ ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৬ই জানুয়ারী, স্বর্গীয় সাধক নিত্যগোপাল রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, গাজীপুরস্থ তাঁহারভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ শী তথায় গমন করিয়াছিলেন। এই দিন স্মরণার্থ ব্রহ্মানন্দাশ্রমেও প্রার্থনাদি হয়।

গত ৫ই জানুয়ারী, স্বর্গীয় সহৃদয় সাধক অপূর্ব্ব কৃষ্ণ পালের সাম্বৎসরিক দিনে ব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়। এই দিন শ্রীমান্ বিধান ভূষণ ও শ্রীমতী সুনীতি মল্লিকের শিশুপুত্র ধ্রুবেরও সমাধিতে প্রার্থনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

গত ২রা ফাল্গুন, ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৩রা ফাল্গুন, হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথদত্তের গৃহে, তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া সুরমা দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং প্রচার-ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ৯ই জানুয়ারী, বুধবার, ভাগলপুরে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন। কলিকাতা হইতে পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং স্থানীয় ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই দিন স্মরণে পাটনায় ভাই প্রমথলাল সেনও বিশেষ উপাসনাদি করেন।

গত ৫ই ফাল্গুণ, ৮১নং অপার সার্কুলার রোডে, মঙ্গলপাড়ায় স্বর্গগত ভাই মহেন্দ্রনাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। প্রচার-ভাণ্ডারে দান ১৲ টাকা। ব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৩১শে জানুয়ারী, ৮৩।১ অপার সার্কুলার রোডে, মঙ্গলপাড়ায়, স্বর্গীয় কাদম্বিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী কমলেকামিনী বসু উপাসনা করেন। প্রচার-ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

বিগত ১লা ফাল্গুন, বুধবার প্রাতে স্বর্গীয় সাধক হরিসুন্দর বসুর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাগলপুরে গোলকুঠিতে বিশেষ উপাসনা হয়; সন্ধ্যায় জলা বাংলায় বিধান অনুরাগী স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উক্ত দুই স্থানেই উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী হৈমবতী চাটার্জ্জি প্রার্থনা করেন। স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপাসনায় যোগদান করেন

ধর্ম্ম প্রবেশ—সেউগঞ্জ চককমলা নিবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ সিংহ গত ২রা ফেব্রুয়ারী নববিধানের ধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রবেশ ব্রত গ্রহণ করে। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ও আশীর্ব্বাদ করেন।

শুভ-বিবাহ—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বালীগঞ্জে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের দৌহিত্রী শান্তিদায়িনীর সহিত চককমলা নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের পুত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণের শুভ-বিবাহ হইয়াছে; শ্রীযুক্ত বাবু বরদা কান্ত বসু বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা ও রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করেন। নববধূর শুভাগমন ও পাকস্পর্শ উপলক্ষে গত ৪ঠা ও ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের গৃহে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনাদি করেন। ভগবান্ নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পুণ্যস্মৃতি—বিগত ৮ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, প্রাতে ৮টার সময়, পাটনায় শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ চাটার্জ্জির গৃহে শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিতে বিশেষ উপাসনা হয়; ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ চাটার্জ্জি ভক্তি-বিগলিত-হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। স্থানীয় কয়েকটী ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫॥ টায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ইংরাজিতে বক্তৃতা দেন।

নামকরণ—গত ৩০শে জানুয়ারী, হাওড়াতে শ্রীমান্ বিভূতি ভূষণ বসুর শিশুকন্যার নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং শিশুকে "পূর্ণিমা" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি :—

গত ৩রা ফাল্গুন, চট্টগ্রামে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত দীর্ঘ-জীবনে অক্লান্ত-ভাবে দেশের সেবা ও সমাজের সেবা করিয়া, রোগাক্রান্ত দেহখানি ফেলিয়া শান্তি-ধামে গমন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনা ও যত্নেই চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি ও উন্নতি। তাঁহার স্থান বিধাতা পূর্ণ করুন।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, স্বর্গীয় এস্, কে, লাহিড়ীর মধ্যম পুত্র নানাসদ্গুণসম্পন্ন বিনীত শান্ত শ্রীমান্ হেমন্তকুমার ৩০ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাতা, অল্পবয়স্কা পত্নী, তিনটী শিশুসন্তান, ভ্রাতা ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় উপাসনা করেন।

আমরা শোকার্ত্তগণের প্রতি আমাদের হৃদয়ের সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্তজনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১লা চৈত্র, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 15th March, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩.

প্রার্থনা।

হে নববসন্তের চির উৎস! এই বসন্ত ঋতুর সমাগমে বাহ্য প্রকৃতি নব বসন্তের নব সাজে সজ্জিত হইয়া নীরবে তোমারই সৃষ্টির বিচিত্র কারুকার্য্য, তোমারই সৃষ্টির শোভা সৌন্দর্য্য কত ভাবে প্রকাশ ও ঘোষণা করিতেছে। তুমি স্বয়ং কত সুন্দর, তোমার মন কত সরস, তোমার ভাব রুচি কত সরস ও সুন্দর, কত বিচিত্রতায় পূর্ণ,এই বসন্তের বাহ্য প্রকৃতি আপনার জীবন দ্বারা তাহা প্রতিফলিত করিয়া, প্রচার করিয়া ধন্য হইতেছে। কিন্তু এই মানব-কুলের তোমার পুত্র কন্যা আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠস্থান, সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াও,আমাদের জীবন, আচরণ, অনুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে তেমন করিয়া, তোমার শোভা, সৌন্দর্য্য, মহিমা, গৌরব তেমন করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিতে তো পারিতেছি না। পবিত্র, সরস, সুন্দর নব জীবনের উৎস যেমন তুমি বহির্জ্জগতে, পবিত্র, সরস, সুন্দর নব নব জীবনের উৎস তেমনই তুমি অন্তর্জ্জগতে। স্বর্গলোকে তোমার সাধুভক্ত সন্তানগণের জীবনে, তোমার প্রকাশ, বিকাশ, তোমাকে গ্রহণ, ধারণ অবিচ্ছেদে চলিতেছে; তাই সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান।

আমাদের মত তোমার অধম সন্তানদের জীবনে, তোমার বিশেষ কৃপার অবতরণে, তোমার জীবন্ত সমাগমে, সময় সময় নব বসন্তের সমাগম হয় বটে, সুন্দর সরস দেব জীবনের উদ্গম হয় বটে, কিন্তু আমাদেরই অপরাধে, সে বসন্তের ভাব তো স্থায়ী হয় না, দেব জীবনের শোভা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনশীল ভাবে তো স্থিতি করে না। কিন্তু আমাদের আত্মা ক্রন্দন করে, কবে আমরা আমাদের জীবনে স্বর্গের চির বসন্তের অধিকারী হইব, স্বর্গের শোভা সৌন্দর্য্য কবে নব নব ভাবে জীবনে পাইব,হারাইব না,কবে আমরা নব নব বসন্তের বর্দ্ধনশীল জীবন যাপন করিব, কবে আমরা আমাদের জীবনের পবিত্র শোভা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দ্বারা, তোমার শোভা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশ ও প্রচার করিয়া ধন্য হইব। হে অন্তর্য্যামিন্! তুমি আমাদের আত্মার এই গূঢ় ক্রন্দন শ্রবণ কর এবং আমাদের প্রাণের আশা,আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর,তব চরণে এই ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—•—

বাহ্য প্রকৃতির নিকট শিক্ষা।

প্রাচীন ভারতের ঋষি-আত্মা,ভক্তাত্মাগণ বাহ্য প্রকৃতি হইতে কত শিখিলেন, কত জানিলেন,কত সহায়তা গ্রহণ করিলেন। নববিধানের লোক বিশেষভাবে শিষ্য-প্রকৃতি। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র শিষ্য-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

বসন্তের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের নিকট গুরু হইয়া উপস্থিত। এখন বাহ্য প্রকৃতি বসন্তের নব সাজে, স্বর্গের সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া, তাহার নীরব বাণীতে আমাদিগকে উপদেশ দিতে ব্যস্ত। সমস্ত বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ছোট বড় প্রত্যেকে বসন্তের নব-জীবনের পবিত্র শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া, মিলিত জীবনের সৌভাগ্য লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। যদি তাহাদের মধ্যে এখানে, সেখানে, বিচ্ছিন্ন ভাবে দুই একটা বিশেষ বৃক্ষ, লতা নবজীবনের সাজ সজ্জা পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান হইত, আর অপর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম পত্র-পুষ্প-বিহীন হইয়া মৃত জীবনের শোকাবহ মূর্ত্তি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে কি প্রকৃতিরাজ্যে নব-বসন্তের এরূপ জমাট, ঘন, উজ্জ্বল, পবিত্র শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ পাইত? নবজীবন-সম্পন্ন ছোট, বড় তরু লতা গুল্ম সকলের মধুর জমাট সম্মিলনে বসন্তের শোভা সৌন্দর্য, মহিমা ও গৌরব। সম্মিলন-শোভার প্রাচুর্য্য যেমন বাহ্য প্রকৃতি-রাজ্যে, এমন আর কোথায়? শত শত আম্র-বৃক্ষ পত্র, পুষ্প, ফলে শোভিত হইয়া যখন মিলিত জীবনের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করে, তখন যোগীর মনও হরণ করে। তাই, মহা তপস্বী পরম যোগী শ্রীবুদ্ধ আম্রকানন আপনার ধ্যান, যোগ, তপস্যা ও বাসের জন্য মনোনীত করিতেন। যশোহর, খুলনা জেলার কোন কোন স্থানে মুক্তমাঠের মিলিত খেজর বৃক্ষগুলি আপনার পত্র ফলে সজ্জিত হইয়া কি শোভাই বিস্তার করে! সত্যই সে শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, মানবপ্রাণ সেই সৌন্দর্যের মধ্যে পরম সৌন্দর্যের আকর যিনি, তাঁহার সাড়া পাইয়া, তাঁহার চরণে বিনীত মস্তকে প্রণত হয়। এইরূপে শুপারি, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী সারি সারি মিলিত হইয়া, মিলিত জীবনের শোভাসৌন্দর্য্যে দর্শকের চিত্তে কত তৃপ্তি দান করে, ভাবুকের প্রাণে কত স্বর্গীয় ভাবের উন্মেষ দান করে। ঘন পত্র পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া পুষ্পবৃক্ষগুলি যখন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আপনাদের হাস্য-ময় সৌন্দর্য্যে কানন, প্রান্তর হাস্যময় করিয়া তোলে, তখন সেই মিলিত জীবনের মহিমা, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্যে কে মুগ্ধ না হয়? প্রকৃতি-রাজ্যে বসন্তকাল বিকাশময় নব-জীবনের মিলন-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। হায়! আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিত্য বিকাশশীল দেব-জীবনের ঘন জমাট সম্মিলন মধ্যে আমরা কবে স্বর্গের বসন্ত-সমাগম, কবে স্বর্গীয় বসন্তের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ধন্য হইব?

নববিধান দ্বিজত্বের সুগন্ধে পূর্ণ, নিত্য নব বিকাশশীল দেব-জীবন সমূহের শোভাসৌন্দর্য্যে পূর্ণ মিলন-ক্ষেত্র। কিন্তু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি, সে নববিধানের মিলন-ক্ষেত্র সুদূর ভবিষ্যতে, এখন পর্য্যন্ত সে পথে প্রচেষ্টা মাত্র। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিয়া গেলেন, পিতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ভ্রাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার বাকী রহিল। তিনি আরও বলিয়া গেলেন, "পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে"। তাই আমরা নিরাশ হই না। নিরাশ হইতে পারি না। যখন উৎসব-সময়ে, কি সাপ্তাহিক উপাসনা-কালে, ব্রহ্ম-মন্দিরে, কি অন্যত্র সকলে মিলিত হইয়া আত্মপর ভুলিয়া যান এবং আপনাদিগের উপাস্য দেবতার ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া পুণ্য সম্মিলনের স্বর্গীয় দৃশ্য প্রদর্শন করেন, তখন স্বর্গের নব বসন্তসম্মিলনের সুন্দর দৃশ্য এই ধরাধামে পরিদৃশ্যমান হয়। কিন্তু উৎসব-ক্ষেত্র, কি উপাসনা-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইলেই, অথবা কখন কখন সেই উৎসব-ক্ষেত্রে কি উপাসনাক্ষেত্রেই যদি কাহারও কাহারও মধ্য হইতে অমিলন বা হিংসা বিদ্বেষের বহ্নি উত্থিত হইতেছে দেখিতে পাই, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃত মিলন-ক্ষেত্র এখনও সুদূরে। কখন কখন মুসল-মান ভ্রাতাদিগের বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে যখন দেখি, দীর্ঘসারি গাঁথিয়া শত শত সমবিশ্বাসী সহ-উপাসকগণ এক ঈশ্বরের নমাজ বা উপাসনায় নিমগ্ন, তখন সত্যই বাহিরে অন্ততঃ স্বর্গীয় পুণ্যসম্মিলনের অপরূপ দৃশ্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই নমাজক্ষেত্র হইতে বাহিরে আসিলে, সেই সম-বিশ্বাসী সহ-উপাসকদিগের কাহারও কাহারও জীবনে যদি প্রাণহর ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তখন সেখানে যে যথার্থ মিলনের জীবন হয় নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সত্য কথা এই—গূঢ় শুভ মিলনাকাঙ্ক্ষা অনেকের জীবনেই রহিয়াছে, কিন্তু মিলনাকাঙ্ক্ষার পার্শ্বে মিলনের বহু-বিধ কণ্টক রাগ, হিংসা, বিদ্বেষের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। ক্রমে সাধনবলে সেই সকল কণ্টক-মুক্ত হইতে পারিলেই, মানবজীবন পরস্পর মধ্যে স্থায়ী স্বর্গীয় মিলনের অধিকারী হইতে পারে। নববিধানের নব সাধনা এই স্বর্গের মিলন সংস্থাপন জন্যই সমাগত। ইহা আপাততঃ অসাধ্য বোধ

হইলেও, ব্রহ্ম-কৃপাবলে সুসাধ্য হইবেই হইবে। বাহ্য জগতে নবসাজে সজ্জিত বসন্তের সম্মিলিতপ্রকৃতি এবিষয়ে আমাদিগকে কেমন উদ্বুদ্ধ করিতেছে, কেমন অনুপ্রাণিত করিতেছে। এই প্রকৃতিদেবী স্বর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমরা এই সত্য দৃষ্টান্তকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না, এই সত্য শিক্ষাকে বাহিরের ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। আমরা বসন্তের স্বর্গীয় দৃশ্যের ভিতরে পরম-দেবতার গম্ভীর অথচ মধুর দেববাণী শ্রবণ করিয়া, আত্মিক নবজীবনের স্বর্গীয় মিলন-পথে অগ্রসর হই।

—:০:—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দেহ, মন, প্রাণ।

দেহ রক্ষার উপায় আহার, পান ও ব্যায়াম ; মন বাঁচে চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে ; প্রাণ বাঁচে প্রাণের প্রাণ যিনি, তাঁর শক্তিতে। তাঁকে প্রাণে দেখিলে, সদা মনে রাখিলে, তাঁর কথা বিবেক-কাণে শুনিলে, দেহ মন প্রাণ সকলই বাঁচিবে।

মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া, নাম শুনিয়া, মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্দ্দেশ করি। কিন্তু তাহার মন কেমন, কার্য্যের দ্বারা চেনা যায়। মনই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করে। মনের নিয়ন্তা যিনি, তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিয়া, তাঁহার পরিচালনায় চলিলে, মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মনুষ্যত্ব ক্রমে দেবত্বে পরিণত হয়।

আমি, না আমরা একজন ?

প্রাচীন শাস্ত্রের সংস্কার, ধর্ম্ম-সাধন চিরদিন কোণে, মনে বা বনে ভিন্ন হয় না। অর্থাৎ একা একা নির্জ্জনে, ধ্যানে বা সংসার ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। খৃষ্ট, মুসলমান, বৌদ্ধ বা য়িহুদী বিধানে, সদলে সপরিবারে সামাজিক সাধন প্রবর্ত্তিত। ব্রাহ্ম-সমাজেও আমরা "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ" সাধন করিয়াছি ; কিন্তু বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম নববিধান বলেন, তাহাতেও ধর্ম্ম-সাধন পূর্ণ হয় না। কেননা নববিধান, সমগ্র মানবপরিবার যে এক অখণ্ড মানব, ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতেই সমাগত। তাই আচার্য্য বলিলেন, "এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে।" অতএব নববিধানে কেবল একা একা আমি ধর্ম্ম-সাধন করিতে পারি না, আমরাও নয় ; সবে মিলে একজন, ইহাই নববিধানের নূতন সাধন।

বেদ বাইবেলের মিলন।

বেদের অর্থ শব্দ, বাইবেলের অর্থও Word শব্দ, ব্রহ্মমুখ-বিনিঃসৃত শব্দের নামই বেদ। এই "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থও শব্দ। শব্দই ব্রহ্ম। বাইবেলেও সাধুজন বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে শব্দই ছিল, সেই শব্দ ঈশ্বরে অবস্থিত ছিল, সেই শব্দই ঈশ্বর। যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শব্দ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতেই উদ্ভাবিত ঈশাও সেই শব্দরূপ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বা পুত্র। এ দিকে বেদবাণীরও অভিব্যক্ত বা প্রতিমা পুরাণে সরস্বতী। মানবহৃদয়-কমলস্থ শুভ্রজ্ঞানরূপিণী বিবেক-বীণাবাদিনী যিনি, তিনিই সরস্বতী। ইনি আদ্যাশক্তি ভগবতীর কন্যা বলিয়া অভিহিত। এইরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইলে সর্ব্বশাস্ত্রে আমরা মিলন দেখিতে পাই।

নববিধানের প্রেরিত নিয়োগ।

নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে দিনে যে শুভক্ষণে ধর্ম্মজগতে এক একটি স্বর্গীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা স্মরণে আমাদের আত্মার যথেষ্টই কল্যাণ হইয়া থাকে। আমরা সাধু ভক্ত মহাপুরুষদিগের জন্মদিন ও স্বর্গারোহণ দিন স্মরণ করিয়া, তাঁহাদিগের অধ্যাত্ম জীবনের প্রভাব অনুভব করিয়া, কতই আধ্যাত্মিক সম্বল লাভ করিয়া থাকি। বসন্ত পূর্ণিমায়, শারদীয় পূর্ণিমায় বা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠার দিনে উৎসব-সাধনে যে আত্মিক উন্নতিলাভ হয়, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তেমনি নববিধানের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণ করিয়া, আমরা সেই সেই অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক সাধনা আমাদিগের মণ্ডলীগত বা পারিবারগত জীবনে জাগ্রত করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই আমরা নববিধানের নবজীবন-লাভে ধন্য হইতে পারি। জলসংস্কার, হোম, গৃহস্থ-বৈরাগ্য-ব্রত অনুষ্ঠান, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থীকে ব্রতদান, প্রেরিত-নিয়োগ ইত্যাদি অনুষ্ঠান যে যে দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সেই দিন স্মরণ করিয়া উৎসবাদি করিলে, আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ সহায় হইবে, বিশ্বাস করি। বসন্ত পূর্ণিমা দিনে যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্মোৎসব হয়, তেমনি এই দিনে নববিধানের প্রেরিত-নিয়োগ ও নববিধানাচার্য্যদেব ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। এই বিশেষ উপলক্ষে নব দেবালয়ে এবার বিশেষ উৎসব করিতে, সকল প্রচারক, প্রচার-কার্য্যে নিরত এবং মণ্ডলীর সকল ভাইভগিনীকে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

নবনবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫ই মাঘ—অপরাহ্নে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বক্তৃতাদি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয় নাই। ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥ টায় Dr F. C. Southworth M. A., D. D., L. L. D. ইংরাজীতে উপাসনা করেন এবং "The Vision on the Heights" বিষয়ে উপদেশদান করেন।

৬ই মাঘ, মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণের দিন। প্রাতে ৭॥ টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জি উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্ম-মন্দিরে স্মৃতি-সভা হয়। ডাঃ কামাখ্যানাথ ব্যানার্জি সভাপতি মনোনীত হন।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষিদেবের জীবন সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়—সত্যলাভের জন্য মহর্ষিদেবের দারুণ পিপাসা, ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য সদা জাগ্রত ভাব, ব্রহ্মের দিকে নিত্য উন্মুখীনতা, "যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে ? ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান, প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে।" তদ্রচিত এই সঙ্গীতের যাথার্থ্য, নিরাভিমানিতা, বৈরাগ্য, ত্যাগস্বীকার, অমায়িকতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া সংক্ষিপ্ত সুন্দর বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত হরকালী সেন তারপর বলেন যে, মহর্ষিদেবের জীবনের বিশেষ দান ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বানার্জ্জি বলেন, মহর্ষিদেবের পুণ্যচরিত্র যদি হৃদয়ে বরণ করে নিতে পারি, তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেওয়া হয়। তাঁর জীবনের সত্যনিষ্ঠা, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করা, গৃহে তপোবনে যোগজীবন, গৃহধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মযোগ এই সকল উচ্চ চরিত্রের কথা অতীব ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বানার্জ্জি যাহা বলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহর্ষির সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্রবাবু ও তাঁহার পরবর্ত্তী বক্তাগণ যা যা বলেছেন, তার চেয়ে আমার আর অধিক কিছু বল্‌বার নাই। তবে সভাপতির আসন গ্রহণ কর্‌লেই দু'এক কথা বলিতে হয়। তা ছাড়া, আমার দৃষ্টিটা হয়ত সকলের সঙ্গে সমান ভাবে দেখ্‌তে শেখেনি, সেজন্য আমি যে ভাবে তাঁকে দেখি, তারও দু'এক কথা বলা মন্দ নয়। নেবা (jaundice) হলে মানুষের চোখ্‌টা যেমন হলদে হয়ে যায়, আর সেই চোখ্‌ দিয়ে যা দেখে তাই হল্‌দে রং দেখায়, তেমনি আমারও চক্ষের দৃষ্টিটা এক রঙা হয়ে গেছে, যেদিকে দেখি বা যা দেখি, তাতেই যেন নববিধানের নূতন আলোক ফুটে উঠেছে। কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি শিক্ষায়, কি সমাজে, কি জীব-তত্ত্বে, কি জন্ম-তত্ত্বে, কি মৃত্যু-তত্ত্বে একই কথা আমার জীবনকে অধিকার করে রেখেছে। একটা অনন্তের ধারা পৃথিবীর সব দিক দিয়ে যেন ভেসে চলেছে। মহর্ষির জন্ম একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এই জন্ম-কথাটা ভগবানের পাঁজিতে বহুযুগ পূর্ব্বে লেখা ছিল। যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়ে বা জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে তাঁর জন্মটা আমাদের কাছে সত্য হয়ে দেখা দিল। এই জন্মের সঙ্গে যে পৃথিবীর কত যুগের কত জন্মের যোগ আছে, তুমি আমি তার সন্ধান রাখি না। তবে এইটুকু নববিধানের আলোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, যেমন প্রাচীন বিধানগুলি আস্তে আস্তে ফুটতে ফুটতে নববিধানের নূতন ফুলে ফুটে উঠেছে, সেইরূপ মানুষের জন্ম, মহাপুরুষের জন্মও কোটি কোটি অসংখ্য জন্মের ভিতর দিয়া নূতন আকার নিয়ে ফুটে উঠে। একটা অখণ্ড প্রবাহের মধ্যে জন্মগুলি সব ভাস্‌ছে, একটা অখণ্ড যোগের মধ্যে এই জন্ম-লীলা নিজের প্রতিভা বিস্তার কর্‌ছে। তুমি আমি এই যোগকে কাট্‌তে পারি না। একটী জীবন থেকে আর একটী জীবনকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পার না। কালও যেমন অনন্ত, জন্ম-রহস্যও সেইরূপ অনন্ত, অচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, যঁদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে সংবদ্ধ, তাঁদের কথা যখন ভাবি, তখন আমি পৃথক্‌ করে কাহারও কথা ভাব্‌তে পারি না। তিনটী ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের যেন তিনটী অবস্থা, একটী আর একটীর সহিত অনুস্যূত, একটীকে বাদ দাও, ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। সে ধর্ম্ম আর নববিধান থাকিবে না। একটী বীজ, আর একটী অঙ্কুর, তৃতীয়টী ফলফুলে সুশোভিত বৃক্ষ। রাজর্ষির ধর্ম্মতত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজরূপে যাহা অবতীর্ণ হ'ল, তাহা ভারতের জাতীয় ভাবের ভিতর মহর্ষির আত্মায় অঙ্কুরিত হ'ল; ঋষিভাব ভারতের জাতীয়ভাব, ঋষিভাব ভারতের আত্মা, এই ভারতের আত্মা ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়ে, আজ বিশ্বজনীন আত্মার রূপ ধরে, আমাদের কাছে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিশ্বজনীন আত্মাই শ্রীকেশবচন্দ্রের নববিধান। রাজর্ষি ও মহর্ষি শ্রীব্রহ্মানন্দের ভিতর নবজন্ম গ্রহণ করে পূর্ণ হলেন। সকল জন্ম ও সকল মৃত্যু সেই অনন্তের সংবাদ, সেই অখণ্ড যোগের সংবাদ বহন করে আজ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। নববিধানের আলোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, আমরাও সকলে মৃত্যুর মধ্যদিয়া মৃত্যুকে জয় করে অমৃতের পথে চলেছি।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন এম,এ, ব্রহ্মমন্দিরের বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি অনন্তের ভাবে

পূর্ণ হইয়া আরাধনাদি করেন এবং সেই ভাবে নববিধানের বিরাট ব্যাপারের বহু দিক উল্লেখ করিয়া উপদেশ দান করেন। ব্রহ্মানন্দের "স্বর্গীয় অলৌকিক বল" প্রার্থনাটী পাঠ করিয়া ধর্ম্ম-জীবনের অলৌকিক বলের কথাও নানা জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে সুন্দর করে উপদেশে বলেন।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, সোমবার, ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ের উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। "জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম জলন্ত পাবন।" এই সঙ্গীত অবলম্বনে উদ্বোধন হয়। জীবন্ত জাগ্রত সর্ব্বমূলাধার ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আজ প্রচারকার্য্যালয়ে উৎসব। প্রচার করেন কে ? ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর যিনি, তিনিই মূল প্রচারক। যুগে যুগে যত সাধু ভক্ত মহাজন প্রচারকরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এই জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র মাত্র। তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছেন, বলিয়াছেন— "আমরা কেহ কিছুই নহি, সর্ব্বমূলাধার যিনি, তিনি আমাদের জীবনকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া, আপনি যন্ত্রী হইয়া কার্য্য করেন, ধর্ম্মালোক বিতরণ করেন"। এই প্রচার-কার্য্যালয় নববিধানের প্রচার-কার্য্যালয়। ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, প্রচারকের প্রাচুর্য্য নাই, বাহিরে সামান্য বোধ হইলেও ইহা প্রকাণ্ড ব্যাপার। "নববিধানে হ'লরে ভাই প্রকাণ্ড ব্যাপার, এত নহে মানুষের কারবার। খুলে দিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ড-পতি অনন্ত ধন-ভাণ্ডার।" আদি যুগ হইতে, আদি কাল হইতে আমাদের ভারতের কত ঋষি আত্মা, যোগী আত্মা, ভক্তাত্মা বিধানের জয়-নিশান হাতে লইয়া, বিবিধ ধর্ম্মবিধান ঘোষণা করিলেন, প্রচার করিলেন। বিদেশে এব্রাহিম হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশা মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ কত নব নব ধর্ম্ম-সংবাদ জগতে প্রচার করিলেন। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ভক্ত ব্রহ্মানন্দ সদলে কত অতীত ও বর্ত্তমানের বিধানালোক জগতে ঢালিলেন, বিধান-তত্ত্ব প্রচার করিলেন। সকলের মূলে একজন অনাদি, অনন্তলীলাময় ঈশ্বর। সকলের মূলে একজনকে দর্শন করিয়া, একজনকে স্বীকার করিয়া, অতীত ও বর্ত্তমান সকল প্রেরিত সাধু মহাজন ভক্তাত্মাদিগকে প্রাণে লইয়া, আমরা সেই জীবন্ত জাগ্রত লীলাময় ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হই। এইভাবে উদ্বোধনান্তে আরাধনা প্রার্থনাদিও সেই ভাবেই নির্ব্বাহ হয়।

অপরাহ্ন ৫টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, আমাদের মন্দিরের খোল-বাদক বাবাজি ভক্তি-প্রধান-সাধন-ভাবাত্মক মধুর কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন বেশ সন্তোষের বিষয় হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী সুমিষ্ট উপাসনা করেন। এখানকার পুণ্যস্মৃতি সকলের প্রাণে জাগ্রত করিয়া উদ্বোধনান্তে তিনি আরাধনা করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনায় বিশেষ ভাবে এই নববিধানের প্রচার-কার্য্যালয়ের মহত্ত্ব ও গৌরব প্রকাশিত হয়। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে আহারের সময় অনেকটা অসুবিধার কারণ হইয়াছিল।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, শ্রীদরবারের উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা প্রচারকার্য্যালয়ের দেবালয়ে শ্রীদরবার-সম্পাদক ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। অতীতের, বর্ত্তমানের, দূরের, নিকটের, শরীরী, অশরীরী, সকলের সহিত মিলিত হইয়া, সকলকে প্রাণে লইয়া বেশ জমাট উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পর পাঠ, প্রসঙ্গ ও প্রার্থনাদি হয়।

১০ইমাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, বুধবার, শান্তিকুটীরে পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি যাহা নিবেদন করেন, তাহা গতবারে প্রকাশিত হইয়াছে। উপাসনান্তে প্রীতি-ভোজন হয়।

সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন। সংকীর্ত্তনে উপাসনা সকলেরই বেশ তৃপ্তিকর হইয়াছিল।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্নে ৭॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মাঘোৎসবে প্রদত্ত একটী উপদেশ হইতে প্রথমে কিয়দংশ পাঠ করা হয়, তৎপর নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত মাঘোৎসব উপলক্ষে উপদেশের অধিকাংশ পঠিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ও ঈশ্বরের পুত্র কন্যা আমাদের ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে মিলন, এই উপদেশের বিশেষ বিষয় ছিল। অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে কিছু কথাবার্ত্তা হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি নববিধানের সাধন-তত্ত্ব বিষয়ে সারগর্ভ উপদেশ দান করেন।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, শুক্রবার, নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। নববিধানের বিশেষ লক্ষণ "বিশ্বাস", সেই বিশ্বাসলাভের জন্য ভাই গোপালচন্দ্র গুহ দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। বেদী হইতেও বিশ্বাসলাভ বিষয়ে বিশেষ প্রার্থনা হয়।

সন্ধ্যায় এলবার্টহলে নববিধান বিষয়ে আলোকচিত্রযোগে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল। তাঁর গলার অসুখের জন্য হইতে পারে নাই। ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ মধুরভাবে "নববিধানের নূতন কথা ও নূতন ভাব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম গতবারে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩ই মাঘ ২৬শে জানুয়ারী, শনিবার, বালকবালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টার পর বালকবালিকাদিগকে লইয়া মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। অপরাহ্ন ৪টায় ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট

হলে পুরস্কার-বিতরণ ও বালক-বালিকা সম্মিলন হয়। আমেরিকার Dr. F. C. Southworth সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং Lady Southworth বালক বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। বালিকাগণের সঙ্গীত, বালকদিগের Drill, বালক বালিকাদিগের আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আমরা এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি, এবং সকলের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি প্রার্থনা করি।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তনান্তে ৮॥টায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বেলা উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরে পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় শ্রীমদাচার্য্যদেবের একটী প্রার্থনা পাঠান্তে প্রাতের উপদেশের একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া নববিধানের সাধনাদি বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ তাঁহার প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া প্রাচীন হিন্দুসমাজের ও বর্ত্তমান নববিধান-মণ্ডলীর অবস্থা উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গের পরিপুষ্টি করেন। তৎপর অখিল বাবু ধ্যানের উদ্বোধন করিলে, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। তৎপর ৫॥টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ৬॥টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হয়। তৎপর বেদী গ্রহণ করিয়া ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে নববিধানের সাধনা বিশেষভাবে বিবৃত হয়। সকল ধর্ম্মবিধানের সমগ্র সত্য গ্রহণ নববিধান-সাধনের লক্ষ্য। বিভিন্ন ধর্ম্মবিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া সত্যগ্রহণ Abstract ভাবের গ্রহণ, তাহা নববিধানের প্রকৃত সাধন নহে। অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে আমি আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করার পূর্ব্বে আমাকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমি যদি মুসলমানকে আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলি, তৎপূর্ব্বে আমাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করা, পালন করা উচিত। আর যদি খৃষ্টবাদীকে আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি, তৎপূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম আমাকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইহা নববিধানের শিক্ষা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সমগ্র সাধু ভক্ত মহাজন হইতে আরম্ভ করিয়া—সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের সকল পুত্র কন্যাকে গ্রহণ করিয়া, যে বিরাট অখণ্ড জীবন সাধন করিলেন,সেই বিরাট জীবনই অবস্থান্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনের অনুভূতির বিষয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, শ্রীঈশাও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুষা প্রভৃতি প্রেরিত মহাজনগণ সঙ্গে যোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট সেই স্বর্গীয় বিরাট জীবনের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নববিধানে প্রদর্শিত সেই বিরাট জীবনেরই তত্ত্ব এ বেলা বিশেষভাবে বিবৃত হয়।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, সোমবার, নগর সংকীর্ত্তন। প্রাতে ৭॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৫॥টার পর ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া, ঝামাপুকুর লেন, বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সুকিয়া ষ্ট্রীট, রামমোহন রায় রোড, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ,গড়পার রোড, অপার সার্কুলার রোড হইয়া কমলকুটীরের নবদেবালয়ে যাওয়া হয়; তথা হইতে পুনঃ অপার সার্কুলার রোড, পার্শিবাগান লেন, বাদুরবাগান ষ্ট্রীট, পঞ্চানন ঘোষ লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া কীর্ত্তন শেষ হয়। কীর্ত্তনটি বরাবর বেশ জমাটভাবে চলিয়াছিল। স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস নগরকীর্ত্তনের সুন্দর গানটী রচনা করিয়াছিলেন। ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কীর্ত্তনান্তে চা ও মিষ্টিমুখ করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

১৬ই মাঘ,২৯শে জানুয়ারী,মঙ্গলবার,পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজের উৎসব হয়। মহারাণী সুচারুদেবী উপাসনা করেন। অনেকগুলি মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়া সুখী হইয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আর্য্যনারী-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের নারী আর্য্যনারীর আদর্শে জীবন গঠন করেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের সাধ ছিল। ভগবান্ তাঁহার সাধ পূর্ণ করুন। সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা হয়।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, বুধবার, কমলকুটীরে কেবল মহিলাদের জন্য "আনন্দবাজার" হয়। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি মনোনীত হন। তিনি প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, নূতন বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহকসভাগঠন, "নববিধান" ইংরেজী পত্রিকার জন্য নূতন কমিটী গঠন, "নববিধান" কাগজ, "নববিধান প্রেস" ইত্যাদি সম্পর্কে নানা আলোচনাদি হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। ভগবান্ নূতন বৎসরে মণ্ডলীকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করুন। নববিধানের মণ্ডলী যে এক পরিবার, সেই আদর্শে সকল ভেদাভেদ বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া, সকলে এক প্রাণ হইয়া, নববিধানকে মণ্ডলীতে, পরিবারে ও জীবনে জয়যুক্ত করুন।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, কমলকুটীরে কেবল মহিলাদের জন্য আনন্দবাজার হয়। সন্ধ্যায় কমলকুটীরের সমাধিমণ্ডপে উৎসবের শান্তিবাচন হয়। ধ্যান, কীর্ত্তন, আচার্য্যদেবের প্রার্থনাপাঠ ও পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও প্রেমালিঙ্গন হইয়া উৎসবের শান্তিবাচন হয়।

২০শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, কেশব একাডেমী স্কুলের বিশেষ উৎসব হয়। ছাত্র, শিক্ষক, এবং মণ্ডলীর অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করেন। ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। আমরা এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

সন্ধ্যায় এই স্কুলগৃহেই নববিধানের যুবকসঙ্ঘের উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী সংক্ষেপে উপাসনা করিলে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মধুর উপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতাদানে যুবকদের প্রাণে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করেন। যুবকদের নিজেদের যত্নে আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। সকলে আলাপ প্রসঙ্গে ও আহারাদি করিয়া সুখী হইয়াছেন।

২১শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ২০নং দমদম রোডে, কাশীপুরস্থ রায় বাহাদুর রামেশ্বরপ্রসাদ নাথানীর (পুরাতন শেঠ ছুলিচাঁদের) বাগানবাটীতে উদ্যান সম্মিলন হয়। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী মহোদয়া উপাসনা করেন। প্রায় সাত শত নর নারী, বালক বালিকা এই উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। একদিকে সরল, মিষ্ট, মধুর উপাসনা, অপর দিকে উদ্যানের শোভা সৌন্দর্য্য, আবার আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকার ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের আয়োজন উদ্যোগে ও মধুর যত্নে সকলের পরম তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন, মুক্ত বাগানের মুক্ত আকাশের তলায় বালক বালিকাগণের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ, পরস্পরের প্রেমালাপ, গান বাজনা ইত্যাদিতে সত্যই সকলের মনপ্রাণ পরিতুষ্ট হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উদ্যানস্বামীকে এবং আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করি। ভগবান্ তাঁদের আশীর্ব্বাদ করুন।

এইরূপে নবনবতিতম উৎসবের কার্য্যপ্রণালী সমাপ্ত হয়। নববিধানের উৎসব নিত্য উৎসব। নববিধানজননীর কৃপায় এই উৎসবানন্দ আমাদের জীবনকে নিত্যোৎসবে পরিণত করুক।

গত পৌষের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিষয়ক।

গত পৌষের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'গ্রন্থ-পরিচয়' শীর্ষক সমালোচনাতে, ২৪২ পৃষ্ঠায় উক্ত পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত "বিশ্বপরিবারের কেশব" প্রবন্ধে, কেশবচন্দ্রের একটি প্রার্থনার উদ্ধৃত অংশের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "'বিশ্বপরিবারের কেশব' প্রবন্ধে ব্রহ্মানন্দের একটি প্রার্থনার উদ্ধৃত এক অংশে আছে, 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছেন উপরে। একমেবাদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে।' আমরা কিন্তু বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—রাজা রামমোহন রায় অবধি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত সকলেই ব্রাহ্মসমাজ হইতেই প্রচার করিয়াছেন যে, একমেবাদ্বিতীয়ং কেবল আকাশে নয়, কিন্তু প্রতি নরনারীর আত্মাতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিস্তরেণালং।"

ক্ষিতিবাবুর লিখিত অংশ আমরা উপরে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ক্ষিতি বাবুর লেখাই প্রমাণ করিতেছে, তিনি কেশবচন্দ্রের উদ্ধৃত প্রার্থনাংশের মূল তাৎপর্য্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। উদ্ধৃত প্রার্থনাংশের প্রথম একমেবাদ্বিতীয়ং শব্দে ব্রহ্মানন্দ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াছেন, দ্বিতীয় একমেবাদ্বিতীয়ং শব্দে পৃথিবীস্থ অখণ্ড মানব-পরিবারকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ঈশ্বরকে নহে। ক্ষিতিবাবু আদিসমাজের প্রতিনিধিরূপে ব্রাহ্মসমাজের আদিস্তরের তাঁহার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দুই একমেবাদ্বিতীয়ংকেই ঈশ্বরের অর্থে গ্রহণ করিয়া আপনার ভাবের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাধনা কত নব নব ভাব লইয়া, নব নব বিষয় লইয়া ছিল। তাঁহার জীবনের সমস্ত নব সাধনার সমষ্টিগত ব্যাপারকে তিনি নববিধান নাম দিলেন। এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ঈশ্বরের মহিমা ব্রাহ্মসমাজের আদিস্তরে ঘোষিত এবং কীর্ত্তিত হইল, ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় স্তরে নববিধানের নব সাধনে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ঈশ্বরের জয়ঘোষণা ও গুণকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র-প্রকৃতির সমস্ত মানব-মণ্ডলী যে এক অখণ্ড পরিবার, তাহা শুধু মতে নয়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিক ভাবে তাহা প্রত্যক্ষের ব্যাপার করিয়া জীবনে সাধন করিলেন। কেশবচন্দ্র দ্বিবিধযোগ বিশেষভাবে জীবনে সাধন করিয়াছেন। প্রথমতঃ এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ঈশ্বরের সঙ্গে অখণ্ড যোগ এবং দ্বিতীয়তঃ বিচিত্র ভাব ও প্রকৃতি সম্পন্ন সমস্ত মানব-মণ্ডলীর সঙ্গে অখণ্ডযোগ। এই শেষোক্ত যোগের ভাব যে প্রার্থনায় পরিব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রার্থনারই অংশ-বিশেষ বিশ্ব-পরিবারের কেশব প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাবের ভাবুক কেশবচন্দ্র কবিত্বপূর্ণ রসাল ভাষায় আপনার ভাব প্রার্থনার আকারে প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "এদের বুঝিতে দেও যে, এখানে কেহ আমি আমার হইতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছেন উপরে, একমেবাদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদায় মনুষ্য সমাজ এক।" বিস্তৃত প্রার্থনা হইতে ঐ উপরের লিখিত অংশই আমরা আমাদের প্রবন্ধের প্রয়োজনে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জীবনে এক সময় যাহা সাধন করিতেন, পরে তাহাই বক্তৃতার আকারে সজ্জন-সমক্ষে ঘোষণা করিতেন। কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষ বক্তৃতা 'Asea's Message to Europe'। ১৮৮৩ সনের মাঘোৎসব উপলক্ষে টাউন হলের ঐ বক্তৃতায় Communion এবং Community বিষয় বলিতে গিয়া, অখণ্ড মানব-পরিবার, সকল সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন অখণ্ড মানব-সমাজ (community) ইহাই নবযুগের নব ভাব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়, ইহাতেই পৃথিবীতে সুখ, শান্তি, আনন্দ, এইটী বিশদরূপে আপনার জীবনের সাধনালব্ধ সত্য ও আলোক অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে অংশনার অংশ-বিশেষ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা ১৮৮২ সনের ৬ঠা অগ্রহায়ণের প্রার্থনা বলিয়া লিখিত আছে। ক্ষিতিবাবুকে ঐ সমগ্র প্রার্থনাটী

পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। দৈনিক প্রার্থনা, চতুর্থ ভাগ, ৩৯ পৃষ্ঠায় ঐ প্রার্থনাটী আছে। তাঁহার ভুল কোথায়, বুঝিতে পারিবেন এবং আমাদের সহিত একমত হইবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।
ধর্ম্মতত্ত্বের অন্যতর সম্পাদক।

স্মৃতি-সভা

ময়মনসিংহ।

বিগত ৮ই জানুয়ারি, স্থানীয় টাউনহলে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণ উপলক্ষে বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ, বি, এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম নববিধান সমাজের প্রচারক মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করেন, এবং পরে কিঞ্চিৎ তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট আমরা বহু ঋণে ঋণী; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ঋণ এই যে, তিনি "মা" নামে ভগবান্‌কে আমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। ইহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে "মা" নাম একবার প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাহা বিলুপ্ত হইয়া নানা উপধর্ম্মে পরিণত হয়েছিল; নববিধানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহা বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়। এজন্য আমরা কেশবচন্দ্রের নিকটে অনেক ঋণী। তারপর স্থানীয় খৃষ্ট-ধর্ম্ম-যাজক মিঃ লেনিয়ন সাহেব ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, কেশব চন্দ্রের জীবনে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হয়েছিল, ইহা আমরা অনুভব করেছি; তা না হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। তৎপর সিটিস্কুলের শিক্ষক বাবু বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা গতবারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁর প্রবন্ধে শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তার পর শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি এল, তাঁর সম্বন্ধে বলেন। ব্রহ্মানন্দ যে সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করে এক নূতন ক্ষেত্রে সকলকে এক করেছেন, ইহাই তাঁর জীবনের বিশেষত্ব। তার পর ডাঃ বৈদ্যনাথ রায় বলেন যে, কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সকলে পড়েন, এই আমার বিশেষ অনুরোধ। তৎপর সভাপতির বক্তব্য খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। তিনি বলেন, পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের জীবনে ভক্তির ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। শুধু মস্তিষ্কের ধর্ম্ম নয়, কিন্তু হৃদয়ের ধর্ম্ম তাঁর জীবনকে উজ্জ্বল করেছিল। এইরূপে বড় সুন্দর কথা বলেছিলেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শিলচর।

গত ৮ই জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৬টার সময়, স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে এক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সহরের গণ্য মান্য এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক অনেকে সভায় যোগ দিয়াছিলেন। স্থানীয় নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পেনসন্-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় কেশবচন্দ্রের বিষয়ে কতকগুলি সুন্দর কথা বলেন। তিনি বলিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে দেশের উন্নতির জন্য যে সকল পন্থার উদ্ভাবন হইয়াছে, কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনে সমস্তই দেখাইয়াছিলেন। কিছুই নূতন বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীশিক্ষা, পানদোষ-নিবারণ, যুবকদিগের শিক্ষা এবং স্বদেশী ভাব প্রভৃতির সমস্যা কেশবচন্দ্র স্বীয় জীবনে সাধন করিয়া গিয়াছেন। দেশের উন্নতির জন্য এমন কথা বলা যাইতে পারে না, যাহা কেশবচন্দ্র নিজের জীবনে না দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই মনে হয়, এই যুগকে "কেশবযুগ" বলিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কেশব বাবুর মত স্বদেশ-ভক্ত আর কে আছে? বিলাতে গিয়াও তিনি দেশীয় চোগা চাপকান্ পরিধান করিলেন। দেশেও সামান্য ধুতি পরিতেন এবং খালিপায়ে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত ভাব এবং ক্রিয়াকলাপ ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত। স্থানীয় জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম বলিলেন যে, কেশববাবু এত উচ্চস্তরে আসিয়া স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাঁহার জীবন-বেদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা অধ্যায় হইতে অনেক অংশ পাঠ করিয়া ভদ্রমণ্ডলীকে শুনাইলেন এবং বলিলেন যে, বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা এবং কর্ম্মযুগের বাণী কেশববাবু অনেক পূর্ব্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কেশববাবু বড়লোক ছিলেন, ইহা বলিলে তাঁহার প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করা হয় না; তাঁহার জীবনের আদর্শ যদি একটুকু গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। তৎপর আর দুইটী ভদ্রলোক কেশবের জীবনে ধর্ম্মের যে সমন্বয় হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া কিছু বলিলেন। তাঁহার জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহাইত বর্ত্তমান যুগের আদর্শ। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া যারপর নাই প্রীত হইলেন।

"নববিধানের গুরু।"

১লা ও ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে "নববিধানের গুরু" পড়িতে পড়িতে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। তিনি একদিন শ্রীশ্রীকেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যা বলিবেন, আমি তাই করিব"।

ব্রহ্মানন্দ—কি বলিলে, আমি যা বলিব, তুমি তাই করিবে?

প্র—হাঁ, তাই করিব।

ব্র—আমি বলিতেছি, তুমি কাহারও কথায় কিছুই করিবে না, আমার কথায়ও নয়। স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে যা করিতে বলিবেন, তুমি তাই করিবে।

এই কয়টী কথার মধ্যে নববিধানের গুরুর পরিচয় কেবল তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন, যাঁহারা ভগবৎকৃপায় মানবজীবনের উর্দ্ধে নবজীবন বা দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন; আর যাঁহারা মনে করেন যে, কেবল মানবের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা এই জীবনেরই ক্রমোন্নতি-সাধন করিতে পারিলেই নব-জীবন লাভ করা যায়, আত্মিক জীবন বলিয়া স্বতন্ত্র জীবন নাই, তাঁহাদের কাছে মানুষের গুরু বা আদর্শ মানুষই হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা এই দ্বিজত্ব পাইয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করেন, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদের, অণ্ড হইতে দ্বিজের, পশু হইতে মানবের যেরূপ স্বাতন্ত্র্য, ঠিক সেইরূপ নর হইতে নরহরির স্বাতন্ত্র্য। নরের জীবন যেমন এক দুর্ভেদ্য নিগূঢ় রহস্য দ্বারা সংরক্ষিত, এই জীবন কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, কি উপায়ে ইহা পাওয়া যায়, এ সকল না জানিতে পারিলেও নর এই জীবন সম্ভোগ করিতে পারে, নরহরির জীবনও ঠিক সেইরূপ। এই আত্মিক জীবনের ব্যাপার সম্বন্ধে নরহরিরা বলেন, "আমি কথা কহিতেছি সত্য, আমি কাজ কর্ম্ম করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার ভিতরে একজন আছেন, তিনি আমাকে যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি। তাঁহার অধীনতাই আমার পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনিই আমার জীবনের জীবন। সাধন ভজন জানিনা, দেহে জীবন থাকিলে যেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস ও দেহের উত্তাপ সহজ, সেইরূপ আমার সাধন ভজন উৎসাহ উদ্যম। ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল যেমন প্রতি-গ্রাসে পুষ্টি ও তুষ্টি-দায়ক, প্রার্থনা, যোগ, ধ্যান, প্রেম, ভক্তি তেমনই।" ব্রহ্মানন্দ তাঁহার আত্মিক জীবন-তত্ত্ব জীবনবেদে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ব্রহ্মানন্দ একজনের কাছে এক রকম, আর একজনের নিকট আর এক রকম, এই দ্বিধা ঘুচাইবার জন্যই তিনি নিজ মুখে তাঁহার নবজীবনের রহস্য প্রকাশ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। তথাপি সে আত্মা আজও পরিচিত হইল না, কবে হইবে কে জানে।

জীবনবেদ, প্রথম অধ্যায়—"প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চারিত হইত। কেন কিসের জন্য প্রার্থনা করিব, তাহাও সম্যকরূপে বুঝিতাম না,………ভ্রান্ত হইতে পারি এ সন্দেহও হইল না।…………সকালে একটী আর রাত্রিতে একটী, লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম।… আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়।………সাড়ে পনের আনা পারত্রিক সম্পত্তি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে, প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক।

দ্বিতীয় অধ্যায়—আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি।……… শরীর যখন আছে, কাম-ক্রোধাদির মূলও আছে।………এই পাপ-গণনা বুদ্ধিগত নয়, হৃদয়ের গণনা।………যদি অসাধুতার সম্ভাবনা না যায়, তবে পাপ রহিল। এই আমি অন্যকে শীঘ্র সাধু মনে করিতে পারি না, আর এই জন্যই আমাকে আজ পর্য্যন্ত কেহ পাপী বলিয়া লজ্জিত করিতে পারে নাই। কখন যে পারিবে, তাহার সম্ভাবনাও অল্প।………তোমাদের মনে হয়, পাপী ছিলাম, পাপী নাই, এখন সাধু হইয়াছি। নববিধানের দিকে দৃষ্টি নাই। যেমন খ্রীষ্টবাদীর কাছে, বুদ্ধ-বাদীর কাছে, অনেকের কাছে পরিত্রাণ, তাহাই হইতেছে। আমি দেখিতেছি, হরিপদে আমার সম্পূর্ণ মুক্তি হইল না।

তৃতীয় অধ্যায়—হাত পা যেমন গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনই কার্য্য, চিন্তা, আশা, বিশ্বাস, কথা, ব্রত এ সমুদয় উত্তাপ থাকিলে ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়—মহাত্মা ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না।………স্বর্গে কি পৃথিবীতে কাহারও দাস হইব না।………কে গুরু? কে ব্রাহ্ম-সমাজ? কে আমার ব্রাহ্ম-দল? কোন বিষয়ের উপরেই আসক্তি নাই। ঈশ্বরের আমরা অধীন, এই জন্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন।………ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানি।

পঞ্চম অধ্যায়—মানুষ কথা কয়, বিচার করে, বিচার করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে। আমি ভাবিয়া ধর্ম্মপথে আসি নাই, একথা বরাবর স্বীকার করিয়া আসিতেছি; কিন্তু "আমি"র মধ্যে তুমি বলিয়া সম্বোধন করে যাহা আমি নই, এমন একজনকে স্পষ্ট অনুভব করি, তাঁহার কথা শুনিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিতে চাই।

এইরূপ অনেক কথা সকল অধ্যায়েই আছে, যাহাতে মানব-জীবন এবং ধর্ম্মজীবন উভয়ের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। শেষ পঞ্চদশ অধ্যায়ের এই কয়টী কথায় আমার কথার শেষ করিতে চাই। যিনি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই মজিয়াছেন। "নিজ বুদ্ধিতে কখনও আমি সত্য লাভ করি নাই,……ঘোর অন্ধকার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রকাশ যেমন, তেমনই আমাতে সত্যপ্রকাশ হয়।"

ইহাই নবজীবন-সম্ভোগ। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখন কি উপায়ে এই জীবন লাভ হইয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না; যিনি ঐ জীবন লাভ করিয়াছেন, তিনিও বুঝিতে পারেন না। "হে দীনবন্ধু, হে অপার করুণাসিন্ধু! তুমি যাহাকে লইয়া

খেলা কর, তার চরিত্র অন্যে বুঝিতে পারে না, সে আপনিও বুঝিতে পারে না।……একটী জননী তুমি মাঝখানে দাঁড়াও, সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক"—জীবনবেদ, সপ্তম অধ্যায়।

সেবক—শ্রীহলধর সেন।

এই লেখক মহাশয় আচার্য্য ও ভাই প্রসন্নকুমারের কথোপকথন উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, নববিধানের গুরুর পরিচয় কি। সত্যই কেশবচন্দ্র প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া চলিতেই সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কখনও অন্যধর্ম্মের গুরুর ন্যায় তাঁর নিজের কথা মানিতে বলেন নাই। তিনি যে "নববিধানের গুরু" হইতে চাহিয়াছেন, ইহার অর্থও ইহা নয় যে, তাঁহাকে অন্যগুরুর ন্যায় অভ্রান্ত গুরু বলিয়া আমরা মানিব ও অন্য গুরুর শিষ্যের ন্যায় আমরা তাঁহার শিষ্য হইয়া কেবল তাঁহারই কথা শুনিয়া চলিব বা তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিব। কেবল এক ঈশ্বরবাণী শুনিয়া সকল বিষয়ে চলিতে হইবে, ইহাই নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেরই পক্ষে বিধি। এমন কি, কেশবচন্দ্রের উক্তি বা কোন মহাপুরুষের উক্তিও ঈশ্বরের বাণীর সহিত না মিলিলে, তাহাও লইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তিনিই বলিয়াছেন "আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্ছেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গরীব, বাণের জলে ভেসে এয়েছি। কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শেখাতে এয়েছি। তাহা করিলেত হবে না। যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড়জন থাকুন।" ইহার অর্থ এই কি নয়, নববিধান সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রকেই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ষোল আনা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে নিজ নিজ বুদ্ধির মত মিশাইয়া যার যেটা খুসি লইলে বা যার যেটা খুসি নিজ ইচ্ছামত বাদ দিলে চলিবে না। কেন না নববিধান সম্বন্ধে তাঁর যে কথা, সে তো তাঁর নিজের কথা নয়। তিনি বলিলেন, "আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলিনা"। সুতরাং তাহা ঈশ্বরেরই বাণী, এই বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "নববিধানের স্থানে দাঁড়াইয়া যদি আমি প্রাণ দিতে বলি, যিনি প্রাণ দিতে পারেন, তাকেই বলি বিশ্বাস।" সুতরাং নববিধান বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁহার বাণীকে ব্রহ্মবাণী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবেই তিনি গুরু বলিয়া গৃহীত হইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এ গুরু আগেকার গুরু নয়, তাই বলিলেন, "নববিধানের গুরু"। নববিধানে পূর্ব্বকার অনেক শব্দই ব্যবহার করিতে হইয়াছে, সে শব্দের অর্থ পূর্ব্বকার ভাববোধক নয়। এই জন্য সেই সকল শব্দের পূর্ব্বে নববিধান বিশেষণ বসাইতে হয়। যেমন নববিধানের যে দুর্গা, তিনি আগেকার মৃণ্ময়ী দুর্গা নন, তিনি নবদুর্গা। এইরূপ "গুরু" শব্দও আগেকার গুরু শব্দের অর্থে নববিধানাচার্য্য ব্যবহার করেন নাই। এমন কি, নববিধান সম্বন্ধেও যখন প্রেরিতদের মধ্যে মতভেদের লক্ষণ দেখিয়াছেন, তখনও বলিয়াছেন, নববিধানে দীক্ষিতদিগকে নূতন নববিধানে দীক্ষিত কর। তেমনি নববিধানের গুরুর অর্থও নিজে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু। "এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস।……এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।" (ধঃ সঃ)

—•—

সংবাদ।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা মার্চ্চ, স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ের দেবালয়ে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১লা মার্চ্চ, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে আচার্য্যদেবের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা জগন্মোহিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ৭ই মার্চ্চ, ৮৩।১ অপার সার্কুলার রোডে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন, ভগ্নী কমলেকামিনী বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন। পুত্র শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ৩৮নং হ্যারিসন রোডে, ডাঃ জগন্মোহন দাসের গৃহে, স্বর্গীয় প্রসন্ন চন্দ্র চৌধুরীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ডাঃ দাস প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৮ই মার্চ্চ, ২নং ছকুখানসামা লেনে শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের গৃহে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতা স্বর্গীয়া চঞ্চলাদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ও ভগ্নী শ্রীমতী চপলা মজুমদার বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১৬ই ফাল্গুন, ৪নং ময়রা ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ উপাসনা করেন, শ্রীমতী অশোকলতা দাস প্রার্থনা ও শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত প্রার্থনা, শ্লোকপাঠ ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন।

পুণ্যদিনে দীক্ষা—গত ৮ই মার্চ্চ, ৩২নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গগত শান্ত সাধক ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার পৌত্রী, শ্রীযুক্ত মনোগত ধন দের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী অরুণাশোভার পবিত্র দীক্ষা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও কন্যাকে দীক্ষা দান করেন। নবদীক্ষিতার মস্তকে ভগবানের ও পিতামহাদি সাধুভক্তজনের

শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। অদ্য খাটুরার সমাধিতেও কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাস উপাসনাদি করিয়াছেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতিতে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থ ১৲ এবং প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১১নং পদ্মনাথ লেনে, শ্রীমান্ হরিসুখ গুপ্তের শিশুপুত্রের নামকরণ হয়, শিশুর নাম "দেবব্রত" রাখা হয়।

গত ৬ই মার্চ্চ ৫৪।১ হাজরা রোডে, শ্রীমান্ অজিতনাথ মল্লিকের শিশু কন্যার নামকরণ হয়। শিশুর নাম "কল্পনা" রাখা হয়।

দুই অনুষ্ঠানেই শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ-বিবাহ—গত ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রবোধকুমার দাসের সহিত, সিরাজগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত জলধর সরকারের দৌহিত্রী, স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র দাসের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী প্রতিভার শুভ-বিবাহ ২৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কন্যার মাতুলালয়ে সম্পন্ন হইয়াছে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস রেজিষ্ট্রার ও আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় ব্রহ্মানন্দের উপদেশ-পাঠান্তে নিজেও কিছু বলিয়া বরকন্যার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, ২৮।এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, ভবানীপুর-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বসুর সহিত, শান্তসাধক স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত মনোগতধন দের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী অরণ্যশোভার শুভ-পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

ভগবান্ নবদম্পতিদিগকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

নববধূর শুভাগমন—গত ১৩ই মার্চ্চ, ২৪।১এ হরিশ মুখার্জি রোডে, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে নববধূর শুভাগমন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

পারলৌকিক—আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১লা মার্চ্চ, স্বর্গীয় সত্যভূষণ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রমিলা গুপ্তা চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে, প্লুরেসীর চিকিৎসার্থ অস্ত্রপ্রয়োগে ভগ্ন জীর্ণ নশ্বর দেহখানি পরিত্যাগ করিয়া, শোকদুঃখতাপের অতীত চিরশান্তির রাজ্যে আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুকাল চিকিৎসার্থ বিলাতে অবস্থান করিয়া কতকটা সুস্থ শরীরে মৃত্যুর প্রায় মাস দুই পূর্ব্বে দেশে আসেন। কে জানিত, দেশে আসিয়া এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। সবই বিধাতার খেলা। একমাত্র সন্তান পিতামাতার অতি আদরের কন্যারত্ন এখন পিতৃমাতৃহীন। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গধামে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত করুন, এবং পৃথিবীস্থ কন্যার প্রাণে এবং মাতৃদেবী ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকল শোকার্ত্তজনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

উৎসব—ময়মনসিংহে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব উপলক্ষে একদিন "ঈশ্বরদর্শন" বিষয়ে বক্তৃতা, একদিন মেয়েদের উৎসব, ১১ই মাঘ দিনব্যাপী উৎসব, একদিন "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" বিষয়ে শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ রায়ের বক্তৃতা, একদিন যুবকদের উৎসবে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সেনের বক্তৃতা, একদিন বালকবালিকাদের উৎসবে শতাধিক বালকবালিকার উপস্থিতি, এইরূপে প্রথম রবিবার উদ্বোধন হইয়া পরের রবিবার শান্তিবাচন হয়।

নববিধান ট্রাষ্ট—গত ২রা মার্চ্চ, এলবার্ট হলে, নববিধান ট্রাষ্টের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। কীর্ত্তন, উপাসনা, কার্য্যবিবরণীপাঠ, আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন এবং ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেনের কথকতা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ট্রাষ্টের উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয় ব্যয় হিসাব।

আয়

মে, ১৯২৮ :—

শ্রীমতী চারুবালা বানার্জি ১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত মাসিক দান দশ মাসের	২০৲
পুস্তক বিক্রয়ের তহবিল হইতে	৫১৲

জুন, ১৯২৮ :—

সাধু হীরানন্দের পত্নীর শ্রাদ্ধে বাড়ীভাড়ার ঋণশোধার্থ	৫০৲
শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দত্ত ১৯২৮ সনের মে পর্য্যন্ত বার মাসের মাসিক দান	১২৲
বাড়ীভাড়ার ঋণশোধার্থ বিশেষ দান	৩৲
স্বর্গীয় দীননাথ দত্ত ফণ্ডের চা বাগানের ১৯২৭ সনের ডিভিডেণ্ড	১২৫৲
শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার সেন Bar-at-Law ১৯২৭ সনের মে হইতে ১৯২৮ সনের জুলাই পর্য্যন্ত ১৫ মাসের মাসিক দান	৭৫৲

বিবরণ		টাকা
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস কন্যার শুভ-বিবাহে বাড়ী ভাড়ার ঋণশোধার্থ		১০৲
শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী শাসমল মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে		৫০৲
বাড়ীভাড়া আদায়		৬০৲
জুলাই, ১৯২৮ :—		
ডাঃ অমর নাথ কুণ্ডু শিশুপুত্রের নামকরণে বাড়ী ভাড়ার ঋণশোধার্থ		৫৲
কোম্পানীর কাগজের ছয় মাসের সুদ—		
স্বর্গীয় কেদার নাথ রায় ফণ্ডের	১৫৸৵০	
,, কানাই লাল সেন	১৫৸৵০	
,, দেবীদত্ত	১৯৲	
,, ছকড়ি ঘোষ	৪৸০	
,, ভুবনমোহন সেন	৩৵০	
,, ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী	৩৵০	
,, শ্যামাচরণ দত্ত	১৷৷৵০	
,, সুরমা দত্ত	১৷৷৵০	
,, জগদীশ গুপ্ত	৭৸৶০	
,, নলিনীবালা বানার্জ্জি	২৷৷০	৭৫৷৶০
শ্রীমতী চারুবালা বানার্জি ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯২৮ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঁচ মাসের দান		১০৲
বাড়ীভাড়া আদায়		১৪২৲
আগষ্ট, ১৯২৮ :—		
শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু পাল বাড়ীভাড়ার ঋণশোধার্থ মাতৃশ্রাদ্ধে		২৲
ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার ১৯২৭ সনের সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নভেম্বরের মাসিক দান		১৫৲
বাড়ীভাড়া আদায়		১৭৬৷০
সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ :—		
বাড়ীভাড়া আদায়		১২১৷৷০
অক্টোবর, ১৯২৮ :—		
ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর ও ১৯২৮ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর মাসিক দান		১৫৲
বাড়ীভাড়া আদায়		১৮২৲
নবেম্বর, ১৯২৮ :—		
বাড়ীভাড়া আদায়		১০২৲
ডিসেম্বর, ১৯২৮ :—		
বাড়ীভাড়া আদায়		১৩২৲
		১৪৪১৷৶০

ব্যয়

বিবরণ	টাকা
জুন, ১৯২৮ :—	
১৯২৮ সনের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চের বাড়ীভাড়া	৩৭৫৲
বাড়ী মেরামত	১৩৷৫
জুন কোয়ার্টারের মিউনিসিপাল ট্যাক্স	৩২৸৵১০
ক্ষুদ্র ব্যয়	১৷৷০
জুলাই, ১৯২৮ :—	
১৯২৮ সনের এপ্রিল ও মে মাসের বাড়ীভাড়া	২৫০৲
বাড়ী মেরামত	১০৸৵৫
ক্ষুদ্র ব্যয়	২৷৷৶০
আগষ্ট, ১৯২৮ :—	
জুন (১৯২৮) মাসের বাড়ীভাড়া	১২৫৲
দারোয়ানের জুলাইর বেতন আংশিক	১৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	১/০
সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ :—	
সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের মিউনিসিপাল ট্যাক্স	৩২৸৵১০
জুলাই (১৯২৮) মাসের বাড়ীভাড়া	১২৫৲
দারোয়ানের বেতন জুলাই শোধ	৫৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	২৸৶০
অক্টোবর, ১৯২৮ :—	
আগষ্ট (১৯২৮) মাসের বাড়ীভাড়া	১২৫৲
দারোয়ানের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের বেতন	১২৲
নভেম্বর, ১৯২৮ :—	
সেপ্টেম্বর (১৯২৮) মাসের বাড়ীভাড়া	১২৫৲
বাড়ী মেরামত	৩৸০
ক্ষুদ্র ব্যয়	১৷৷০
ডিসেম্বর, ১৯২৮ :—	
ডিসেম্বর কোয়ার্টারের মিউনিসিপাল ট্যাক্স	৩২৸৵১০
বাড়ী মেরামত	১০৲
অক্টোবর (১৯২৮) মাসের বাড়ীভাড়া	১২৫৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	৷০
	১৪১৪৸০

মোট আয়——১৪৪১৷৶০
মোট ব্যয়——১৪১৪৸০

হস্তেস্থিত ২৬৷৷৶

শ্রীঅক্ষয় কুমার নথ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্টীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৬ই চৈত্র, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 30th March, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

মা, এই ত তুমি জীবন্ত জাগ্রতরূপে এই বিশ্বমন্দিরে বর্ত্তমান। তুমিই আমাদিগকে প্রকৃতির ভিতর দিয়া এবং ইতিহাসে তোমার ভক্তবৃন্দের জীবন দেখাইয়া, নিত্যই আমাদিগের জীবনকে কেমনে সমুন্নত করিব, তাহাই শিখাইতেছ এবং তুমিই তোমার নববিধানালোক প্রকাশ করিয়া, পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছ। সেই অনন্ত পথের সহায় কেবল তোমার কৃপা। তুমি ভিন্ন কেহই আমাদের পাপ প্রবৃত্তি, আলস্য ও দুর্ব্বলতা দূর করিয়া সেই পুণ্য সঙ্কল্প, সেই পুণ্যবল সঞ্চার করিতে পারে না, যদ্দারা আমরা তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করি এবং আমরা তোমার আনন্দজাত ব্রহ্মানন্দ-জীবন-লাভে ধন্য হই। তাহাইতো তোমার ইচ্ছা। তোমারই কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হইয়া আমরা যাহাতে তোমার বিধান জয়যুক্ত করিতে পারি, তাহার জন্য তোমারই শরণাপন্ন হই। পূর্ণিমার আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার তিরোহিত হয়, তেমনি, হে পূর্ণ মা, তোমার পূর্ণ প্রকাশ এই হৃদয়াকাশে হউক, যেন জীবনে সংসারের অন্ধকার আর না আসিতে পারে। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়, তেমনই তোমার ভক্তচন্দ্রের উদয় এই হৃদয়েও সংসাধন কর। বসন্তের সমাগমে সুসমীরণ যেমন চারিদিকে প্রবাহিত, তেমনি তোমার নববিধানের সুবসন্ত-সমীরণ আমাদিগের হৃদয়কে উৎফুল্ল করুক এবং তাহা তোমার পবিত্রাত্মার প্রভাবে জীবনে জীবনে প্রবাহিত হউক। তুমি তোমার নববিধানবাহক নবশিশুকে প্রার্থনাশীল ও তোমারই কৃপার চিরভিখারী করিয়াছ এবং আমাদিগকেও তাঁহারই সঙ্গের সঙ্গী, তাঁহারই অনুগামী করিয়াছ। তবে, মা, আমরাও যেন তোমার দীন ভিখারীদল হইয়া, তোমারই কৃপাভিক্ষা করিয়া, ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও দলগত জীবনে তোমার উদ্দেশ্যসাধন করিয়া, নববিধানকে গৌরবান্বিত করিতে পারি। এই পুরাতন বর্ষের সঙ্গে আমাদের পুরাতন জীবন বিদায় করিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুরাতন ও নূতন।

পুরাতন গেলে নূতন আসে। পুরাতন থাকিতে নূতন আসে না। পুরাতনের বিনাশে নূতনের প্রকাশ, পুরাতনের পরিবর্ত্তনে নূতনের সমাগম। ইংরাজীতে

তাই প্রবচন আছে, "নূতন সুরা পুরাতন বোতলে থাকিতে পারে না", "পুরাতনকে উচ্ছেদ কর, নূতন প্রতিষ্ঠান কর।"

প্রকৃতিতে তাই দেখি, এই বসন্ত-সমাগমে বৃক্ষের পুরাতন পত্র সকল ঝরিয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্থানে নূতন পত্র, নূতন পল্লব উদ্গত হইতেছে।

এইরূপে পুরাতন ঋতু শেষ হইল, নূতন ঋতু দেখা দিল। পুরাতন মাস বৎসর চলিয়া গেল, নূতন মাস নূতন বৎসর তাহার স্থান অধিকার করিল।

এমনই মানবজীবনেও বালক যুবা হইল, যুবা বৃদ্ধ হইল। বৃদ্ধ মরিল, শিশু জন্মগ্রহণ করিল।

ধর্ম্মজগতেও তাই পুরাতন বিধানের পর নূতন বিধান। পুরাতন বিধান না গেলে নূতন বিধান আসে না। বিধান পুরাতন হইলেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে। এই জন্য পুরাতন যাহা কিছু, তাহার স্থান নূতন বিধানে নাই। পুরাতন মত, পুরাতন পথ, পুরাতন সাধন, পুরাতন মন থাকিতে নূতন বিধান লাভ হয় না।

আমরা নূতন বিধান, নূতন বিধান বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। আমরা নূতন-বিধান-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতেছি। এই পুরাতন বর্ষ বিদায় করিয়া নূতন বর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে, যাহাতে আমাদেরও ভিতর যাহা কিছু পুরাতন, পুরাতন বর্ষসঙ্গে বিদায় করিয়া দিতে পারি এবং নূতন বর্ষে যথার্থ নববিধান কি, জীবন দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি, তাহারই জন্য প্রস্তুত হওয়া কি কর্ত্তব্য নয়?

আচার্য্যদেব বলিলেন, "আমি কাপড়ে রিপু করিতে, তালি দিতে আসি নাই। আমি যে একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি।" আর এক স্থানে বলিলেন, "আমরা যাহা করিতেছি, পুরাতন জমির উপর। পুরাতন পচা হৃদয়ে কাজ কি? জীবন পুরাতন হইলে দুর্গন্ধ হয়, বল থাকে না। অতএব পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীবন যাহা, তাহা ত্যাগ করিতে দাও। আমাদিগকে নবজীবন-দানে কৃতার্থ কর।"

তিনি আরো বলিলেন, "বাহিরে সমস্ত নূতন, ভিতরে সমস্ত নূতন। এই যাবতীয় নূতন একত্র করিলে কি হয়? নূতন বিধান। সমুদয় যার নূতন, সেই নববিধানে দীক্ষিত; যাদের পিতামাতা ভার্য্যা পুরাতন, তারা কখন নববিধান-বাদী নহে। এ নববিধানে প্রবঞ্চকেরা থাকিতে পারে না, এ নবীনের ঘর, প্রাচীনের ঘর নয়।"

নববিধান-প্রবর্ত্তকের এই উক্তিগুলি বিশেষভাবে আলোচনা ও আত্মচিন্তার দ্বারা ইহার গভীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক, কার্য্যতঃ তাহা সাধনের জন্য কৃতসংকল্প হওয়া আমাদিগের এক্ষণে নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এই পুরাতন বর্ষ বিদায় করিবার জন্য হিন্দু শৈব সম্প্রদায় সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া আত্মসংযম করিতেছেন। মুসলমান বিশ্বাসিগণ নূতন চাঁদ দেখিবার পূর্ব্বে মাসাধিক কাল রোজা রাখিয়া উপবাস ও প্রার্থনায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন। খৃষ্ট-বিশ্বাসিগণ খৃষ্টের ক্রুশারোহণ স্মরণ করিয়া, আত্ম-নিগ্রহ, উপবাস ও প্রার্থনা এবং কেহ কেহ দিনব্যাপী মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া, ধ্যান চিন্তা পাঠাদি দ্বারা ব্রত সাধন করিতেছেন। সকলেরই একই উদ্দেশ্য, একই প্রথা। পুরাতন বিধানে যদি এই পুরাতন বর্ষ-বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জীবন, পুরাতন মন, পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করিবার জন্য এত কঠোর সংযম, কঠোর ব্রত-সাধনের বিধি ব্যবস্থা থাকে, পৃথিবীর নূতন চাঁদের উদয় দেখিবার জন্য যদি নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের এত কঠোর তপস্যা-সাধন বিধি হয়, আমরা যাঁহারা নববিধানের লোক "বাহিরে সমস্ত নূতন, ভিতরে সমস্ত নূতন" দেখিতে চাই, "যাঁদের পিতা মাতা ভার্য্যা নূতন, হরি নূতন, পূজা নূতন, নাম নূতন, সাধন নূতন, জল নূতন, বায়ু নূতন, পাহাড় নূতন, সমস্তই নূতন, আর পৃথিবী নূতন, স্বর্গ নূতন, ঈশা নূতন, মুষা নূতন, শাক্য নূতন, গৌরাঙ্গ নূতন, বেদ, কোরাণ, বাইবেল, পুরাণ সমুদয় নূতন," তাঁদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারের পুরাতন যাহা, তাহা পরিহার করিবার জন্য কত আত্মত্যাগ, কত আত্ম-সংযম, কত ক্লেশ সাধন করা প্রয়োজন। যদি আমরা বিশেষ তপস্যা ও সাধন সহকারে তাহা না করিতে পারি, নববিধান-প্রবর্ত্তকের অনুশাসন অনুসারে আমরা যথার্থই যে বিধান সম্বন্ধে প্রবঞ্চক এবং আমরা যে নববিধান-বাদী নই, তাহা কি স্বীকার করিব না? নববিধান-বিধায়িনী জননী তবে আমাদিগের আত্ম-দৃষ্টি খুলিয়া দিন, যথার্থ অনুতাপ ও সাধন দ্বারা এই আত্ম-প্রবঞ্চনা হইতে মুক্ত হইতে দিন এবং নববর্ষে নববিধানবাদীর নবজীবন লাভ করিতে যথার্থ আকাঙ্ক্ষিত ও ভিখারী করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানে বিশ্বাস।

নববিধান-বিশ্বাসী কে? সর্ব্বধর্ম্ম-বিশ্বাসী যে। হিন্দু যিনি তিনি মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, মুসলমান যিনি তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, খৃষ্টান যিনি তিনি হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করেন না, আবার হিন্দু বা বৌদ্ধ মুসলমান বা খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে ম্লেচ্ছের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন; কিন্তু নববিধান বলেন, সর্ব্ব ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মই অধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাজ্য নয়। নববিধান বিশ্বাস করেন যে, হিন্দুকে মুসলমান-ধর্ম্ম পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্ম তেমনি গ্রহণ করিতে হইবে, হিন্দুকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, বৌদ্ধকে হিন্দু হইতে হইবে, হিন্দুকে খৃষ্টান হইতে হইবে। প্রত্যেককে পরস্পরের ধর্ম্ম এবং সর্ব্ব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তবে পূর্ণধর্ম্ম লাভ হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মই আংশিক ধর্ম্ম, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মই ধর্ম্ম, সর্ব্বমানবের ধর্ম্ম, মানব মাত্রেরই গ্রহণীয়। তাহা গ্রহণ না করিলে পূর্ণ-ধর্ম্ম-গ্রহণ ও সাধন হইবে না। ইহাই নববিধান।

—০—

উপার্জ্জন ও ভিক্ষা।

উপার্জ্জন করা পৃথিবীতে পুরুষকারের ধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত। ভিক্ষা করা হেয় বলিয়া ঘৃণিত। কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যে ইহার ঠিক বিপরীত। ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের কৃপা বিনা মানুষের নিজ চেষ্টার বলে কিছুই উপার্জ্জন হয় না, তাই তাঁহার কৃপা-ভিক্ষাই জীবনের সম্বল করেন। সুতরাং ধর্ম্ম-বিধানে ভিক্ষাই শ্রেয়, উপার্জ্জন হেয়। উপার্জ্জন দ্বারা সংসারের অর্থ, বিত্ত, মান, মর্য্যাদা লাভ হয়, কিন্তু ভিক্ষা দ্বারা স্বর্গলাভ হয়; এই জন্য ধর্ম্মসাধক সাধু ভক্তগণ ভিক্ষাই উচ্চ ব্রত জানিয়া তাহা অবলম্বন করেন, তাহাই স্বর্গ ও ঈশ্বর লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

চয়ন

(১)

১৮৬৮ সালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বোম্বে প্রার্থনাসমাজে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবার সময়ে তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন:—

"আমি আশার নেত্রে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে, একদিন ভারতের যাবতীয় শিক্ষিত-মণ্ডলী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান নির্ব্বিশেষে সকলে সম্মিলিত হইয়া, তাঁহারা এত কাল যাবৎ যে জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিবেন। অতি সামান্য লইয়া যাহা আরম্ভ হয়, তাহাই সময়ে অসামান্য হইয়া পড়ে। বোম্বে, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে মাত্র ১২টি করিয়া লোক আমাদিগের সহিত দাঁড়াইতে দাও, দেখিবে আমরা সকলে মিলিয়া সমস্ত শিক্ষিত জাতির জন্য একজাতি হইয়া পড়িব এবং আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য যাবতীয় সম্প্রদায়ের সকলকেই গ্রহণ করতঃ সম্মিলিতভাবে এক বিশাল শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিব। আশা করিতেছি যে, এমন দিন আসিবে, যখন নানাভাবে বিভক্ত, নানাস্থানে অবস্থিত সম্প্রদায় সমূহ সম্মিলিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে। তখন নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেই ঐ ঈশ্বরের মহিমাই মহিমান্বিত করিবে, প্রত্যেকে মিলিয়া তাঁহারই পূজা অর্চ্চনা করিবে। সকল প্রকারের বিভিন্নতা দূরীভূত হইয়া সকলেই এক বিশাল পরিবারভুক্ত হইয়া যাইবে। কে বলিতে পারে, ভারত আবার সঞ্জীবিত হইয়া, ঐ সঞ্জীবিত ও মুক্ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ এবং আমেরিকার সহিত করমর্দ্দন করিবে না? তোমরা কি বলিবে যে, এ সকল সম্ভব হইবে না? তোমরা কি বলিবে যে, এ সকল বার্ত্তা শুধু কল্পনা বা স্বপ্নবৎ অলীক? আমি জ্বলন্ত বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, যেন শীঘ্রই ভারতের দুঃখ দুর্গতির অবসান হয়। অন্যান্য দেশে যেমন এক স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভারতেও যেন সেই হাসি আবার ফুটিয়া উঠে। বিধাতা প্রকৃত বিশ্বাস ও দেশহিতৈষণার দ্বার উন্মুক্ত করুন, যেন উহা সকলের হৃদয়েই প্রবেশ করিতে পারে, এবং ঐ দেশহিতৈষণা হইতে মহৎ কার্য্যাবলী, পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ও পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া, ভারতের সমস্ত জাতির আত্মিক, কায়িক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন করিবে।"

(২)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আচার্য্য ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত একটি শ্লোক:—

"আদেশানুগতো ভক্তঃ কেশবো ব্রহ্মসেবকঃ।
কেশবানুচরা ভক্তা যোগবৈরাগ্যভূষণাঃ॥
বিজয়াঘোরগৌরাশ্চ কান্তিচন্দ্রোদয়স্তথা।
প্রকাশো বিনয়ীভূতঃ প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

শ্রীমহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রশ্নোত্তর ও প্রার্থনা।

(Theistic Annual, 1872, হইতে উদ্ধৃত)

১। ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবার উপায় কি? তিনি অত্যন্ত নিকটে আছেন, ইহা বিশ্বাস করা।

হে ঈশ্বর, তোমার কাছে আসিয়া কত দুঃখের কথা

বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া সকলি ভুলিয়া গেলাম। আর কিছু বলিবার চাহিবার রহিল না। তোমার দর্শনে সকল সাধ মিটিল, সকল দুঃখ দুর হইল। আমি এখন আর কিছু চাহিব না, কেবল তোমার প্রতি স্থির-নয়নে নিরীক্ষণ করি।

২। ঈশ্বরকে পাইবার উপায় কি? যিনি লক্ষ্য, তিনিই উপায়; পবিত্র ঈশ্বর লক্ষ্য, দয়াময় ঈশ্বর সহায়।

তুমি মহান্, আমি ক্ষুদ্র, তুমি অকলঙ্ক পুণ্যময়, আমি মহাপাপী, তোমার কাছে আমি কি ভিক্ষা চাহিব? কেবল এই আমার প্রার্থনা, যেন চিরদিন তোমার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া থাকি। আমার নিজের গৌরব কিছুই নাই, আমি অপদার্থ, তুমি সর্ব্বস্ব হও, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।

৩। ধ্যানের মূল মন্ত্র কি? "সত্যং", "তুমি আছ" ইহা বারম্বার আলোচনা ও ধারণা করা।

হে ঈশ্বর, তুমি কি যথার্থই সম্মুখে আছ? না আমি কল্পনার পূজা করিতেছি? আমার অনেক প্রার্থনা স্তুতি কল্পনা গ্রাস করিতেছে। আমার অনেক কথা তোমার নিকটে যায় নাই, কেবল অরণ্যে রোদন করিয়াছি। তাই ডাকিতেছি, পিতা, তুমি কাছে আসিয়া দেখা দেও; তবে একবার তোমার সাক্ষাৎ পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

৪। উপাসনা কি? ঈশ্বরের দিকে আত্মাকে ফিরাইয়া রাখা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার জ্যোতি ইহার উপর পড়ে।

যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, ততক্ষণ, হে ঈশ্বর, আমার মন ভাল থাকে; কিন্তু সংসারে প্রত্যাগমন করিলেই আবার আমার পুরাতন পাপ সকল আমাকে উৎপীড়ন করে। আমি এক ঘণ্টা কাল সংসারে স্থির থাকিতে পারি না। সেই জন্য মিনতি করিতেছি, হে দীনশরণ! আমাকে নিয়ত তোমার কাছে রাখিয়া দেও, যেন আমি কখন তোমাকে ছাড়িয়া না থাকি। লোকে আমাকে সাধু বলে, বিদেশে আমার কত প্রশংসা; কিন্তু অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, তুমিই কেবল জান, আমার মধ্যে কত পাপ ও জঘন্যতা। লোকে যদি আমার সমস্ত অপরাধ জানিত, তাহা হ'লে কি আমাকে কেহ স্পর্শ করিত? না, জগদীশ! তুমি কিন্তু আমার সমুদায় পাপ জানিতেছ, আমার ছদ্মবেশ বুঝিতেছ। এ কপটীর কিসে পরিত্রাণ হইবে বল।

৫। ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগ কোথায়? প্রাণের মধ্যে।

তুমি কেমন ধন, হে ঈশ্বর, তাহা এখনও বুঝিতে পারিলাম না। তাই তোমাকে এত অনাদর করি, এত অবজ্ঞা করি। যদি তোমাকে বুঝিতাম, তাহা হইলে আমার এত দুর্দ্দশা হইত না। আমি তোমাকে যত্ন করিয়া প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিতাম এবং প্রতিদিন ভক্তি-জলে তোমার চরণ ধৌত করিয়া সুখী হইতাম।

৬। পাপ-দমনের উপায় কি? পাপ-জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বিচ্ছেদ কালে উপাসনাতে সবল হওয়া।

কিরূপে, হে ঈশ্বর, তোমার নিকটে আজি আমি মুখ দেখাইব? গত কল্য যে তোমার কাছে পাপের জন্য কত ক্রন্দন করিয়াছি এবং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কত প্রর্থনা করিয়াছি। আবার আজ সেই পাপ-হ্রদে ডুবিয়া কলঙ্কিত হইয়া কপট পূজা করিতে আসিয়াছি। আমি যে আবার প্রতারণা করিতে আসিয়াছি, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? হে জগদীশ, আমাকে দণ্ড দেও, পদাঘাত কর; আমি জানি না, কাহার কাছে আসিয়াছি।

কি আশ্চর্য্য, পিতা, যখন আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হই, তখন মনে করি, তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছ; আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকি, কিন্তু মনে করি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে; আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, মনে আমি করি, তুমি আর আমাকে ভালবাস না। একে পাপ করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছি, তাহাতে আবার তোমার প্রতি দোষারোপ করি। এ ভয়ানক পাপ হইতে, পিতা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

৭। পরলোক কি? ঈশ্বরেতে আত্মার অনন্তকাল অধিবাস।

৮। পরলোকের গূঢ় প্রমাণ কি?

ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ।

৯। ধর্ম্ম-রাজ্যের ভিত্তি কি।

কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম বিশ্বাস-সূত্র।

১০। ধর্ম্ম-পথে সহায় কোন কোন ব্যক্তি? যাঁহারা আপনার সাধুতা দেখিতে দেন না, কিন্তু স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন।

১১। পরিবার-সাধনের মূলমন্ত্র কি? অন্যকে ছাড়িয়া আমার পরিত্রাণ অসম্ভব, ইহা স্বীকার করা।

করুণাময় পিতা, আমাদের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার কর এবং শান্তি সংস্থাপন কর। তোমাকে যদি পিতা বলিয়া ভালবাসি, তাহা হইলে কি পরস্পরের প্রতি আমরা ঘৃণা বা রাগ করিতে পারি? তুমি আমাদিগকে এক পরিবারে সম্বদ্ধ হইতে বলিয়াছ, আমরা যেন তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন না করি। প্রেমময় ঈশ্বর, সকলে মিলিয়া এক পরিবার হইয়া তোমাকে যখন পিতা বলিয়া পূজা করি, তখন যেরূপ তৃপ্তি হয়, সেরূপ একাকী ঘরে তোমাকে ডাকিলে তৃপ্তি হয় না। আবার একাকী ডাকিলে যে সুখ, সজন উপাসনাতে সেরূপ সুখ কদাপি হয় না। এই দুই অধিকার আমাকে দিয়া কত সুখী করিয়াছ। দেখ, যেন উভয় অধিকার রক্ষা করিতে পারি।

১২। কতবার অপরের অত্যাচার সহ্য ও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য? যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ক্ষমা অসম্ভব হয়।

১৩। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অবস্থা কি? যে অবস্থায় পাপ করা অসম্ভব।

১৪। ঈশ্বরের কথা কিরূপে জানা যায়? বার বার শুনিলে তাঁহার স্বর দ্বারা জানা যায়।

আমাকে কেবল দেখা দিলে হইবে না, হে ঈশ্বর, আমার সঙ্গে কথা কও। চক্ষু কর্ণ উভয় পরিতৃপ্ত হউক। তোমার শ্রীমুখের একটী কথা শুনিলে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, অন্ধের চক্ষু হয় এবং ভগ্নহৃদয়ের আনন্দ হয়। স্পষ্ট করিয়া বল, পিতা, কিসে আমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘুচিবে। এ জীবনে কতবার অবিশ্বাসীর ন্যায় তোমাকে ডাকিয়া চলিয়া গিয়াছি, তোমার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করি নাই। আজ তোমাকে ছাড়িতে পারি নাই। আমার প্রতি, নাথ, তোমার কি আজ্ঞা হয়, তাহা শুনিবার জন্য পড়িয়া রহিলাম।

হে ঈশ্বর, আজ কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিলে না, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি নাই, কেবল কতগুলি ভাল ভাল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি। তুমিত মুখের উপাসনা গ্রহণ কর না, ভাব-বিহীন শব্দে তুমি প্রতারিত হও না, তাই আমার অদ্যকার প্রার্থনা তোমার অগ্রাহ্য হইল। পিতা, এরূপ কপটতা হইতে রক্ষা কর। যাহাতে মনের সহিত তোমার পূজা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা অর্পণ কর।

পূর্ব্বে আমি তোমাকে কেমন প্রীতি করিতাম, তোমার নাম শুনিলেই আমার চক্ষু হইতে ভক্তিবারি পতিত হইত, তোমার উপাসনা করিতে আমার আনন্দ হইত; কিন্তু, হে জগদীশ! সে সুদিন চলিয়া গিয়াছে। এখন তোমার আরাধনা আমার পক্ষে কেবল ব্রত-পালন হইয়াছে, তোমার কাছে আর সুখ পাই না। কেন আমার এ দুর্দ্দশা হইল? কৃপাময়, এ দুর্দ্দশা দূর কর, এ পাপীর মনে প্রেম সঞ্চার কর। এখানে আর কেহ নাই, হে অন্তরাত্মা, কেবল তুমি আর আমি। আমার মনের দুঃখ দুর্দ্দশা তুমি গোপনে দেখ, মনের কথা গোপনে শ্রবণ কর। আমি সকলের কাছে গুপ্ত কথা বলিতে পারি না। তোমার নিকট এখন একাকী সকল ব্যাপার জানাইলাম, পিতা, আমার কাছে থাকিয়া সকল দুঃখ দূর কর। আমি যে তোমার কাছে বসিতে পারি, হে বিশ্বপতি, এই আমার পরম সৌভাগ্য। এত অধার্ম্মিক অপরাধী হইয়াও তোমার পবিত্র উচ্চ সিংহাসনের নিকটে আসিয়াছি, পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট হইয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি, ইহা অপেক্ষা এ অধমের আর অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? আশীর্ব্বাদ কর, যেন ইহা কখন না ভুলি, এই বহুমূল্য অধিকারের জন্য যেন কৃতজ্ঞ ও প্রণত হই।

পিতা, তোমার নিকটে বসিলেই মনে আনন্দ হয়, তোমার এমনি স্বভাব, এত গুণ। আর কি কথা বলিব, আর কি ভিক্ষা চাহিব? তুমি যদি কেবল এই পামর সন্তানকে নিকটে রাখ, তাহা হইলেই আমার সুখ শান্তি হয় আমার জীবন সার্থক হয়।

আমার মন এত অস্থির কেন, বল, জগদীশ! একবার তোমার পূজা করিয়া হৃদয় পবিত্র ও প্রফুল্ল হয়, আবার তোমাকে ভুলিয়া অবনত ও শোকগ্রস্ত হই। এই কত আশা, আবার তখন নিরাশা। পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। আমি আর আপনার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি কাছে আনিয়াছ, চিরদিনের জন্য, হে নাথ, আমাকে তোমারি করিয়া রাখ। K. C. S.

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৈদিক-পূর্ব্ব-যুগের ধর্ম্ম ইতিহাস আমাদের নাই। বেদ আর্য্য-জাতির প্রাচীন শাস্ত্র, কেবল আর্য্য জাতির কেন, সমগ্র মানব সমাজের ইহা প্রাচীনতম ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর্য্য-পূর্ব্ব-যুগের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বেদ রচিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে মানব-জাতির বসবাস ছিল এবং আর্য্যগণ বাঙ্গালা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এক বা একাধিক প্রাচীন জাতি বাস করিত। তাহাদের লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও, প্রাচীন জনশ্রুতি বা জন-প্রবাদ সেই লিখিত ইতিহাসের স্থান অধিকার করিত।

মানবের ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত হইবার বহু পূর্ব্বে তাহা ভাব-রূপে হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম আদিতে ভাবের মধ্যে স্থিতি করিত। ভাবকে রূপ দিতে গিয়া ভাষার সৃষ্টি হইল। ভাষা ফুটন্ত ফুলের মত ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের আকার গ্রহণ করিল। প্রাচীন ব্রহ্ম-জ্ঞান যাহা ভাবে লুক্কায়িত ছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রে পরিণত হইল। বেদ বেদান্ত প্রাচীনতম শাস্ত্র, ইহাই মানব সমাজের প্রাচীনতম ইতিহাস। বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত আর্য্যজাতির ধর্ম্মের ও সমাজের চিত্র। আর্য্যজাতির এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্ব্বে যে সকল অনার্য্য ও প্রাচীন জাতি এদেশে বাস করিত, তাহাদেরও ইতিহাস ইহাদের অন্তস্তলে নিহিত আছে। তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া বঙ্গদেশের একটী পৃথক ইতিহাস লেখা আমাদের সাধ্য নয়। যে সকল পণ্ডিত প্রাচীন শাস্ত্র সকল গবেষণা করিতেছেন, হয়ত তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও চেষ্টা এদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। তখন হয়ত বাঙ্গালার ইতিহাস অনেক নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিবে। আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের লিখিত ইতিহাস বাঙ্গালায় নাই। বঙ্গের ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে হইলে, ঐতিহাসিক যুগের সময় হইতে তাহা বলিবার চেষ্টা করিলে, সাধারণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়। অনুমান ও জন-

প্রবাদের উপর একমাত্র নির্ভর করিয়া এদেশের ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিলে তাহা চিরদিনই অমীমাংসিত তর্কের বিষয় হইয়া থাকিবে। আমরা সে পথে না গিয়া, যে পথে ইতিহাসের উজ্জ্বল আলোক আমাদের কুজ্ঝটিকা-পূর্ণ দুর্গম পথকে অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়াছে, আমরা সেখান হইতে বাঙ্গালার ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অবশ্য আমাদিগের আলোচনা যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণ আলোচনা হইবে, সে আশা আমরা রাখিনা। তবে এই আলোচনার ভিতর একটী ভাবের ধারা যদি আমরা খুঁজিয়া পাই, যে ধারা বহিয়া বাঙ্গালার ধর্ম্ম যুগে যুগে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে কি মহারত্ন নিহিত আছে যাহার উজ্জ্বল প্রতিভায় বঙ্গের ধর্ম্মাকাশ মধ্যে মধ্যে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কণক কিরণে যুগে যুগে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার সন্ধান যদি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমাদের গম্য পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে।

বৌদ্ধ যুগ বাঙ্গালার বিশেষ ধর্ম্মযুগ। ইতিহাস পাঠে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মদেশ সিংহল চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশ সকল যেমন বৌদ্ধ দেশ বলিয়া বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বঙ্গদেশও একটী বৌদ্ধদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। আর্য্য সভ্যতা বঙ্গদেশের প্রাচীন সভ্যতাকে জয় করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা বহুযুগ বলিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। বাঙ্গালার স্বভাব ভাব-প্রবণ। ভাবের ঘরে আঘাত করিতে পারিলে, নদীর প্লাবন দুকূল ভাসাইয়া যেমন নগর উপনগরকে নিজের বক্ষে ডুবাইয়া রাখে, ভাবে ভরা বাঙ্গালার হৃদয়ও সেইরূপ ভীষণ প্লাবনের ন্যায় সম্মুখের বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া স্বগতিতে প্রবাহিত হয়। আসক্তির একনিষ্ঠ আকর্ষণ, প্রবৃত্তির অদম্য প্রলোভন, স্ত্রীপুত্রের অনতিক্রমণীয় মায়ার টান হৃদয়োন্মাদক প্রবল ভাবের এক আঘাতে ছিন্ন করিতে পারে। শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব সর্ব্বত্যাগের বাহ্যমূর্ত্তি লইয়া যাহা বঙ্গের প্রান্ত ভাগে উদয় হইয়াছিল, শুষ্কব্রহ্মজ্ঞান-প্রণোদিত আর্য্যাবর্ত্তের কঠিন মাটীতে তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারিল না। পাষাণময় বেদান্তের উচ্চ গিরিশিখরে তাহা অধিরোহণ করিতে পারিল না। বেদান্তের লৌহবর্ম্ম উত্তর ভারতকে এরূপ জড়াইয়া ধরিয়া ছিল যে, ভাবের কোমল তরঙ্গ তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, তাহার আশে পাশে যেখানে নিম্ন ভূমি লাভ করিল, সেইখানেই সে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার কোমল মাটীতে ভাবের বীজ রোপিত হওয়াতে সে যথাসময়ে অঙ্কুরিত হইল, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ফলে ফুলে শোভা প্রাপ্ত হইল। বঙ্গদেশ নিজের গৃহের সকল দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া নব-সূর্য্যের নূতন কিরণকে বরণ করিয়া লইল। নির্ব্বাণের মহাভাব প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা আপন স্বভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইল। বসরাই গোলা বাঙ্গালার মাটীতে উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গালার নারিকেল বৃক্ষ আরবের মরুভূমিতে জন্মলাভ করে না। উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে উদ্ভিদ সকল জন্মায় না, সেইরূপ ভাব প্রসারিত হইবার উপযুক্ত মানব-হৃদয় না পাইলে ভাবের বিকাশ হয় না। নির্ব্বাণের পবিত্র কিরণে স্নান করিয়া বঙ্গদেশ জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রাপ্ত হইল, শতদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল। শ্রীবুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-তপস্যা বাঙ্গালার অন্তরে যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, আজও তাহার উত্তাপ বঙ্গের শিরা উপশিরাকে মৃত্যুর শীতলতা হইতে রক্ষা করিতেছে। নির্ব্বাণধর্ম্ম বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করাই নির্ব্বাণ। প্রবৃত্তিই সম্ভোগের মূল হেতু। এই সম্ভোগের মূল বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই বাসনার নিবৃত্তি হইবে। এত শুষ্ক ধর্ম্ম, এই কঠোর শাল্মলি তরু কেমন করিয়া নদী-বহুল বাঙ্গলার কোমল মটীতে উৎপন্ন হইল, তাহা চিন্তার বিষয়। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, যেখানে কঠোরতা আছে, সেই খানেই কোমলতা বিরাজ করে। দৃশ্যমান কত কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া কত নদনদী প্রবাহিত হইয়াছে, কত পাষাণময় হিমালয় হইতে কত পবিত্র ভাগীরথী আপনার শীতল দেহ বিস্তার করিয়া অসংখ্য নরনারীর পিপাসা শান্তি করিয়াছে। এই দৃশ্যমান কঠোর বৈরাগ্যের ভিতর, এই পাষাণ-সম শুষ্ক নির্ব্বাণের ভিতর যে শান্ত-সলিলা গঙ্গা বিরাজ করিতেছিল, বঙ্গদেশ তাহার সন্ধান পাইল, তাহার ভিতর নিজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির জাগরণের স্পর্শ পাইয়া বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইল।

কোমল-সলিলা নদী যখন শৈত্যের স্পর্শলাভ করে, তখন বরফে পরিণত হয়। সেই বরফ বৃহৎ লৌহ-নির্ম্মিত বাষ্পীয় পোতকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে। বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণ হৃদয় বৈরাগ্যের স্পর্শ পাইয়া যখন শক্তিশালী হইল, তখন আসক্তির লৌহ-বর্ম্ম এক আঘাতে চূর্ণ করিল। রাজা একদিনে ফকির হইল, পুত্রবতী নারী পুত্রের স্নেহ ডোর ছিন্ন করিল, গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইল। সহস্র সহস্র বঙ্গনারী বীরাঙ্গনার ন্যায় তিব্বতের তুষার ভেদ করিয়া চীন ও জাপানে প্রচার করিতে ছুটিল, এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশে নূতন সভ্যতার জয়-পতাকা বঙ্গনারী উড্ডীন করিল। বঙ্গদেশ তমলুক ও বিক্রমপুর হইতে বহু বৌদ্ধ পুরোহিত ব্রহ্মদেশে ও তিব্বতে পাঠাইয়া ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রধান লামার আসন গ্রহণ করিয়া সকলের পূজনীয় হইয়াছিলেন; এবং তাহাতে ব্রহ্মদেশের সহিত এদেশের এত ঘনিষ্ঠ যোগ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, ১৩৩০ খৃঃ ব্রহ্মদেশের রাজা বুদ্ধগয়ার জীর্ণসংস্কার করিতে বহু লোক ও অর্থ এদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ যে বৌদ্ধদেশ ছিল, ইহা আমাদের কল্পনা-প্রসূত আখ্যায়িকা নয়। হিউয়ানচ্যাঙ্গ যখন ১২০০ খৃঃ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন বঙ্গদেশ

মুসলমান রাজাদিগের অধীন ছিল ; সে সময়ে বঙ্গদেশে দশ সহস্র বৌদ্ধসঙ্ঘ বর্ত্তমান ছিল এবং একলক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই বৌদ্ধ-সঙ্ঘ, বৌদ্ধ-মঠ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইত। সেই সকল অর্থ যে দেশের বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী জন সমূহ হইতে আসিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। এদেশ যে বৌদ্ধদেশ ছিল, তাহার আর একটী নিশ্চিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। তাহা এই যে, বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা তখন এদেশে বাস করিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা আটশত মাত্র ছিল।

অতএব দেশের অধিকাংশ লোক যে বৌদ্ধ ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আধিপত্য হীন হইয়া আসে এবং ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক অত্যাচারও বৌদ্ধদিগের উপর যথেষ্ট হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মের সাম্যবাদ যখন এদেশে প্রচারিত হইল, তখন দলে দলে বৌদ্ধগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার ইহা যেমন একটী বিশেষ কারণ, সেইরূপ বৌদ্ধ-সংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে যে অধিক ছিল, ইহার দ্বারা তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

নূতন বিধান বলি কেন?

(ভক্তিভাজন প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতার মর্ম্ম লইয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

পৃথিবীর সভ্যদেশে ও সভ্যজাতিতে যেখানে সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে ধর্ম্ম জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই আজকাল স্বাধীন ও উদারভাবে ধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যদি অভাব-বোধ ও অভাব-পরিপূরণের উদ্যমের ফলে পরিবর্ত্তন-সংসাধনের প্রয়োজন-বোধ জন্মে, তবে ধর্ম্মজগতে অদূর ভবিষ্যতে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। লোকের ধারণা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন বহুবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন রক্ষণশীলতা শিথিল হইয়াছে। নূতন বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ ভাবে যোগস্থাপনের জন্য একটা ব্যগ্রতা জাগিয়া উঠিয়াছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টিও জাগ্রত হইয়াছে। বিশ্বজগতের সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ-স্থাপন, বৈজ্ঞানিক নির্দ্ধারণ, জ্ঞান ও বিশ্বাস এবং মত ও অনুষ্ঠানের সহিত নৈতিক সম্বন্ধ-স্থাপন, রুচির ক্রমোন্নতি, শিক্ষার বিস্তার এ সকল হইতেই জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মেই এক নব জাগরণ দেখা যাইতেছে। নূতনভাবে একটা পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মেও ভাবে ও আকাঙ্ক্ষায় আর অনৈক্য বেশী-দিন থাকিতে পারিবে না। একটা প্রবল জ্ঞানস্রোত ও জীবন-স্রোত, শত প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অনৈক্য দূর করিয়া, সকলকে এক করিবার দিকে ছুটিয়াছে। সাম্প্রদায়িক পরিসর বাড়াইবার দিকে, সকলকেই প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিবার জন্য, পৃথিবীতে এক উচ্চতর, পবিত্রতর সভ্যতা স্থাপনের নিমিত্ত, ঐ দেখুন প্রবল জ্ঞানস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মে এখনও এক মহা জীবনীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে এক করিবার মানসে, মনুষ্যত্বকে আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, আরও উদারতা-বিস্তৃতির দিকে, আধ্যাত্মিকতাকে আরও বিকশিত ও বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং বিশ্বাস, সাধনা ও অনুষ্ঠানকে আরও উচ্চতর করিবার মানসে, সর্ব্বত্রই কেমন সেই মহাশক্তির ক্রিয়া অনুভূত হইতেছে। আমাদের এদেশেও, হিন্দুধর্ম্মেও এক নূতন পুনরুত্থান লক্ষিত হইতেছে। আবার সেই ভারতীয় আর্য্যজাতির সেই সকল গুণগ্রাম, যাহাদ্বারা তাঁহারা চির গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা এ যুগের উপযোগী করিয়া ফুটাইবার জন্য এক অদম্য উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন আবার বেদ, বেদান্ত, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব লোকে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া ক্রমাগত খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। গীতায় উক্ত সেই যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের মিলন বা সমন্বয়-সাধনের প্রয়াসী বহু জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে এক অভিনব নবশক্তি জাগ্রত হইয়া, যাবতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনে বর্ত্তমানে ইউরোপ ও এদেশে আবার শত শত ব্যক্তি যত্নশীল হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের সেই উচ্চনীতি, উচ্চভাব, উচ্চপ্রেম সমস্তই আবার পুনরুত্থানের দিকে চলিয়াছে। এমন কি, মুসলমান ধর্ম্মেও এক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। পারস্যে "বাহাই সম্প্রদায়" ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক উদারভাব এবং এক অসাম্প্রদায়িকতার মহামিলনের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। ইদানীং পাঞ্জাবের কাদিয়ান জেলায় এক অভিনব সম্প্রদায় গঠিত হইয়া নিজদিগকে "কাদিয়ানী" সম্প্রদায় নামে ঘোষণা করিতেছেন এবং নূতন-ভাবে নূতন মত, নূতন ভাব ও বিশ্বাস প্রচার করিতেছেন। ইঁহারা খৃষ্ট, মুসা ও মহাপুরুষ মহম্মদকে যেমন পেগাম্বর বলিয়া স্বীকার করেন ও সম্মান প্রদান করেন, বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্য-দেবকেও তেমনি পেগাম্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। দিন দিন যতই জ্ঞানের আলোক বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, ততই মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরেও অভিনব ভাব পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। বীরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কামাল পাশার চেষ্টাতে নব্যতুর্কিতে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া পড়িতেছে। কেবল যে ধর্ম্মেই এক

নব-জীবন, নব-চেতনা, নব-জাগরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নহে; দেহবাদ, জড়বাদ, নাস্তিকতা প্রভৃতিও চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়া এখন পুনরায় আবার বিপরীত মুখে গতি আরম্ভ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে, ঈশ্বর-বিশ্বাস, পূজার্চ্চনা, আত্মজ্ঞান ও পবিত্রতা প্রভৃতির সংমিশ্রণে এক উচ্চতর মনুষ্যত্ব দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে।

এদিকে ভারতে আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম এযুগে এদেশে বিধাতার এক নূতন বিধান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কেননা, ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের এ ধর্ম্ম নিজেরা গড়িয়া তুলেন নাই। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় বা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ইঁহারা বাহ্যদৃষ্টিতে এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বীকৃত হইলেও, আমরা বিশ্বাস করি, যিনি মানবের অভাব বুঝিতে পারেন ও অভাব বুঝিয়াই যিনি তাহা বিদূরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তিনিই এযুগে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠাইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম রাজা রাম মোহন রায়ের নিকটে ও ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের প্রাণে প্রকাশিত হইয়াছে। পীড়িত বা মুমূর্ষুকে যেরূপ ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে, ক্ষুধিতকে যেরূপ অন্ন বিতরিত হইয়া থাকে, দুঃখী দরিদ্রগণকে যেরূপ "দান" বিতরণ করা গিয়া থাকে, তেমনি ভাবে ইহাও এদেশবাসী আমাদিগের দুঃখ, অভাব, বিষাদ ও অবসন্নতা দেখিয়াই স্বর্গ হইতে ধর্ম্মরাজ বিধাতা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা আমাদিগের বুদ্ধি-বিচারের ফলে অথবা চিন্তা ভাবনার জন্য পরিস্ফুটিত হয় নাই। অথবা ইহা আমাদিগের বক্তৃতা, আলোচনা বা আন্দোলনের ফল-স্বরূপও নহে। বিধাতার চিরন্তন বিধি, ব্যবস্থা অনুসারে ইহা প্রেরিত হইয়াছে। সাধনের একাগ্রতা, আধ্যাত্মিক গভীরতা ও ব্যাকুল প্রার্থনার পুরস্কার স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ জন্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম একমাত্র গ্রন্থে আবদ্ধ নহে, ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, ইহা বিধাতার বিধান। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার ৮ই জানুয়ারী, "কেশবচন্দ্রের স্মৃতি-সভাতে" আলবার্ট হলে দাঁড়াইয়া শতশত ব্যক্তির সমীপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিধাতার বিধান, ইহা মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ইঁহারা কেহই ঘোষণা করেন নাই, কিন্তু একমাত্র মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনই এযুগে এধর্ম্মকে জগতে বিধাতার বিধান বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন; এমন কি ইহাকে এক 'নূতন বিধান' বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।" ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মানবজাতির উন্নতির উপকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে অতি সামান্য হইতেই এক এক ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় আরম্ভ সময়ে ইহার কোন আড়ম্বর পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অদ্ভুত-কর্ম্মা বিধাতা ক্রমশঃ ইহার প্রকৃতি-নিহিত শক্তি ফুটাইতে ফুটাইতে ইহাকে এক বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলেন। প্রকৃতি-রাজ্যেও সাধারণতঃ এ ব্যবস্থাই দেখা গিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজও এই ভাবেরই একটী মহৎ প্রতিষ্ঠান (Institution)। যাঁহারা এই ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে রহিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার বিশ্বাসের গভীরতা ও শক্তির প্রাচুর্য্য বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এখন ইহাকে সামান্য মনে করিতে পারেন না। যাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচক, তাঁহারা সংখ্যায় সহস্র সহস্র হইলেও, এবং তাঁহাদের শক্তি ও প্রভাব প্রচুর থাকিলেও, তাঁহারা যত সহজে মনে করিতেছেন, তত সহজে ইহাকে বিদায় দিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ও চতুর্ম্মুখীন কার্য্যাবলী সামান্য ভাবের হউক না কেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ ও প্রচারকগণ এবং এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ উচ্চদরের লোক বলিয়া গৃহীত না হইলেও, প্রথম হইতেই বিধাতার এক অলৌকিক হস্তের ক্রিয়া ইহার প্রত্যেক বিষয়েই পরিলক্ষিত হইতেছে। মাননীয় লর্ড সিংহ, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার জগদীশচন্দ্র বসু, সার পি,সি, রায়, সার কে, জি, গুপ্ত, সার নীলরতন সরকার, সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাহাকে সামান্য মনে করিবার বিষয় নহে। আমাদিগের নেতৃবর্গ ও প্রচারকগণ যাহা যাহা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিধাতার কৃপায় কার্য্যে পরিণত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এখন আর আমাদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, এক সময়ে এ ধর্ম্ম সমস্ত ভারতের ধর্ম্ম হইবে, এমন কি, ভাবে, মতে ও বিশ্বাসে জগতের ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে। বাস্তবিকই যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ব্যগ্র, যাঁহারা পুণ্য ও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষী, যাঁহারা মানবের ভ্রাতৃত্ব ইচ্ছা করেন, মুক্তির জন্য যাঁহারা অনন্ত জীবনের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা একভাবে না একভাবে, এক নামে না হয় ভিন্ন নামে, এই ধর্ম্মের সার সত্য ও মর্ম্ম এবং বিশ্বাস ও জ্ঞান, যাহা প্রেমময় পরমেশ্বর প্রতিনিয়ত ইহার প্রতি বর্ষণ করিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিবেনই করিবেন। বৃথা অসার বাগাড়ম্বর অথবা আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। তবুও আমাদিগের বিশ্বাসের পূর্ণতার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা নিরর্থক মনে করিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কোচবিহারে নবব্রহ্মোৎসব।

শ্রীনববিধানাচার্য্য প্রার্থনায় বলিলেন, "আজ প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতেছি, বিধান পূর্ণ হইল। সুনীতির সঙ্গে সুনীতির আলোক ও পরিত্রাণ কুচবিহারে প্রবেশ করিবে।"

কোচবিহার-নৃপেন্দ্র নৃপেন্দ্র নারায়ণ, রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ, জিতেন্দ্র নারায়ণ, হিতেন্দ্র নারায়ণের দেহাবস্থানকালে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর নববিধান-নিষ্ঠার প্রভাবে, তখন যে বৎসরে বৎসরে মহোৎসব হইত, যখন রাজহস্তীর পৃষ্ঠে নববিধানের নিশান উড়াইয়া, কুমারগণ গৈরিকধারী হইয়া, নগ্নপদে কীর্ত্তন

বাজাইতে বাজাইতে, উন্মত্ত নৃত্য করিতে করিতে, মহাসংকীর্ত্তন-কারী দলের সঙ্গে কোচবিহার পরিভ্রমণ করিতেন, যখন স্বয়ং রাজর্ষি নৃপেন্দ্র নারায়ণ ব্রহ্মমন্দিরের একটি কোণে দীনভাবে উৎসবে যোগদান করিতেন বা সময়ে সময়ে সন্তানদের দীক্ষানুষ্ঠান সময়ে তাঁহাদিগকে আচার্য্যের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া দীক্ষার জন্য উপস্থিত করিতেন, তখন কাহার না মনে হইত, নবভক্ত আচার্য্যদেবের প্রাণের প্রার্থনা প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণ হইয়াছে। রাজপরিবারের সঙ্গে সমগ্র রাজ্যই নববিধান-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

হায়, রাজপরিবারে মৃত্যুর পর মৃত্যুর সংঘটনে, মহারাজ-মাতার শোকের পর শোকাঘাত ও বার্দ্ধক্যবশতঃ দূর দূরান্তে প্রবাস কারণে, বর্ত্তমান মহারাজার নাবালক অবস্থা ও নানা-প্রকার দুর্ঘটনাবশতঃ, সাধারণের ও আমাদের ধর্ম্মোৎসাহের অভাবহেতু, যেন কুচবিহারে নববিধানের দীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিতেছে, বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু আমরা শত অনুপযুক্ত হইলেও, রাজশক্তি এবং মানবীয় উদ্যম খর্ব্ব হইলেও, নববিধান-বিধায়িনী জননী যে কুচবিহার ত্যাগ করেন নাই, পবিত্রাত্মার নববিধানের প্রভাব এবং ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যদেবের আত্মা যে এখনও এই রাজ্যে জীবন্ত রূপে বর্ত্তমান, এবারকার নবব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ইহা সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। যাঁহারা শুষ্কমনে ঔদাস্যভাবে আসিয়া ছিলেন, তাঁহারাও প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাবতরণ উপভোগ না করিয়া গৃহে ফিরেন নাই।

গত ৬ই মাঘ হইতে ১৬ই মাঘ পর্য্যন্ত মার আচার্য্য অলৌকিক কৃপাবিধানে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নবব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।:—

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, শনিবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ দিবসে কেশবাশ্রমে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে মহর্ষির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, রবিবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত উষাকুমার দাস, বি, এ, মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, সোমবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় কেশবাশ্রমের সমাধিপ্রাঙ্গণে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, বি, এল, উকীল মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্দ্রনাথ গুহ, বি, এল, সিভিল এবং সেসন্স্ জজ, মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, বুধবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় কেশবাশ্রমে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত দীনেশানন্দ চক্রবর্ত্তী, সিভিল সার্জ্জন, মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৯ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন; তৎপরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পাঠ ও আলোচনাদি। ৫।॥০ ঘটিকায় কীর্ত্তন; তৎপরে উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, শুক্রবার—প্রাতে ৮ঘটিকায় কেশবাশ্রমে উপাসনা। ল্যান্সডাউন হলে নববিধান-ঘোষণা উপলক্ষে সর্ব্বধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্ররায়, বি, এস, সি, এম, আই, ই, এস, এঃ ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, শনিবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ, মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় কেশবাশ্রমে বালকবালিকা-সম্মিলন।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, রবিবার—প্রাতে ৯ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল খাস্তগীর, রায় বাহাদুর, এম, এ, রেভিনিউ অফিসার, মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা।

১৫ই মাঘ, প্রাতে সমাধি মণ্ডপে উপাসনা। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রায় সারদাচরণ মিত্র বাহাদুর বি, ই ষ্টেট এঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের বাসভবনে উপাসনা।

১৬ই মাঘ, শ্রীকেশবাশ্রমে প্রাতে শান্তিবাচন।

এবার বিশেষভাবে ভাই প্রিয়নাথকে পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রেরিত করিয়া আনিয়া এই মহোৎসব-সম্পাদনে সমর্থ করেন। প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে শতাধিক বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া, উৎসাহে যোগদান ও জলযোগ করিয়া উৎসবানন্দ পরিবর্দ্ধন করেন। প্রত্যেক বাড়ীর গৃহিণীগণ অতি আগ্রহের সহিত কেবল যে উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন, তাহা নহে, অভ্যাগত-দিগকে আদরে জলযোগ করাইয়া, কেহ কেহ বা সমুদয় মিষ্টদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়া, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

১১ই মাঘের উৎসবদিনে সত্যই নববিধানের ঝড় মন্দিরে বহিয়াছিল। নববিধান-ঘোষণার উৎসব ল্যান্সডাউন হলে অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে কয়েকটী সংগীত ও সংকীর্ত্তন রচিত ও গীত হয়। সেবক প্রিয়নাথ সমাগত দুইশত ব্যক্তির কপালে ভাই ফোঁটা দেন এবং আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ রাজপ্রতিনিধি রেভিনিউ অফিসার মিঃ খাস্তগির মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত গোপালচন্দ্র বেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে, পণ্ডিত নিত্যগোপাল পুরাণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে, মৌলবী আমানৎউল্লা খাঁ বাহাদুর মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে, একজন খৃষ্টীয় পাদ্রি দুইজন

সহযোগী সহ খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে এবং ষ্টেটজজ বাবু সতীন্দ্রনাথ গুহ সমন্বয়-ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করেন। সর্ব্বধর্ম্মের মহামিলন কেমনে নববিধানে সংসাধিত, ভাই প্রিয়নাথ তাহা ব্যাখ্যান করিয়া উপসংহার করেন।

১৬ই মাঘ শান্তিবাচনের উপাসনা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক ব্রহ্মানন্দাশ্রমে পুনঃ যাত্রা করেন।

পুস্তক পরিচয়।

সীতাচরিত্র।—শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল স্মৃতিরত্ন, এম, এ, ডি, এল প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বাস্তবিকই আমরা সুখী হইয়াছি। সীতা-চরিত্র আদর্শ নারী-চরিত্র। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে যেমন এই চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁরই অনুগমনে এই চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস বাল্যকালে আমরা কতই আদরের সহিত পাঠ করিতাম। ডাঃ কাঞ্জিলাল মহাশয় অনেকটা তাঁহারই ভাষার অনুকরণে সীতাচরিত্র রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেমন একমাত্র স্বাবলম্বন দ্বারা জ্ঞান-শিক্ষায় এবং কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনে সমুন্নত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা ভাষায় এই সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করিয়াও যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের কন্যাগণ সীতাচরিত্র পাঠ করিয়া সেই আদর্শ চরিত্রে চরিত্রবতী হউন, ইহাই প্রার্থনা।

নির্ম্মাল্য।—"সংস্কৃতবোধিনী" "সন্দর্ভমুকুলম্" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

পুস্তকে লিখিত প্রবন্ধগুলি বেশ গবেষণাপূর্ণ ও সুচিন্তিত। লেখকের সকল মতের সঙ্গে আমাদের মিল না হইলেও, সাধারণ পাঠকবর্গের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় ইহাতে আছে।

সংবাদ।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা চৈত্র ১এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগ্নী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে ১৲ টাকা দান করেন। ৪ঠা চৈত্র পুনঃ এখানে শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেনের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা হয়, ভাই অক্ষয়কুমার উপাসনা করেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ, ৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ, কাশীপুরে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী অনাথ-আশ্রমে ৫৲, আতুর আশ্রমে ৫৲, অন্ধবিদ্যালয়ে ৫৲, কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲, কালাবোবা স্কুলে ৫৲, বাণীভবন বিধবাশ্রমে ৫৲, ও নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৪শে মার্চ্চ, ১১ বি স্কটস্ লেনে, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগীরের মাতৃদেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে যোগেন্দ্রবাবু ১০৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গুড্‌ফ্রাইডে—গত ২৯শে মার্চ্চ, গুড্‌ফ্রাইডে উপলক্ষে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

বসন্তোৎসব—গত ২৫শে মার্চ্চ, বসন্তোৎসব ও শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে, প্রাতে ৮॥টায় উপাসনা হয়, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় নবদেবালয়ের রোয়াকে কীর্ত্তনাদি হয়। ভাই প্রিয়নাথ পাঠ ও প্রার্থনা করেন, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহও একটী প্রার্থনা করেন।

অদ্য শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে, ২৪।১এ হরিশ মুখার্জির রোডে, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময়, কমলকুটিরের নবদেবালয়ে, ৭৮।বি অপার সারকুলার রোডে, স্বর্গীয় সত্যভূষণ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া প্রমীলা দেবীর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান এক-মাত্র কন্যা শ্রীমতী অমিতা চাটার্জি ও একমাত্র বংশধর (ভাসুরপুত্র) শ্রীমান্ সুশোভন গুপ্ত কর্ত্তৃক গম্ভীর ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মঙ্গলপাড়ার বড়ীস্থিত সমাধিতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পবিত্র ভস্ম স্থাপন করেন। তৎপর উপাসনা আরম্ভ হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠাদি করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠান্তে নিজেও একটি সুন্দর প্রার্থনা করেন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ সমস্বরে শ্লোকপাঠান্তে শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। শ্রীমান্ সুশোভন গুপ্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এইরূপে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন

হইয়াছে। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই পবিত্রানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের আদিমযুগে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য গৃহপরিবার ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়-নিশান হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে দৃশ্যমান জগৎ হইতে অদৃশ্যলোকে চলিয়া যাইতেছেন। স্বর্গীয় গুরুচরণ মহালানবিশের পত্নী, প্রায় শতবর্ষীয়া বৃদ্ধা, মণ্ডলীর বয়োজ্যেষ্ঠা, ব্রাহ্মসাধারণের মাতৃস্থানীয়া পূজনীয়া রুক্মিণী দেবী গত ১৯শে মার্চ্চ, নশ্বরলোক হইতে অমরলোকে অমর দলে মিলিত হইয়াছেন। ১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ্চ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য উপাসনার কার্য্য করেন। আমরা শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে অনন্তশান্তিধামে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তজনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ—শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ ঘোষের পৌত্রীর নামকরণ উপলক্ষে, গত ৩০শে মার্চ্চ, শনিবার, ১৭বি, বিপ্রদাস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। নিমাই বাবু পৌত্রীটিকে কোলে লইয়া একটী সময়োপযোগী মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানটী নিরবচ্ছিন্ন সুখের অনুষ্ঠান ছিল না। সুখ দুঃখে, আলো আঁধারে, হর্ষ বিষাদে মিশান ছিল। কন্যার পিতা, নিমাই বাবুর এক মাত্র পুত্র, শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ, ইহাকে কয়েক দিনের শিশু মাত্র রাখিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মনে হয়, বিধাতা জেনে শুনেই, পরিবারের সান্ত্বনার জন্য এই শিশুটীকে পাঠাইয়া, ইহার পিতাকে অকালে আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন; দারুণ শোক-ব্যথার উপশম হেতু এই অমৃত-কণাটুকু দান করিলেন। শিশু "সুমিত্রা" নাম লাভ করিয়া, প্রথম মানব-মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদ এই শিশুটীর উপর বর্ষিত হউক। এই অনুষ্ঠানে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

বারিপদার সংবাদ—বারিপদা হইতে ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—

গত বৎসরের ন্যায় ৯ই মার্চ্চ শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষভাবে কার্য্যাদি হইল। সন্ধ্যা ৭টা হইতে সমস্তরাত্রি উপবাসে জাগ্রত থাকিয়া যোগ সাধন করা হইল। বালেশ্বর হইতে গোবিন্দ দল সহ আসিয়াছিলেন। প্রথমে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। তারপর সেবকের নিবেদন হইতে "উদাসীন ব্রহ্ম" পাঠ ও প্রার্থনাদি করা হয়। গভীর রাত্রিতে ব্রহ্মগীতোপনিষৎ হইতে যোগতত্ত্ব পাঠ ও ধ্যান করা হয়। সময়োপযোগী সংগীতাদি মধ্যে মধ্যে চলিয়াছিল। অনেক গুলি নরনারী সমস্ত রাত্রি যোগদান করিয়াছিলেন।

১৫ই মার্চ্চ, বারিপদা পূর্ণচন্দ্রপুর পাঠশালায় (অস্পৃশ্য শ্রেণীর) সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রজমোহন বেহারার গৃহে (যেখান উক্ত গৃহস্থ স্কুল করিবার জন্য উপস্থিত ব্যবহার করিতে দিয়াছে) বিশেষ দিন স্মরণে উপাসনা আমি করি, হরিমোহন প্রার্থনা করেন, উপাসনান্তে বালকদিগকে মিষ্টি-মুখ করান হয়। উক্তস্থানে একটী বালিকা-স্কুলও স্থাপন করার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, কি প্রকারে তাহা হইবে, জানি না। সম্পূর্ণ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। স্কুল প্রায় এক বৎসর চলিল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। কেমন কৌশলে নববিধানের জননী সব সম্পন্ন করছেন, তাহা ভাবিলে আমাদের সকল জল্পনা কল্পনা চূর্ণ হয়ে যায়।

মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনাদি খুব জমাটভাবে হইতেছে। অন্য প্রকারে আরো কার্য্যও সাধ্যমত করা যাইতেছে। বালিকাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা ছাড়া ইংরাজী পড়ানও হয়। বালকদিগের জন্য শনিবার নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি হয়।

এখানে জলের কল ও Electric light হইতেছে। Free পাইবার জন্য মহারাজা বাহাদুরকে apply করেছিলাম, কিন্তু তিনি দিতে পারেন নাই। কেবল জলের কলের connectionটি free দিয়েছেন, কিন্তু জলের tax দিতে হবে। আলোর সব খরচই আমাদের দিতে হবে। আলোর কত খরচ পড়িবে, তাহার একটী Estimate দেবার জন্য State Engineerকে অনুরোধ করেছি।

ভ্রম-সংশোধন ঃ—১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে ভাগলপুরের উৎসবের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর বিবরণে যাহা ভুল হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল ঃ—

২৬শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায় ডাক্তার সুকুমার মিত্রের গৃহে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায় স্বর্গীয় সাধক হরিসুন্দর বসুর গৃহে শান্তিবাচন হয়।

শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি।

বঙ্গানুবাদসহ সটীক খণ্ডাকারে প্রকাশিত। তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ১।০। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪৲। প্রাপ্তিস্থান:—ঢাকা, ৩৫ নং বিধান পল্লী, পোঃ আঃ রমণা। কলিকাতা—৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"অপরোক্ষ ভগবদ্দর্শনে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির বিরোধ মীমাংসা করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত হইয়াছে। সমান্তর ভাবাপন্ন সাধকদিগের অন্তরে নিরন্তর ক্রমান্বয়ে যে সকল ভাবের অনুভূতি হইয়া থাকে, তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রীমদ্গীতাতে বিবৃত হয়

নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে হইয়াছে। শ্রীমদ্গীতাতে যাহা সূত্রাকারে আছে, তাহাই ভাগবতে পরিস্ফুটাকারে পাওয়া যায়। গীতা এবং ভাগবতের এই সম্বন্ধ অদ্যাবধি কাহারও দৃষ্টিগোচরে আসে নাই। এই অভাব মোচনার্থ এই শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল।"

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
উপাধ্যায়।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সমগ্র গ্রন্থ একখণ্ড গ্রহণ করিলে, এই শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি প্রচারের সহায়তা হইবে। ইতি—

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

—০—

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা বিনীত ও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, ১৯২৯ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে, ধর্ম্মতত্ত্বের নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি ও দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

জানুয়ারী :—কুচবিহার—প্রিন্সিপাল মনোরথ ধন দে ৬৲; গ্রাম আমতা (ঢাকা)—শ্রীযুক্ত চক্রধর সাহা ৩৲; ফরিদপুর—রায় সাহেব রাজেন্দ্র কিশোর গুপ্ত ৫৲; কটক—শ্রীমতী আশালতা দেবী ৩৲; রাঁচি—রায় সাহেব উপেন্দ্র নাথ দে ৬৲; কুমিল্লা—অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত ৪৲; গরিফা (২৪ পরগণা)—রায় সাহেব বলরাম সেন ৩৲; হাওড়া—শ্রীমতী বিনোদিনী দাস ২৲; জামসেদপুর—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার গুহ রায় ২৲; বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)—শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সিংহ ৩৲; কলিকাতা—মিসেস সুষমা ব্যানার্জ্জি ৩৲, ডাঃ উপেন্দ্র নাথ বসু ৩৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২॥০; ভাগলপুর—শ্রীমতী গুনীতিবালা ঘোষ বিশেষ দান ১৲।

ফেব্রুয়ারী :—হাওড়া—ডাঃ বিহারি লাল ঘোষ ৩৲, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রসাদ বসু ৩৲; দিনাজপুর—শ্রীযুক্ত চৈতন্য চরণ দত্ত ৩৲; এলাহাবাদ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৩৲; হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট)—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত ৬৲; মজফরপুর—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ৩৲; বর্হি (মুঙ্গের)—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দ ৩৲; কলিকাতা—স্বর্গীয় হরলাল সাহা ২॥০, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকার ২॥০, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার ১৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন স্বামীর সাম্বৎসরিকে বিশেষ দান ২৲।

ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য যাঁহাদের নিকট এখনও বাকী আছে, দয়া করিয়া তাঁহারা টাকাটা পাঠাইয়া দেন, এই আমাদের সানুনয় নিবেদন। অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে ধর্ম্মতত্ত্বের সাহায্যার্থ বিশেষ দান ভিক্ষা করি।

বিনীত—শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

নববর্ষোৎসব।

আগামী, ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল, রবিবার, নববর্ষ আরম্ভ হইবে। এই বর্ষেই ব্রাহ্ম-সমাজের শতবর্ষ ও নববিধানের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইবে। এই দিনে নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজ-পতি শ্রীমন্মহর্ষিদেব কর্ত্তৃক আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। এই দিনে নববিধানাচার্য্য-পত্নী পতির ধর্ম্মানুগমনার্থ স্বামীসহ সংসারগৃহ হইতে বর্জ্জিতা হন। এই দিনে নববিধানের প্রেরিতগণকে চারিটী বিশেষ সাধনব্রত প্রদত্ত হয়। সুতরাং এই দিনে নববিধান-বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনী, প্রেরিত প্রচারক, সাধক ও সাধিকাগণের বিশেষ বিশেষ ব্রত-গ্রহণের দিন। এই দিনে নবদেবালয়ে (৭৮ বি অপার সার্কুলার রোডে) প্রাতে ৮॥টায় উপাসনাদি হইবে। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী মহোদয়া উপাসনা করিবেন। সপরিবারে ও সবান্ধবে সকলের শুভ-সম্মিলন ও সমযোগ একান্ত প্রার্থনীয়।

নিবেদন।

আগামী ১৩৩৬ সালের ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ এবং ১২ই মাঘ নববিধান-ঘোষণার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইবে। এখন হইতেই শতবার্ষিক উৎসব ও জুবিলী উৎসবের প্রস্তুতি সাধন জন্য মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই নানা ভাবের অনুষ্ঠানের আয়োজন বাঞ্ছনীয়। আমি এ উপলক্ষে স্থানে স্থানে প্রয়োজনানুসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমবিশ্বাসিগণের সেবা করিতে প্রস্তুত আছি। যাঁহারা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলোকের সেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে, নববিধান প্রচার-কার্য্যালয়ে জানাইলে, আমি তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে যাইতে প্রস্তুত হইতে পারিব।

নিবেদক—
শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—•—

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২৯শে চৈত্র, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং, ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 14th April, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে নববিধান-প্রবর্ত্তক লীলাময় শ্রীহরি! তোমার এই নবযুগধর্ম্ম নববিধানকে তুমি পুণ্য-ভূমি ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিলে। তোমার নববিধান-বাহক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "যখন আমাদিগের নববিধান-বৃক্ষ ভারতভূমিতে রোপিত,তখন এই বৃক্ষ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয় থাকিবে, এবং হিন্দু-বৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হইবে।" "ঈশ্বর হিন্দু-মাটীতে ও হিন্দু-রক্ত লইয়া, এই নববিধান গঠন করিয়াছেন; কাহার সাধ্য ইহাকে হিন্দুভাব বিহীন করে? ঈশ্বর এই নববিধানকে আরও হিন্দুভাবে শোভিত করিবেন, এবং ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন সমুদয় রত্ন পুনরুদ্ধার করিবেন।" হে পরম দেবতা! যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন সমুদয় রত্ন পুনরুদ্ধার করিয়া, হিন্দুভাবে তোমার নববিধানকে শোভিত করা, এবং আমাদের আত্মিক জীবনকে তদ্দ্বারা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট, সরস, সুন্দর করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে এ সময়ে আমাদের প্রাণকে হিন্দুজাতির স্বর্গীয় সাত্ত্বিকভাবে উদ্বুদ্ধ কর, পূর্ণ কর। সম্মুখে নব বর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ মাস, স্বর্গের পুণ্য-সম্ভার লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। হিন্দুজাতি এই বৈশাখ মাসকে পুণ্য-মাস বলিয়া গ্রহণ করেন, আদর করেন। বৈশাখের প্রখর সূর্য্যোত্তাপ, ভারতের অগণ্য অসংখ্য নর-নারীর প্রাণে পুণ্যোত্তাপ দান করিয়া, নিদ্রিত সাত্ত্বিকভাবকে জাগাইয়া তোলে; তাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চ সাধন-পথে সিদ্ধি-কামনায় কত নব নব ব্রত নিয়ম এ সময় গ্রহণ করেন। ভক্ত কেশব চন্দ্রও তাঁহার পৃথিবীর জীবনের শেষ নব-বর্ষের বৈশাখ মাসে প্রেরিত প্রচারকদিগের গ্রহণ ও পালনের জন্য, চারিটী ব্রত-বিধি প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক পুরাতন বর্ষের অবসানে,আবার নববর্ষ স্বর্গের নূতন ধন-রত্নের ডালি সাজাইয়া,স্বর্গের কত শুভ সংবাদে পূর্ণ হইয়া, কত আশা ভরসা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে, এবারও উপস্থিত। তোমার সেই সকল পুত্রকন্যারাই ধন্য,যাঁহারা সমস্ত বৎসরে স্বর্গের যে সকল অমূল্য ধনরত্ন জীবনে সঞ্চয় করিবেন এবং যদ্দ্বারা আত্মিক জীবন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন, সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ-কামনায় নব বর্ষের প্রথম মাস বৈশাখের বিশেষ পুণ্য দিনে, বিশেষ বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিবেন। হে অন্তর্যামিন্! তুমি দেখিতেছ, আমরা বর্ত্তমানে কেমন সাধন-বিমুখ, ভজন-বিমুখ; আমাদের হৃদয় মন কত শুষ্ক। যে জীবনে নব-নব সাধনার উচ্ছ্বাস নাই, সে জীবনে নব নব ব্রত-গ্রহণের প্রয়োজন-বোধ ও গ্রহণ জন্য ব্যগ্রতা কিরূপে সম্ভবে? হে আমাদের ভাগ্য-বিধাতা! যখন তুমি আমাদিগকে আর্য্যসন্তান করিয়াছ, এবং ভারতের জাতীয় বিধান, হিন্দুভাব-প্রধান

নববিধানে দীক্ষিত করিয়াছ, নববিধানের বিচিত্র আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সাধনে ব্রতধারী করিয়াছ, তখন প্রকৃতির উচ্ছ্বাসময় পুণ্য বৈশাখের দিব্য স্পর্শে আমাদের প্রাণে আর্য্য-রক্ত জাগাইয়া, তোমার অযাচিত কৃপাগুণে আমাদের প্রাণকে জীবনের উপযোগী নব-নব সাধনার ভাবে উদ্বুদ্ধ কর, এবং সেই সাধনার সিদ্ধির পথে আমাদিগকে নব-নব ব্রত-গ্রহণে প্রবর্ত্তনা দিয়া, ব্রতধারী করিয়া ধন্য কর, তোমার শ্রীপদে এই বিনীত প্রার্থনা।

নববর্ষাভিবাদন।

নূতন বরষে, নূতন হরষে,
নূতন বিধানে পূজি মায় ভাই ;
নবশিশু সনে, মিলে প্রাণে মনে,
নূতন জীবনে ব্রহ্মানন্দ পাই।

মা নববর্ষবিধায়িনি জননি, যদি আজ আর একটি নূতন বৎসর আনিয়া দিলে, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দসনে প্রার্থনা করি, "হে রাজাধিরাজ, নববর্ষের আরম্ভটা অমান যাইতে দিওনা। পুরাতন পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া নববর্ষে নূতন কাজ আরম্ভ করি। তোমার রাজ্যে কি কি নূতন কাজ করিব,ঠিক করিয়া ব্যবস্থা করিয়া লই। পুরাতন বৎসরের সম্পর্ক আর থাকবে না, তাহার জঞ্জাল আর সঙ্গে লইবনা। সব ঠিক করিয়া আনন্দে নূতন বৎসরে প্রবেশ করিব। নরনারী তোমার নূতন বিধানের পথে চলিবে। যাহার যাহা করিবার থাকে, করিয়া লই।" মা, এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর। নববর্ষ দিনে নববিধানের নূতন জীবন-দানে আমাদিগকে কৃতার্থ কর। নিত্য নব নব ভাবে তোমার পূজা করি, নব নব ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করি এবং নব নব জীবনের পথে সমুন্নত হইয়া তোমার নববিধানকে গৌরবান্বিত ও প্রমাণিত করি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববর্ষ।

নব বর্ষ করুণাময় ঈশ্বরের কি প্রকাণ্ড দান! সম্মুখে নূতন বর্ষ স্বর্গের সংসাজে সজ্জিত হইয়া, নবজীবনের, দেব জীবনের, অনন্ত জীবনের কত সম্ভার, সামগ্রী বক্ষে লইয়া কত আশা উৎসাহের বেদবাণীতে পূর্ণ হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমরা কি কৃতজ্ঞহৃদয়ে, প্রেমময়ের এই অযাচিত স্নেহের দানকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার চরণে এই দানের জন্য প্রণত হইব না? সময় কি অমূল্য সামগ্রী। এই সময়ের সদ্ব্যবহারের ভিতর দিয়াই তো আমাদের অমর জীবনের বিকাশ, প্রকাশ ও সম্ভোগ। এই সময়ের সদ্ব্যবহারের ভিতর দিয়া পূজা, বন্দনা, পাঠ, প্রসঙ্গ যোগে আমরা কতরূপে, সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় দেবতা যিনি, তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হই, তাঁহাকে স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, সখা, সুহৃদরূপে পাইয়া কত ধন্য হই। তাঁহার স্নেহ করুণার ভিতর দিয়া, ইহলোকে কত সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করি, পরলোকের জন্য কত অমূল্য ধন সঞ্চয় করি। অখণ্ড অনন্ত সময়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া মাস, ঋতু, বৎসররূপে আমাদেরই কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে স্বয়ং বিধাতা বিভাগ করিয়া প্রেরণ করেন।

সংসারে পুত্রকন্যাগণ বুঝিয়া, না বুঝিয়া, কত সময়, কত ভাবে পিতামাতার নিকট অপরাধ করে, তথাপি স্নেহ-প্রবণ পিতামাতা সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া, যে সময়ের যেরূপ সুখদ সামগ্রী,অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি সন্তানকে যোগাইয়া, আপনার অযাচিত স্নেহ করুণার সাক্ষ্যদান করেন। তেমনই আমরা অল্পবুদ্ধি বশতঃ, অশিক্ষা, কুশিক্ষা বশতঃ, সময়ের কত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকি; তাহা সত্ত্বেও আমাদের পরম-পিতা পরমেশ্বর, পরম-জননী আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহার শ্রীহস্তের নবনব দান লইয়া, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। আমাদের নানা ত্রুটী অপরাধ সত্ত্বেও, আমরা পুরাতন বৎসরে কত রূপে, কত আকারে তাঁহার কৃপালাভ করিলাম। তিনি যেমন বাহিরে খাওয়া পরা যোগাইলেন, তেমনই প্রচুর আত্মিক সামগ্রী আমাদিগের গ্রহণ করিতে দিয়া আত্মিক জীবনকে কত পোষণ করিলেন, পালন করিলেন। মানুষ আমাদিগকে অস্বীকার করিল, তিনি আমাদিগকে স্বীকার করিলেন; মানুষ কত রূপে প্রাণে আঘাত করিল, তিনি সান্ত্বনা, শান্তি, আরাম, বল দান করিলেন। মানুষ কতভাবে নিরাশা, নিরুৎসাহের কুজ্ঝটিকা দ্বারা আমাদের জীবনকে আবৃত করিল, আমাদের গমন-পথ রোধ করিল, তিনি আপনার কৃপা-পবনে সে কুজ্ঝটিকা বিদূরিত করিলেন, আশা বিশ্বাসের দিব্যালোকে আলোকিত করিয়া, আমাদিগকে গন্তব্য

পথে হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন, আশা উৎসাহে, বল শক্তিতে আমাদের জীবন পূর্ণ করিয়া কত স্নেহ করুণার সাক্ষ্য দান করিলেন। তাই তো আমরা তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত পুরাতন বৎসরের স্নেহ করুণা স্মরণ করিয়া, আমাদের জীবনের নানা ত্রুটী সত্ত্বেও, তাঁহার এই নূতন স্বর্গের দান নব বৎসরকে নূতন আশা, উৎসাহ, বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছি। অনেক নূতন বৎসর আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমাদের সম্মুখের এই নূতন বৎসর বিশেষ বৎসর। এ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসবের বৎসর এবং নববিধান-ঘোষণার জুবিলী উৎসবের বৎসর। এ বৎসর আত্মিক জগতে ব্যাপক কারবারের বৎসর, অনেক আমদানি ও অনেক রপ্তানির বৎসর। এ বৎসরের প্রথম মাসে নূতন করিয়া বিশেষ কারবারের খাতা খুলিবার বৎসর। যাহারা বিষয়-রাজ্যে ব্যবসায় করে, তাহারা অনেকেই পুণ্যমাস বৈশাখের বিশেষ বিশেষ পুণ্যদিনে, শুভদিনে নূতন খাতা খোলে। নূতন খাতার ভিতরে শুধু নূতন টাট্‌কা ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিবরণ বা হিসাব লেখা হয় না; নূতন নামে যে কারবার খোলা হয়, নূতন খাতায় শুধু সে নামের হিসাব খোলা হয় না; পুরাতন বৎসরের খাতা হইতে পুরাতন নামের দেনা পাওনার হিসাবও নূতন খাতায় তুলিয়া লওয়া হয়। পুরাতনের নূতন করিয়া গঠন দিয়া, পুরাতন-কেও নূতন সাজে সজ্জিত করিয়া, যতটা সম্ভব পুরাতনকে নূতনের শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়া, কারবারের প্রশস্ততা, স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতির আকারকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতে হয়। নূতন এবং পুরাতন মিলিয়া একটা অখণ্ড আকার ধারণ করে, এবং এই আকার মধ্যে নব বৎসরের নূতন কার-বারের নূতন জীবনীশক্তি প্রবেশ করিয়া, সমস্ত কারবার-দেহকে জীবন্ত প্রাণময়, শক্তিময় করিয়া তোলে। বাহিরের বিষয়-রাজ্যে যেমন, অন্তর-রাজ্যে, আধ্যাত্মিক কারবার ক্ষেত্রে এ নিয়মের অন্যথা হয় না। নববিধানে জীবন্ত জাগ্রত নিত্য ক্রিয়াশীল, নিত্য-লীলাময় দেবতার পরি-চালনে আমাদের আত্মিক জীবনের কারবার। তিনি তাঁহার আশ্রিতজনকে যেমন নূতন বৎসরের নূতন পাঠ দেন, আবার অতীতের পুরাণ পাঠ, পুরাতন পড়াকে নূতন করিয়া পড়িতে দিয়া, পুরাতনকে নূতনে পরিণত করিয়া, তাহারই পরিপক্ক ভিত্তির উপর নব-বৎসরের আত্মিক জীবনের নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত করেন; অথবা পুরাতনে নূতনে মিলাইয়া, সকলের মধ্যে নূতন সঞ্জীবনী-শক্তি প্রবহমানা করিয়া, নবজীবনের জীবন্ত একটা অখণ্ড আকার দান করেন।

এবার নববিধান-ক্ষেত্রে শত-বার্ষিক উৎসব, এবং তৎসঙ্গে নববিধান-ঘোষণার জুবিলী উৎসব। এবার নববিধান-মণ্ডলীতে বিশেষ করিয়া নূতন খাতা খুলিবার সময়। সমস্ত অতীতকে এ সময় জীবনের হিসাবে নূতন করিয়া তুলিতে হবে, পবিত্রাত্মার সঞ্জীবনী-শক্তিতে অতীতকে বর্ত্তমানের সঙ্গে সঞ্জীবিত করিয়া, একাকার করিয়া, একটা অখণ্ড বিধানের বিরাটমূর্ত্তি আপনার জীব-নের ভিতরে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতে হবে। তাঁহার স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে আপনাকে পূর্ণ করিয়া, আপ-নার জীবন-ভাণ্ডার হইতে আপনি মধু-পান, অমৃত-পান করতে হবে, অন্যকে দান করতে হবে, আবার অন্য হইতে গ্রহণ করতে হবে। আমদানী রপ্তানী, আদান প্রদান, ইহা লইয়াই শত-বার্ষিক উৎসব, ইহা লইয়াই পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব। এবার দেখাইতে হবে, "নববিধানে হল রে ভাই প্রকাণ্ড ব্যাপার। এত নহে মানুষের কারবার। খুলে দিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ড-পতি অনন্ত ধন ভাণ্ডার। বাহির হয়েছে খনি, বড় বড় চিন্তামণি, কেনা বেচা করে যত সাধু সওদা-গর; কত জগৎজোড়া ভাবের মাণিক রয়েছে পর্ব্বতাকার। নব নব তত্ত্ব-রত্ন, হীরা মতি মুক্তা স্বর্ণ, ছড়াছড়ি যায় হাজার হাজার; যে যত পার লওহে লুটে, গিয়ে আনন্দের বাজার। এ সংসারের বাজারে, কেবা তা চিনতে পারে, কিনিতে নারে মুদি ভুষির দোকানদার; তারা দর শুনে ভয় পেয়ে, আসা যাওয়া কচ্ছে বারেবার। শাক্য, ঈশা, চৈতন্য, যত সব মহাজন, বসেছেন সাজায়ে বাজার; আম-দানি দেখে অবাক হয়ে গেছে প্রেমদাস এবার।"

সত্যই নববিধান-ক্ষেত্রে শত বার্ষিক উৎসব ও পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব স্বর্গের প্রকাণ্ড ব্যাপার। এই নববর্ষে নব-বিধান-বিশ্বাসি-বিশ্বাসিনী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার পক্ষে সেই স্বর্গের মহা ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত হইবার সময়; এবং এই নব বর্ষের প্রথম মাস পুণ্য বৈশাখ সেই প্রস্তুতির অনুকূলে ব্রত-ধারণ, সঙ্কল্প-গ্রহণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল কাল। পবিত্রাত্মা এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

উপাসনা সম্পাদন ও উপাসনায় যোগদান।

নববিধানের উপাসনা মানবীয় সাধ্য সাধনা নয়। পবিত্রাত্মার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় যে উপাসনা সম্পাদিত হয়, তাহাই নববিধানের উপাসনা, তাহাতে মানুষের হাত নাই। আবার যাঁহারা উপাসনায় যোগদান করেন, তাঁহারাও যদি তাঁহাতে পবিত্রাত্মার প্রেরণা অনুভব না করেন, তাঁহাদেরও যোগানুভব হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনে ভাব খুলিত না, যদি সেখানে কোন পাষণ্ড থাকিত। উপাসনাতেও তেমনি ভাব খোলে না, যদি না ভাবের ভাবুক ভক্তিভাবে তাহাতে যোগদান করেন। সংশয়, বিচারবুদ্ধির ভাব বা চঞ্চলচিত্ততা, যেখানে, উপাসনার ভাব কই খোলে সেখানে। পবিত্রাত্মার জীবন্ত আবির্ভাব যেখানে, নববিধানের উপাসনা সেখানেই হয়।

—:•:—

দীনতা ও হীনতা।

দীনতা স্বর্গের সোপানে উন্নীত করে,হীনতা মানবাত্মাকে নিম্নগামী করে। দীনতা মানবের অহং চূর্ণ করে, হীনতা মানবের আত্মমর্য্যাদা খর্ব্ব করে। দীনাত্মাকে ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহারই। হীনাত্মাকে ধিক্, কারণ সে মানবের মহত্ত্ব হারাইয়া ফেলে। অতএব দীন হও, হীন হইও না। দীন ভিখারী হইয়া স্বর্গীয় ভিক্ষান্ন ভোজনে পরিপুষ্ট হও। হীন ভিখারী হইয়া উদরান্নের জন্য লালায়িত হইও না।

—•—

পরিবার ও দলের মিলন।

নববিধান মিলনের বিধান। দেশের মিলন, জাতির মিলন জগতের সকল সম্প্রদায়ের মিলন সম্পাদন করিতেই নববিধান সমাগত। বিশেষভাবে পরিবার ও দলের মিলন সর্ব্বাগ্রে আকাজ্ক্ষণীয়। তাই নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "আমার পরিবারটী ও দলটী যদি ভাল হয়, তবে পৃথিবী বলিবে, নববিধান ঠিক।" বাস্তবিক, পরিবার ও দল নববিধানের সাক্ষী হইলেই নববিধান প্রমাণিত হইবে। বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে আচার্য্য-পত্নী সতী জগন্মোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন এবং নববিধান প্রেরিত-দলের উপাধ্যায় শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়ের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন একই দিনে পড়িয়াছে। আচার্য্যপত্নী পরিবারের প্রতিনিধিরূপে আচার্য্য সঙ্গে যেমন শারীরিকভাবে উদ্বাহিত, তেমনি আধ্যাত্মিক উদ্বাহে উদ্বাহিত হন এবং আচার্য্যের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিকভাবেও একাত্মতা লাভ করেন এবং দুজনে একজন হন। ইহা স্বয়ং আচার্য্যদেবও স্বীকার করিয়াছেন। তেমনি নববিধানদলের উপাধ্যায় মহাশয়ও সেই সতীদেবীর স্বর্গারোহণ দিনে স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহার সহিত অধ্যাত্মরাজ্যে একত্ব লাভ করিলেন। এই ভাবে আচার্য্যের সহিত একত্বে বা একাত্মতাতে যথার্থ পরিবার ও দলের মিলন।

—:•:—

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম একদিকে যেমন ভারতে ও ভারতের বাহিরে নূতন সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, অপর দিকে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। নলন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক বাঙ্গালী ছিলেন। বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন শুভঙ্কর গুপ্ত, ইনি বাঙ্গালী। ইনিই মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গের প্রতিভা জীবনের সকল দিক দিয়া বৌদ্ধযুগে বিকীর্ণ হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের অবসান কালে সাধকদিগের মধ্যে ভিতরের ভাব যেমন ম্লান হইতে লাগিল, বাহ্যিক আচার সেইরূপ ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। প্রাণ-হীন আচার বহুদিন সমাজে রাজত্ব করিতে পারে না। নিম্নভাবের সাধকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। নানা উপধর্ম্ম, আখ্যায়িকা ও বাহ্য আচার সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। হৃদয় মন শুষ্ক হইয়া গেল। এই শুষ্কতা নিবারণ করিবার জন্য বৌদ্ধ সাধকগণের নিজ নিজ আলোক অনুসারে এবং সমাজের তৎকালীন ভাবের উপযোগী করিয়া ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ের ভিতর, নূতন সাধনতন্ত্রে ফুটিয়া উঠিল। মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি অষ্টাদশ বৃহৎ সম্প্রদায় ও বহু উপসম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া, নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের নামে উপধর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত হইল। এই উপধর্ম্মের সাধকদিগের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ-ভাবের সাধনায় নিযুক্ত হইল। একটী নাথমার্গ, অথবা যোগমার্গ। বুদ্ধদেব যে যোগের পথ দেখাইয়া ছিলেন, অথবা পাতঞ্জলি যে যোগ শাস্ত্র-নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাহা হইতে নিকৃষ্ট। প্রাণ-বায়ুকে মনের অধীন করিয়া অনেক অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় এবং মানব ইচ্ছামত সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, নাথমার্গে তাহা লিপিবদ্ধ করা আছে। নাথ সাধকগণ নেপালে গিয়া তাঁহাদের যোগধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং নেপালে গিয়া বাঙ্গালার সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার করিয়া সেখানে গুরুর স্থান অধিকার করেন। আজ নেপালে পশুপতিনাথ ও গোরক্ষনাথের যে শিবমন্দির দেখা যায় এবং নেপালীগণ প্রতিদিন পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করেন, এবং বৎসরান্তে মহোৎসব করিয়া ভারতের শৈবসাধকদিগকে আহ্বান

করেন, তাহা বঙ্গদেশের নাথ যোগীদিগের স্মৃতি-রক্ষার জন্য। আজ তাঁহারা নেপালে দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর নিষ্ঠুর দেশাচারের অত্যাচারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধযোগিগণ আজ অস্পৃশ্য যুগী নামে বঙ্গদেশে অভিহিত হইতেছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের আর একটী উপধর্ম্ম সহজিয়া সম্প্রদায়। ইঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের শীল, ব্রত, আচার, রিপুসংযম, ধ্যান প্রভৃতি সাধন ও সদাচারকে অস্বীকার করিয়া, শারীরিক সুখভোগকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ করিয়া লইলেন। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন, আত্মা নিত্যসিদ্ধ, অতএব শারীরিক বা মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার পাপ, অসংযম ও দুর্নীতি আত্মাকে মলিন করিতে পারে না। দেহতত্ত্ব-সাধনই তাঁহাদিগের পরম সাধন। দেহের ভিতরই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করিতেছে। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রভূত আধিপত্য দেখা যায়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে বাউলিয়া সম্প্রদায় দেখাযায়, তাহাদিগের সহিত সহজিয়া সম্প্রদায়ের যথেষ্ট একতা আছে। একটা ভাবের ধারা সংগীত-সাধনার ভিতর দিয়া, সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া, বঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা কৃষ্ণাচার্য্য। ইনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই যে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিব্বতবাসীরা এখন পর্য্যন্ত কৃষ্ণাচার্য্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর সাধনায় নরনারীর অন্তর যখন পাষাণের মত শুষ্ক হইয়া উঠে, তখনই বঙ্গে সহজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপের পর যেমন শ্রাবণের ধারার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্ক পাষাণ ভেদ করিয়া সহজিয়া ধর্ম্মের ভাবের ধারা বঙ্গদেশকে সিক্ত করিল। সংগীতের মিষ্টতা প্রাণকে আস্তে আস্তে নরম করিয়া তুলিতে লাগিল। ভগীরথ অনেক তপস্যা করিয়া ধরাতলে গঙ্গা আনয়ন করিলেন, গঙ্গার স্পর্শে ষাট্ হাজার সগর-বংশ মৃতসঞ্জীবনী-শক্তিতে জাগিয়া উঠিল। সহজিয়াও ছয় শত বৎসর ধরিয়া ভক্তিগঙ্গার আগমনী সংগীত গান করিতে লাগিল। ছয়শত বৎসরের ভাব ঘন হইয়া ভক্তিতে পরিণত হইল। ছোট ছোট ধারা মিলিত হইয়া যেমন বড় বড় ধারা সৃষ্টি করে এবং সেই বৃহৎ ধারাগুলি আবার মিলিত হইয়া প্রবল জল-প্রপাত সৃষ্টি করে এবং সেই জলপ্রপাত হইতে বড় বড় নদনদীগুলি প্রবাহিত হইয়া দেশকে শস্যশ্যামলা করে ও নরনারীর তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেইরূপ ছয়শত বৎসর ধরিয়া ছোট ছোট ভাবের ধারা প্রবাহিত হইতে হইতে, সেই মিলিত ভাব শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তির প্রবল প্রপাত সৃষ্টি করিল।

ভক্তিই বাংলার অন্তর্নিহিত ভাব, ভক্তিই বাংলার অন্তর্নিহিত শক্তি। বৌদ্ধধর্ম্মের মহাভাবের স্পর্শ পাইয়া, প্রজ্বলিত হুতাশন সম বৈরাগ্যের জ্বলন্ত উত্তাপে যে বাংলা আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল, সহজিয়া ও বাউলিয়া সম্প্রদায়ের ভাবধারার অমৃত সিঞ্চনে যে বাঙ্গালা মিষ্ট ও মধুময় হইল, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-গঙ্গায় সেই বাঙ্গালা স্নান করিয়াই নূতন দেহ মন প্রাপ্ত হইল। এক অখণ্ড ভাব-ধারার ভিতর বাংলা আপনার জন্ম-পত্রিকা রচনা করিয়াছে। এই ভক্তিতত্ত্বের ভিতর দিয়াই বঙ্গদেশ আপনার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে সহজিয়া সম্প্রদায়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এই সহজিয়া সম্প্রদায় ও বাউল সম্প্রদায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব তাহা নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম (Modern Bhuddism) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, নেপালে যে সকল হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, সহজিয়া সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী শাখা এবং ইহাতে যে সকল ভাবের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর স্থান পাইয়াছে। সহজিয়ার সাধন-প্রণালী বাউলদিগের সঙ্গীতের ভিতর পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব যে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে, প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায়।

যাহা হউক, প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ পাঠ করিয়া এবং প্রাচীন সাধন-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, একই ধারার ভিতর দিয়া বাংলা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালী ভাবের উপাসক না হইলে, তুষারাবৃত হিমালয় পার হইয়া তিব্বতে প্রধান লামার আসন গ্রহণ করিয়া চিরদিন সে দেশে সশিষ্যে বাস করিতে পারিত না এবং দুর্দ্ধর্ষ-প্রকৃতি নেপালীদিগের মধ্যে নিজের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া সেখানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিত না। অন্তরের মহাভাবের দ্বারা পরিচালিত না হইলে, সিংহলে গিয়া বাঙ্গালার বৌদ্ধগণ ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। প্রবল বন্যা যেমন দেশ উপদেশ সহর নগর ভাসাইয়া পাগলের মত ছুটিতে থাকে, বাঙ্গালীর মহাভাব তেমনি নূতন ধর্ম্ম, নূতন সত্য পাইবার জন্য উন্মাদের ন্যায় অবিরাম গতিতে দৌড়াইতেছে। বৌদ্ধ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার ধর্ম্ম কেমন একটী ভাবের পর আর একটী ভাবকে, একটী সাধনের পর আর একটী সাধনকে, একটী সম্প্রদায়ের পর আর একটী সম্প্রদায়কে আত্মস্থ করিয়া, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া, পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিতেছি এবং

ইতিহাসের দিক দিয়া ইহা পূর্ণ সত্য না হইতে পারে, আমরা তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। তবে ভাবের দিক দিয়া আমরা যে একটা যোগ-সূত্র পাইয়াছি, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মধ্যযুগের হিন্দু সাধকদিগের সহিত মুসলমান সাধকদিগের একটা ভাবের যে যোগ ছিল, অনেক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। এই ভাবের হাত হইতে মুসলমানগণও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। রংপুর জেলায় নীলফামারী মহকুমায় মুসলমান-বাউল-সম্প্রদায় দেখা যায়, যাহাদের সাধনা, ভক্তি, দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত, আহার, পরিধান ও আচারের সাত্ত্বিকতায়, তাহারা হিন্দুবাউল-সম্প্রদায় অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এখন পর্য্যন্ত আমরা এদেশের খ্রীষ্টান সাধকদিগের ভিতর বাঙ্গালার ভাব-ধারার পরিস্ফুরণ দেখিতে পাই নাই; ইহার বিশিষ্ট কারণ এই মনে হয় যে, ইঁহাদের সাধন-প্রণালী য়ুরোপীয় সাধন-প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাঙ্গালার খ্রীষ্টানগণ স্বাধীন ভাবে নিজেদের প্রকৃতি ও দেশের অনুরূপ সাধনা প্রবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতে সাহসী নন। বাঙ্গালী খৃষ্টানগণ নিজেদের ভারতীয় খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দান করেন; ইহাতে মনে হয় যে, বাঙ্গালার নিজস্ব যে ভাব আছে, তাহা এখনও ধরিতে পারেন নাই এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাবরাজ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে পৃথক সত্তা বা স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালার খৃষ্টানগণ তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালার প্রকৃতিকে ধর্ম্মের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে, বাঙ্গালার বিশিষ্টতাকে হারাইতে হইবে। তবে তাঁহাদের ভিতর দিয়া যে দেশ নিজ আত্মাকে ফিরাইয়া পাইবেন, ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমরা তাহা দেখিতে পাই। জাতীয়তার ভিতর দিয়া সার্ব্বজনীনতা গ্রহণ করাই প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। নিজ প্রকৃতিকে অস্বীকার করিলে জাতীয় মৃত্যু অনিবার্য্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন-বিধান বলি কেন?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যদি আমরা নিজেরাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হইতাম, যদি ইহা শুধু মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনেরই কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তবে তাঁহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারও আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত দেখিতাম। যদি এই নেতৃত্রয় ভিন্ন শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিম্বা গৌরগোবিন্দ রায় অথবা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনস্বিগণের মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়াই স্বীকার করিতাম, তবেত ইহার ভবিষ্যৎ প্রভাবের বিষয় সাহস ভরে বলিতে পারিতাম না। কিন্তু এই ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমানে সামান্য হইলেও, বিধাতার ইচ্ছায়ই ইহা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়মিত, প্রতিপালিত এবং জীবন্ত। কোন মানুষ, ইহার অস্তিত্বের জন্য, কৃতকার্য্যতার জন্য, প্রভাবের জন্য, পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ইহা যে সম্মান ও সহানুভূতি পাইয়া আসিতেছে তাহার জন্য, প্রশংসার ভাগী নহেন। অন্যদিকে ইহার উপর দিয়ে যে সকল প্রতিকূল ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, তাহার জন্যও আমরা নিরাশ হইব না। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জের ভিতর দিয়ে, লোকের দৃষ্টি, লোকের প্রাণ, অনবরত ইহার দিকে, সত্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। ঐ আকর্ষণেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের প্রতি সকলের প্রাণ আকৃষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম এখনও আরম্ভ মাত্র। ভবিষ্যতে পূর্ণভাব ধারণ করিবে। কেশবচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন যে, "পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে"। আমরা এখন গাহিয়া যাইতেছি, লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি যে, "পিতা, তব প্রেমরাজ্য আসিছে ধরাতলে। আশাপথ চেয়ে মোরা রহিয়াছি সকলে।" ইহাকে এই পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য অভিনব আর্য্যবংশ দলে দলে জন্মগ্রহণ করিবে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম যেমন বিধাতার বিধান বলিয়াই ধর্ম্মরাজ্যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহাও তেমনি ঈশ্বরের বিধান। মহাত্মা কেশবচন্দ্র ইহাতে ঐশ্বরিক আলো দেখিয়াই, "Behold the light of Heaven in India" নামক বিখ্যাত বক্তৃতায়, ইহাকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, বঙ্গচন্দ্র রায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি আমাদের নেতৃবর্গও ইহাকে এ যুগে ভারতে বিধাতার বিধান বলিয়াই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা কতগুলি সামান্যব্যক্তিও তাঁহাদের ঐ ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি মাত্র করিতেছি। স্বর্গগত নেতৃবর্গ এবং জীবিত শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রগামিগণ সকলেই জীবনের অভিজ্ঞতায়, ইহাকে বিধাতার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা-প্রসূত বুঝিয়াই, ইহাকে নূতন বিধান আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস ক'রে বলিয়াই ইহা নূতন বিধান, এ কথা বলিতেছিনা। কেন বিশ্বাস করি, কেন যে স্বীকার করি, কেনই বা ঘোষণা করি, তাহার কারণ দেখাইতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা বিশ্বাস করি, যে হেতু ইহা আমাদের বিবেককে জাগ্রত করিয়া, দোষ, ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা-জনিত পাপ দেখাইয়া দেয় এবং ইহার সাধনায় আমরা ঐ সকল দোষ, দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকি। এই ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগকে আর আর সমস্ত ধর্ম্ম-বিধানের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিয়াছে। ইহা আমাদিগের সমীপে প্রকৃত বিশ্বাস ও সাধনার সুফল প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞান, দর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞান

এবং পূজা, প্রার্থনা, চেষ্টা ও কর্ম্মশীলতার সহিত পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদিগের সমীপে এক নূতন সাধনপ্রণালী প্রকাশিত করিয়াছে। আমাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের এ ঘোষণার ভিতরে কল্যাণ ও সত্য নিহিত না দেখিলে, অথবা ইহার মূল উদ্দেশ্য লোকের প্রাণে আবেগ ও উচ্ছ্বাস জন্মাইতে না পারিলে, ইহা কখনও গৃহীত হইবে না। যদি আমাদিগের এই কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোকের বিশ্বাস ও উৎসাহ ভিন্ন ইহার অন্য কোন সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকে, তবেও ইহা গৃহীত হইবে না। সকলে ইহা একবার নিজ নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, যদি ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁহাদের শক্তি, ইচ্ছা ও জ্ঞানের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তবেই যেন তাঁহারা গ্রহণ করেন। আমরা শুধু বিধাতার সমীপে ইহাই প্রার্থনা করি, যেন দৃঢ়তা ও বিজয় সহকারে দিন দিন জীবনের অভিজ্ঞতা প্রচার করিতে পারি। কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করি না। অতিরঞ্জিত করিতেও প্রয়াসী নহি; অথচ যাহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, শিখিয়াছি, তাহাই যেন নির্ভয়ে শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়া যাইতে পারি। প্রকাশিত সত্যের যেন সাক্ষী হইয়া থাকিতে পারি। স্বর্গীয় অদৃশ্য হস্ত ভারতের জন্য, জগতের জন্য যাহা করিতেছে, তাহার আভাস যেন ঘোষণা করিয়া যাইতে পারি। বিধাতার বলে বলীয়ান্ হইয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া, উৎসাহ সহকারে, যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রচার করিয়া যাইতে পারি।

কালের প্রভাবে প্রাচীন সেই সনাতন সত্যের ভিতর হইতে নানা নূতন নূতন ভাব ফুটিয়া উঠে। জীবনের গভীরতা, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রসার ও মানবীয় আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই যেন পুরাতন হইতে নূতন বাহির করতঃ মানবজাতির উন্নতির নূতন যুগ আনয়ন করে। সেই পুরাতন শাশ্বত-ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি হইতে নব জীবনী-শক্তি ফুটিয়া উঠে। এই ভাবেই অতি প্রাচীন হইতেও, কালের পরিবর্ত্তনে নূতন প্রকাশিত হয়, অভিব্যক্ত হয় এবং তাহা নূতন বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে। "নূতন" এই কথা ভিন্ন অন্য কোন বাক্যে ইহা ব্যক্ত হয় না। ক্রমোন্নতির এই ধারাবাহিক নিয়মই প্রাকৃতিক রাজ্যে ও অন্তর্জগতে একই ভাবে কার্য্যকরী হইয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই পুনরুত্থানের পরিদ্যোতক। উহাতে নৈতিক পবিত্রতার এক নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টিয়ান-ধর্ম্ম য়িহুদী-ধর্ম্মেরই পুনরুত্থান ও পূর্ণতা। মুসলমান ধর্ম্মও মহাত্মা এব্রাহিমের ধর্ম্মের বিকাশ, অথচ উহাতে এক নূতন একেশ্বরবাদিত্বের গৌরব-পূর্ণ দৃঢ়তা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল ধর্ম্ম যখন প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তখন ইহাদের ভিতরে যে কি নূতন, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন ব্যাপার ছিল। অথচ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জাতীয় প্রকৃতি, স্থানীয় ধারাবাহিক বিধিব্যবস্থার রীতি, নিয়ম ও সময়ের আবশ্যকতা, এ সমস্ত দ্বারাই এ সকল ধর্ম্মের উপাদান গঠিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে নূতন বিধান বলিয়া ঘোষণা করাতে অনেকেই সঙ্কুচিত, এবং তাঁহারা অসন্তোষও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার নূতনত্ব কি? কেন ইহাকে নূতন বলিব? অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই বিশ্বাস আবহমানকাল হইতেই ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে, ইহা পুরাতন সত্য, নূতন নহে। এই যুক্তি, তর্ক, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ভাব অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যদি ইহা নূতন হয়, তবে কে ইহার স্রষ্টা? যখন এ রহস্য বুঝিতেই পারা যায় না, তখন ইহাকে নূতন বলিবার কারণ কি?

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে নূতন বলা হয়, ইহার কারণ ইহা নহে যে, ইহার ভিতরে যাহা যাহা অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সে সমস্তই নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক সত্যই পুরাতন, অসৃষ্ট এবং প্রথমাবধিই বিদ্যমান রহিয়াছে। নানা সময়ে, নানাস্থানে, নানা ভাবের মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া, সেই চিরন্তন সত্য স্বকীয় জ্যোতিঃকণা বিকীরণ করিয়া থাকে; প্রত্যেক ধর্ম্ম-বিধানই সেই চিরস্থায়ী সত্যবিকাশের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। তথাপি এই সকল শাশ্বত সত্য হইতে, সর্ব্বত্রই এক নূতন আলোক ও নূতন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যের ভিতরে অবস্থিত ভাব অসংখ্য। তাহা যেমন প্রাচীন, তেমনি নূতন। অতীতের দিকে তাকাইয়া তাহাকে প্রাচীন বা পুরাতন বলা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে আবার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া নূতন বলা হইয়া থাকে। যখন মানবীয় বিশ্বাসের উপরে ঐশ্বরিক প্রভাব নিপতিত হয়, তখন উহা হইতে এক নূতন জ্যোতিঃ, নূতন আলো ছড়াইয়া পড়ে। নূতন ভাব আসিয়া জন-সমাজের ভিতরে এক অভিনব ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। তাহা সময়ে ইহা এক নূতন বিধান বলিয়াই কথিত হয়। এই ভাবেই মানবের ভাগ্যদেবতা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার লীলা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। মানবের আকাঙ্ক্ষা, ধারণা ও আবশ্যকতা সন্দর্শন করতঃ, বিশ্বপতি এক নবালোক প্রদর্শন পূর্ব্বক, সর্ব্ব বিষয়েই এক নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তুলেন। ব্রাহ্মসমাজের এই সরল ও পবিত্র ধর্ম্ম তাঁহারই আলোকে প্রকাশিত এক নব বিশ্বাসের অভিনয় মাত্র। ইহা এখন আমাদিগের সমক্ষে তাঁহার প্রকৃতির এক নূতন ভাব প্রকাশ করিতেছে। পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ নূতন ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। মানব প্রাণের প্রত্যেক বিভাগেই এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের

ভিতরে, নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থের ভিতরে এবং সমস্ত মহাপুরুষগণের জীবন ও কার্য্যাবলিতে এক অপূর্ব্ব মিলন দেখাইয়া দিতেছে। এ সকল কারণেই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম এ যুগে এ দেশে এ জাতির জন্য এবং জগতের জন্য এক নূতন বিধান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

(গত ১৭ই মার্চ্চ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহের আত্মনিবেদন)

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, ধর্ম্ম-জীবনে প্রত্যেককে বহু স্তর ভেদ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হয়। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রধান, শিক্ষা-সভ্যতা-প্রধান যুগে, যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনই ধর্ম্মবিষয়েও, লোকে পাঠ, প্রসঙ্গ, চর্চ্চা ও আলোচনার ভিতর দিয়া, প্রথমে মানবীয় শিক্ষা-পিপাসা, জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে চায়। গ্রন্থ-পাঠ ও আলোচনাদি দ্বারা জ্ঞান-পিপাসার একটা তৃপ্তি লাভ হয়। গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জানা শুনার সুখ সৌভাগ্য একটা কম সামগ্রী নহে। কেহ কেহ এ বিষয়ে এত ঝুঁকিয়া পড়েন যে, তাঁহাদিগকে লোকে "Book-worms" গ্রন্থের পোকা বলিয়া সম্বোধন করে। এরূপ পাঠ ও প্রসঙ্গের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা আছে বটে, কিন্তু শুধু এরূপ পাঠ প্রসঙ্গের উপায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎকার লাভ জন্য ভিন্ন স্তর আশ্রয় করিতে হয়। আপনারা সকলেই জানেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে অনুতাপের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। যৌবনের আরম্ভে কেশবচন্দ্রের অন্তরাকাশে এক দিকে যেমন সাত্ত্বিক ভাব, ধর্ম্মের ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে আবার পাপের সম্ভাবনাগুলি ধীরে ধীরে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া তাঁহার চিত্তকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি যখন আপনার অন্তরের কাল দিক্ দেখিয়া অনুতপ্ত হইতে ছিলেন, ব্যাকুল হইতেছিলেন, ভিতরে মহা যুদ্ধ-বিগ্রহে পতিত হইয়াছিলেন, তখনই ভিতর হইতে ধ্বনি হইয়াছিল, 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা দ্বারা এ যুদ্ধে জয়লাভ করিবে'। তিনি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অব্যবহিত সম্পর্ক তাঁহার প্রত্যক্ষের বিষয় হইল। যাঁহারা ব্রহ্মানন্দের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উষাকালে তিনটী বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট, ঈশা এবং পল। প্রথম ব্যক্তির মুখে ধ্বনি হইয়াছিল, 'অনুতাপ কর, স্বর্গ-রাজ্য নিকটে'। অতএব কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রথমেই অনুতাপ উপস্থিত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ নাকি প্রতিদিন ষাট কি ততোধিক বার অনুতাপব্রত সাধন করিতেন। আমাদের দেশে প্রাচীন হিন্দুসমাজে কেহ কোন বিশেষ ধর্ম্ম-বিধি-লঙ্ঘন-জনিত পাপ করিলে, তাহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-শ্রেণীর ব্যবস্থাপকদিগের ব্যবস্থামত সোনা রূপা গাভী দান ইত্যাদি বাহ্য অনুষ্ঠান মূলক, অর্থব্যয়-মূলক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তদ্দ্বারা সামান্য ভাবে বা সাময়িক ভাবে মানুষের মন অনুতপ্ত হইলেও, তদ্দ্বারা যথার্থ মানসিক অনুতাপের স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। এরূপ অনুতাপে অন্তরের আমূল শোধন, কি বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না। তাই, বাহ্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধির অনুষ্ঠানে ও অনুসরণে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের যথার্থ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মার্থিগণের জীবনে প্রকৃত মানসিক অনুতাপে মহৎ ফল লাভ হইয়াছে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

আপনারা জানেন, প্রাচীন ভারতে ঋষিদিগের আশ্রমে যে সকল ছাত্র অধ্যয়নাদি উদ্দেশ্যে স্থান গ্রহণ করিতেন, সেই ছাত্রগণের প্রতিপালনের জন্য বিশেষ বিধি এই ছিল যে, তাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ ইত্যাদি অপরা-বিদ্যা যেমন শিক্ষা করিবেন, তৎসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেই হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষাই শেষ পরীক্ষা। অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেও, ব্রহ্মবিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, গৃহে গমন করিতে পারিতেন না এবং দারাদি পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ-ব্রতে ব্রতী হইতে পারিতেন না। এরূপ আশ্রমে কোন এক বৎসর পরীক্ষার সময় যে সকল ছাত্র পরীক্ষা দিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন অন্যান্য সকল বিষয়ে খুব উচ্চস্থান, সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াও, ব্রহ্ম বিদ্যা অথবা ব্রহ্ম জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। অন্যান্য বিষয়ে যাঁহারা তাঁহার অনেক নিম্নে স্থান পাইয়াছিলেন, ব্রহ্ম-বিদ্যায় উত্তীর্ণ হওয়াতে তাঁহারা গৃহে গমন করিতে অনুমতি পাইলেন; কিন্তু তিনি অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াও, ব্রহ্ম-বিদ্যায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে, গুরুগৃহে আবদ্ধ রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার গুরুদেব নিমন্ত্রিত হইয়া দূরস্থানে কিছুদিনের জন্য চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন না, তিনি একাকী গুরুগৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। একাকী গুরুগৃহে এইরূপে আবদ্ধ থাকাতে, নির্জ্জন সময়ে তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হইতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রহ্ম-বিদ্যায় উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে অগ্রে চলিয়া গেলেন, তিনি পড়িয়া রহিলেন, এই চিন্তাতে তাঁহার প্রাণে বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল, অসহ্য যাতনায় শরীর মন ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বদাই তিনি বিমর্ষ, গভীর চিন্তামগ্ন থাকেন, গুরুপত্নী এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, বাছা! তোমাকে এত

বিমর্ষ, এত চিন্তামগ্ন, শোকাকুল দেখাইতেছে কেন? তোমার কি অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে, আমাকে বল। শিষ্য গুরুপত্নীর সস্নেহবাক্যে সকাতরে বলিলেন, মাতঃ! আমরা যাহারা এবৎসর পরীক্ষা দিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে আমি এক ব্রহ্ম-বিদ্যা ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যায় বিশেষ উচ্চস্থান লাভ করিয়াছি; কিন্তু ব্রহ্ম-বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। তাই আমার নিম্নে যাহাদের স্থান হইয়াছিল, অথবা আমার পরে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছে, কেবল আমি একাই পড়িয়া রহিয়াছি, যাহতে অনুমতি পাই নাই। এজন্য আমার প্রাণে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। গুরুমাতা শুনিয়া, তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি ধৈর্য্যধারণ কর, তোমার গুরুদেব গৃহে আসিলে তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু সুব্যবস্থা করা যাইবে। গুরুপত্নীর সহানুভূতি ও আশ্বাসবাণীতে, তাহার প্রাণ আশা বিশ্বাসে পূর্ণ হইল। তাহার হৃদয়ে যথার্থ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম-কৃপার অবতরণের অবসর হইল। অনুতাপের পর শিষ্যের প্রাণে যে আশা বিশ্বাসের সঞ্চার হইল, তাহার ফলে ক্রমে তাহার অন্তর সাত্বিক জ্ঞান, সাত্বিক ভাবে পূর্ণ হইল, ব্রহ্ম জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সাত্বিক জ্ঞান, ও সাত্বিক ভাব যাহা, ব্রহ্ম-জ্ঞানও তাহাই। যথার্থ অনুতাপের সাক্ষাৎ ফল জীবে ব্রহ্মের অবতরণ, ব্রহ্ম-স্পর্শ-লাভ, ব্রহ্মের উত্তাপ-লাভ, দেবভাবের উন্মেষ। গুরুদেব কিছু দিন পরে গৃহে ফিরিলেন। ঋষি গৃহে উপস্থিত হইলে, ঋষিপত্নী স্বামীর নিকট গৃহে আবদ্ধ শিষ্যটীর অবস্থা জানাইলেন এবং তাহার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঋষি দেখিলেন, শিষ্যের অন্তরে যথার্থ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাহার অন্তরে ব্রহ্ম বিদ্যা, ব্রহ্ম-জ্ঞানের সমাগম হইয়াছে। তাই অনতিবিলম্বে গুরুদেব তাহাকে ব্রহ্ম-বিদ্যায় উত্তীর্ণ মধ্যে গণ্য করিয়া গৃহে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। যথার্থ অনুতাপের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-লাভ, ব্রহ্মের উত্তাপ-লাভের সুযোগ সহজেই উপস্থিত হয়।

অনুতাপের অনলে যখন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য অন্তরের আবর্জ্জনা দগ্ধ হইয়া যায়, চিত্ত অহঙ্কার ও অভিমানশূন্য হয়, তখন এই শূন্যতার ভিতর দিয়া পূর্ণতা আরম্ভ হয়। এসময় ঈশ্বরের কৃপার অবতরণ হয়। ব্রহ্মের অবতরণে, ব্রহ্ম-স্পর্শে আত্মায় নব-জীবনের সঞ্চার হয়, অন্তরে ব্রহ্মবল, দেববল আসিয়া জীবনে শক্তি-সঞ্চার করে, ব্রহ্ম-বাণী আসিয়া অভয় দান করে, শুভ বুদ্ধি অন্তরে উপস্থিত হইয়া জীবকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। তখন মানুষের নূতন চক্ষু খুলিয়া যায়, ক্রমে দিব্যালোক ও দিব্য-জ্ঞান অন্তরকে আলোকিত করে, নূতন আশা ও বিশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়। একবার দেব-জীবনের আস্বাদন পাইলে, মানুষ কি আর তাহা ভুলিতে পারে? তাই ক্রমে পূজা বন্দনা, ধ্যান ধারণা, পাঠ প্রসঙ্গ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। তপস্যার যে জীবন আরম্ভ, তাহার শেষ কোথায়? ক্রমে তপস্যার অনুকূল ব্রত সকল অবলম্বন করিয়া মানুষ স্বর্গীয় অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হয়। ক্রমে মানবজীবন দিকে দিকে ব্রহ্ম-স্বরূপে ভরাট হইয়া যায়। তখন অন্তর রাজ্যের শোভা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য শতগুণে, সহস্রগুণে বিকাশ লাভ করে। এ যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। অনুতাপে ও প্রার্থনায় ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইল। ক্রমে তাঁহার জীবনে কত ব্রহ্ম-বল, ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইল, ব্রহ্ম-বাণী সমাগত হইল। অনন্তের উপাসকের সাধনের শেষ নাই, গ্রহণের শেষ নাই, ধারণের শেষ নাই। অনন্ত প্রেম পুণ্যে জীবন কত সরস হইল, সুন্দর হইল। তাঁহার পাপ বোধ, পাপের সম্ভাবনাতে পাপ-বোধ কত তীব্র ছিল, সত্য ছিল; তাই নিত্য নূতন অনুতাপ, ব্রতের পর ব্রত-গ্রহণ, তপস্যার পর তপস্যা। এইরূপে তাঁহার জীবনে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের সমন্বয় হইল, ব্রহ্মে ভরাট জীবনের স্বর্গীয় মহিমা গৌরবে পূর্ণ হইয়া গেল। এই জীবন পাইয়া আপনি ধন্য হইলেন, আমাদের জন্য এই স্বর্গীয় নবজীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন। প্রত্যেক জীবনের পক্ষে ইহাই সত্য, যাঁহারা অনুতাপের তপ্ত অশ্রুর ভিতর দিয়া জীবন আরম্ভ করেন, তাঁহারা পরিণামে আনন্দে প্রচুর স্বর্গের শস্য সংগ্রহ করেন।

—:০:—

স্বর্গগত বিষ্ণুপদ শী।

গত চারি পাঁচ বৎসর যাঁহার সুমিষ্ট সঙ্গীত ও কীর্ত্তন ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ নববিধান প্রচারাশ্রম ও প্রচার-কার্য্যালয়ের নিত্য উপাসনা ও সাময়িক অনুষ্ঠানাদি সরস ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিবার বিশিষ্ট আয়োজন ছিল, যাঁহার প্রাতঃ সঙ্গীত গোলদীঘিতে প্রাতঃকালীন ভ্রমণকারী ও প্রাতঃ-সমীরণ-সম্ভোগকারী অনেকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্ভোগ, আরাম ও আনন্দের বিষয় ছিল, যাঁহার ভোরসঙ্গীত ও স্তোত্র-পাঠাদি, সান্ধ্যসঙ্গীত ও প্রসঙ্গাদি, দিনের বেলায় সময় সময় ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ এবং কখন রাত্রিতে, কখন দিনের বেলায় পৌরাণিক গল্প ইত্যাদি, দীর্ঘদিন রোগ-শয্যাশায়ী আমাদের ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর বিশেষ ভাবে ইদানীং তৃপ্তি, আরাম ও সম্ভোগের বিষয় ছিল, সেই ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটের বিষ্ণুবাবু, প্রায় দুই সপ্তাহকাল কঠিন পীড়ায় ভুগিয়া, ৬৬বৎসর বয়সে গত ৩রা এপ্রিল, বুধবার, সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময়, ইহলোকে তাঁহার নশ্বর

জীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়া, পরম জননীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। ইঁহার শেষ কঠিন পীড়ার সময় সেবা-পরায়ণ আমাদের প্রিয় ভাই অক্ষয়কুমার নধ বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইঁহার সেবা করিয়াছেন, এজন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ।

শান্তিপুরে তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল। তিনি স্বর্ণকার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একটী মাত্র পুত্রসন্তান প্রসবের পর তাঁহার স্ত্রীর বিয়োগ হয়, তিনি আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। জাতীয়-ব্যবসায়-পরিচালনে বিশেষ মিথ্যা ও ছল চক্রে জড়িত হইতে হয় বুঝিয়া, জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। মনে হয়, সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদিতে স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল বলিয়া, লীলা-কীর্ত্তনাদি করিয়া জীবন কাটাইবেন, এই মানসে সেই পথ অবলম্বন করেন। ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ভক্তিধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রথমে দীক্ষা-গ্রহণ করেন। ইনি প্রথম জীবনে শান্তিপুরের নববিধান-বিশ্বাসী সাধক স্বর্গগত বীরেশ্বর প্রামাণিকের ছাত্র ছিলেন; পরে তাঁহার সঙ্গ ও সহায়তায় এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের সঙ্গ ও সহায়তায় ক্রমে ইনি নববিধান ধর্ম্মে আকৃষ্ট হন। পূর্ব্বে প্রায়ই মাঘোৎসবের সময় ইনি কলিকাতা আসিয়া মাঘোৎসব সম্ভোগ করিতেন এবং প্রাচীন ভক্তিপুথের লীলা-কীর্ত্তনাদি করিতেন। ৪।৫ বৎসর হইল, মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা আসেন, উৎসবের পরে কিছু কাল তাঁহার প্রিয়বন্ধু শান্তিপুর-নিবাসী, অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হাজারিলাল ভড়ের সঙ্গে অনাথ আশ্রমে বাস করেন। তারপর ভাই প্রমথলাল সেনের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য মুঙ্গেরে গমন করেন। নববিধানের ভক্তিতীর্থ মুঙ্গের হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া, ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে, প্রচারাশ্রমে বাস করিতে থাকেন। মধ্যে কিছুদিনের জন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার ভাই প্রমথলাল সেনের আহ্বানে আসিয়া প্রচারাশ্রমে থাকেন।

ক্রমে নববিধানে ইঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। প্রায় দুই বৎসর পুর্ব্বে বৈশাখী-পূর্ণিমায়, শ্রীবুদ্ধের জন্ম, নির্ব্বাণ ও তিরোধানের দিনে, এই প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে দীক্ষা-গ্রহণ করেন, এবং তৎপর হইতে এই বাড়ীতেই বাস করিয়া জীবন-লীলা শেষ করেন।

বিষ্ণুবাবু সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা ৩নং প্রচারাশ্রম ও প্রচার কার্য্যালয় বাড়ীতে বিশেষ সেবা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতা সদরে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদিতে সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন, মফঃস্বলস্থ কোন কোন নববিধান সমাজে উৎসবাদি সময়ে সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। শুনিয়াছি, চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে কোনস্থানে উপাসনার কার্য্যও করিয়াছেন।

প্রাচীন সমাজের ও রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এবং একমাত্র পুত্রের সঙ্গেও সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বিষ্ণুবাবু বৃদ্ধ বয়সে নববিধানে দীক্ষিত হইয়া এই ৩নং বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সঙ্গীত ও কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া এখানে সকলের সেবা করিয়া, উপাসনা, সৎ-সঙ্গ, পাঠ ও প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া ক্রমে নববিধানে দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিয়া, আত্মিক জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে, তিনি ৬৬বৎসর বয়সে এই ৩নং বাড়ীতেই ইহজীবনের লীলা শেষ করিলেন, ইহা তাঁহার জীবনে লীলাময়ের বিশেষ করুণা। লীলাময় শ্রীহরি এখানে তাঁহার জীবনকে ধন্য করিলেন, পরলোকে অনন্ত জীবনপথে ক্রমে আরও ধন্য করুন, এই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।

—:o:—

অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

সপ্তচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

দীন ভক্ত ফকিরদাস বলিলেন, "যার কেহ নাই, কিছু নাই, মাই তার সর্ব্বস্ব"। এবার আমাদের দরিদ্র অমরাগড়ীর উৎসব সেই ভাবেই হইয়াছে। বিগত ৩রা ফাল্গুন, শুক্রবার, সায়ংকালে, ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমে "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে চল ভাই যাই সকলে" এই মধুর সঙ্গীতটী গান করিবার পর, সংক্ষেপে উপাসনান্তে, আরতির সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়।

৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার, প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এ দাসকেই করিতে হয়। সায়ংকালে ভিন্ন গ্রামে প্রচারে যাবার সময় কলিকাতা হইতে ৩।৪জন যাত্রী আগমন করায়, তাঁদের সেবাদির ব্যবস্থার পর, ব্রহ্মমন্দিরেই সংক্ষেপে প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন হয়।

৫ই ফাল্গুন, রবিবার, বেলা ১০॥টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ডাক্তার ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র মিত্র কয়েকটী মধুর সঙ্গীত করেন। এ সেবককেই বেদীর কার্য্য করিতে হয়। জীবনে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আত্মনিবেদন হয়। মধ্যাহ্নে বিধানকুটীরে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরের রোয়াকে হিন্দি ভজন ও প্রসঙ্গ হয়, স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্র ও কৃষক ভজন শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ ভজন করেন, স্বামী সত্যানন্দ কৃষকদিগের সহিত সমস্ত মানবমণ্ডলীর সকল বিষয়ে বিশেষ যোগ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের পর বেদী হইতে প্রেমিক ভাই প্রেমেন্দ্রনাথ রায় ভক্তিবিগলিত-প্রাণে মা আনন্দময়ীর সুমিষ্ট ও সুন্দর উপাসনা করেন। আচার্য্যের "সর্ব্বস্বহরণ" প্রার্থনা পাঠের পর, ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ যে আত্মনিবেদন করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "যদি আমরা এই নিরাকার প্রেমময়ের শ্রীপদে

আত্ম-সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের এ জীবনে অপার আনন্দ ও ধরায় স্বর্গ সম্ভোগ করিব। প্রেমময় শ্রীহরির শ্রীপদে আত্ম-সমর্পণ করিলে নববিধানের স্বর্গ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মণ্ডলীর সেবক ফকিরদাস এই মার শ্রীপদে আপনাকে উৎসর্গ করে, সত্যই তিনি যেমন নামে ফকির, তেমনি জীবনে ফকির হইয়াছিলেন। আমরাও সকলে জীবনে ফকির হইয়া মা বিধানজননীর এই স্বর্গের বিধানকে যেন জয়যুক্ত করিতে আরি।" শেষে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। জানিনা, বিধাতার কি অপূর্ব্ব খেলায়, আজিকার সায়ংকালীন উপাসনায়, কয়েকটী যুবক, যাঁরা স্থানীয় মণ্ডলীকে অনেক প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, তাঁহারাও যোগ দিয়াছিলেন। ধন্য মা, বিধান-জননী! ধন্য তাঁর প্রেমের বিধান।

৬ই ফাল্গুন, সোমবার, এখানকার মণ্ডলী ও ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন। অদ্য প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতা ডাক্তার অনুকুলচন্দ্র মিত্র সরল সুমিষ্ট ভাবে উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি আচার্য্যের প্রার্থনা ভক্তিভাবে পাঠ করিয়া সময়োপযোগী প্রার্থনা করেন। শেষে "বাজিছে মধুর মধুর স্বরে সখার মোহন বাঁশীরে" কীর্ত্তনটী হয়। সায়ংকালে এ দাসকেই সংক্ষেপে উপাসনা করিতে হয় এবং ৩টী ভক্তের বিষয় বলা হয়। মহর্ষি ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবনে কেমন বিশ্বাস, প্রেম ও নবভক্তির অভ্যুদয়ে ধরায় স্বর্গ-স্থাপন হইল, তাহাই বর্ণিত হয়। শেষে খুব জমাট সঙ্কীর্ত্তন হয়। প্রাচীন বন্ধু হরলাল রায় এই কয়দিন মৃদঙ্গবাদন ও সংকীর্ত্তনাদি করেন। স্থানীয় কৃষকেরাও মৃদঙ্গবাদন ও সংকীর্ত্তনে যোগ দেন।

৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের সমাধিমন্দিরে উপাসনা এই সেবক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ৩টার সময় জয়পুর ফকিরদাস হাইস্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের লইয়া একটী সভা হয়। হেডমাষ্টার বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "মাতৃভূমি"। প্রথমতঃ এ সেবক কর্ত্তৃক আচার্য্যের "মাতৃভূমি" প্রার্থনার কিয়দংশ পঠিত হয়। স্বামী সত্যানন্দ প্রকৃতির ভিতর দিয়া নিরাকার ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে বর্ণনা করেন। শেষে সভাপতি কিছু বলিয়া সভা ভঙ্গ করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতে ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ ও স্বামী সত্যানন্দ এখানকার শ্মশান-ভূমিতে হারমনিয়ম যোগে সংগীত ও হিন্দিভজন করেন। সন্ধ্যার সময় তথা হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে আগমন, তথায় সংকীর্ত্তন ও শান্তিবাচন হয়। ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ শান্তিবাচনের প্রার্থনা করেন।

এই উৎসবে বর্দ্ধমান কর্ম্মস্থল হইতে ভক্ত ফকির দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুব্রতানন্দ ও স্থানীয় মণ্ডলীর সভ্য বাবু হরিসুন্দর দাস কলিকাতা হইতে আগমন করেন এবং ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ রায়, ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র মিত্র, স্বামী সত্যানন্দ কলিকাতা হইতে আগমন করিয়া এ মণ্ডলীর সেবা করিয়া, বিশেষ ভাবে এ অযোগ্য ভৃত্যকে কৃতার্থ করিয়াছেন। জয় মা বিধানজননীর জয়।

অমরাগড়ী নববিধানসমাজ, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৫ } বিনীত সেবক— শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই মার্চ্চ, কাপ্তান কল্যাণকুমার মুখার্জ্জির স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে ২নং Ray Street এ বিশেষ উপাসনা হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় সুন্দর উপাসনা করিয়াছেন। ১২ বৎসর পূর্ণ হইল, সেই বীরপুত্র দেশ-হিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে গেছেন। পৃথিবীতে সে নিঃস্বার্থ জীবন দৃষ্টান্ত হয়ে চিরদিন থাকবে।

বিগত ২৬শে চৈত্র (১৩৩৫), প্রাতে ৮॥টায়, অমরাগড়ীতে, স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর সমাধিমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। এই পারলৌকিক সাধনার উপাসনা অতি গম্ভীর ও ভক্তিভাবে সম্পন্ন হয়। আচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দের "নবজীবন" বিষয়ক প্রার্থনা পাঠান্তে সেবক অখিলচন্দ্র রায় বলেন," স্বর্গীয় শান্ত সাধক তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ ভক্ত ফকিরদাসের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপে, এদেশে সুনীতি-বিস্তার, বালকবালিকাদিগের শিক্ষা ও দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দৈনিক জীবনে নিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা ও চারিধারে নববিধান-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; তাঁদের সেই সুন্দর জীবনের আকর্ষণেই অন্যান্য যুবকদলের সহিত আমিও এখানকার বিধানমণ্ডলীতে আশ্রয় পাইয়াছিলাম।" এই পারলৌকিক সাধনার জন্য সাধক যশোদাকুমারের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে আসিয়া ছিলেন। স্থানীয় উপাসক ও উপাসিকাগণ এই সাধনায় যোগ দিয়া ধন্য হইয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী, কোচবিহারের স্বর্গগত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের পৌত্র, কুমার কমলেন্দ্র নারায়ণের নবকুমারের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান, শিশুর মাতামহ ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বসুর লক্ষ্ণৌস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বসু উপাসনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সপরিবারে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। পিতামহী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করেন।

পুরস্কার-বিতরণ—গত ২৯শে মার্চ্চ, বিরাটী গ্রামে প্রেমেন্দ্র-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ-সভায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। বালকগণ সুন্দর আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মন

যুক্ত করে। ডাঃ সত্যানন্দ রায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ও মৌলবী ওহায়েদ হোসেন উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে কিছু বলেন। আমরা এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

উৎসব—হাজারিবাগ নববিধান-মন্দির-প্রতিষ্ঠার চতুর্থ-সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, গত ২৮শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬॥টায় মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন, ২৯শে মার্চ্চ, শুভ শুক্রবার, প্রাতে ৮টায় মন্দিরে উপাসনা, সন্ধ্যা ৬॥টায় "কেশব চন্দ্র" বক্তৃতা, ৩০শে মার্চ্চ, শনিবার, প্রাতে ৮টায় মন্দিরে উপাসনা, সন্ধ্যা ৬টায় নগর-সংকীর্ত্তন, ৩১শে মার্চ্চ, রবিবার, সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসবদিনে, মন্দিরে প্রাতে ৮টায় উপাসনা, অপরাহ্ন ৪॥টায় আলোচনা ও বালকবালিকা-সম্মিলন, সন্ধ্যা ৬॥টায় কীর্ত্তন ও উপাসনা, ১লা এপ্রিল, সোমবার, সন্ধ্যা ৬॥টায় মন্দিরে কীর্ত্তন ও শান্তিবাচন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে পাটনা হইতে ভাই প্রমথলাল সেন ও শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বসু সপরিবারে, বোলপুর হইতে অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু, কলিকাতা হইতে কিশোরগঞ্জের শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন সপুত্রক, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র সস্ত্রীক, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সস্ত্রীক, শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় হাজারিবাগ গিয়াছিলেন। বেশ জমাট উৎসব হইয়াছে। বিধাতার প্রসাদ সকলেই সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন।

গত ৩০শে চৈত্র, শনিবার, বাঁটরা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, প্রাতে ৯টার পর উপাসনা হয়, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, সন্ধ্যা ৬॥টায় কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। প্রাতের উপাসনা মধ্যে বসন্তবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রভাতকুমারের নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীমান্ প্রভাতকুমার শিশুটীকে কোলে লইয়া নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠ করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। দুই বেলাই উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। শ্রদ্ধেয় বসন্তবাবু সপরিবারে সমাগত বন্ধুগণকে আদর আপ্যায়নে পরম সন্তোষ দান করিয়াছেন। এত উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৬৲ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

প্রেরিতনিয়োগ-সাম্বৎসরিক—গত ১৫ই মার্চ্চ, নববিধান প্রেরিত নিয়োগের সাম্বৎসরিক সাধনার্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র উপাসনার প্রথমাংশ, প্রেরিতগণের প্রতি আচার্য্যের নিয়োগ বিধি পাঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলন প্রার্থনার প্রার্থনা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ শান্তিবাচন করেন। অদ্য হইতে বসন্ত পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত বিশেষ ব্রতসাধনের কথা হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ৫ই চৈত্র, ভাই প্রিয়নাথের প্রথমা কন্যা শ্রীকৃপার সাম্বৎসরিক দিনে, কৃপাসমাধিতে ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হয়।

গত ১০ই এপ্রেল, ২৮নং নিউরোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবী স্বর্গগতা মঙ্গলা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুমতি মজুমদার লিখিত মাতৃ-তর্পণ পঠিত হয়। এই দিনে নববিধান ট্রাষ্টের "মঙ্গলা দেবী ফণ্ড" হইতে দশ জোড়া বস্ত্র বিতরিত হয়।

১২ই এপ্রেল, ঐ গৃহেই, দেবী মায়ের দেবপুত্র স্বর্গগত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে মাননীয়া মহারাণী সুচারুদেবী উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনা বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সুলিখিত বিনয়েন্দ্রনাথের সুন্দর জীবনী হইতে, তাঁর জীবনের সুন্দর সুন্দর অংশ, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী সুধা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া, সকলের প্রাণেই সুধা বর্ষিত হয়েছিল।

গত ১১ই এপ্রিল, ৭নং রামমোহন রায় রোডে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করা হয়।

গত ২৬শে মার্চ্চ, ১২ই চৈত্র, ১৩।১ বোসপাড়া লেনে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে বিশেষ উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে পুত্র কন্যাদের মধ্যে উপেন্দ্রবাবু ৪৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী দেব ২৲, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ ২৲, শ্রীমতী কিরণকুমারী মিত্র ২৲ ও শ্রীমতী চপলা মজুমদার ১৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

আর্য্যনারী সমাজের জুবিলী।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ দেব কর্ত্তৃক আর্য্যনারী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আগামী ৯ই মে উহার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইবে এবং এই জুবিলী উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা ও অধিবেশন হইবে। কলিকাতা ও মফঃস্বল-বাসিনী আর্য্যনারীগণ যাহাতে এই উৎসবে যোগদান করেন তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা উপস্থিত হইতে পারিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যদি কোন প্রবন্ধ পাঠাইয়া দেন, তবে উহা অধিবেশনে পঠিত হইবে।

৯ই মে, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্নে সাড়ে আট ঘটিকার সময় উপাসনা হইবে ও অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় অধিবেশন হইবে। সকল সমাজ নির্ব্বিশেষে ভগ্নীগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করুন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নিবেদিকা—
আর্য্যনারী সমাজের সভ্যগণ।

—•—

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৮ই বৈশাখ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 29th April, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, আমরা বলি, তুমি আছ, অথচ তোমাকে দেখিও না, তোমার কথা শুনিও না, তোমার প্রভাব অনুভবও করিনা। তবে আমাদের 'তুমি আছ' বলাত সত্য বলা নয়। অগ্নি আছে বলিলাম, কিন্তু তাহার উত্তাপ গায়ে লাগিল না, তাহার দাহিকা শক্তি কিছুই অনুভব হইল না, তাহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। তেমনি 'তুমি আছ' যখনই বলি, তখনই যদি না আমি তোমার সত্য সত্তায় সঞ্জীবিত হই, তোমার চিন্ময় প্রভাবে চৈতন্য-যুক্ত হই, তোমার অনন্তত্বে আমার ক্ষুদ্রতা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইয়া তোমার উচ্ছ্বসিত প্রেমে উন্মত্ত হই, তোমার অদ্বৈত সত্তায় আমার স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জিত হইয়া তোমার পুণ্যপ্রতাপে আমি পাপমুক্ত হই, তোমার আনন্দে আমার নিরানন্দ তিরোহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দময় হই, তাহা হইলে 'তুমি আছ' বলা মিথ্যা হইয়া যায়। এই জন্যই তোমার পুত্র শ্রীঈশা বলিলেন, যে আমাকে দেখেছে, সেই আমার পিতাকে দেখেছে, কেননা পিতা আমাতে, আমি পিতাতে। ইহাই যথার্থ 'তুমি আছ' বলা, ইহাই যথার্থ তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নিদর্শন। শ্রীগৌরাঙ্গও এই অবস্থায় বলিয়াছেন, "মুঁই সেই।" এবং আর আর ভক্তগণও যুগে যুগে তোমাতে আত্মনিমজ্জিত হইয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এ যোগের অবস্থাতেই বলিলেন "ঈশ্বরকে দেখ নাই? আমাকে দেখ, দুই এক হইয়াছে। 'ভক্তগণ আছেন' বলারও অর্থ সেই, গাছে যেমন ফল ঝুলে, ঈশা মুষা তেমনি জীবনে ঝুলিতেছেন।" মা, তবে এই ভাবে, তুমি যে আছ ও তোমার ভক্তগণও যে আছেন, বলি, তাহা জীবন দ্বারা প্রমাণ ও প্রদর্শন করিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানের মানুষ।

বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, "প্রথমে ব্রহ্মবাণী ব্রহ্মেতেই ছিল, কিন্তু যখন তাহা দৈহিক আকার ধারণ করিল, তখনই সকলে তাহা দর্শন করিতে বা চিনিতে পারিল।"

ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, বিধানই ব্রহ্মবাণী। এই নিরাকার ব্রহ্মবাণী যতক্ষণ না মানুষের আকারে মানব-জীবনে প্রতিমূর্ত্তিত বা প্রতিফলিত হয়, ততক্ষণ কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে বা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। বাস্তবিক, নীতি বিধি শাস্ত্র কেবল কথাতে মতেতেই থাকিয়া যায়, যতক্ষণ না জীবনে কার্য্যে তাহা সাধিত হয়।

তাই যুগে যুগে যে যে বিধান বা যে যে ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা এক এক মহাপুরুষের জীবনে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে। খৃষ্ট-বিধান ঈশাজীবনে, মোসলমান-বিধান মোহম্মদের জীবনে, বৌদ্ধ-বিধান বুদ্ধ-জীবনে, গৌরাঙ্গ-বিধান শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনেই যে মূর্ত্তিমান্, ইহা কে না স্বীকার করিবেন। তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে, সেই সেই বিধানের অনুবর্ত্তিগণ, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাবতারবোধে, আপন আপন জীবনে তাঁহাদের ধর্ম্মবিধান যে মূর্ত্তিমান্ হওয়া সম্ভব, ইহা মনে করেন নাই।

সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিবার জন্যই নববিধান সমাগত। নববিধান সর্ব্ব বিধানের সমন্বয়-বিধান। এ বিধানও ব্রহ্মবাণী বা পবিত্রাত্মার বিধান। কিন্তু ইহাও কেবল শাস্ত্র বা মতে নিবদ্ধ নয়, ইহা জীবনে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না করিলে, ইহাকে বিধান বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। কারণ বিধান যতক্ষণ না মূর্ত্তিমান হয়, ততক্ষণ বিধানই নয়।

এই জন্য নববিধানাচার্য্য প্রার্থনায় বলিলেন, "আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? ঈশা মুষা গৌরাঙ্গের বিধানে যে লোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। মানুষ যদি না হয়ে থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা। দোহাই, হরি, গরিব বলিতে চায় যে, ঈশা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরিব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না। কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল সার্ব্বভৌমিক হইল, কাল মলিন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল। সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে। তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে, অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে, অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে। আমি নববিধানে সব ধর্ম্মের সমন্বয় মিলন দেখিতেছি। আমি তো সিদ্ধ হইয়া জন্মি নাই। আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম। পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্য বিধানে তো তা হয় নাই। প্রেমভক্তি ছিলনা, ভক্তদের জানিতনা, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল। সকলের আশা হইবে। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ, আমি নিশ্চয় বলছি, আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হইবে। নারকী উদ্ধার হইতে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে, ভাই, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। এঁদের বন্ধু দরকার, একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। এঁদের যখন বড় খিদে পাবে, একটা মেঠাইএর দানা আমাকে কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত আমি দেখাতে চাই।"

নববিধানের বাণীতে যদি আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই নববিধানের মূর্ত্তিমান্ বাণীতেও বিশ্বাসী হইতে হইবে। নববিধানে বিশ্বাস অর্থ "প্রত্যক্ষ দর্শন", কেবল মতে স্বীকার নয়। সুতরাং নববিধানের মূর্ত্তিমান্ মানুষ বলিয়া যিনি আত্মপরিচয় দিলেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাস করা নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে বিশ্বাস করার অর্থ, তাঁহার উক্তিতে বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের প্রমাণে বিশ্বাস এবং তাহা বিশ্বাস করিয়া নিজ জীবনে তাহা অনুসরণ।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমার প্রত্যেক বিন্দু সত্যেতে পূর্ণ", "আমি বানিয়ে বলিনা, বাণী শুনিয়া বলি।" সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে, তাঁহার উক্তি যে ব্রহ্মবাণী, ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি ব্রহ্মবাণী শুনিয়া বা ব্রহ্ম-নিশ্বসিত হইয়াই বলিয়াছেন, "সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত আমি দেখাতে চাই।" "এবারও মানুষ চাই, আমার জীবন দেখ—কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে।" ইহার অর্থ আর কিছু নয়, "একজন আমাদের মধ্যে ঈশা গৌরাঙ্গের মত হয়েছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে।"

কেননা তিনি বলিলেন, "নববিধান আশার বিধান, পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে দেখা যায়, অন্য বিধানে তা তো হয় নাই যে, সকলের আশা হইবে।"

এইটীই এই জীবনের মহাবিশেষত্ব। এই বিধানের মূর্ত্তিমান্ মানুষ যিনি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের ঈশা গৌরাঙ্গের ন্যায় বিধান-মূর্ত্তিমান্ মানুষ হইলেও, তাঁহারা যেমন "সিদ্ধ" মানুষ, নববিধানের মানুষ আপনাকে পাপী মানুষের সমজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কেননা তাহাতে পাপী মানুষের আশা হইবে। তাই বলিলেন, "আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরুদ্ধ ভাব ছিল, এমন কার? কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল সার্ব্বভৌমিক হইল; কাল

মলিন ছিল জ্যোতির্ম্ময় হইল, ইহাতে সকলের আশা হইবে।"

যুগে যুগে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাত মানুষের আদর্শ হইয়াই জন্মলাভ করিয়াছেন; কিন্তু "নববিধানের প্রসাদে অনেক কেঁদে" অর্থাৎ প্রার্থনার বলে "নববিধান পেয়েছে", এমন মানুষ নববিধানের মানুষ না হইলে, কেমন করিয়া পাপী নারকী উদ্ধার পাইবে, পাপী মানুষ নববিধানের মানুষ হইবে, কাল জ্যোতির্ম্ময় হইবে। ইহারই দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য নববিধান-মূর্ত্তিমান কেশবচন্দ্র আশার চন্দ্ররূপে প্রেরিত।

আবার কেবল ইহা মতে স্বীকার করাই, নববিধানে বা নববিধানের মানুষে বিশ্বাস করা নয়। তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইলে, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত তেমনি পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ করিতে হইবে।

তাহারই জন্য তিনি বলিলেন, "নারকী উদ্ধার হতে পারে, ইহা যদি দেখিতে চাও, তবে, ভাই, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ।" এবং মাকে বলিলেন, "যখন এঁদের বড় খিদে পাবে, আমাকে একটা মেঠাইএর দান কর, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই।" ইহার গভীর তাৎপর্য্য বিধান-বিশ্বাসী মাত্রেরই অতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য।

তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাকে ভাই বলিয়া, বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং উপাসনায় বা জীবনের পথে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হইবে। আবার মেঠাই যেমন অনেকগুলি দানার সমষ্টি, তেমনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় নববিধানের মিষ্ট মেঠাইরূপে ধর্ম্মক্ষুধায় ক্ষুধিত হইয়া তাঁহার চরিত্র আহার করিতে হইবে বা আত্মস্থ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহাকে যথার্থ গ্রহণ বা গ্রহণের সাধন।

অতএব আমরা যদি নববিধানের মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, তাহা হইলেই নববিধানের এই মূর্ত্তিমান্ মানুষকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-বন্ধু বলিয়া সদা সঙ্গে রাখিতে হইবে এবং যথার্থ ধর্ম্মক্ষুধায় ক্ষুধিত হইয়া তাঁহার চরিত্র আত্মস্থ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ করিয়া নববিধান-মূর্ত্তিমান্ মানুষ হইব। এতদ্ভিন্ন আর অন্যগতি নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধান সহজ বিধান!

আচার্য্য বলিলেন, এই ঘটী থেকে জল পান করা যেমন সহজ, ঈশ্বরকে দেখা, তাঁর বাণী শোনা তেমনি সহজ। এজন্যই নববিধানও অতি সহজ বিধান। কেন না, ইহা মানবের স্বভাবের ধর্ম্ম। নিঃশ্বাস ফেলা যেমন সহজ, নববিধানে বিশ্বাস তেমনই সহজ। কেবল আমরা অস্বাভাবিক-ভাবাপন্ন হইয়াছি বলিয়াই, ইহা আমাদিগের পক্ষে অসহজ বা কষ্ট-সাধ্য মনে হয়।

—•—

ভাবে ঐক্য।

শব্দে অনেকের সঙ্গে মিলন হয়, কিন্তু ভাবে মিলন হয় না। ইহার কারণ, শব্দ বাহিরের, ভাব ভিতরের বস্তু। আমরা ব্রাহ্ম বলিলে অনেক লোক পাই, আমরা নববিধান-বাদী বলিলেও কতক লোক পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবের ভাবুক অতি কমই। বাহিরের মিলনে তাই তৃপ্তি হয় না। অন্তরের মিলন, ভাবের মিলন বিনা যথার্থ মিলন হয় না। কারণ ইহাই যোগের মিলন, স্থায়ী মিলন। ভাবের মিলন যাহাতে পরস্পরের মধ্যে হয়, তাহারই জন্য যেন আমরা আকাঙ্ক্ষিত হই।

ব্রহ্ম-সম্ভোগ।

আকাশ বাতাসে সর্ব্বদাই ভরা রহিয়াছে। কখনও তাহা বহমান হয়, কখনও স্থির অবাত-কম্পিত অবস্থায় রয়। বাতাস আপনি আপনি যখন বহমান হয়, তখন আর তাহা সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিতে হয় না। যখন অবহমান, তখন পাখা নাড়ীতে হয় এবং তাহা নাড়িবা মাত্র বাতাস গায়ে লাগিয়া থাকে। বিধানের অবস্থা বহমান বাতাসের অবস্থা। সাধনের অবস্থা পাখা নাড়িয়া বাতাস সেবনের অবস্থা। এমনই উপাসনার অবস্থায় যখনই সত্যং জ্ঞানমনন্তং উচ্চারণ করি, তখনই সত্যং জ্ঞানং অনন্তের প্রভাব জীবনে অনুভূত, হয়। ইহাই সহজ ব্রহ্ম-সম্ভোগ।

উপদেশ।

(গত ২৪শে মার্চ্চ, রবিবার, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকালে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ যে আত্মনিবেদন করেন, তাহার মর্ম্ম)

আগামী কল্য পূর্ণিমা তিথি, ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্তের জন্ম-তিথি। আজ পূর্ব্ব দিনে আকাশের চন্দ্র যেন পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোতি ও শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া পূর্ণাকার ধারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উর্দ্ধদিকে ছুটিতেছে। আজ আমাদের মনও সেই নবদ্বীপের চন্দ্র, বঙ্গ ও ভারতের গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহর সরস সুন্দর অথচ তেজঃপুঞ্জ স্বর্গের চরিত্র খানি ভাল করিয়া প্রাণে ধারণ করিয়া, আত্মার একটা পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। আগামী কল্য সেই উপলক্ষে ঈশ্বরের পূজা বন্দনা, কীর্ত্তনাদি ও পাঠ প্রসঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে, এবং তাহার ভিতর দিয়া সকলের সেই অগাধ জীবন-সমুদ্রের গভীরে প্রবেশের সুযোগ উপস্থিত হইবে। আজ আমরা আরম্ভিক উদ্বোধনের ভাবে তাঁহার জীবন লইয়াই কিছু প্রসঙ্গ করি। বৈষ্ণব সমাজে একটা কথা আছে, "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ, 'তৃণাদপি' শ্লোকে ঘটাল পরমাদ।" শ্রীগৌরাঙ্গের এমন মধুর ভক্তির ধর্ম্ম—সুধামাখা হরিনাম-জপ ও হরিগুণ-কীর্ত্তন যে ধর্ম্ম-সাধনের বিশিষ্ট অঙ্গ, সে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে কে না চায়? ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, ছোট বড়, নানা অবস্থার নানা শ্রেণীর লোক ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের দল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন তাঁহারা সাধন-বিধি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে যাইয়া শুনিতে পাইলেন, তৃণ হইতে নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অমানী হইয়া, অন্যকে মান দিয়া হরিনাম-সাধনের অধিকার লাভ করিতে হইবে, অন্যথা নয়, তখন অনেকের মনে ত্রাস উপস্থিত হইল। ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিগণ জাতি কুল, মহত্ত্বেরই গুণে সমাজে বিশেষ গৌরবান্বিত। তাঁহাদের পক্ষে, তৃণ হইতে আপনাকে নীচ মনে করা, ক্ষতি বৃদ্ধি ও মান অপমানে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া, নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করাতো আর সহজ নয়। তাই কথা উঠিয়াছিল, "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ, তৃণাদপি শ্লোকে ঘটাল পরমাদ।" শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে জীবনে এই শ্লোকের মর্ম্ম কি ভাবে সাধন করিয়াছিলেন, একটু আলোচনা করিয়া দেখি।

আপনারা সকলেই জানেন, তিনি যৌবনে অধ্যয়নাদি যোগে মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইত, এবং তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার-কৌশলে পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিত। এইরূপে শুধু নবদ্বীপে কেন, সমস্ত বঙ্গদেশে নিমাই পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের জন্য মহা যশস্বী হইয়া উঠিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি কার্য্যে যেমন তাঁহার অনুরাগ, উদ্যম ও উৎসাহ, বিচারও তর্কদ্বারা পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠাতেও তাঁহার তেমনই উৎসাহ ও অনুরাগ লক্ষিত হইত। এইরূপে প্রথম জীবনের কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, ভিতরে ভিতরে তাঁহার প্রাণে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ হঠাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, ইহাতে নিমাইয়ের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। কিছু দিন পর, তাহার প্রিয়তমা প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হয়। এই সময়ে শুনা গিয়াছে, তাঁহার সহোদরা ভগ্নী প্রভৃতি আরও আত্মীয়াগণের পরলোক-গমন হয়। এই সকল ঘটনাপরম্পরাযোগে ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণে সংসারের অসারতা, দেহের ও ধনজনাদির অনিত্যতার ভাব জাগিয়া উঠিল। ক্রমে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আর ভাল লাগিলনা, মন যেন আর কিছু চায়। যিনি স্বর্গের নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে মহাব্যাপার সম্পাদনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বেশী দিন তিনি সংসারের অনিত্য বিষয় ব্যাপারে মত্ত থাকিবেন কিরূপে? এই সময়ে তিনি কয়েকটী ছাত্র সঙ্গে লইয়া, গয়াতীর্থে পিতৃ-পিণ্ডদান উদ্দেশে বাহির হইলেন। গয়াধামে বিষ্ণুপদ-দর্শনে তাঁহার প্রাণে ভক্তির অব্যক্ত ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া উঠিল। এইখানে ঈশ্বরপুরী নামে এক ভক্ত সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অতি বিনীত অন্তরে ইঁহার নিকট দীক্ষার্থী হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিমাইয়ের আর গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইলনা। কিন্তু ঈশ্বরপুরী নিমাইকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন— এখন তুমি গৃহে গমন কর, ইহার পর যখন সময় হইবে, তখন তুমি সংসার ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিবে। গুরুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিমাই গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া সর্ব্বদা হরিগুণকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন, অধ্যাপনাদি কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি অন্তরে যে বস্তুর আস্বাদন পাইয়াছেন, সে বস্তু তো আর সামান্য সীমাবদ্ধ সামগ্রী নয়। যতটুকু আস্বাদন করেন, সম্মুখে তাহার অনন্ত সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়া সমধিক লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ক্রমে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহার অন্তরে স্বতঃই এই জ্ঞানের উদয় হইল যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং জাতি কুলের মাহাত্ম্য দ্বারা জীবনে দেবদুর্ল্লভ হরিভক্তি-লাভ হইবেনা। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও জাতিকুলের অহঙ্কারকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া দীন অকিঞ্চন হইতে হইবে, এবং সেই ভাবে আপনাকে হরিপদে বিকাইয়া দিতে হইবে। তিনি এইরূপে হরিপদে আত্মসমর্পণ করিয়া, শুধু হরিকৃপার ভিখারী হইলেন, তাহা নয়; তিনি হরিভক্তিপরায়ণ সরল সাধুভক্ত বৈষ্ণবদিগেরও কৃপার ভিখারী হইলেন। তাঁহার অন্তরে এই সরল সহজ বিশ্বাসের উদয় হইল যে, এই হরিভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব সাধুদিগের প্রসন্নতা এবং কৃপা তিনি লাভ করিতে পারিলে, শ্রীহরিও তাঁহার প্রতি বিশেষ

প্রসন্ন হইবেন, এবং তাঁহাকে সমধিক কৃপা করিবেন। পূর্ব্বে যে সকল সরল-স্বভাব ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে দেখিলে নিমাই পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মহিমা গৌরবে পূর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া আমোদ পাইতেন, এখন সেই সকল সাধু ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে দেখিলেই তিনি তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে প্রণাম, অভিবাদন করিয়া কাতরভাবে তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতেন এবং তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা জানাইতেন, "আপনারা দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার হরিভক্তি লাভ হয়।" গঙ্গার ঘাটে গিয়া তিনি প্রাচীন ও প্রবীণ ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সেবা-কার্য্য নানাভাবে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ক্রমে বিনয় ও দীনতা এমন ব্যাকুলতা ও অনুতাপে পরিণত হইল যে, হরিভক্তি-লাভের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের উচ্চ ক্রন্দন ও অনুতাপ-ধ্বনিতে নিতান্ত পাষণ্ড প্রাণও গলিয়া যাইত। তৃণ হইতে নীচ হইয়া কেমন করিয়া হরিনাম সাধন করিতে হয়, কেমন করিয়া ভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ আপন জীবন দ্বারা দেখাইলেন। তিনি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া কত সহিয়াছেন, বহিয়াছেন—একবার স্মরণ করি। নিমাই পাণ্ডিত্য অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, পথের ধূলি হইয়া হরিনাম-জপ ও উচ্চনাম-কীর্ত্তনে সজনে, নির্জ্জনে হরিভক্তি সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্চ বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তি মাখা জীবন দেখিয়া দলে দলে লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাধন পথ অবলম্বন করিতে লাগিল। অপর দিকে পাষণ্ডী দলেরও অভাব ছিলনা। তাহারা বলিতে লাগিল, সে দিনের নিমাই পণ্ডিত, জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে; সেও যেমন, 'আমরাও তেমন, তাহার হঠাৎ কি মাহাত্ম্য বাড়িল যে, আমরা তাহার সাধনার অনুসরণ করিতে যাইব? শুধু তাহাই নয়, কত নিন্দা, গালি তাঁহার উপর বর্ষণ করিতে লাগিল, পাগল বলিয়া গায়ে ধূলি ছুড়িতেও লোকে কুণ্ঠিত হইল না। তিনি সকল সহ্য করিয়া, সকল বহন করিয়া সেই পাষণ্ডদিগেরই উদ্ধারের জন্য আপনার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্নেহের প্রতিমা মাতৃদেবীর বক্ষে নিদারুণ আঘাত দান করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। আপনি অমানী হইয়া অন্যকে মান দিয়া কৃষ্ণ-কৃপা আস্বাদন করিলেন; আপনার জীবন দিয়া, আচরণদিয়া অক্ষরে অক্ষরে 'তৃণাদপি' শ্লোকের সাক্ষ্য দান করিয়া জীবের পরিত্রাণের পথ খুলিয়া দিলেন। ধনীর সন্তান ভক্ত রঘুনাথ দাসের কথা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি যখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গেলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাব্রতধারী গোবিন্দকে বলিলেন, রঘুনাথ ধনী ঘরের সন্তান, সে হরিভক্তি-সাধনের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে; তাহাকে আমার এখান হইতে প্রতিদিন প্রসাদান্ন দিবে, তাহার যেন কষ্ট না হয়। রঘুনাথ প্রতিদিন শ্রীগৌরাঙ্গের ভোজনান্তে প্রসাদ পান, আর মনের সাধে ভক্তদল সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিভক্তি সাধন করেন। অল্প দিন মধ্যেই রঘুনাথ অন্তরে বুঝিলেন, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের অযাচিত কৃপার দান অন্ন-জল-গ্রহণে তাঁহার অধিকার নাই। তাঁহার জীবনে দীনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদান্ন পরিত্যাগ করিয়া, জগন্নাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার দৈনিক আহারাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রাণে যথেষ্ট দীনতার উদয় হইতেছেনা। তাই তিনি সিংহদ্বারে ভিক্ষাব্রত পরিত্যাগ করিলেন এবং জগন্নাথের উদ্বৃত্ত প্রসাদ যাহা ডেহনে প্রতিদিন পরিত্যক্ত হইত, এবং সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ গাভী ঘোড়া প্রভৃতি পশু ও পাখীতে খাইলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, রঘুনাথ তাহাই জলে ধৌত করিয়া লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এ সকল খবর রাখিতেন। একদিন রঘুনাথ সেইরূপ পরিত্যক্ত প্রসাদ ধৌত করিয়া আপন মনে আনন্দের সহিত আহার করিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং রঘুনাথের আহারের পাত্র হইতে রঘুনাথের উচ্ছিষ্ট একমুঠা অন্ন উঠাইয়া আপনার মুখে দিয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, রঘুনাথ, তুমি এমন দুর্লভ অমৃত আমাকে বঞ্চিত করিয়া রোজ রোজ নিজে খাইতেছ? এই আচরণ দ্বারা তিনি সেই প্রসাদের মান বাড়াইয়া দীনতারও মান বাড়াইলেন। এইরূপে মহাজনগণ "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের ও তাঁহার পারিষদ ভক্তদলের জীবনের এই সকল আচরণ দ্বারা, স্বয়ং পবিত্রাত্মারূপী শ্রীহরি আমাদিগকে যাহা শিখাইবার শিখাইয়া ধন্য করুন।

চয়ন।

ইং ১৮১৪ সনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ সনে (বাঙ্গলা ১৭৩৭ শকে) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার কলিকাতার মাণিকতলার বাগান বাড়ীতে "আত্মীয়সভা" স্থাপন করেন।* ১৮৪৬-৪৭ সনের (বাঙ্গলা ১৭৬৯ শকের) আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই "আত্মীয়সভার" বিষয় এই ভাবে বর্ণিত রহিয়াছেঃ—

১৭৩৭ শকে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার মণিকতলার বাগান বাড়ীতে "আত্মীয়সভা" সংস্থাপিত করেন। অল্প সময়ের পরেই ঐ সভা তাঁহার সিমলার বাড়ীতে উঠিয়া যায়। ইহার পরে ঐ "আত্মীয়সভা" তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ঐ আত্মীয়সভাতে বেদ পাঠ করা হইত

এবং সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মসংগীত হইত। কিন্তু উহাতে বেদের কোন ব্যাখ্যা হইতনা। অধ্যাপক শিবশঙ্কর মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন এবং গোবিন্দ মাল সংগীত করিতেন। মাননীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয় কখন কখন সেখানে যাইতেন। ব্রজমোহন মজুমদার, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং লালমোহন মজুমদার শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে যোগদান করিতেন। এই আত্মীয়সভার তখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবেশন হইত। কখনও ভূ-কৈলাসের রাজা কাশীশঙ্কর ঘোষালের বাড়ীতে, এবং কখনও বড়বাজারের বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮১৯ সনের পরে "আত্মীয়সভার" অধিবেশন বন্ধ হইয়া যায় এবং উহা উঠিয়া যায়।

১৮২৭ সনে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পুনরায় খৃষ্টান একেশ্বরবাদিগণের সহিত একযোগে এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় বারের চেষ্টার ফল। উহা "হরকরা আফিসের" এক অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ এডাম এখানে এই একেশ্বরবাদ-প্রচারকার্য্য ও উপাসনা-পদ্ধতি স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই বিদেশাগত বৃক্ষটি সতেজ হইতে পারে নাই। এখানে ইংরেজী ভাষায় প্রাতের উপাসনায় অতি সামান্য ব্যক্তিই অমনোযোগ সহকারে উপস্থিত হইতেন। এমত অবস্থা দেখিয়া "Unitarian Committee" মিঃ এডামকে আর এ কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিতে পারিলেন না। তখন মিঃ এডাম ভগ্নহৃদয়ে এ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ১৮২৮ সনের প্রথম ৬মাসের মধ্যে এ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ইহার পর দৃঢ়চিত্ত রাজা ১৮২৮ সনের ২০ এ আগষ্ট পুনরায় আর একটি সভা সংস্থাপিত করিলেন এবং ইহার আত্মীয়সভার পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-সভা নামকরণ করিলেন। তখনও উহা "ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়া আখ্যাত হয় নাই। উহাতে ঐ সেই ১৮১৫ সনের স্থাপিত আত্মীয়সভার ন্যায়ই উপাসনার ব্যবস্থা হইল। মাত্র সামান্য এই পার্থক্য রহিল যে, পূর্ব্বের আত্মীয়সভাতে পণ্ডিত শিব শঙ্কর মিশ্র মহাশয় শুধু বেদ পাঠ করিতেন। এখানে বেদ ও উপনিষদ উভয় হইতে পাঠ হইতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বেদ ও উপনিষদ পাঠ করা হইত। তাহাতে শুধু ব্রাহ্মণেরাই উপস্থিত হইতে পারিতেন এবং তাহার পরে সংলগ্ন একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে পণ্ডিত উৎসবানন্দ গোস্বামী ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উভয়েই ঐ সকল পঠিত অংশের ব্যাখ্যা করিতেন এবং ঐ সেই পূর্ব্বেকার গোবিন্দ মালই সংগীত করিতেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলেই থাকিতেন। এই ভাবের উপাসনা চিৎপুর রোডের কমল বসুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইত। তখন দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। উৎসবানন্দ গোস্বামী উপনিষদ হইতে পাঠ করিতেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাঙ্গলাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই সভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাজর্ষি মহারাজা রামচন্দ্রভঞ্জদেব।

অনেক দিন হইতে আমাদিগের চির ভক্তিভাজন রাজর্ষি মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরের বৈরাগ্য-প্রধান জীবন-কাহিনীর একটু আভাস আমাদের পত্রে প্রকাশ করিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা চলিয়া আসিতেছে। আজ আমার ক্ষুদ্র লেখনী সেই চিত্র দিবার জন্য পাঠক পাঠিকা-দিগের নিকট উপস্থিত। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মহারাজা বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। ঐ সনের আগষ্ট মাসে যখন আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদা ও মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী, কনিষ্ঠা রাজকুমারী দেবী এবং আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী দার্জ্জিলিং প্রবাসে বাস করিতে ছিলেন, সেই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ ও মাননীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর ও শ্রদ্ধাস্পদা মাননীয়া মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারুদেবীও দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের এই সুন্দর সমাবেশ ও সম্মিলনের মধ্যে সেই সময়ের সাময়িক উৎসব "ভাদ্রোৎসবের" আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে. এই সময়ে আমি কুচবিহারে সুনীতি কলেজ সম্বন্ধীয় কার্য্যে সপরিবারে উপস্থিত। ভাদ্রোৎসব সম্বন্ধে উপাসনার কার্য্যভার লইবার জন্য শ্রদ্ধাস্পদা মহারাণী সুনীতি দেবীর অভিপ্রায়ানু-সারে শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের টেলিগ্রাম আসিয়া পড়িল। আমিও বিধাতার আদেশে দার্জ্জিলিংয়ে উপস্থিত হইলাম। ভাদ্রোৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য উপাসনার ব্যবস্থা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের, Rose Bank নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রকোষ্ঠে স্থির হইয়াছিল। এই স্থানের সঙ্গে নববিধানের এক আধ্যাত্মিক যোগ চলিয়া আসিতেছিল। শ্রীমদাচার্য্য এই স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়া যোগ-সাধন করিয়াছিলেন। উৎসবে কেবল দার্জ্জিলিং-বাসী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারাই যোগদান করেন তাহা নহে, বর্দ্ধমানাধিপতির তত্রত্য রাজ-কর্ম্মচারী মহাশয়েরাও যোগদান করেন। এই উৎসবের আনুষঙ্গিক উপাসনা মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরের বাসভবন Sligo Hall, ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের বাসভবন Rothi-may এবং Auckland Road এর উপরিস্থ আর এক

ভবনেও ব্যবস্থানুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই আশাপ্রদ অপূর্ব্ব সম্মিলনের মধ্যে মহারাজা ময়ূরভঞ্জাধিপতির উপাসনায় যে একাগ্রতা ও সমাহিত ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহার জীবন্ত চিত্র এখনও আমার সমক্ষে চিত্রার্পিতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে! এই উৎসবের আনুষঙ্গিক যে যে স্থানে প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে মহারাজা বাহাদুর সাধারণ মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া কুশাসনে বসিয়া কদলীপত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। উৎসব-ক্ষেত্রে তিনি সাধারণের সঙ্গে সাধারণ ভাবে ধুতি ও পিরাণ পরিধান করিয়া যে ভাবে বসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই দৃশ্য এখনও আমার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাব উদ্দীপিত করিতেছে! দার্জ্জিলিং হইতে আমার কুচবিহারে প্রত্যাগমনের পর মাননীয় মহারাজা আমাকে যে উৎসাহ-পূর্ণ ভাষায় পত্র লিখিয়াছিলেন, এখনও সে পত্র সযত্নে আমার বাক্সের ভিতর রক্ষিত হইতেছে।

আজ তাঁহার সরলতা-পূর্ণ শিশু ভাবের আর একটী সাক্ষ্যদান করিতে আসিলাম। যে দিন আমাদিগের সেই চির ভক্তিভাজন রাজর্ষি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পবিত্র দেহ-ভস্ম ইংলণ্ড হইতে কালকাতায় আসিয়া পড়িল, সেইদিন সেই মহাভস্মের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দিবার জন্য কলিকাতাবাসী অনেক ব্রাহ্ম হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। আমিও সে সময়ে ষ্টেসনে উপস্থিত। জানিতাম না যে, মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ষ্টেসনের কোন কক্ষে অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া আছেন। মহারাজা তাঁহার সেই অলক্ষিত স্থান হইতে আমাকে দেখিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কালোচিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার যে সকল ভৃত্য উপস্থিত ছিল, তিনি অনায়াসেই একজনকে পাঠাইয়া আমাকে ডাকিতে পারিতেন; কিন্তু সেই মহাহৃদয় মহারাজা স্বয়ং ছুটিয়া আসিয়া দেখা করিলেন ও আমার সঙ্গে একাসনে এক বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। তিনি রাজাসন ভুলিয়া গিয়া, সাধারণের সঙ্গে একাসনে বসিয়া, তাঁহার বৈরাগ্য-প্রধান জীবনের যে উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আজ সে দৃষ্টান্ত কোথায়? সরলতা ও শিশু-প্রকৃতির যে উজ্জ্বল প্রভাব মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ভিতর প্রতিভাত হইয়াছিল, মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের ভিতরেও সে প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ সেই বৈরাগী রাজর্ষিগণ কোথায়? প্রবুদ্ধ বুদ্ধের সেই বৌদ্ধ ভাব এবং রাজর্ষি জনকের ঋষিভাবে গঠিত আত্মার দৃষ্টান্ত কোন দিন অদৃশ্য হইবে না।

রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরের জীবনের একটু আভাস বলিতে গিয়া, প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মানন্দের প্রত্যাদেশের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রত্যাদিষ্ট কেশবের যে করাঘাত কোচবিহারের দ্বারদেশে পড়িয়াছিল ও যে করাঘাতে রাজর্ষি নৃপেন্দ্র-আত্মা দেশাচার-প্রচলিত দুর্ভেদ্য অবরোধ ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল ও যে করাঘাতের প্রতিধ্বনি অনতি-বিলম্বে তদ্বংশ-জাত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের আত্মাকেও তদ্রূপ জাগাইয়া তুলিল, সেই প্রত্যাদেশের করশব্দ শ্রীমন্ ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের বহুবৎসর পরে ময়ূরভঞ্জের দ্বারদেশে প্রতিধ্বনিত হইল। যে করাঘাত একদিন হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজগণ-পরিবার মধ্যে এক নবসংবাদ ঘোষণা করিয়াছিল, সেই করাঘাতের প্রতিধ্বনি কতদিন পরে সাগর-বারি-বিধৌত হিন্দুপ্রধান উড়িষ্যা প্রদেশে হিন্দু রাজপরিবারের দ্বারদেশে নববিধানের নবশব্দ রূপে ধ্বনিত হইল। প্রত্যাদিষ্ট সাধু পুরুষের করাঘাত কত জাতির মধ্যে কত বিঘ্ন বাধার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল, কিন্তু প্রত্যাদেশ কখনও স্থির থাকিতে পারে নাই। কৃষকের শস্যক্ষেত্রে কত বার কত কাঁটার গাছ বর্দ্ধিত হয় এবং কতবার তাহা কর্ত্তিত ও উৎপাটিত হইয়া শস্য-ক্ষেত্রকে ফল-প্রদ করিতে থাকে। প্রত্যাদিষ্ট সাধু মহাজনের শস্য-ক্ষেত্রও সেইরূপ সময়-সাপেক্ষ। পৃথিবীতে অনুকূল ও প্রতিকূল চিরদিনই থাকিবে। বিশ্বাসী অপেক্ষা করেন ও জয়যুক্ত হন। বিশ্বাসী হল ধারণ করিয়া বিশ্বাসের পথে ভূমি কর্ষণ করিতে থাকেন। পাহাড়ে শীতল ও উষ্ণ-প্রস্রবণ চিরদিনই থাকিবে। প্রকৃত পিপাসু তাঁহার পিপাসার জল অন্বেষণ করিয়া লন। বিশ্বাসীর ভিতরে নববিধানের কার্য্য এইরূপ।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।
নামকুম পোঃ, রাঁচি।

প্রেরিত কেদারনাথ দে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন এই বাড়ীতে কয়েক বৎসর থাকিয়া কলিকাতায় কেদারনাথ প্রচারের কার্য্য এবং নানা প্রকারের সৎ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। Interpretor নামক কাগজে ধর্ম্ম-বিষয় লিখিতেন। মেছুয়াবাজারে চার তলা বাড়ীতে Victoria School তখন Circular Road হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। ভাই কেদারনাথ আবার সেখানে মেয়েদের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় কোন সম্ভ্রান্ত কুলের ধার্ম্মিকা মহিলা কেবল ধর্ম্মের জন্য শ্বশুর গৃহ ছাড়িয়া একটী শিশুপুত্র সঙ্গে লইয়া আমাদের School এ পড়াইতে আসিতেন। ছুটী পাইলেই তিনি পিতৃদেবের নিকট আসিয়া ধর্ম্মের অনেক কথা প্রশ্ন দ্বারা জানিয়া লইতেন এবং ভাই কেদারনাথ অনেক উপদেশ দিয়া এই ধর্ম্ম-পিপাসু কন্যাটীকে ধর্ম্মপথে রক্ষা ও পরিচালিত করিয়াছিলেন। ছুটীর দিনে অথবা অন্য সময়

তিনি আমাদের বাড়ীতেও সর্ব্বদা পিতার নিকট হইতে ধর্ম্ম-পথের সহায়তা লইতেন। এই সময় ১৮৮৭ অব্দে, মে মাসে, ভাই কেদার নাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী নববিধান-বিশ্বাসী যুবক শ্রীরমণীকান্ত চন্দের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কেহ কিছুই জানিতেন না, স্বয়ং ব্রহ্ম এই বিবাহের কার্য্য পরিদর্শন ও সম্পন্ন করিলেন। ভাই কেদার-নাথ বৈরাগী ফকির ছিলেন। সংসারের কোন চিন্তাই তাঁহার ছিলনা। কোথা হইতে বর আসিল, কোথায় বিবাহ হইবে, কে বিবাহ দিবেন, তাহার ব্যয় নিমিত্ত অর্থ সামর্থ আসিবে কোথা হইতে, ঋষি কেদারনাথ কোন কিছুরই অনুধাবন করেন নাই। অথচ ভগবান্ আপন হস্তে ভক্তের সেবা করিলেন। কমলকুটীরে বিবাহ অনুষ্ঠানটী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। স্বর্গীয় ব্রাহ্মবন্ধু মঙ্গলগঞ্জের জমীদার বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ সকল ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যে শ্রীআচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন, নববিধানে এইরূপ হবে, বর ঠিক নাই, টাকা হাতে নাই, কোথাও কিছু নাই, কিন্তু বিয়ের বাজনা বসিয়া গেছে, এই বিবাহ ঠিক সেই রূপই হইল। তাঁহার কন্যার বিবাহ, তিনি রাত্রে খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষীর হয় নাই? কন্যা বিদায় হওয়ার পর ভাই কেদার নাথ দ্বিগুণ উৎসাহে নিজ জীবনের কার্য্য করিতে লাগিলেন। ভোর হইতে রাত্রি প্রায় ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কত বাড়ীতে সকালে ও বিকালে কোন অনুষ্ঠানিক কার্য্যে এবং অন্য বাড়ীতে সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে উপাসনা করিতেন। বেনেপুকুরে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার বাস করিতেন। সেখানে বাবাকে তাঁহারা উপাসনা করিতে ডাকিতেন এবং বিশেষ রূপে উপকৃত হইয়া তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। বেনেপুকুরের ব্রাহ্মদিগের নিকট ভাই কেদারনাথ একদিন শুনিলেন, সেখানে একটী গরিব ভদ্র গৃহস্থ যুবতী স্ত্রী ও দুইটী শিশু পুত্র লইয়া বাস করিতেন। অতি ক্লেশে সংসার চলিত। তিনি ব্যারামে পড়াতে যাহা কিছু অর্থ ছিল, নিঃশেষ হইয়া গেলে। পরে মারা গেলেন। তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন ও খাইবার থাকিবার স্থান নাই। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া পরদুঃখ-কাতর ভাই কেদারনাথের প্রাণ আকুল হইল। অনতিবিলম্বে শিশু পুত্র দুইটী ও তাহাদিগের মাতাকে নিজের নিতান্ত অস্বচ্ছল সংসারে লইয়া আসিলেন। খাওয়ার কথার ত দূরে থাকুক, যে সংসারে ১০।১১টী প্রাণীর জন্য এক পয়সার ঘি তেলে দিন কাটিত, সেখানে আর তিনটীকে কেবল দয়ার খাতিরে ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া লইয়া আসিলেন। অবস্থা ছিল এই যে, ছেলেগুলি বই খাতার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইত, জুতা বিনা শুধু পায়, ছেড়া ময়লা কাপড় জামা পরে স্কুলে চলিয়া যাইত। তবু ছেলেগুলির কোন বিরক্তি বা উত্ত্যক্ত ভাব ছিল না। কয়েকটী বালক মাতার কথা বেদবাক্যের মত মানিয়া চলিত। একবার জজ কেদারনাথ রায়ের পত্নী বেড়াইতে আসিয়া দেখিলেন, ছেলেরা খাইতেছে। পরে তিনি অন্য একটী ব্রাহ্মিকার নিকট গল্প করিয়াছিলেন, ছেলে মেয়েগুলি এমন ভাল দেখিলাম, ছোট্ট উঠানটীতে সকলে স্কুল হইতে আসিয়া খাইতে বসিয়াছে, মা যাহা কিছু দিলেন, নিঃশব্দে অম্লানবদনে খাইয়া উঠিয়া গেল। কেহ কিছু চাহিল না অথবা কোন আব্দার করিল না। অন্য একজন আমাদের বাড়ীওয়ালা গৃহিণী বামন দিদি বলিয়াছিলেন, আধ-খানি আলু পটলের ঝোল ভাত খেয়ে ছেলেগুলির কি সুন্দর স্বাস্থ্য, এ নিশ্চয় হরির দৃষ্টিতে হয়েছে। এমনত কোথাও দেখিনি। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে থাকা কালীন, সেই স্থানের অতি নিকটেই একটী বাড়ীতে শ্রদ্ধেয় রামতনু লাহিড়ী বাস করিতেন। তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিতেন। একদিন বৈকালে আসিয়া বালকগুলিকে খাইতে দেখিয়া মাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি এইটী বেশ কর। সকাল সকাল খাওয়া শেষ করা বড় ভাল। ইহাতে শরীর ভাল থাকে। বেশ বেশ, আমি দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। স্কুল হইতে আসিয়া সকলে আহার করিত, পরে খেলা করিয়া, বেড়াইয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া, বিছানায় যাইত। আর কোন কিছু খাইবার বন্দোবস্ত ছিল না। পিতৃদেব অধিক রাত্রে আসিতেন। তিনি কখনও রাত্রে ভাত খাইতেন না। ৮খানি রুটী, ২খানি ভাজা ও একটু ডাল, মা আলাদা করিয়া রাখিয়া দিতেন। ভাই কেদার নাথ ঢাকা খুলিয়াই রুটী গুণিতেন এবং খাইবার পূর্ব্বেই ছেলেদের সকালের জল খাবারের জন্য রাখিয়া অতি অল্পই নিজে খাইয়া উঠিতেন। এখন এই অসহায় শিশু দুইটীকে গৃহে লইয়া আসিয়া নিজের চেয়েও ইহাদের জন্য ব্যস্ত হইতেন। যখন যাহা খাইতেন, শিশুদের কাছে বসাইয়া তবে খাওয়া আরম্ভ করিতেন। প্রাতে স্নানের পর নাল্তে আদার ভাগও তাহারা লইতে ছাড়িত না। তিক্ত আস্বাদনের নিমিত্ত তাহাদের ঐটীতে ইচ্ছা না থাকিলেও, ছোলাভিজার লোভে খাইয়া ফেলিত। তাহাদের মা এ বাড়ীতে আসিয়া এত সুখী ও কৃতজ্ঞ হইয়াছিল যে, আপনার মা বাবার মত করিয়াই ভক্তির সহিত ডাকিত ও পরমানন্দে তাঁহাদের সেবা করিত। অনেক বছর আমাদের বাড়ীতে প্রফুল্লমনে হাসি মুখে বাস করিয়াছিল। কিছু দিন অন্তর ব্রাহ্ম হোমিওপ্যাথী ডাক্তার শরচ্চন্দ্র দত্তর স্ত্রী তাহাদিগকে নিজ আবাসে লইয়া যান। শুনিয়াছি, কুসুমদিদি অল্প বয়সে অল্পদিনের পরেই মারা গিয়াছেন। তাঁহার কথা স্মরণ হইলে এখনও মনে কষ্ট হয়। কুসুম দিদি কোন কথা হইলে বলিতেন, ছেলেরা আমার যদি সৎপথে না থাকে, আমি একদিকে চলে যাব। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনেই

আমাদের মনে হল, ছেলেদের ফেলে এমন দিকে চলে গেলেন, যেখান থেকে আর কখনও কেহ ফিরে আসে না।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী হেমলতা চন্দ।

—:০:—

দিন স্মরণ, দিন সাধন।

দিন, ক্ষণ অনুসরণ, বার, তিথি স্মরণ ও সাধন প্রাচীন ধর্ম্মবিধানের বিশেষ অঙ্গ। নববিধান প্রাচীন ভাবে যদিও তাহা অনুসরণ বা অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু তাহা যে অনেক পরিমাণে ধর্ম্ম-সাধনের উপযোগী, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করেন। সাধু ভক্ত ও প্রেরিতগণের জন্মদিন এবং স্বর্গারোহণ দিন যেমন তাঁহাদিগের আত্মার সহিত যোগ সমাধান করিবার দিন, তেমনি নব-ধর্ম্ম-বিধানে যে যে দিনে যে যে মহানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সেই দিন স্মরণেও আমরা যথেষ্ট উপকৃত হই।

এবার বিশেষ ভাবে নবদেবালয়ে প্রেরিত-নিয়োগের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে, নববিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণকে কি ভাবে শ্রীমন্নববিধানাচার্য্যদেব গ্রহণ ও স্বীকার করিলেন, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইয়াছি। তাঁহাদের মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, তাঁহারা যে নববিধান-ঘোষণার জন্য প্রেরিত এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক এক বিশেষত্ব আছে, তাহা স্বীকার ও গ্রহণ করা নববিধানের নূতন সাধন। নববিধানাচার্য্য নিজ সম্বন্ধেও যেমন বলিলেন, "আমাকে পাপী জেনে, মূর্খ জেনেও, নববিধান সম্বন্ধে আমি যাহা বলি, তাহা যিনি বিশ্বাস করেন, তাকেই বলি বিশ্বাস।" এই ভাবে নববিধানের প্রত্যেক প্রেরিতকেই গ্রহণ ও বিশ্বাস করিতে হইবে। স্বয়ং বিধাতাও ত আমাদের সহস্র দোষ দুর্ব্বলতা জানেন, তথাপি যেমন আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আমাদের হাতে তাঁর যুগধর্ম্ম-বিধান দান করিয়াছেন, তেমন আমাদেরও প্রেরিত প্রচারকদিগকে বিশ্বাস করিতে ও তাঁহাদের বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বাস করিলেই স্বর্গ নিকট হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিজনের নিয়োগ ও দায়িত্ব অনুভব করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। এই দিন আবার নববিধানাচার্য্য বিশেষ ভাবে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন এবং তদ্দ্বারা ভিক্ষাব্রতের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেন। যুগে যুগে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মাত্রেই সংসার-ত্যাগী হইয়া এই পবিত্র ব্রত অবলম্বনে শরীর রক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের অনুগামিগণ এই ভিক্ষা-ব্রতকে বৃত্তিতে পরিণত করিয়া, কতই আত্মমর্য্যাদাহীন হয়েছেন এবং এই উচ্চব্রতেরও পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছেন। আমরা সংসারে থাকিয়াও ভিক্ষা-ব্রত ধারী হইব কেননা, ভিক্ষা-ব্রত দীনতা-সাধন-ব্রত। পুরুষকার অহং দমন করিয়া ঈশ্বরের দ্বারে অধ্যাত্ম অন্নের জন্য যেমন প্রার্থনা, ব্রহ্মমন্দিররূপ শরীর-রক্ষার জন্য ভিক্ষান্ন-গ্রহণও তেমনি। এইভাবে ভিক্ষান্ন যিনি দান করেন, তিনিও ধন্য হন; যিনি গ্রহণ করেন, তিনিও ধন্য হন। নববিধানাচার্য্য এই উচ্চভাব সাধনের জন্য, প্রেরিত প্রচারকদিগের নিমিত্ত ভিক্ষা-ব্রতের উপযোগিতা আচরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিলেন। দাতার হাত দিয়া মার দেওয়া ভিক্ষান্ন, ভিক্ষাবস্ত্র গ্রহণে যে শরীরপোষণ, তদ্দ্বারা আত্মারও কল্যাণ-সাধন হয়, ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন। আমরা তাঁহার সহিত গরিব ভিখারীদল হইয়া, মার চির-কৃপার ভিখারী হইয়া, যেন ভিক্ষান্নে পরিপুষ্ট হইয়া নববিধান প্রচার করি এবং ভিক্ষা করিতে করিতে স্বর্গে উত্থান করিতে পারি।

বসন্তপূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব নবভক্তি-সাধনের উৎসব। নববিধানাচার্য্য বলিলেন, আকাশের পূর্ণচন্দ্র বড়, না নবদ্বীপের গৌরচন্দ্র বড়? পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, পূর্ণ মার পূর্ণ প্রেম-প্রকৃতিতে গঠিত গৌরচন্দ্র মার অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্যের বিকাশ। প্রেমের সৌন্দর্য্যের মত সৌন্দর্য্য এমন আর কি? সূর্য্যের জ্যোতি যেমন পূর্ণচন্দ্রে প্রতিফলিত, তেমনি মার পুণ্যজ্যোতি গৌরচন্দ্রের প্রেম-জ্যোৎস্নায় প্রতিবিম্বিত। সেই গৌরচন্দ্রের শুভ জন্মদিনে নববিধানের নবভক্তির জন্য হৃদয়ে উপভোগ করিয়া আমরা ধন্য হই। গৌরচন্দ্র-গ্রহণে আমাদের আত্মা যেন সংসার-রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যপ্রেমের উন্মত্ততা লাভে কৃতার্থ হয়।

বসন্তোৎসব ঋতু সমাগম-সাধনের উৎসব। শীত এবং গ্রীষ্মের সময়কাল বসন্তকাল। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ও পৃথিবীতে মলয়সমীরণের প্রবাহে প্রকৃতি নবশোভায় পূর্ণ। বৃক্ষের পুরাতন পল্লব ঝরিয়া পড়িল, নবপল্লব উদ্গত হইল। নববিধানের ভাব ও প্রকৃতির উপমা এই বসন্তঋতুতে যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত, এমন আর কোথায়? এই নিমিত্ত সে দিন নবদেবালয়ের রোয়াকে, নবশিশু ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে পরিবার ও দল মিলিত ভাবে বসন্তোৎসব-সাধনে আমরা যথার্থই ধন্য হইয়াছি।

বৈশাখী নববর্ষ-দিন নববিধানের এক বিশেষ দিন। এই দিনে প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নববিধানাচার্য্য ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। মহর্ষিদেব বলেন, তিনি ঈশ্বরের আদেশ লাভ করিয়াই শ্রীকেশবচন্দ্রকে এই পদে বরণ করেন এবং তাহার পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনের ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিয়া ক্রমে আপনি অবসর গ্রহণ করেন।

সুতরাং মহর্ষিদেব যেমন ঈশ্বরালোকে ব্রহ্মানন্দকে "ব্রহ্মানন্দ" এবং আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলেন, আমরাও যেন তাঁহাকে

সেই ভাবে গ্রহণ করি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনে আচরণ দ্বারা নববিধান সপ্রমাণ করি।

এই দিন আবার আচার্য্যের সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবী আচার্য্যের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়া, অতি শৈশবেই তাঁহার সহিত সংসার-গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুসরণ করেন এবং সতীত্ব-সাধনে পরিণামে যেমন ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে একাত্মতা-লাভে "দুজনে একজন" হইলেন, তেমনি আমরাও এই একাত্মতা-ব্রত-সাধনে নিরত হই।

এই দিন আরও আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রেরিতবর্গকে চারিটী বিশেষ ব্রত প্রদত্ত হয়। বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, পবিত্রতা। বলা বাহুল্য, এই চারিটী ব্রত-সাধনের প্রতি নিষ্ঠার অভাবে আমাদের কতই দুরবস্থা হইতেছে। তাই পুনঃ পুনঃ সেই পুণ্যস্মৃতি জাগ্রত করিয়া, যাহাতে এই সমুদয় ব্রতপালনে আমরাও সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারি, তাহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক। এই ব্রত-পালনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, কিছুতেই আমরা আমাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রেরিত-ব্রত-সাধনের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবনা।

এই দিন হিন্দুগণ নব-ব্রত গ্রহণ করিয়া বর্ষারম্ভ করিয়া থাকেন। এমন কি শিশুদিগকে পর্য্যন্ত পুণ্যপুকুর ও চিত্র-সাধনার্থে ছোট ছোট ব্রত প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন অপেক্ষা নবীন বিধানের সাধন-বিধি আরো কত উচ্চ, আরও কত গভীর। যাঁহারা এই ধর্ম্মপালনে কৃতসংকল্প, তাঁহারা এই দিন ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও মণ্ডলীগত ভাবে, অবস্থা ও আধ্যাত্মিক অভাবের উপযোগী কত প্রকার ব্রত গ্রহণ করিয়া বর্ষারম্ভ করিলেন।

বিশেষভাবে এই বর্ষেই ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ এবং নব-বিধানের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইবে। এই মহোৎসব-সাধনের জন্য এই দিন হইতে আমরা বিশেষ প্রাত্যহিক ব্রত অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। নববিধান-বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী, সাধক সাধিকা, প্রচারক পরিচারিকা ভাই ভগ্নীগণ কে কি ভাবে এজন্য প্রস্তুত হইতে সংকল্প করিতেছেন, জানি না। পরস্পরের সহিত ভাবের বিনিময় করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

—•:•:•—

আর্য্যনারী-সমাজ।

গত ৮ই এপ্রেল, সোমবার, শ্রীমতী মণিকা দেবীর নূতন গৃহে আর্য্যনারী-সমাজের অধিবেশন ও প্রীতি-সম্মিলন হইয়াছিল। মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা করেন। প্রায় একশত মহিলা সমবেত হইয়া উপাসনায় যোগদান করেন। শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর মধুর উপাসনায় সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি বিশেষ ভাবে শ্রীমতী মণিকা দেবীর পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী প্রাচীনা ব্রাহ্মিকা শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী, যিনি কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মণিকাদেবী শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ হইতে "দাসীব্রত" বিষয়ক উপদেশ পাঠ করেন ও এই অনুষ্ঠানে তিনি যে প্রার্থনা করেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

আনন্দময়ি জননি, আজ এই কথাই কেবল বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কেন ভালবাস মা আমায়, আমি যে অধমপাপী কত অপরাধী তব পায়।" সত্য সত্যই তোমার প্রেমের প্রমাণ আজ এই আনন্দমিলনে দেখাইলে। আমার সাধ পূর্ণ করিলে। আজ তুমি যে প্রেমের মূর্ত্তি ধরে এসেছ, সকলকে তাহা ভাল করে দেখতে দাও। এই মিলনে পরস্পরের প্রেমের সংঘর্ষণে যে অভিনব প্রেমপরিবার গঠিত করিতেছ, তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত, সুখী ও আনন্দিত হইতেছি। এ মিলন যে স্বর্গীয়। তোমার চরণতলে বসিলেই বুঝিতে পারি, আমরা সকলে তোমারই সন্তান, অমৃতের অধিকারী।

কিছুদিন পূর্ব্বে তুমি এ পরিবারের জননীকে তোমার শান্তিবক্ষে তুলিয়া লইয়াছ। অমর নিকেতনে স্থান দান করিয়াছ। মৃত্যু না দেখিলে আমরা অমৃতের সন্ধান করিনা; তাই তুমি মৃত্যু আন। বিচ্ছেদ না ঘটিলে মিলনের অপূর্ব্ব সুখ অনুভব হয়না, অন্ধকার না দেখিলে আলোর মর্য্যাদা বুঝিনা; তাই তুমি জীবন মৃত্যু, বিচ্ছেদ মিলন, আলো আঁধার পাশাপাশি রেখেছ। যাঁহাকে নিয়ে গিয়েছ, তাঁকে শান্তি ও আনন্দ দাও। তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া শরীরের সকল অশান্তি দূর করিয়া দিয়াছ। এখন সুখে রাখ, শান্তিতে রাখ, আনন্দে রাখ তাঁরে।

আজ যে ভগ্নীগণ দয়া করে আমার এ গৃহে পদধূলি দিয়াছেন, তাঁদের তুমি ভাল করে মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ কর। তাঁদের পদধূলি আজ আমার অঙ্গের ভূষণ। আজ আমি ধন্য হইলাম, এ গৃহ ধন্য হইল। যে প্রিয়তমা ভগ্নী মধুরকণ্ঠে তোমার নাম শুনাইলেন, তাঁকে বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ কর। তিনি মধুর হরিনামে চিরদিন সকলকে পরিতৃপ্ত করুন। তোমার ইচ্ছা তাঁর জীবনে জয়লাভ করুক, তোমার নাম ধন্য হউক।

আজ এ আনন্দোৎসবে কত কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু দুর্ব্বল আমি, আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। তুমি মনের কথা সবই জানিতেছ। আমার জীবন ধন্য হইল। আমার স্নেহের ভগিনী, শ্রদ্ধেয়া ভগিনী, পূজনীয়া ভগিনী সকলে যে আমার কত আদরের; আশীর্ব্বাদ কর, তাঁদের সঙ্গে প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় কর, সুমধুর কর। জননি, আশীর্ব্বাদ কর আমাকে। যে পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই পূজনীয় পিতা ব্রহ্মানন্দদেবকে স্মরণ করি, তাঁহার ইচ্ছা

আমার জীবনে ও এ ক্ষুদ্র পরিবারে পূর্ণ হউক। এই বংশের উপযুক্ত হইয়া যেন জগতের নিকটে এই নামে পরিচিত হইতে পারি।

করুণাময়ি, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ইচ্ছা এ পরিবারে জয়যুক্ত হউক, তোমার নাম মহিমান্বিত হউক। সুখ আনন্দের মধ্যে তোমাকে গৃহদেবতা রূপে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করি, প্রাণের দেবতা বলে তোমার পূজা করি, প্রাণের সর্ব্বস্ব বলে তোমার চরণে সব সমর্পণ করি। সুখ আনন্দের মধ্যে তোমাকে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে কি করে পূজা করিতে হয়, তাহা দেখাও। তুমিত আমাকে ছাড়না, আমি যেন তোমাকে না ছাড়ি। নিত্য সঙ্গী হয়ে কাছে থাক, তোমার বাণী শোনাও, তোমার অপরূপ রূপ প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। আমার এ প্রাণ তোমারই, তুমি লও। ভক্তিভরে তব শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

প্রায় ১৫ বৎসর পরে কোচবিহারের বিশ্বাসী বন্ধুদিগের আহ্বানে উৎসবের যাত্রিরূপে যাইয়া, নববিধান-জননীর নবভক্তের অশ্রুতীর্থে উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। যে সময় ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বাহিরে ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল, সেই আন্দোলনের মধ্যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের আদেশে ভক্ত ব্রহ্মানন্দ তাঁর আদরের কণ্যা সুনীতি দেবীকে কোচবিহার মহারাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনাকেও বিধাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রথম লীলাভূমি কোচবিহার এখনও সাক্ষ্যদান করিতেছে যে, এখানে নবভক্তের অশ্রুজলে বিধানবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, ব্রহ্মকৃপাবায়ুতে পবিত্রাত্মার প্রভাবে তাহা দিন দিন পত্র, পুষ্প, ফলে পরিশোভিত ও বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে। এখানে নবভক্ত কেশবচন্দ্র সদলে বিশ্বাসের পরীক্ষায় বিজয়ী হইয়া ছিলেন। পূর্ব্বের উৎসবাদির আকার এখন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া, এখানকার জনসাধারণের আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে। ধন্য বিধাতা, তাঁর লীলাখেলা আমাদের বুদ্ধি মনের অতীত।

বিগত ১৭ই এপ্রেল, বুধবার হইতে ২২ শে এপ্রেল, সোমবার পর্য্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী উৎসব হইয়া ছিল। ১৭ই সায়ংকালে উদ্বোধন সঙ্গীত, আরতির সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। ১৮ ই এপ্রেল, বৃহস্পতিবার, দুইবেলা উপাসনা, অপরাহ্ণে পাঠ, সায়ংকালে জমাট সংকীর্ত্তন হয়। প্রাতের উপাসনায় ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ হইতে "অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন" বিষয়টী পাঠ, রাত্রিতে দৈনিক প্রার্থনা হইতে "দিবারাত্রি হরিসংকীর্ত্তন" বিষয়টী পাঠ ও ঐ বিষয়ে আত্মনিবেদন হয়। অদ্য মধ্যাহ্নে মন্দির-প্রাঙ্গণেই প্রীতি-ভোজন হয়। ১৯শে এপ্রেল, শুক্রবার, প্রাতে কেশবাশ্রমকুটীরে উপাসনা, "জীবনে নববিধানের মহিমা প্রমাণ" বিষয়ে প্রার্থনা পাঠ ও কাতর প্রার্থনা হয়। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন, বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ ও সংশোধন এবং গ্রহণ। একটী প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়।

২০ শে শনিবার, প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা, হিমাচলের প্রার্থনা হইতে "বৈরাগ্য" বিষয়ক প্রার্থনাপাঠ ও ঐ ভাবেই সকাতর প্রার্থনা হয়। অপরাহ্নে কেশবাশ্রমে বালক বালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। অনেকগুলি বালক বালিকা আবৃত্তি ও সংগীতাদি করিয়া ছিল। শেষে—জগতে ঈশ্বরের সহজ প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলা হয়। ২১ শে রবিবার, প্রাতে ২।৩টী বন্ধুর বাড়ীতে উষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনা, ১১॥ টায় কেশবাশ্রমে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসবের উপাসনা, পাঠ ও সংগীত, এই সেবককে উপাসনার কার্য্য করিতে হয়; প্রায় ৬০ জন হিন্দু ও ব্রাহ্মমহিলা উৎসবে যোগ দিয়া সঙ্গীত এবং একত্রে প্রীতি-ভোজন করেন। 'সতীত্ব' বিষয়টী সেবকের নিবেদন হইতে পঠিত হয়। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমে সঙ্কীর্ত্তন ও তৎপর সংগীত, উপাসনা এবং দৈনিক প্রার্থনা হইতে "নবসন্ন্যাস-ধর্ম্ম" বিষয়টী পাঠান্তে নববিধানের ধর্ম্ম যে অহেতুক ও উদার প্রেমের ধর্ম্ম, তাহা আত্মনিবেদনে বলা হয়।

২২শে সোমবার, প্রাতে ৭॥টায় বন্ধুবর দক্ষিণাচরণ নন্দীর বাটীতে তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা, সায়ংকালে স্বর্গীয় মহারাজা সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সমাধি-মন্দিরে প্রথমে সংকীর্ত্তন এবং সংক্ষেপে উপাসনা ও প্রার্থনা, শেষে ২।৩টী সংকীর্ত্তন এবং আচার্য্যের প্রার্থনা হিমাচল হইতে "শান্তি" বিষয়ক প্রার্থনা পাঠান্তে সকাতর প্রার্থনা পূর্ব্বক শান্তিবাচন হয়।

এই কয়দিন এখানকার অধিকাংশ হিন্দু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ উপাসনা, প্রার্থনা, সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া এখানকার ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে কৃতার্থ করেন। এখানকার বিশেষ সেবক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ ও ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় উৎসবের বিশেষ বিশেষ উপাসনাদির কার্য্য এ সেবককেই করিতে হইয়াছিল।

এই কয়দিন কোচবিহারের ক্ষুদ্রমণ্ডলী সহ একরকম বেশ জমাট ভাবেই কাটাইয়াছি। কেহ কেহ এই উৎসবের উপাসনাদিতে যোগ দিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিনীত সেবক—

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—০-:০:-০—

সংবাদ।

নববর্ষ—১লা বৈশাখ, নববর্ষোপলক্ষে, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী উপাসনা করেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমার শ্রীমান্ ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্রের বিলাত যাত্রা উপলক্ষে মণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস সুন্দর উপদেশ দান করিয়া, রাজকুমারের মঙ্গলভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। নববিধানজননীর আশীর্ব্বাদ এবং ইহপরলোকস্থ নববিধান-মণ্ডলীর সকলের আশীর্ব্বাদ শ্রীমানের মস্তকে বর্ষিত হউক।

১লা বৈশাখ, নববর্ষে, হালখাতা উপলক্ষে, ঘোষ এণ্ড সন্স এর ৭৮।১নং হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৬৮নং হ্যারিশন রোডে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

বিলাত যাত্রা—গত ১৮ই এপ্রেল, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর পুত্র কুমার ধ্রুবেন্দ্র চন্দ্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে ১লা বৈশাখ নবদেবালয়ে শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনাদি হয় এবং ১৮ ই এপ্রেল প্রাতে রাম্বাবাগ রাজপ্রাসাদস্থ দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও সস্ত্রীক ধান, দূর্ব্বা, পুষ্প চন্দনাদি দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। মহারাণী দেবীও কাতরপ্রাণে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। কুমারের বিদায় অভিনন্দনার্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাজমাতা, মহারাজ প্রতাপচন্দ্র ও অনেকগুলি আত্মীয় আত্মীয়া বন্ধু বান্ধব হাবড়া ষ্টেশনে গমন করেন। কুমার ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া, সকলকার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ ও শুভ কামনা লইয়া যাত্রা করেন। শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন বীর তাঁহাকে বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সহযাত্রী হইয়াছেন। মা ভক্তজননী, রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্মের পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালনা করুন।

বিদায় আশীর্ব্বাদ—গত ১৭ই এপ্রিল, ১৭নং নিউ থিয়েটার রোডে, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির গৃহে, ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমার শ্রীমান্ ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্রের উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ বিলাত যাত্রা উপলক্ষে, পারিবারিক সম্মিলনে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে উপস্থিত হইয়া শ্রীমানকে আশীর্ব্বাদ করেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৫শে এপ্রিল, দেরাদুনে, স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষের সহধর্ম্মিণী, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্রের ভগ্নী, আমাদের মণ্ডলীর সর্ব্বজন-প্রিয় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের মাতৃদেবী শ্রীমতী সারদাসুন্দরী ঘোষ ইহলোক ত্যাগ করিয়া, বিধান-জননীর নিজালয়ে নূতন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭ শে এপ্রেল, নববিধান-প্রেরিত সোদামা ভক্তি-জীবন শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃত লালের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিন স্মরণার্থ,৫১।১ দিনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয় নাথ দ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ, শ্রীমতী ভক্তিমতী, শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী এবং ভ্রাতা অখিলচন্দ্র প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

ভগ্নী মাধবীবালা বসুর কনিষ্ঠ পুত্রের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভগ্নী মাধবীবালা আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ১৲ টাকা দান করা হয়।

বর্ষবিদায়—গত ১৩ই এপ্রেল, অপরাহ্নে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে পুরাতন বর্ষবিদায় ও নব-বর্ষ আহ্বান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। সেবক ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, স্থানীয় মণ্ডলীর অনেক গুলি ভগ্নী যোগদান করেন।

শুভবিবাহ—গত ৭ই বৈশাখ (২০ শে এপ্রিল), চট্টকাবেড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চৌধুরীর পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুকুমারের সহিত,দানাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কুণ্ডুর প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী আরতি-প্রভার শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে বাঁকীপুরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র রায়ের বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

নামকরণ—১৯শে এপ্রিল, শুক্রবার, ৩৩।১ ল্যান্সডাউন রোডে শ্রীমান্ আতর চাঁদ বাত্রার কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ সত্যানন্দ রায় সকালে সুমিষ্ট উপাসনা করিয়া নবশিশুর নাম শ্রীমান্ অজয় সিং রাখিয়াছেন। মাতামহী বিশেষ প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। বিধান-জননীর মঙ্গল আশীর্ব্বাদ শিশু ও তাহার পিতামাতা, ভাই ভগিনীর মস্তকে বর্ষিত হউক। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৮ই বৈশাখ, ৩১নং হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত অরুণোদয় চাটার্জির দৌহিত্র, ডাঃ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দাসের শিশুপুত্রের নামকরণ উপলক্ষে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, এবং শিশুকে "সমরেন্দ্র" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

—•:—:•—

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্তৃক ৬ই জ্যৈষ্ঠ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 15th May, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনের পরম সহায়, পরম সম্বল, পরম-গতি, জীবনের কর্ণধার হইয়া, আশ্রয়, অবলম্বন ও পরমগতি হইয়া প্রত্যেক জীবনেই তুমি বাস করিতেছ; অথচ তোমাকে আমাদের মধ্যে জীবনের সেই সেই ভাবে তো তেমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, ধারণ করিতে পারিতেছি না, আশ্রয় করিতে পারিতেছি না। আমরা সেই সেই ভাবে তোমাকে গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে, অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, ইহার বিশেষ প্রমাণ হয় কখন? যখন আমরা জীবনে ঘোর অন্ধকার প্রভৃতি, অথবা আকস্মিক ঝড় তুফান আসিয়া আমাদের জীবনকে ঘেরিয়া ফেলে, সেই অবস্থায় 'তুমি আছ' সত্ত্বেও আমরা জীবন-পথে অন্ধকার দেখি; তুমি পরমবল হইয়া, সম্বল হইয়া আছ, অথচ নিজেকে নিতান্ত দুর্ব্বল, অসহায়, অসম্বল মনে করি; তুমি কর্ণধার হইয়া আছ, অথচ ভবনদীর তুফান ভারি দেখিয়া ভীত হই। তোমার পরিচালনা তেমন ভিক্ষা করি না, তোমার পরিচালনায় তেমন নির্ভর করিতে পারি না। মুখে স্বীকার করি, তুমি জীবনের কর্ণধার, আশা ভরসা একমাত্র তুমি; অথচ প্রবল ঝড় তুফানের পীড়নে পড়িয়া চঞ্চল হই। সহায়, সম্বল ও পরিচালনার জন্য এদিক্ ওদিক্ তাকাই। ইহা কি নিতান্ত অস্বাভাবিক? অপরিপক্ক ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। যাহারা সংসারের পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধবের সহায়তায় পৃথিবীর শারীরিক, সাংসারিক জীবন আরম্ভ করিল, যাহারা অন্ততঃ দুই একটী চিহ্নিত ধর্ম্ম-বন্ধু, ধর্ম্ম-সঙ্গীর সহায়তায় ধর্ম্ম-জীবনের প্রাথমিক স্ফুরণ প্রত্যক্ষ করিল, ধর্ম্মসঙ্গী ও ধর্ম্মদলের সুরক্ষিত পক্ষতলে বাস করিয়া ধর্ম্মের কিছু উত্তাপ লাভ করিল, সেই উত্তাপ হইতে দ্বিজ-ত্বের সুগন্ধ ফুটিয়া বাহির হইল, তোমার শ্রীমুখ দর্শনের ও তোমার মধুর বাণী শ্রবণের প্রাথমিক সৌভাগ্য লাভ করিল, সে সব জীবনে গুরুতর ঝড় তুফানের সময়, সঙ্গ সহায়তার জন্য এদিক ওদিক তাকান কি অস্বাভাবিক? কিন্তু এ স্বাভাবিকতা যে অসাধিত জীবনের চিহ্ন, দুর্ব্বলতার চিহ্ন, ক্ষীণ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরিচায়ক। সংসারে, ধর্ম্মক্ষেত্রে তুমি আমা-দিগকে দুর্ব্বল, অসহায় জানিয়া বাহিরে অনেক সহায় সম্বল দিয়াছ; সে সকলের প্রয়োজন কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তুমিই আবার এই ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে, সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আমাদিগকে বীর-বলে বলীয়ান্ করিবে বলিয়া, সকল প্রকার ক্ষীণ বিশ্বাস, অবিশ্বাস দূর

করিয়া, দুজ্জয় অটল বিশ্বাস-বলে বলী করিবে বলিয়া, এই অনন্ত জীবন-পথে তুমিই বুঝি কৌশল করিয়া এক দিকে ধর্ম্মজীবনাকাশে পরীক্ষার ঝড় তুফান অপ্রত্যাশিত, অসহনীয়রূপে উত্থাপিত কর, অপর দিকে বাহিরের সহায় সম্বল বলিয়া যাহা কিছু তাহা অপসারিত করিয়া, অথবা তাহা হইতে দূরে রাখিয়া, জীবনকে নিতান্ত অসহায় অসম্বল করিয়া, তোমাকে ভাল করিয়া আশ্রয় করিবার, একমাত্র তোমা দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরাপদ্ ভূমি লাভ করিবার কৌশল বিস্তার কর। যদি তাহাই হয়, এরূপ পরীক্ষা আসুক, এরূপ ঝড় তুফান উঠুক। এরূপ পরীক্ষা কি এযুগে ভক্ত ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার সঙ্গী দলে উপস্থিত হয় নাই? তবে, হে জীবনের পরম সহায়! এরূপ পরীক্ষাকে সাহসের সহিত আলিঙ্গন করিতে শক্তি দান কর, আলোক দান কর। তোমার প্রদত্ত পরীক্ষার ভিতর দিয়া তোমাকে জীবনের পরম সহায়, সম্বলরূপে চিনিয়া, জানিয়া, তোমাকে জীবনের একমাত্র নেতা ও পরিচালক রূপে গ্রহণ করিয়া নিরাপদ্ হই, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—:—:—

ভারতে শ্রীবুদ্ধ।

কাশি, গয়া, শ্রীবৃন্দাবন, মক্কা, জেরুজেলাম প্রভৃতি যেমন স্থান-তীর্থ পৃথিবীতে রহিয়াছে, পৃথিবীর সাধুভক্ত মহাজনদিগের অবতরণ, তিরোধানের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ তেমনই কতগুলি সময়তীর্থ রহিয়াছে। সাধু-মহাজনদিগের জন্মতারিখ এবং স্বর্গারোহণের তারিখ অবলম্বন করিয়া, পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহাদের আপন আপন সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-প্রেরিত সাধু মহাজনদিগের পবিত্র জীবনরূপ পরমতীর্থে গমন ও সেই স্বর্গীয় জীবন যথাসম্ভব আপন আপন জীবনে গ্রহণ করিয়া, জীবন্ততীর্থের জীবন্ত ফল লাভ ও সম্ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা নববিধানের লোক, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আমাদের আপনার সম্প্রদায় এবং সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-প্রেরিত সাধু ভক্তগণ আমাদেরই সদ্গতি ও উদ্ধারের জন্য প্রেরিত, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এই জন্য সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্বীকৃত সাধু মহাজনগণের জন্ম ও স্বর্গারোহণের স্মৃতিচিহ্নরূপ তাঁহাদের পবিত্র জন্ম তারিখ ও স্বর্গারোহণের তারিখ আমাদের বিশেষ সময়-তীর্থে পরিণত। এ সকল দিন বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আমাদের স্মরণীয় পর্ব্বদিন।

বৈশাখী পূর্ণিমা ভারত-জ্যোতিঃ, সমগ্র এসিয়া মহাদেশের জ্যোতিঃ শ্রীবুদ্ধের জন্ম, বোধিদ্রুমে সিদ্ধিলাভ ও স্বর্গারোহণের পবিত্র তিথি। তাই এ সময় শ্রীবুদ্ধের পবিত্র জীবন পাঠকগণের স্মরণ ও আলোচনার বিষয় করিয়া, আমরা সেই বিরাট্ জীবন-সমুদ্রের গভীরে একটু নিমগ্ন হইয়া, সামান্য ভাবে হইলেও কিছু কিছু সত্য-রত্ন, তত্ত্বরত্ন উদ্ধার করিতে চাই। পরম গুরু এ বিষয়ে কৃপা করিয়া আমাদিগকে আলোক দান করুন।

প্রত্যেক সাধু মহাজন জগতে বিশেষ বিশেষ আলোক, বিশেষ বিশেষ আদর্শ দান করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তাঁহারা যখন ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র জীবন রূপ কৌটার ভিতরে কি স্বর্গের বিশেষ আলোক, বিশেষ আদর্শ অস্ফুট ভাবে নিহিত থাকে,তাঁহারা আপনারাও তাহা সে সময় জানিতে পারেন না; তাঁহাদের নিকট আত্মীয় স্বজন, পিতা মাতা,অথবা দেশস্থ লোকগণও তেমন কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারেন না; কেবল তাঁহাদের প্রেরণকারী মঙ্গলময় বিধাতাই তাঁহাদের জীবনের উচ্চ নিয়তি, উচ্চগতি ও বিশিষ্টতার বিষয় জানেন। শ্রীবুদ্ধ সমস্ত মানব-পরিবারে জীবনের একটী বিশেষ উচ্চ আদর্শ দিতে আসিয়া ছিলেন, পৃথিবীতে ধর্ম্মের বিশেষ আলোক ঢালিতে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন সেই শিশুর ভাবী জীবনের বিশেষ নিয়তি ও গতির বিষয় তাঁহার নিজের নিকটও অজ্ঞাত ছিল; তাঁহার পরম আত্মীয়, অতি আপনার জন যাঁহারা, তাঁহারাও সে নিয়তি, সে উচ্চগতির বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীবুদ্ধের জীবনের যতই বিকাশ হইতে লাগিল, দেখা গেল,নানাপ্রকার বাহ্য আড়ম্বর, ধন, ঐশ্বর্য্য, বিচিত্র বিলাস সামগ্রীর চাকচক্যের মধ্যে তাঁহার চিত্ত-বহির্ম্মুখীন না হইয়া স্বভাবতঃই অন্তর্ম্মুখীন। তাঁহার চিত্ত বাহিরের শোভা সৌন্দর্য্যের প্রতি বিমুখ হইয়া অন্তরের মধ্যে কি যেন কিছু খুঁজিতে প্রয়াসী। এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে শিখায় না, জানায় না, বুঝায় না, বরং

তাঁহাকে তদ্বিপরীত দিক দেখায়, শিখায়, জানায়, বুঝায়। কিন্তু তাঁহার চিত্ত বহির্ম্মুখীন না হইয়া অন্তরস্থ স্বভাবের গুণেই অন্তর্ম্মুখীন, ইহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল। চুম্বক লৌহশলাকার স্বাভাবিক গতি চুম্বক লৌহের খনির দিকে। "মাল পোরা ধন সিন্দুকেতে, চিনে নেও মন পলকেতে"। অন্তরের ভিতর প্রচুর ধন রত্নের আকর রহিয়াছে; খোজ, চিন, গ্রহণ কর, সেই ধনে ধনী হও। বাহিরের অতুল ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মানব-জীবনের ভিতরে কি অপার, অসীম, অফুরন্ত নিত্য কালের ধন ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, তাহা খুজিয়া বাহির করিয়া, নিজে ধনী হওয়ার জন্য এবং সেই ধন ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথিবীর ছোট বড় সকলকে ধনী করিবার পথ প্রদর্শন জন্য শ্রীবুদ্ধের আগমন। তাই তিনি রাজার ঘরে জন্মিলেন, প্রচুর ধন, ঐশ্বর্য্য, ভোগ বিলাসিতার অতুল আয়োজনের ভিতরে লালিত, পালিত ও বৰ্দ্ধিত হইলেন, অথচ তাঁহার মন সেদিকে নাই, তাঁহার মন অন্তরে কি যেন কি খুজিতেছে; তাই তিনি বাল্যকাল হইতেই ধ্যান-পরায়ণ। বাহিরের কোন মানুষ গুরু তাঁহাকে এ ধ্যান শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাঁহাকে এপথে নিয়মিত করিতেছিল। রাজা শুদ্ধোধনের তিনি একমাত্র পুত্র, রাজ্যৈশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, ঘরে গুণবতী, রূপবতী স্ত্রী ও হৃদয়ানন্দ-দায়ক কমনীয়-কান্তি শিশুপুত্র। একদিকে পার্থিব জগতের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ, অপর দিকে ভিতরে অপার্থিব, অজানিত ধর্ম্ম-সম্পদ-লাভের জন্য প্রবল পিপাসা। প্রমোদ-কাননে ভ্রমণার্থ বাহির হইয়া চারিদিন যে চারিটী দৃশ্য তিনি দর্শন করিলেন, তাহাতে সেই অন্তর্নিহিত পিপাসার অগ্নি প্রবল বেগ ধারণ করিয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পৃথিবীর চারি সমুদ্রের বারি-রাশি মিলিত করিয়া ঢালিলেও সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। অবশেষে বাহিরের সকল আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া গেল, ভিতরের আকর্ষণ জয়লাভ করিল। শ্রীবুদ্ধ সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসীর সাজে আপনার ঈপ্সিত বস্তুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া কত গুরুর আশ্রয় লইলেন, কত শাস্ত্র পাঠ করিলেন, কত শিক্ষা লাভ করিলেন, কিন্তু সে সকল তাঁহার প্রাণে কোন মৌলিক আলোক ঢালিতে পারিল না। একটী নবধর্ম্মের পথ বাহির করা তাঁহার জীবনের নিয়তি; পূর্ব্বে যদি দশটী ধর্ম্মের পথ বাহির হইয়া থাকে, একাদশ পথ বাহির করা তাঁহার জীবনের বিধি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। পুরাতন কোন পথ অবলম্বনে তাঁহার প্রাণের সাধ মিটিবে কেন? তিনি পৃথিবীর পুরাতন সকল ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের টানে মনকে সম্পূর্ণ অন্তর্ম্মুখীন করিলেন, শরীরকে শোষণ করিয়া উৎকট কৃচ্ছ্র সাধনে দীর্ঘ ছয় বৎসর কাটাইয়া দিলেন। জীবন-পথে "মার" রূপী পাপ প্রলোভন আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি অন্তরের অমিত তেজে "দূরহ, সয়তান" বলিয়া মারকে তাড়াইয়া দিলেন। কথিত আছে, দেবকৃপাতে অন্তরে ব্রহ্ম-তেজ লাভ করিয়া তিনি কামনা বাসনা সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ করিলেন। অভাবাত্মক দিকের সাধনা যাহা হইবার তাহা হইল, ভাবাত্মক দিকের সাধনা ভিন্ন জীবনের পূর্ণতা কোথায়? শান্তি ও আনন্দ কোথায়? কৃচ্ছ্র সাধনে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই সময় ভিতর হইতে বাণী আসিল, মধ্যপথ আশ্রয় কর, উৎকট কৃচ্ছ্র সাধনাদি অস্বাভাবিক পথে সিদ্ধির আশা নাই। তখন তিনি দীর্ঘ দিনের পর সম্মুখস্থ নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন-স্নান করিলেন, সেবা-নিরতা সুজাতা নাম্নী নারীর প্রদত্ত পায়সান্ন ভোজন করিয়া সুস্থ ও সবল হইলেন। তৎপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া দিব্যালোক লাভের জন্য আবার ধ্যানাসনে বসিলেন। জীবনে আশার আলোক লাভ করিবার জন্য চরম ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। ব্যাকুলতা দৃঢ় সঙ্কল্পের আকার ধারণ করিল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করিল। এই ব্যাকুলতাই তাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতম ধ্যানসোপানে আরোহণ করাইল। ক্রমে তিনি এই ধ্যান সোপানের ভিতর দিয়া পূর্ব্বতন বুদ্ধ যোগীদের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। পরে দিব্য বলে বলীয়ান্ হইয়া মহাসম্বোধি লাভ করিলেন। অনন্ত জ্যোতিঃ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত আনন্দ, শান্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি অনন্ত আনন্দে বিভোর হইলেন; এবং ধ্যান-জনিত প্রীতি-সুখে সপ্তরাত্রি সেই বোধিদ্রুম তরু-তলেই যাপন করিলেন। শ্রীবুদ্ধের সিদ্ধির প্রধান আয়োজন ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতারই অন্যনাম প্রার্থনা। ব্রহ্মানন্দ [illegible] ব্যাকুলতাই প্রার্থনার

প্রাণ, ব্যাকুলতাই প্রার্থনা। এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া শ্রীবুদ্ধের জীবনে সিদ্ধি, এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া শ্রীঈশার জীবনে সিদ্ধি, এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া শ্রীচৈতন্য-জীবনে সিদ্ধি, এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া শ্রীনানক, শ্রীকবীর প্রভৃতি সাধু মহাজনদের জীবনে সিদ্ধি। এই ব্যাকুলতা রূপ প্রার্থনা-যোগে শ্রীকেশবের জীবনে সিদ্ধি। অতএব এই ব্যাকুলতার ভূমিতে শ্রীবুদ্ধের সঙ্গে, শ্রীঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অতীতের সাধু মহাজনদিগের সঙ্গে এবং বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবের সঙ্গে সাধনের উপায় বিষয়ে মিলন। উপায় বিষয়ে মিলন, উদ্দেশ্য বিষয়ে ও লক্ষ্যবিষয়ে কি মিলন নাই? ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ "ভূমৈব সুখম্" বলিয়া যে ভূমাতে সুখ আনন্দ লাভ করিলেন, শ্রীবুদ্ধের জীবন-লব্ধ পরম বস্তুও সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ভূমানন্দ। শ্রীঈশা, শ্রীচৈতন্যের জীবনের উপাস্যও সেই পূর্ণানন্দময় পিতা, পূর্ণানন্দ-স্বরূপ প্রাণবল্লভ। বর্ত্তমান যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাস্যও সেই ভূমানন্দময় পরম দেবতা। ভক্ত কেশবচন্দ্রও আনন্দময় ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ, সেই আনন্দময়ী মায়ের ক্রোড়ে ভক্ত শিশু।

—:০:—

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ একত্রে।

শ্রীবুদ্ধদেবের জন্মদিন, নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি দিন এবং মহাপ্রয়াণ দিন একই বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে সংঘটিত। এই নিমিত্ত এই তিন ঘটনার স্মৃতি অবলম্বনে বৌদ্ধসাধকগণ [illegible] সাধন করিয়া থাকেন। নববিধানেও এই দিন পালন করা হয়। কিন্তু আমাদের নিত্য উপাসনাতেই আমরা জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ একত্রে সংসাধন করি। "আমি আমার" মৃত্যুতে নবজন্ম এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একাত্মতা বা উদ্বাহ, ইহা ভিন্ন যথার্থ উপাসনা আর কি?

নববিধানরথে নববৃন্দাবন-যাত্রা।

রেলওয়ে ষ্টেসনে এক এক স্থানে যাইবার এক একটী বিশেষ বিশেষ চিহ্নিত গাড়ী এক একটী প্লাটফরম হইতে ছাড়িয়া থাকে। কাশীতে যাইতে একটী গাড়ী, বৃন্দাবনে যাইতে একটী গাড়ী, পুরী যাইতে আর একটী গাড়ী; যাত্রিগণ সেই সেই স্থানের নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে আরোহণ করিলে তবে গম্যস্থানে যাইতে পারেন। একস্থানে যাইতে অন্য স্থানের গাড়ীতে উঠিলেই বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হয়। এইরূপ ধর্ম্মবিধানেও, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান এক এক বিধানের এক এক সাধন-পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কোন্ পথে গেলে কোথায় যাওয়া যায়, অনেকেই তাহা না জানিয়া, ভ্রমবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়া, বিষম বিড়ম্বনায় পড়িয়া থাকেন। একবার এক পথ ধরিলে মনের সংস্কার সহজে শুদ্ধ হয় না; তাই কতই কৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্য সাধনা করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্ব তীর্থের মিলন নববৃন্দাবনে যাইতে হইলে, নববিধানের রথে সহজে মার কোলে বসিলেই যাওয়া যায়। মানুষ পৃথিবীতে জন্ম লইবা মাত্র সহজেই মা বলিয়া কাঁদিতে শিখে। এই সহজে মা বলিয়া কাঁদা মানবের স্বভাবসিদ্ধ সাধন। ইহাতে ভ্রমভ্রান্তি আসিবার আশঙ্কা নাই, কৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্য সাধনার আবশ্যকতাও নাই। নববিধানরথে উঠিলেই নববৃন্দাবনে যাওয়া যায়।

মার কাজ।

পৃথিবীর মার কাজ ছেলে মানুষ করা। স্বর্গের মার কাজ ছেলে মানুষকে দেব সন্তান করা। স্বর্গের মাকে মা বলিয়া যাঁরা বিশ্বাস করিয়া তাঁর উপাসনা করেন, তাঁদের তিনি প্রতিদিন কাছে বসাইয়া, তাঁদের মিথ্যা আমিত্ব মুছাইয়া, সত্যেতে জ্ঞানেতে অমরত্বেতে প্রেমেতে পুণ্যেতে আনন্দেতে ও নিজস্বরূপেতে গঠিত করিয়া তাঁর দেবসন্তান করিয়া লন। ইহাই ইঁহার কাজ। অগ্নির কাজ যেমন কয়লার ময়লা ঘুচাইয়া অগ্নিময় করা, স্বর্গের মার কাজ তেমনি মানুষের ছেলেকে তাঁর স্বরূপময় দেবসন্তান করা।

নববিধান-মণ্ডলীর পরিচালন-বিধি।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলিলেন :—"Beware of being guided by the rule of majority in matters of prayer, faith and doctrine. Beware of allowing an unspiritual majority to guide and control the house of the Lord. They will drive away spirituality and even morality from the sanctuary and establish carnality and their own conceits. In this country the principles of true religion and true character have yet to be established, and if a majority of men, who are as far as ever from those principles are to legislate and settle about them, we know very well where they will lead the movement. There will be an utter shipwreck of every thing good and holy. We are not much for majority, we are for unanimity and this is secured when men's adhesion and loyalty to fixed principles are unshakable. But when private views and reasoning constitute the all in all of a guiding body in a Church, the rule of majority is simply a fatal rule. It will invariably lead to the absolute downfall of the Church. Experience will teach the truth of our statement more fully than any words can.

"সাবধান, প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং ধর্ম্মবিধি সম্বন্ধে অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্তের নিয়মে পরিচালিত হইও না। অনাধ্যাত্মিক অধিকাংশেকে ঈশ্বর-গৃহ পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে দিতেও সাবধান হইবে। তাহারা যাহা আধ্যাত্মিক, এমন কি যাহা নৈতিক, তাহাও দেবগৃহ হইতে বিদূরিত করিবে এবং আপনাদের অহং ও যাহা কায়িক ভাব, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিবে। এদেশে এখনও প্রকৃত ধর্ম্মের নীতি এবং চরিত্র-বিধি স্থাপনা করিতে হইবে। কোন অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি, যাহারা সে সমুদয় নীতিবিধি হইতে বহুদূরে অবস্থিত, যদি সে সম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে বা তদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করে, আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি, তাহারা কোথায় মণ্ডলীকে নিয়া ফেলিবে। যাহা ভাল এবং পবিত্র, তাহা একেবারেই ভরাডুবি হইবে। আমরা তাই অধিকাংশের পক্ষপাতী নই, আমরা ঐকমত্যের পক্ষপাতী এবং যেখানে স্থির-নীতিতে আনুগত্য ও দৃঢ়তা অচল, সেই খানেই এই ঐকমত্য সংস্থাপিত হয়। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিগত মত এবং বিচার-বুদ্ধি মণ্ডলীর পরিচালন-নীতির যথাসর্ব্বস্ব, সেখানে অধিকাংশত্বের বিধি সাংঘাতিক বিধি। ইহা নিশ্চয়ই মণ্ডলীকে একেবারে মহা-পতনের পথে লইয়া যাইবে। আমাদের কেবল কথায় যত না হয়, অভিজ্ঞতাতেই ইহার সত্যতা অধিক সপ্রমাণ করিবে।"

শ্রীনববিধানাচার্য্যদেবের এই উক্তি এ সময় নববিধান-বিশ্বাসী ভাই ভগ্নীদিগকে বিশেষ প্রার্থনা-যোগে আলোচনা করিতে ও ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম-পূর্ব্বক কার্য্য করিতে আমরা সানুনয়ে অনুরোধ করি।

আমরা সকলেই ইহা বিশ্বাস এবং স্বীকার করি, নব-বিধান পবিত্রাত্মার বিধান। এই পবিত্রাত্মাই বিধানের নেতা এবং পরিচালক। আমাদিগের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবারগত জীবন এবং মণ্ডলীগত জীবনের পরিচালক স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্রাত্মা; সুতরাং এ বিধানে মানবীয় বিচার-বুদ্ধি বা অধিকাংশের মতামতের সিদ্ধান্ত যদি মণ্ডলীর পরিচালক হয়, তাহা হইলে আচার্য্য যেমন আশঙ্কা করিয়াছেন, "মণ্ডলী যে কোথায় গিয়া পড়িবে" তাহাই হইবে। এই অবস্থায় মণ্ডলী হইতে আধ্যাত্মিকতা এবং যাহা কিছু পবিত্র, তাহা যে একেবারে তিরোহিত হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? পাছে কোন মানুষকে নববিধানের মধ্যবিন্দু বলিয়া স্বীকার করা হয়, মানুষকে গুরু বা মণ্ডলীর পরিচালক ও নেতা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এই আতঙ্কেই যাঁহারা সদা শঙ্কিত, তাঁহারা কেমন করিয়া মানবীয় বুদ্ধি-বিচার বা বহুসংখ্যকের মতের বিধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন? মানবীয় বুদ্ধির নেতৃত্বইত মানুষের নেতৃত্ব। তাই বর্ত্তমানে অধিকাংশের মতে পরিচালন-বিধিতে নববিধানের যে সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি ব্যবস্থাপিত হইতেছে, তাহা যথার্থ নববিধান-সঙ্গত হইতে পারে কি না, ইহা বিশেষভাবে নববিধান-বিশ্বাসি-গণের মীমাংসা করা কি কর্ত্তব্য নয়?

মানুষের পরিচালনা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়া নববিধানাচার্য্য প্রার্থনায় একস্থানে বলিলেন, "রাত্রি হইল, হঠাৎ দেখিলাম, তোমার আসনে মানুষ বসিয়া উপদেশ দিতেছে। তোমার শিষ্যেরা অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় মানুষকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতেছে। দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলাম। এ ভয়ের ঘর, মরণের ঘর। আমার সে দেবতা কোথায়? মানুষ আসিয়া সে আসন লইয়াছে? এই কৃত্রিম ধর্ম্ম দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্ম-বিধান আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। যে ধর্ম্মে মানুষের কিছু বলিবার নাই, তোমার কথা শুনিয়া সব করিতে হয়, সেই ধর্ম্ম আন। মানুষকে গুরু করিলে, আপন আপন ধর্ম্ম নববিধান বলিয়া প্রচার করিলে দুঃখের শেষ থাকিবে না। তুমি তোমার সিংহাসন লইয়া বোস। আমার আশঙ্কা দূর কর। যতক্ষণ দেখিব, সোনার ঘরে সিংহাসনে অসুর-মানুষ-গুরু বসেছে, যে মানুষ কেবল পতনের দিকে লইয়া যায়, ততক্ষণ বিপদ যাইবে না। এবারকার ধর্ম্মের নিয়ম এই, তোমাকে লইয়া আমরা থাকিব ....এ ভাব হইতে নববিধান আসিবে না।" অর্থাৎ মানব-বিচার-বুদ্ধির পরিচালনার ভাব হইতে নববিধান হইবে না।

বাস্তবিক মানুষের মতামত, বুদ্ধি, যুক্তি, পরামর্শই পরিচালক যেখানে, সেখানে কিছুতেই নববিধান হইতে পারে না। সে পথ ভয়ের পথ, মরণের পথ, পতনের পথ। যেখানে ঈশ্বরের সিংহাসনে মানুষ বসিয়া রাজবিধি প্রচার করিতেছেন, সেই খানে নববিধান কেমনে হইবে? স্বয়ং বিধাতা যে বিধি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহাই নববিধান।

তাই নববিধানে পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশে ঐকমত্যে পরি-চালন-বিধি শ্রেষ্ঠ-বিধি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ঐকমত্যে পরিচালন, আচার্য্যের মতে তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব, "যাঁহাদের বিধানের নির্দিষ্ট বিধিতে আনুগত্য এবং দৃঢ়তা অচল" অর্থাৎ বিধাতার বিধান সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় ও অবিচলিত। এক বিধাতাই স্বয়ং বিধান-কর্ত্তা, ইহা পূর্ণ-মাত্রায় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহারই আলোকে পরিচালিত হইবার জন্য যাঁহারা দৃঢ়-সংকল্প হন, তাঁহারাই তাঁহার আলোক লাভ করিয়া থাকেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার এক আলোক সকলে একাত্ম হইয়া লাভ করেন, ততক্ষণ বিপথগমনের ও ভ্রান্তিতে পতনের আশঙ্কা দূর হয় না।

প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম-বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই একাত্মতা বা এক আলোকে পরিচালনই নববিধানের বিশেষত্ব। মানব-মণ্ডলীকে এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে একত্ব বা এক অখণ্ড মানবত্ব বিধানের জন্যই নববিধান সমাগত। সুতরাং এ বিধানের বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক এক জনের এক এক মত বা অধিকাংশের

মতের প্রাধান্য কেমনে থাকিতে পারে? এক মানবের এক মত ভিন্ন দুই মত বা বহুমত হইবে কিরূপে?

তাই দেব-নিশ্বসিত ঐকমত্য সম্বন্ধে আচার্য্যদেব প্রার্থনায় বলিলেন, "তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়, তবে ত আমাদের একমত হওয়া চাই। তোমার ধর্ম্ম বাস্তবিক অখণ্ড। আমাদের পাঁচ জনের যদি পাঁচ মত থাকে, তা হলেত আমরা পৌত্তলিক। তুমি বোস, আর আমরা তোমার চরণের কাছে কজনে বসি; তুমি এক কথা বল, আমরা সকলে শুনি, আর সেই রকমে চলি। আমাদের সকলকে এক কর, একখানা কর। এক শরীর, এক মত, এক হৃদয়, এক আত্মা কর। এক দেবতা তুমি, এক কথা বল, আমাদের সকলের হৃদয়ে তাহা একেবারেই পড়িবে। যদি পড়ে, তবেই আমরা ব্রাহ্ম, নতুবা নয়। বিবেক পাপ পুণ্য লইয়া মতভেদ হইতে পারে না। আমরা এক মার সন্তান, কেন বিভিন্ন মত হবে। এক পথে লইয়া চল। একপথাবলম্বী, এক দেবতার উপাসক হই।"

অন্যত্র বলিলেন, "হে ঈশ্বর, তুমি এরূপ মনে করিয়াছ যে, এবার নববিধান মানববুদ্ধিতে একতা দিবে। মানুষ এক ব্রহ্মবাণী শুনিবে, এক কথা শুনিয়া চলিবে, এক পথ ধরিবে, তোমার এক বিধি গ্রহণ করিবে।"

এই জন্যই নববিধানের শ্রীদরবার ঐকমত্যের বিধিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং এই বিধিতেই নববিধানের সমুদয় বিধি ব্যবস্থা অনুষ্ঠান প্রচার-কার্য্যাদি পরিচালিত হইবে, ইহাই নববিধানের বিশেষ বিধান। ইহার অন্যথা হইলে নিশ্চয়ই নববিধান হইবেনা। নববিধানবাদী সাধকই হউন, প্রচারকই হউন, আত্মবুদ্ধিতে বা পরকীয় মানবীয় বিচার বুদ্ধিতে চলিলেই নববিধান-চ্যুত হইবেন।

অতএব নববিধানের শ্রীদরবারে ঐকমত্যের বিধিতে মিলিত হইয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, যাহাতে নববিধান-ঘোষণার পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব সম্পাদন করিতে পারি, তাহারই জন্য আমরা যেন কৃত-সঙ্কল্প হই। এই দরবারের গৌরব সম্বন্ধে আচার্য্য যেমন বলিলেন, "দরবারের ঘর স্বর্গ থেকে প্রথমে আলো আসিবার ঘর। নববিধান এই ঘর দিয়া বাহির হইতেছে। এই ঘরের যে দরবার, সেই দরবারের যে আইন, তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে।" আমরাও যেন এই ভাবে দরবারের গৌরব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করি।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিধানে এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-বিধানেও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের তিরোধানের পর সেই সেই ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস স্থির করিয়া, মতের ও বিশ্বাসের ঐক্য স্থাপনের আবশ্যকতা হইয়াছিল। তখন নেতৃগণ সংঘবদ্ধ হইয়া ঐকমত্যেই মণ্ডলীর পরিচালন-বিধি নির্দ্ধারণ করেন। এখনও ক্যাথলিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণ তাঁহাদের নেতা পোপ নিয়োগ করিবার সময় ঐকমত্য বিধিতে তাহা নির্দ্ধারণ করেন। বর্ত্তমান যুগে যে সর্ব্বজাতির সম্মিলন বা League of Nations স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারাও সমুদয় গুরুতর রাজনীতি বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা ঐকমত্য বিধিতেই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে যে নববিধান জগতে নবালোক প্রদান করিতে অবতীর্ণ, যে নববিধান সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্ম, সকল দেশ, সকল জাতি, সকল মানবকে কেবল একতাসূত্রে বদ্ধ করিতে নয়, কিন্তু এক অখণ্ড সমাধান করিতে আসিয়াছেন। যে নববিধান এক ঈশ্বরের আলোকই আমাদিগের পরিচালক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সে নববিধানে এক আলোক-লাভে ঐকমত্য স্থাপন ও তদবলম্বনে সংঘবদ্ধ হইয়া নববিধান সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, কিছুতেই আমরা নববিধানের লোক বলিয়া প্রমাণিত হইব না। বিশেষতঃ নববিধান কেবল মত বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিতে আসেন নাই, জীবনের প্রমাণেই নববিধানের প্রমাণ, চরিত্রের মিলনের প্রমাণেই নববিধানের প্রমাণ। আমরা যেন সেই প্রমাণ দিতে বদ্ধ-পরিকর হই।

আর্য্যনারী-সমাজের জুবিলী-উৎসব।

(প্রতিষ্ঠিত ৯ই মে, ১৮৭৯; জুবিলী, ৯ই মে, ১৯২৯)

গত ৯ই মে, বৃহস্পতিবার, আর্য্যনারী-সমাজের জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে সাড়ে আট ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা ও অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমতী মহারাণী সুচারুদেবী তাঁহার মধুর উপাসনায় সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। শ্রীমতী আচার্য্যপত্নী জগন্মোহিনী কর্ত্তৃক রচিত দুইটি ও শ্রীমতী মহারাণী সুনীতিদেবী কর্ত্তৃক রচিত একটি সঙ্গীত উপাসনায় সময় করা হইয়াছিল। গান তিনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উপাসনার সময় শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্নে একটি সঙ্গীত ও শ্রীমতী সাবিত্রীদেবীর প্রার্থনা সহ কার্য্যারম্ভ হয়। পরে শ্রীমতী মণিকাদেবী, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র, শ্রীমতী শকুন্তলা সেন, শ্রীমতী সরলা দাস ও শ্রীমতী কুমুদিনী দাস প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীমতী অশোকলতা দাস ও শ্রীমতী চপলা মজুমদার কিছু বলেন। পাঠ ও বক্তৃতা উভয়েই সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর হিমাচল হইতে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা হইল এবং শ্রীমতী মৃণালিনী সেন যে তারে খবর করিয়াছিলেন, তাহাও পাঠ করা হইয়াছিল। পঞ্চাশৎ বৎসর গত হইল আর্য্যনারী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের জীবন সেই আদর্শে গড়িয়া উঠে নাই, এই আক্ষেপ সকলেই বোধ করিয়াছেন। যাহাতে আমরা নূতন

জাগরণে জাগিয়া উঠিয়া, এই মহান্ আদর্শ সম্মুখে লইয়া, জীবনে কার্য্য সাধন করিতে পারি, এই প্রার্থনাই সকলের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই সংকল্পে আর্য্যনারী-সমাজকে আয়তনে বৃদ্ধি করিয়া, সকল ভগ্নী যাহাতে নবোদ্যমে কার্য্যারম্ভ করেন, তাহার জন্য অচিরেই সভা আহ্বান করিয়া আলোচনা করা হইবে। তাই সকল ভগ্নীর কাছে বিশেষ অনুরোধ, তাঁরা এই কার্য্যে যোগদান করিয়া পরস্পরের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

সঙ্গীত।

(আর্য্যনারী-সমাজের জুবিলী উৎসবে গীত)

(১)

হে রাজরাজন্, মুরতিমোহন,
পূজিব চরণ হিয়ার মাঝারে।
এ হৃদি সিংহাসন, তোমার আসন,
বিরাজ রাজন্ মম অন্তরে।
প্রতি ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে,
প্রান্তরে শিখরে কাননে সাগরে,
তারকা-মণ্ডলে, রবি-শশি-জালে,
মহিমা গায় তব মহান্ ঝঙ্কারে।
ভূলোক দ্যুলোক সর্ব্বভুবনপতি,
ভীম-প্রতাপশালী বিশ্ব-অধিপতি;
পুণ্যাত্মা সারি সারি, দাঁড়ায়ে প্রহরী,
আদেশ পালিছে গোলোকপুরে।
যোগী ঋষি মুনি, করে আনন্দ-ধ্বনি,
দেবগণ গায় জয় একস্বরে;
আমিও ও পদ-প্রান্তে, হে রাজন্ একান্তে,
লুটায়ে নমি রাজরাজেশ্বরে।

— ::০:: —

(২)

আহা মরি কিবা শোভা তোমার চরণতলে।
গাইছে আজি হরিনাম আর্য্যনারী দলে দলে।
অনন্ত গগন-মণ্ডলে, ঘুরিছে তারকাদলে,
নাচিছে তরঙ্গমালা গভীর সিন্ধুজলে।
নাচিছে গহন বনে তরুরাজি পুষ্পগণে,
হাসিছে প্রকৃতি সতী বিশ্বপতি-পদতলে।
অনন্ত হিমানী পরে রবির কিরণ ঝরে,
সাজায়েছেন প্রভু অপার জ্ঞান-কৌশলে।
বহিছে বায়ু সবলে, জয় জয় জয় বলে,
বহিছে জগত সংসার, গাহিছে তালে তালে।
ডাকি মোরা সকলে, জয় মাতঃ কমলে,
দয়াময় নাম বিনা কি সুখ ধরাতলে।
চিরসুখী ভক্তদলে, হয়েছিলেন তব বলে,
তব প্রেম-সুধা-পানে কত সুখ শান্তি মেলে।
জয় জগত জননী, জয় বীরপ্রসবিনী,
তব প্রেমে মত্ত হয়ে নমি মোরা সকলে।

— ::০:: —

(৩)

জয় শ্রীহরি শ্রীনাথ হে, পতিতপাবন দীনবন্ধু,
করুণাসিন্ধু শ্রীধর হে।
আমরা দীন দুর্ব্বল, হরি তুমি ভরসা সম্বল,
তোমার আদেশে এ ভবে এসে, যাই তোমার উদ্দেশে।
না শুনে তোমার কথা, পাইলাম মরম ব্যথা,
এখন দয়া করে স্থান দাও তোমার চরণতলে।
পাপী তাপী দুর্ব্বলে, রাখ হরি পদতলে,
জয় জয় জয় বলে যাই চলে, আমরা গাই—
যাই যাই অমরধামে, আমরা গাই গাই—
গাই তব গুণ গাই;
জীবন সাঙ্গ হলে, কোলে স্থান দিও ওমা মঙ্গলে,
বিপদ-ভঞ্জন অধম-তারণ, রেখো ধরে দীন বলে।

— ::০:: —

স্বর্গীয়া মাতৃদেবী সারদাসুন্দরী ঘোষ।

(শ্রাদ্ধবাসরে পাঠিত)

আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী বিগত ২৫শে এপ্রিল, ১২ই বৈশাখ, রাত্রি ১২টার সময়, দেবাদূনস্থ বাস-ভবনে, ব্রাহ্মগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নামগান করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে, পরম স্নেহময়ী বিশ্বজননীর কোলে স্থানলাভ করিয়াছেন—স্বর্গবাসী হইয়াছেন। তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এই দীর্ঘ জীবনে শ্রীভগবানের কত যে লীলা হইয়াছে, তাহা এখানে বলা সম্ভব নয়, তাই অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

নূতন বিধানের প্রথম স্বর্ণযুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মানুরাগে যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমাদের মাতৃদেবী তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি ভক্তিমতী নারী ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। মাতৃদেবী ভক্তিমান্ গৃহস্থ সাধকের কন্যা এবং ময়মনসিংহ-নিবাসী সর্ব্বজন-পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্ম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দের ভগিনী। যখন মাতুল মহাশয় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তিনি মাতৃদেবীকে সেই ধর্ম্মের শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া আমাদের

পিতৃদেবের সহিত বিবাহ দেন। ধাৰ্ম্মিক ভ্রাতার শিক্ষা ও ধর্ম্মানুরাগী সত্যপরায়ণ স্বামীর সঙ্গ লাভ করিয়া মা নিজ ধর্ম্ম-জীবন অতি উচ্চ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে গঠন করিতে পারিয়া ছিলেন।

মাতৃদেবী কোন্ গুণটীতে ভূষিত ছিলেন না, তাহা বলা যায় না। ধর্ম্মনিষ্ঠা, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, সহিষ্ণুতা এবং সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত সহজ ভাবে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাঁহার অতুলনীয় ছিল। মা আবার একজন গায়িকাও ছিলেন, সে কণ্ঠ অন্তিম শয্যাতেও বিকৃত হয় নাই। মাসাধিক কাল তাঁহার রোগ-শয্যা বেষ্টন করিয়া আমরা কয়টী ভগিনী উপাসনা সঙ্গীতাদি করিলাম, মা বাক্‌শক্তি-রহিত হইলেও কণ্ঠ-স্বর মিলাইয়া সুর ধরিতেন এবং আমরা আশ্চর্য্য হইতাম যে, তাঁহার সুর কখনও ভুল বাহির হইত না। অন্য কন্যাগণ যথাসাধ্য তাঁহার চিকিৎসা, ঔষধ-পথ্য ও আরাম দানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন; তিনি যে নামগানে অপার শান্তি পাইতেন, সে ব্যবস্থা ভাল রকম করিবার জন্যই বুঝি,তাঁহার উপাস্য দেবতা এত দূরদেশ হইতে আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন, এবং প্রায় এক মাস কাল প্রাতঃ-সন্ধ্যা তাঁহার সহিত নামগান করিয়া আমি ধন্য হইলাম, তিনিও তৃপ্তি শান্তি লাভ করিলেন। তাঁর প্রিয় গানগুলি যখন তিনি নিজে করিতে পারিতেন না, আমরা করিলে প্রাণ ভরিয়া শুনিতেন এবং প্রশান্তমনে গানের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন। একদিন অস্পষ্টস্বরে 'আরাম' উচ্চারণ করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, 'প্রাণারাম' সঙ্গীতটী শুনিতে চান এবং গানটী শুনিয়া মার নীরব মুখাকৃতি অতি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এই ঘটনায় মঙ্গলময় যেন স্পষ্ট দেখাইলেন যে, তাঁর ভক্ত সন্তানের কোন আন্তরিক কামনা তিনি অপূর্ণ রাখেন না।

মাতৃদেবী সুদীর্ঘ ২৯ বৎসর কাল অতীব নিষ্ঠার সহিত বৈধব্য-ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বিকার মনটী সকল শুচি অশুচি বিচার আচারের অনেক ঊর্দ্ধে থাকিত, যাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইতাম এবং এই কারণেই ভিন্ন নানা প্রদেশের লোকের সহিত সহজ ভাবে মিলিতে পারিতেন। গত পূর্ব্ব বৎসর ৭৪ বৎসরের প্রাচীনা মাতা ষষ্টি-কন্যে সুদূর দেরাদুন হইতে কলিকাতার মাঘোৎসবে যোগ দিবার জন্য, উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ছুটিয়া আসিলেন এবং উৎসবের প্রত্যেক দিন ব্যাকুল হইয়া নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতেন। বার্দ্ধক্যের দৈহিক সকল কষ্ট ও অসুবিধা কিছুমাত্র অনুভব করিতেন না। নূতন বিধানে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের বাণী যাহা শুনিলাম, মাতৃদেবীতে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। "অহৈতুকী হরিভক্তি, জীবন্ত দৈবশক্তি, হরিনাম মোহমন্ত্রে বৃদ্ধকে করে নবীন।"

মাতৃদেবী বহুসন্তানের জননী ছিলেন এবং এই দীর্ঘ জীবনে কয়েকটী কঠিন শোকের আঘাত পাইয়া গিয়াছেন। আমরা ভাবিতাম, প্রাচীন বয়সে বুঝি বা এই শোকাঘাত সামলাইতে পারিবেন না; কিন্তু দেখিলাম, এই মহা ঝড় তুফানে সেই দৃঢ়বিশ্বাসী ভক্তিমতী নারী পূর্ব্বের মতই অচল অটল হইয়া, উপাসনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠের সময় দীর্ঘ করিয়া লইলেন, পরম ধৈর্য্য সহকারে যেন বিধাতার বিধান মাথার মুকুট করিয়া লইলেন। বিগত কঠিন রোগাক্রমণের পর হইতে চসমার সাহায্যেও আর পড়া শুনা চলিত না, তখন অপর কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বের প্রত্যেক পাঠ অতি আগ্রহের সহিত শুনিতেন। গত নয় মাসকাল রুগ্ন অবস্থায় থাকিয়াও মার ধৈর্য্য ও শান্তি পূর্ব্ববৎ অসীম ছিল, প্রাতঃ-সন্ধ্যা নিষ্ঠার সহিত উপাসনা ও গান করিয়া গিয়াছেন। মনে হইত, সংসারের সকল বন্ধন মুক্ত করিতেছেন। মাকে এই বৃহৎ পরিবারের জন্য কোন দিন চিন্তাক্লিষ্ট দেখা যায় নাই। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই "বাহিরের ভুল ভাঙ্গবে যখন, অন্তরের ভুল ভাঙ্গবে কি" এই গানটী করিতে বলিতেন, আজ তাঁর নির্মুক্ত হৃদয় সকল ভ্রমের অতীত হ'য়েছে। যিনি চিরদিন মাকে তাঁর শান্ত ছায়ায় রেখে পবিত্র ও জীবন-মুক্ত করে ছিলেন, আজ তাঁরই পরম শান্তিময় ক্রোড়ে আমাদের মা আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী আজিকার পবিত্র দিনে আমাদের শোকার্ত্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া জীবন ধন্য করুন। আমরা আজ তাঁহারই ইচ্ছার জয় গান করি।

"জয় সচ্চিদানন্দ হরে"

৫ই মে, ১৯২৯। ভাগলপুর } শোকার্ত্তা কন্যা— নির্ম্মলাবালা বসু

—০—

"নববিধানের গুরু"।

মহাশয়

১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে "নববিধানের গুরু" প্রবন্ধের নিম্নে আপনার টিপ্পনী পাঠে দুই প্রকার বিশ্বাসের—আত্মগত ও বুদ্ধিগত বিশ্বাস-দ্বয়ের সংমিশ্রণ দেখিতে পাইলাম। আত্মগত বিশ্বাস কি? যে বিশ্বাস নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ, যে বিশ্বাস বাহ্যপ্রমাণ-নিরপেক্ষ, অথচ সকল প্রমাণের প্রমাণ, নির্ব্বিকল্প, নিঃসংশয় এবং অবিনাশী। বাহিরের কোন বিষয়, কোন গ্রন্থ বা কোন লোকের কথা এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না। ঈশ্বরদর্শনে শ্রবণে ইহার জীবন (জন্ম নয়), ঈশ্বর-কৃপায় ইহার স্থিতি। বিশ্বাসীর জীবনই বিশ্বাসের প্রমাণ:—

"নিশ্বাস ইব বিশ্বাসঃ স্বতঃসিদ্ধোঽপ্রমেয়কঃ।
প্রমাতাচ প্রমাণানাং নির্ব্বিকল্পো নিরত্যয়ঃ॥"

ইহাকেই আত্মগত বিশ্বাস বলে এবং ইহাই নববিধানের বিশ্বাস।

বিচার-বুদ্ধি দ্বারা যে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, উহা প্রমাণ সাপেক্ষ, সংশয়াত্মক এবং পরিবর্ত্তনশীল। ইহা "সুতরাং বা অতএবের" বিশ্বাস। ইহা নববিধানের বিশ্বাস নয়, পুরাতন বিধানের বিশ্বাস।

আপনি একবার বলিতেছেন—"তিনি(কেশবচন্দ্র) কখনও অন্যধর্ম্মের গুরুর ন্যায় তাঁর নিজের কথা মানিতে বলেন নাই।... কেবল এক ঈশ্বরবাণী শুনিয়া সকল বিষয়ে চলিতে হইবে, ইহাই নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেরই বিধি"। আবার বলিতেছেন—"নববিধান সম্বন্ধে তাঁর যে কথা, সে তো তাঁর নিজের কথা নয়। তিনি বলিলেন, 'আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না'। সুতরাং তাহা ঈশ্বরের বাণী, এই বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে হইবে।" এস্থলে ঈশ্বরের বাণী নিজে শুনিয়া আত্মগত বিশ্বাস করা হইল না, অপরের শ্রুত ঈশ্বরবাণীর উপর বুদ্ধিগত বিশ্বাস করিতে বলা হইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানাদি পুরাতন বিধানবাদীরাও তো এই কথাই বলেন। তবে নববিধানের আত্মগত বিশ্বাসের পার্থক্য কোথায় রহিল?

"আমি আবার গুরু হ'তে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হ'ব?" ইহার উত্তর এই, "নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে।" অর্থাৎ ঈশ্বরকেই কেবল আদর্শ গুরু ও শাসন-কর্ত্তা বলিয়া জানিবে, তাঁহারই বাণী শুনিয়া সকল কার্য্য করিবে। তিনি ভিন্ন অপর কাহাকেও জীবনের আদর্শ করিবে না। তিনি ভিন্ন অপর কাহারও দাস হইবে না।

"নববিধানের স্থানে দাঁড়াইয়া যদি আমি প্রাণ দিতে বলি, যিনি প্রাণ দিতে পারেন, তাকেই বলি বিশ্বাস।" "নববিধানের স্থানে" "তাকেই বলি বিশ্বাস" কথাগুলির উপর আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করি। নববিধানের স্থান কি এবং কোথায়? যে স্থানে অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, ধন জন মান সম্ভ্রম সংসার-সুখ-লালসার প্রাদুর্ভাব, সে স্থান নয়। যে স্থানে হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চার প্রাধান্য সে স্থান নয়। এমন কি, যে স্থানে ভগবান্ ভিন্ন অপর কোন বস্তুর উপরে, নিজের প্রাণের উপরেও অধিকতর অনুরাগ বর্ত্তমান, সে স্থানও নববিধানের স্থান নয়। যে স্থানে ভগবানের কর্তৃত্ব, যে স্থানে বিধাতার বিধি-পালনের জন্য প্রাণ মন সর্ব্বস্বধন উৎসর্গিত, সেই তো নববিধানের নববৃন্দাবন, কুণ্ঠাবিহীন বৈকুণ্ঠধাম। এমন স্থানে দাঁড়াইয়া কাহাকেও প্রাণ দিতে বলিতে হয় না। তবে 'যদি আমি প্রাণ দিতে বলি' এ কথার তাৎপর্য্য কি এই নয় যে, নববিধানের স্থান কি এবং কোথায়, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই 'যদি' কথা দিয়া বুঝাইয়াছেন? কারণ "যিনি প্রাণ দিতে পারেন" "তাঁকেই বলি বিশ্বাসী" এ কথা না বলিয়া বলিলেন, "তাকেই বলি বিশ্বাস"। অর্থাৎ যাহার হৃদয় ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই চায় না, ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব চায়, নিজেচ্ছার পরাজয়ে ঈশ্বরেচ্ছার জয় ঘোষণা করিতে সতত প্রফুল্ল, প্রাণের প্রাণ প্রাণারামকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে সানন্দে তাঁহারই আজ্ঞাধীন হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে—তাঁহার সেই হৃদয়ের অবস্থাকেই বিশ্বাস বলিয়াছেন। ইহাই আত্মগত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস জীবনবেদের প্রত্যেক অধ্যায়ে পরিস্ফুট; এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, ইহা প্রত্যক্ষ বা আত্মগত বিশ্বাস, অপ্রত্যক্ষ বা বুদ্ধিগত বিশ্বাস নহে। আমার মত বুদ্ধিগত বিশ্বাসীকে শিখাইলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্য যে স্থানে সকল বৈষম্যের সমন্বয়, উহাই নববিধান এবং অহঙ্কার-শূন্য, পবিত্র-প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ই ইহার স্থান। আরও শিখাইলেন, নববিধানের স্থানে দণ্ডায়মান "আমি" কে।

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

এই আলোচনার মধ্যে এমন কিছুই বলা হয় নাই যে, নববিধান-বাদী কোন গুরুই মানেন না। কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, একমাত্র পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান্ ভিন্ন কেহই অভ্রান্ত আদর্শ গুরু হইতে পারেন না। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জড় জীব সকলেই কত কি বিষয়ে সদাই শিক্ষা দিতেছে। চিরদিনই শিখিবার অনেক বিষয় আছে এবং অনেকেই আপন আপন বিষয় শিখাইতেছে। সাধু মহাপুরুষদের নিকট হইতে অনেক জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি অধিক হওয়াই স্বাভাবিক; এমন কি, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শস্বরূপ অভ্রান্ত গুরু বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহাদের পদানত দাস হইতে প্রাণ চায়। কিন্তু সেই মহাত্মারাই বলেন, "সাধু সাবধান! অল্পের মধ্যে আবদ্ধ হইও না, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমাকেই জানিতে, চিনিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে অনন্ত কাল যত্ন কর। সেই অনন্ত মহিমার নিকটে আমরা কিছুই নয়, বলা যাইতে পারে।" "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"। "There is nothing good but God, Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect."

শ্রীহলধর সেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে যত আলোচনা করা হয়, ততই ভাল। শিক্ষার্থীর ভাবে আলোচনা দ্বারা নিশ্চয়ই শিক্ষা লাভ হয়। তবে কেবল দার্শনিক ভাবে কথা কাটাকাটি ভাল নয়। ভাবের আদান প্রদান ভাল। নববিধান সমন্বয়ের বিধান। আত্মগত বিশ্বাস নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিচার বুদ্ধিও চরিতার্থ হইবে। বিচার-বুদ্ধি একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। অন্যকে বুঝাইতে বা বলিতে হইলে বিচার-বুদ্ধিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আচার্য্য প্রসন্ন বাবুকে

যখন বলিলেন, "আমার কথা শুনোনা, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলিও", তখন তাঁহার আত্মগত বিশ্বাস এবং বিচার-শক্তির যুগপৎ চরিতার্থতা সম্পাদনের কথাই বলিলেন। আবার সেই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য অন্যত্র বলিলেন, "এবারকার গুরু সে,যে বলে,আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার কথা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মনে বুঝতে পার।" লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কথা ঠিক না হউক, আমাদের ভাবই ত প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। সাধারণ ভাবে লোকে যে গুরুকরণ করে, সে গুরু বা ঈশ্বরের এবং মানবের মধ্যবর্ত্তী যে গুরু,কেশবচন্দ্র সে গুরু হতে চান নি,কিন্তু নববিধানের অখণ্ড মানবত্ব জীবনের দ্বারা প্রতিষ্ঠা এবং অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়া যে জীবনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই শিক্ষা-গুরু তাঁহাকে বিধাতা করিয়াছেন, ইহাই অভ্রান্ত ভাবে সকলকে মানিতে হইবে, এই অর্থেই তিনি আপনাকে নববিধানের গুরু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শূকরাদি পশুকেও ত তিনি নিজের গুরু বা শিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সে অর্থে সবাই গুরু, লেখক মহাশয়ও বলিয়াছেন। কিন্তু নববিধান সম্বন্ধে কেবল তাঁহার কথা নয়, তাঁহার জীবনাদর্শ অভ্রান্ত ভাবে গ্রহণীয়,এইটাই তাঁহার নববিধানের গুরু বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য। কেননা তিনি স্পষ্টই বলিলেন,"আমি যে কেবল দুটা কথা বলিতে আসিয়াছি,তাহা নয়। নববিধান ষোল আনা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতে এক জন থাক,দেড় জন থাক।" এই ষোল আনা তার নববিধান গ্রহণ করা,তাঁহাকে নববিধানের গুরু বলিয়া গ্রহণ করা। এ সম্বন্ধে আর অধিক লেখালেখি নিষ্প্রয়োজন। সাধনেই ইহার মীমাংসা, কেবল আলোচনায় হয় না। —ধঃ সঃ

প্রেরিত কেদারনাথ দে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহার পরে বাড়ী মেরামত করিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে বলায় কি হইবে ভাবিতেছেন, এমন সময় Dt. Judge A. C. Sen তাঁহার Circular Road স্থিত আবাসে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করাতে ভাই কেদার নাথ সপরিবারে এই অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এই সময় A. C. Sen এর পরিবার ঢাকায় ছিলেন। কিছুদিন সেখানে A. C. Sen কে লইয়া প্রায় দুই বেলাই উপাসনাদি হইত। একদিন A, C, Sen আমাদের সকলকে নৌকা করিয়া শিবপুরের কম্পানী বাগানে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। আসিবার সময় বিপুল ঝটিকা আসিয়া ভাগীরথী বক্ষকে এমন আলোড়িত করিয়াছিল যে, আমরা সকলে জীবনের শেষ উপকূলে আসিতে আসিতে বাঁচিয়া গেলাম। ভাই কেদার নাথ বাড়ী আসিয়া বিশেষ উপাসনায় সকলকে লইয়া A, C, Sen এর সঙ্গে বসিলেন এবং দয়াময়ী জননীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। সে দিনটী একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে থাকিয়া গেল। এখানে সর্ব্বদা উপাসনা প্রার্থনা ব্রহ্মসঙ্গীতাদিতে আনন্দে কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর, A, C, Sen এর পরিবার যখন ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভাই কেদার নাথও অনেক ঘুরিয়া অন্বেষণ করিয়া সেই সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে খুব গলির মধ্যে আর একটি বাড়ী পাইলেন, যাহার দোতালায় বাড়ী ওয়ালা সপরিবারে বাস করিতেন। শুনিয়া ছিলাম, তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্ত। অর্থাৎ নাম লেখা ছিল, চাঁদাও কিছু দিতেন, কিন্তু বাড়ীতে বা পরিবারে কখনও উপাসনাদি দেখা যায় নাই এবং সমাজেও যাইতেন না। সেই বাড়ীর নীচের ঘর ও স্থান সমূহ স্বাস্থ্যের পক্ষে সুবিধা মত ছিলনা,কিন্তু কি করা যায়। কলিকাতা সহরে চিরদিন যাঁহারা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই জানেন,বাড়ী পাওয়া এবং থাকা কত অসুবিধা-জনক ও কষ্টকর। তাহা হইলেও, এ জগতে কত লোককে যে এই বাড়ী ভাড়া করিয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে,তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পক্ষান্তরে, ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি এই বাড়ীর ব্যবসায় করিয়াই উত্তরোত্তর ধন সঞ্চয় করিয়া, তালুকমুলুকদার হইয়া উঠিতেছেন। কলিকাতা নগরে কত শত সুন্দর সুশ্রী অট্টালিকা উন্নত-মস্তকে [illegible]য়মান হইয়া ধনাঢ্যের ধন মানের পরিচয় দিতেছে, আর কেহবা মস্তক রাখিবার স্থান না পাইয়া কত ক্লেশে দিন যাপন করিতেছে। ভাই কেদার নাথকে অনেক সময় এই ঈশা-বচনটি বলিতে শুনা যাইত,"পক্ষী সকলের কুলায় আছে, শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে, কিন্তু মনুষ্য-সন্তানের এরূপ স্থান নাই, যেখানে তিনি মস্তক রাখিতে পারেন।" এক্ষণে এই বাড়ীতেই উঠিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে আগষ্ট,শুক্রবার, পরম স্নেহের জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার রমণীকান্ত চন্দ শ্রীহট্ট সহরে, স্বর্গারোহণ করিলেন। তার যোগে এই সংবাদ পাইয়া ভাই কেদার নাথ সপরিবারে যে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, জীবন থাকিতে আর তাহা ভুলিতে পারিলেন না। ইহার বিশিষ্ট কারণ, সন্তানাদি সম্পর্কে আর কখনও ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা শোক পান নাই। এই শোকে তাঁহাদিগকে বড়ই কাতর করিয়াছিল। কন্যাকে এই সময় নিকটে আনাইয়া লইলেন ও কিছুদিন সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা উপাসনা শাস্ত্র-পাঠ ইত্যাদি করিয়া কন্যার ভগ্ন প্রাণে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইতেন। প্রেরিত প্রচারক ভাই কেদার নাথকে যে কার্য্য বিশ্বপিতা সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার জন্য আহ্বান আসিল। কিছু দিন এই শোকের যাতনার ভিতর, কন্যাকে পরলোকে নিত্য সম্বন্ধ সকল সম্যক্ রূপে বুঝাইয়া, আবার মঙ্গলগঞ্জে প্রচার-যাত্রা করিলেন। সেই সময় সেখানে থাকিয়া আশপাশের গ্রাম ইত্যাদিতে যাইয়া নববিধান-কাহিনী প্রচার করিতেন। আবার মধ্যে মধ্যে মঙ্গলগঞ্জের জমীদারীতে আসিয়া লক্ষ্মণ বাবুর সহিত মিলিত হইয়া, আরও কর্ম্মচারী দিগকে লইয়া স্থানে স্থানে প্রচার-

যাত্রা এবং উপাসনাদি হইত। মঙ্গলগঞ্জে অবস্থান কালে গাছতলায় হবিষ্যান্ন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং ভক্ত শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র আশও গৃহের রাজভোগ অন্নব্যঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত প্রতিনিয়ত ভাই কেদারনাথের সহিত যোগ দিতেন। এই বৃক্ষতলে রন্ধনাদির সঙ্গে সংপ্রসঙ্গ ও শ্লোকপাঠাদি হইত; তৎপরে পবিত্র বৈরাগ্যের অন্নভোজন একটী বিশেষ সম্ভোগের বিষয় ছিল। সময়ে সময়ে আরও অনেকে এই বৈরাগ্যের পবিত্র আনন্দে যোগ দিয়া সুখী হইতেন। অনেক দিনের পরে আবার কলিকাতা আসিলেন। এই সময় গৃহে ফিরিয়া কনিষ্ঠ পুত্র নব কুমার বিমান বিহারীকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সেই সময় স্পেন্সার সাহেবের বেলুন আকাশ মার্গে ওঠা লইয়া সমগ্র কলিকাতা সহর তোলপাড় হইয়াছিল। পিতৃদেব তদনুসারে উপরিউক্ত নামটী রাখিয়াছিলেন। অন্য চারিটি পুত্রের নাম মনোমত ধন, মনোনীত ধন, মনোরথ ধন, মনোগত ধন,এই প্রকার মিলাইয়া রাখা হইয়াছিল। প্রচারক যিনি, নববিধান-বার্ত্তা দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে সংসারাসক্ত জীব উদ্ধারের জন্য বিলাইতে বিধাতা কর্তৃক যিনি আহুত, তিনি কি আর বসিয়া থাকিতে পারেন? কেদার নাথ আবার লাহোরে চলিয়া গেলেন এবং আনন্দের সহিত সে দেশের চারিদিকে নববিধান-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ত্রিতাপ-দহনে কাতর আত্মা সকল আসিয়া প্রেরিত কেদার নাথের নিকট নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিল। তাঁহার হিন্দি উপাসনা, হিন্দি ভাষায় প্রচার ও ইংরাজিতে বক্তৃতা শুনিয়া শত শত লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই প্রকারে বিধানের প্রচার-কার্য্য সংসাধন করিতে করিতে সিমলা শৈল পর্য্যন্ত চলিয়া যান। কিছু দিন সেখানে থাকিয়া প্রচার ও ব্রহ্মমন্দিরের সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পুরাতন নববিধান-বিশ্বাসী যদুনাথ ঘোষ প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ ভাই কেদার নাথকে পাইয়া সেবারে বড়ই সুখী হইয়াছিলেন,আর ছাড়িতে চাহেন নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমলতা চন্দ

—ঃ০ঃ—

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ট্রষ্ট ফণ্ড।

স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের উইলদত্ত ফণ্ডের আয় ব্যয় হিসাব।

(দ্বিতীয়বার)

নববিধান-বিশ্বাসী শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ভ্রাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের উইলদত্ত নববিধান-প্রচার এবং দাতব্য ফণ্ডের আয় ব্যয়ের হিসাব ইংরাজি ১৯২৩ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৩৩২ সালের ১৬ বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর অর্থাৎ ১৯২৪ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত হিসাব দ্বিতীয়বার নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—

উপরোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বে উল্লিখিত মৌজুত তহবিল
১৯২৩ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত.................... ৪১৩৸১০
উক্ত মৌজুত তহবিলের ব্যাঙ্কের সুদ ১৯২৪ সনের
জানুয়ারী হইতে ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত
৫ বৎসরে ৬৩৷৷৶৭
১৯২৯ সনের ১লা জানুয়ারীতে মৌজুত তহবিল ... ৪৭৭.৫

বাঁকিপুর, পাটনা।
৯ই মে, ১৯২৯।

শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়
স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণের উইলে
একজিকিউটার সম্পাদক।

—০—

সংবাদ।

পারিতোষিক-বিতরণ—বাগনান নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের পারিতোষিক-বিতরণ-উৎসব গত ২৭শে এপ্রেল সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুচারুদেবী সবান্ধবে এবার বাগনানে গমন করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিবেন,স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে যাইতে পারেন নাই। উলুবেড়িয়ার সুযোগ্য মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ পারিতোষিক-বিতরণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, বালিকাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীমান্ অজিত নাথ মল্লিক সহকারী সম্পাদক উদ্বোধন-সঙ্গীত ও রিপোর্ট পাঠ করেন। বালিকাগণ অতি সুন্দর আবৃত্তি করিয়াছে। বালিকাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটী বিশেষ পারিতোষিক দেওয়া হয়:—(১) সতীঙ্গমোহিনী পারিতোষিক বুদ্ধিলাভের জন্য, (২) নিত্যকালী রৌপ্যপদক শিষ্টাচার ও গৃহকর্ম্মজন্য, (৩) হিরণ্ময়ী রৌপ্যপদক পরসেবা জন্য, (৪) কাত্যায়নী রৌপ্যপদক সচ্চরিত্রতা জন্য, (৫) লোকনাথ মল্লিক প্রাইজ ঘড়ি নিয়মিত উপস্থিতি জন্য। সর্ব্বশেষে বালিকাদিগকে উত্তমরূপে জলযোগ করান হয়।

জন্মদিন—গত ৩০শে এপ্রিল, ৮২ ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত মনোনীত ধন দের জন্মদিন সেবিকা শ্রীমতী হেমলতা চন্দ উপাসনা করেন, শ্রীমতী প্রেমলতা দেব প্রার্থনা করেন।

গত ৩রা মে শ্রীমান্ অজিত নাথ মল্লিকের জন্মদিনে ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ও আলীপুরে ১০নং নিউ রোডে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়।

বিশেষ উপাসনা—গত ৩রা মে সন্ধ্যায় ৭নং বজবজ রোডে রাজাবাগ রাজপ্রাসাদে মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর রোগারোগ্য

উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন, মহারাণীদেবী প্রার্থনা করেন।

ব্রহ্মানন্দাশ্রম—৫ই মে, ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দিনে স্বর্গগতা আত্মাকে স্মরণ করিয়া ও পরিবারবর্গের কল্যাণার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়। ৯ই মে, আর্য্যনারী-সমাজের পঞ্চাশৎ বার্ষিক দিন স্মরণে প্রার্থনা হয়।

শ্রীদরবার—শ্রীদরবারের অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত ছিল, আবার মার কৃপায় নিয়মিত রূপে অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই বৈশাখ, ১৭এ বিপ্রদাস ষ্ট্রীট, সন্তানদের গৃহে, স্বর্গগত সাধু অঘোর নাথের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৩৲টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৪ই মে, ১১ বি স্কট্‌স্ লেনে, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীরের মধ্যমপুত্র স্বর্গীয় প্রশান্ত কুমারের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই দিন উপলক্ষে নববিধান ট্রষ্ট ফাণ্ডের অন্তর্গত প্রশান্ত-স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রচার ভাণ্ডারে ৭৲, রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ে নববিধান-সমাজের ছেলেদের সচ্চরিত্রতার জন্য ৫৲, একটা পিতৃমাতৃহীন বালককে ৫৲, একটী গরিব বালককে পুস্তকের জন্য ৫৲ এবং গরীব ব্রাহ্মপরিবারে বস্ত্রের জন্য ৮৲টাকা, মোট ৩০৲টাকা দান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পিতৃদেবও প্রচারভাণ্ডারে ৩৲ টাকা এবং অন্যান্য স্থলে ৭৲টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২০ শে এপ্রিল, ৭২নং নিউ থিয়েটার রোড, ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গগত নকুড়চন্দ্র ব্যানার্জির সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ২৪শে এপ্রিল, ৬নং সানীপার্কে, মিঃ এবং মিসেস্ এস্. কে. চৌধুরীর গৃহে, রেঙ্গুনের মিঃ এবং মিসেস্ এস্. এন্. সেনের কন্যা "প্রকৃতির" সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত এপ্রিল মাসে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—স্বর্গীয়া সারদা সুন্দরী ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ নিম্নলিখিত স্থানে গত ৫ই মে সম্পন্ন হইয়াছেঃ—

দেরাদুন—এক কন্যা ব্যতীত অপর পুত্রকন্যাগণ কর্তৃক দেরাদুনে যে পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান গম্ভীর ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ভাই প্রমথ লাল সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঙার ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ রায় শ্লোক-পাঠে সহায়তা করেন। ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা বাঙ্গলাতে এবং শ্রীমতী ভক্তিসুধা হেমরাজ হিন্দিতে পাঠ করেন। আচার্য্যদেবের নবসংহিতার প্রার্থনা হিন্দিতে শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত কোঙার পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে দশটী নাতী নাতনী দণ্ডায়মান হইয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রের স্তোত্রটি আবৃত্তি করে। অনুষ্ঠানের মধ্যে কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু লিখিত মাতৃজীবনী পঠিত হয়; তদ্ব্যতীত আরও দুইজন মহিলা হিন্দিতে ও বাঙ্গলাতে পরলোকগত আত্মার সুন্দর জীবনের সাক্ষ্য দান করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে দেরাদুনে ১৫০৲, লক্ষ্ণৌ ১০০৲, কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲, নববিধান জুবিলী ফণ্ডে মুদ্রাঙ্কণের জন্য ১৫০৲, কলিকাতা সরষুনদনে ৪০০৲ এবং লাহিরিয়াসরাই বিনয়ভূষণ বালিকা-বিদ্যালয়ে ১০০৲ টাকা, মোট ১০০০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভাগলপুর—লীলালজ ভবনে কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু কর্তৃক মাতৃদেবীর পারলৌকিক ক্রিয়া পবিত্র ও গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী উপাসনায় সকলকে তৃপ্তি দান করিয়াছেন। ভাগলপুরের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকগণ শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মাতৃদেবীর জীবনী যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। এই অনুষ্ঠানে মুঙ্গেরে আশ্রমগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ২৫৲, কলিকাতার জুবিলী ও শতবার্ষিক উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ১০৲, হাওড়া ব্রহ্মানন্দ আশ্রম ২৲, ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দির ২৲, অনাথ আশ্রম ২৲, একটি হিন্দু বিধবা ২৲ এবং প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহ—ব্রাহ্মপল্লীতে পণ্ডিত শ্রীশ্রীনাথ চন্দ কনিষ্ঠা ভগ্নী সারদা সুন্দরী দেবীর পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য, (১) যে ব্রহ্মমন্দিরে সারদাদেবী প্রথম সামাজিক উপাসনা আরম্ভ করেন, ময়মনসিংহের সেই পুরাতন ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, (২) ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার জন্য ৫৲, (৩) ব্রাহ্মসাধনাশ্রমে রুগ্ন পরিচারকগণের পথ্যের জন্য ৫৲, (৪) ঢাকা অনাথ আশ্রমে শিশুদিগের দুগ্ধের জন্য ৫৲, (৫) বিধবাশ্রমে গরিব বিধবাদিগের বস্ত্রের জন্য ৫৲ টাকা, মোট ২৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভগবান্ এই সকল অনুষ্ঠানকে এবং অনুষ্ঠানে উৎসর্গিত দানকে শুভাশীর্ব্বাদে সার্থক করুন। পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, নাতী নাতনী প্রভৃতি সকল পরিবারবর্গের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Bhai Gopal chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", বি, এন, মুখার্জ্জি কর্তৃক ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। ১লা ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 17th August, 1929. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রাণের পরম উপাস্য দেবতা! এই যে নবযুগে নবধর্ম্ম, প্রকাণ্ড নববিধান বঙ্গ, ভারত ও সমস্ত বিশ্বের জন্য দান করিলে, ইহার মূলে তোমার পবিত্র সত্য পূজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। যেমন তোমা হইতে সমস্ত বিশ্বের উদগম, তেমনই এক মাত্র তোমার পবিত্র পূজা বন্দনা হইতে মানব-জীবনের, মানব-পরিবারের সর্ব্ববিধ উন্নতি, উৰ্দ্ধগতি, সর্ব্ববিধ পরিপুষ্টি ও কল্যাণ-লাভ। তাই তুমি, হে চিরকল্যাণ-ঘন পরম দেবতা! অযাচিত কৃপাগুণে এই সত্য জীবন্ত পূজার শুভ ব্যবস্থা আমাদের জন্য, জগতের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিলে। পূজা শিখিব কোথায়? পূজা শিখিব ভারতে। ভারতে যেমন বিচিত্র ভাবে, গভীর ভাবে, জীবন্ত ভাবে, ভক্তি ও অনুরাগে তোমার পূজা হইয়াছে, এমন আর কোথায়? প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত তোমার পূজা বন্দনা, ধ্যান ধারণা জগতের আদর্শ পূজা বন্দনা হইয়া রহিয়াছে। ভারত-ভূমিতে কত যোগী, কত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং প্রাণ মন ঢালিয়া তোমার পূজা বন্দনা করিয়া আপনারা ধন্য হইলেন, ভারতকে ধন্য করিলেন। বঙ্গ ভারতে মূর্ত্তি-যোগে প্রচলিত পূজা বন্দনার প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া, আমরা নিরাকার সত্য-স্বরূপের সত্য পূজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সেই মূর্ত্তি-যোগে পূজা বন্দনার মধ্যে সরল, নিষ্ঠাবান্, ভক্তিমান্ উপাসক ও সাধকগণ যে ভক্তি, অনুরাগ, আদর, সম্মান, নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখনও স্থানে স্থানে দেখাইতেছেন, তাহার মধ্যে কত শিক্ষার সামগ্রী রহিয়াছে। আজ ভারতের পূজা বন্দনার পুণ্য গন্ধে, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে শিক্ষা ও সভ্যতামণ্ডিত ইয়ুরোপ ও আমেরিকার কত কৃতি সন্তান আকৃষ্ট ও মোহিত। নববিধানে প্রাচীন ও নবীন, স্বদেশের ও বিদেশের সকল প্রকার পূজা পদ্ধতির ভাব লইয়া, অতীত ও বর্ত্তমান, স্বদেশের ও বিদেশের সকল সাধু, ভক্ত ও মহাজনগণের জীবনের বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা, অনুরাগ, মত্ততা প্রভৃতি পূজোপ-করণ লইয়া নবযুগে ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনন্তের মহাপূজার অনন্ত আয়োজন লইয়া, হে অনন্ত! তুমি আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ। আমাদের ছোট, বড় সকলের জীবনকে তুমি আপনার লীলা-ভূমি করিয়া, প্রতি জীবনে জীবন্ত ভাবে বিহার করিবে, নব নব লীলা বিস্তার করিয়া আপনার সাধ মিটাইবে, আমাদের সাধ পূর্ণ করিবে, ইহাই তোমার

সম্বল। কিন্তু তোমার কৃপার এত সাক্ষ্য পাইয়াও, পূজা বন্দনা বিষয়ে আমরা কত উদাসীন ও অলস, কত ভক্তি, অনুরাগ ও নিষ্ঠাবিহীন। অতীতের ঋষিযুগের পূজা পদ্ধতি ও ধ্যান ধারণা, বর্ত্তমানে প্রাচীন সমাজের পূজা অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত বিশ্বাস, ভক্তি, অনুরাগ, আদর, সম্মান ও একনিষ্ঠতা আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছে। পূজা উপাসনায় আমাদিগের হৃদয় মনের ভাব, অপ্রস্তুতি, ও হীনতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা নিতান্ত অনুতপ্ত। তাই কাতর প্রাণে তব চরণে প্রার্থনা করিতেছি, এই বিশেষ সময়ে, এই প্রস্তুতির দিনে, আমাদিগকে নব জাগরণে জাগ্রত করিয়া, নব নব প্রস্তুতি বিধান করিয়া, হে সিদ্ধিদাতা! আমাদিগকে নিজ কৃপাগুণে, সিদ্ধির পথে অগ্রসর কর। তোমার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দীনতা।

"দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।" শ্রীঈশা অনুতপ্ত দীনাত্মাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তাহাদের নব জীবন লাভ সম্পর্কে আশাবাণী শুনাইলেন এবং তাহাদিগকে লইয়াই আপনার নব ধর্ম্মের ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সময়ে দেশে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্যাবিশারদ, পণ্ডিত লোক ছিলেন, পৃথিবীর হিসাবে অনেক জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গ করিতেন না, তাঁহাদের সঙ্গ পাইবার জন্য, তাঁহাদিগকে আপনার ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে, ধর্ম্মমণ্ডলীতে আনয়ন জন্য, তাঁহার প্রাণে কোন আশা ও উৎসাহ উপস্থিত হয় নাই; বরং তিনি তাঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গকে ভয় করিতেন—শারীরিক ক্ষতির জন্য নয়, আধ্যাত্মিক ক্ষতির জন্য। ভক্ত শ্রীচৈতন্য কি শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানী, বিদ্যা-বুদ্ধি-জাতিকুলাভিমানী ব্যক্তি হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন নাই? যাঁহার প্রাণের মন্ত্র "তৃণ হতে নীচ হয়ে বল হরি", তিনি কি প্রকারে জ্ঞানাভিমানী, গুণাভিমানী, জাতিকুলাভিমানী ব্যক্তির সঙ্গ করিতে পারেন? সাধু ভক্ত বিশ্বাসিগণ জানেন, যথার্থ দীনাত্মা না হইলে কাহারও নিকট স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। তাই ভক্ত কবি গাহিলেন, "চির দিন তোমার দ্বারে ভিখারী হয়ে পড়ে রহিব। তুমি জীবনসর্ব্বস্ব ধন, বল তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব। শুনেছি সাধুর মুখে, দীনাত্মা হ'য়ে যে ডাকে, সে যে পায় তোমাকে; অনুরাগী কাঙ্গালী না হ'লে, আমি কেমনে তোমারে পা'ব। ত্যজে আত্ম অভিমান, যদি হই তৃণ সমান, পা'ব পরিত্রাণ; তবে তোমারে সঁপিয়ে প্রাণ, আমি চির বৈরাগী হইব।" সাধু-মুখে আমরা আত্ম-চেতনা-সূচক কত কথাই শুনিয়াছি, সঙ্গীতে আমরা নব নব জাগরণ-সূচক, স্বর্গের অগ্নিময় বাণীপূর্ণ কত গানই গাহিতেছি, শুনিতেছি, শুনাইতেছি; কিন্তু আমাদের জীবনে যথার্থ দীনতার ভাব কি সহজে উদয় হয়? যে জীবনে শারীরিক ভাবে যৌবনের বল ও মনের উদ্দাম উৎসাহ রহিয়াছে, অন্ততঃ যৌবনের বল না থাকিলেও, মনের বল, শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, গুণের অভিমান রহিয়াছে, জ্ঞান গুণের, শিক্ষা দীক্ষার, জাতি-কুল-মর্য্যাদার একটা জীবন্ত অনুভূতি রহিয়াছে, জীবন্ত অনুভূতি না থাকিলেও অন্তরের গভীর প্রদেশে একটা অস্ফুট ধারণা রহিয়াছে, সে জীবনে দীনতার ভাব দেখা দিবে কি করিয়া? যে জীবনে ব্রহ্মকৃপাবলে স্বর্গের ধর্ম্মধন শনৈঃ শনৈঃ কথঞ্চিৎ সঞ্চিত হইয়া না থাকিলেও, বংশ-পরম্পরা-গত উত্তরাধিকারিত্ব-স্বত্বে সঞ্চিত ধর্ম্মধনের একটা উত্তাপময় গৌরবের গরম রহিয়াছে, সে জীবনে যথার্থ দীনতার ভাব দেখা দিবে কি করিয়া? যে জীবনে গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান বা ধর্ম্ম-জ্ঞানের সঞ্চিত সম্পদ্ যথেষ্ট না থাকিলেও, শাস্ত্র-জ্ঞানের বা ধর্ম্ম-জ্ঞানের বাহ্যাভাস-জনিত একটা গৌরব-গরিমা রহিয়াছে, সে জীবনে দীনতার উদয় হ'বে কি করিয়া? যে জীবনে জাতি, কুল, মান, মর্য্যাদা-জনিত অন্তঃপ্রবাহী উত্তাপ রহিয়াছে, সে জীবনে দীনতার ভাব কোথায়? যে জীবনে স্বর্গের সত্য ধর্ম্মের অল্পাধিক সঞ্চয় না থাকিলেও, বাহিরে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আচরণ-গত আড়ম্বর যথেষ্ট রহিয়াছে, সে জীবনে যথার্থ দীনতার বিকাশ কোথায়? আমি প্রচারক, আমি সাধক, আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আমি ধনী, আমি

জাতি-কুল-মহত্বে কত গৌরবান্বিত, আমি কর্ম্মী, আমি দেশ-সেবক, অথবা দশের সেবক, আমি কর্ম্ম-কৌশলে বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি, এই সকল ভাবের মধ্যেই অহংভাব বা অহঙ্কার জন্মগ্রহণ করে, যেরূপ বাহিরের আবর্জ্জনা এবং নানা প্রকার ময়লার মধ্যে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষাক্ত কীট জন্মগ্রহণ করে। এই অহঙ্কার সংসারে, গৃহ-পরিবারে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, মানব মনের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বর্দ্ধিত হইয়া, পরিপুষ্ট হইয়া কত বিক্রম প্রকাশ করে, কত বিষাক্ত বায়ু উদ্গীরণ করে, কত সোনার সংসারকে, গৃহ-পরিবারকে, কত প্রভাবময় ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে ছারখার করে। কিন্তু যাঁহার শ্রীহস্ত-রচিত এই সংসার, গৃহ-পরিবার, যাঁহার মঙ্গল-সংকল্প-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলী, তিনি তো নিদ্রিত নন, তিনি তো সংসার ও গৃহ-পরিবার হইতে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে দূরে নন, তিনি তো সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বর্ত্তমান। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভূমা মহান্, তিনি যথাসময়ে সুকৌশলে, সংসারে, গৃহ-পরিবারে, ধর্ম্মমণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ জীবনে, বিপদ্, পরীক্ষা, বিচ্ছেদ, রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য আনিয়া, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, ঘাত প্রতিঘাতে আমাদের অহঙ্কারপূর্ণ গর্ব্বিত মনকে নিষ্পেষিত করিয়া, এই শিক্ষা দেন, তাঁহা হইতে পদে পদে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, শক্তি প্রভাব, শিক্ষা সহায়তা লাভ ভিন্ন, আমরা সংসারে, গৃহ-পরিবারে, বিশেষভাবে ধর্ম্মরাজ্যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, অসার ও অপদার্থ।

তাঁহারই কৌশলে, তাঁহারই শিক্ষার ভিতর দিয়া, তাঁহারই দেওয়া দিব্য চেতনার ভিতর দিয়া, জীবনের সুসময়ে, শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনে যথার্থ দীনতা উপস্থিত হয়। তখন আমরা দীন অকিঞ্চন হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে তাঁর কৃপাধীন হই, এবং তিনি নিজ কৃপাগুণে আমাদের জীবনে, গৃহ-পরিবারে ও ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্বর্গের আলোক জ্বেলে, স্বর্গের প্রভাব বিস্তার করে, যথার্থ স্বর্গ সংস্থাপন করিয়া আপনি সুখী হন এবং তাঁহার প্রিয় পুত্র কন্যা যে আমরা, আমাদিগকেও সুখী করেন।

সম্মুখে ভাদ্রোৎসব, অনতিদূরে সেণ্টিনারী ও জুবিলী উৎসব। এ সময়ে যদি আমরা যথার্থ দীনাত্মা হইয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী হই, তাঁহার একান্ত অধীন হই, তিনি স্বর্গের অতুল প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিবেনই করিবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পরীক্ষা-তরঙ্গের উপকারিতা।

সাগরে যে সকল ছোট ছোট নৌকা ভাসান হয় দেখা যায়, সাগরের তরঙ্গই তাহাদিগকে অগ্রগমনে সহায়তা করে। জীবনের পরীক্ষা বিপদ্, রোগ শোকও এমনই আমাদিগকে ভগবানের দিকে অগ্রগামী করিয়া দেয়। সে অবস্থায় মন যতই আকুল-প্রাণে ভগবানের আশ্রয় ভিক্ষা করে, ততই ভগবানের নৈকট্য লাভ করে ও শান্তি-উপকূলের দিকে ধাবিত হয়।

কুপ্রবৃত্তি-বর্জ্জন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ বলেন, "সয়তানের সহিত তর্ক করিও না, 'দূর হ' বলিয়া তাড়াইয়া দিবে। হবা তর্ক করিয়াছিল, তাই তার পতন হইল। ঈশা 'দূর হ, পশ্চাৎ গমন কর' বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাই জয়লাভ করিলেন।" বাস্তবিক কুপ্রবৃত্তি গুলিকে দৃঢ়তার সহিত তাড়াইয়া না দিলে, তাহা অধিকার বিস্তার করিয়া বসে ও জীবনকে নরকগামী করে। রাবণ যোগীর বেশ ধরিয়াই সীতাকে হরণ করিয়াছিল। কর্ত্তব্যের ছদ্মবেশ ধরিয়া অনেক কুপ্রবৃত্তি আমাদিগকে পাপ প্রলোভনে পাতিত করে।

যুগল সাধন।

এক একটি ক্ষুদ্র ডোঙ্গা বা নৌকা নদীর তরঙ্গে ঝড় তুফানে ডুবিয়া যাইবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা থাকে বলিয়া, কোন কোন অঞ্চলে দুইটি ডোঙ্গা বা নৌকা একত্রে বাঁধিয়া নদীতে ভাসান হয়; এ যুগল নৌকা প্রায়ই ঝড় তুফানে ডুবেনা এবং অনায়াসে নদী পার হইয়া যায়। সংসার তুফানেও মানব-জীবন-তরী রক্ষার জন্য এবং অনায়াসে সংসার পার হইবার জন্যই, নরনারীকে বৈবাহিক যুগল-ব্রতে বিধাতা বাঁধিয়া দেন। বাস্তবিক কি সংসার-সাধনে, কি ধর্ম্ম-সাধনে, যুগল-ব্রতই জীবনের পূর্ণতা সাধনের উপায়।

নরনারীর সম্বন্ধ।

নরনারীর পরস্পর সম্বন্ধ অতি পবিত্র, অতি স্বর্গীয়। নরনারী পরস্পরকে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা জানিয়া শ্রদ্ধা করিবেন, সম্মান করিবেন এবং পরস্পরের সম্বন্ধে কোন প্রকার অপবিত্র চিন্তা বা প্রবৃত্তি কদাপি পোষণ করিবেন না, ইহাই নববিধানের নির্দ্দেশ, ইহাই নববিধানের আদর্শ চরিত্রের প্রথম লক্ষণ। বাস্তবিক নরনারী পরস্পরের সহিত চারিটি স্বাভাবিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ।

(১) নর পিতা, নারী কন্যা, (২) নর ভ্রাতা, নারী ভগ্নী (৩) নারী মাতা, নর পুত্র, (৪) নারী স্ত্রী সতী সহধর্ম্মিণী, নর পতি। এই সকল সম্বন্ধই স্বর্গীয় এবং অতি পবিত্র। ঈশ্বরের সম্পর্কে নর নারী ভ্রাতা ভগ্নীর সম্বন্ধে চির সম্বন্ধ। এক ঈশ্বর পিতা মাতা, নরনারী সেই এক ঈশ্বরের সন্তান সন্ততি, এই পবিত্র সম্বন্ধে পরস্পরকে দর্শন করিলে, আর অপবিত্রতার সম্ভাবনা নাই, থাকিতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধও অতি পবিত্র এবং স্বর্গীয়। পবিত্র উদ্বাহ-বন্ধনে যে দম্পতি আবদ্ধ, তাঁহারা পৃথিবীতে স্বর্গ-স্থাপনের জন্যই উদ্বাহিত। স্বামী যিনি, তিনি স্ত্রীকে সতী ও সহধর্ম্মিণীরূপে দর্শন করিয়া এমনই পবিত্র প্রেমে নিবদ্ধ হইবেন যে, তাঁহার মনে ব্যভিচারের কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না; সেইরূপ সতী নারী যিনি, তিনিও সৎপতি বিনা মনেও অপর কাহারও প্রতি আসক্তি অনুভব করিতে পারেন না। দুর্নীতি বা ব্যভিচার পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিবার জন্যই এই নরনারীর উদ্বাহ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত।

—•—

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা শাক্ত ধর্ম্মের দু একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিতে পারি না। শাক্ত ধর্ম্ম বঙ্গের বিশেষ ধর্ম্ম। এখনও বঙ্গের উচ্চতর সমাজে শাক্ত ধর্ম্মের বিশেষ আধিপত্য বিদ্যমান আছে। প্রাচীন যুগে আহার পান ও যাগ যজ্ঞের আড়ম্বর লইয়া, শাক্তগণ ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। কালক্রমে বহু বিশিষ্ট সাধক শাক্তদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগের সাধনাও ভক্তিমার্গের সাধনা। শাক্তদিগের দুটি বিশেষ সম্প্রদায় এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল। একটি বামাচারী, অপরটি দক্ষিণাচারী। বামাচারী সম্প্রদায় নানা প্রকার বিলাস বাসনা ও মানব-প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল ভোগ সম্ভোগের ভিতর ধর্ম্মের রসাস্বাদন করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কঠোর বৈরাগ্যের ইহা প্রতিক্রিয়া মাত্র। দক্ষিণাচারী সম্প্রদায় সাত্ত্বিক ভাবের সাধক। তাঁহারা যাগ যজ্ঞের আড়ম্বর ও প্রতিমা-পূজার সাধনার ভিতর ভক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই ভক্তির ভিতর শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলন সংসাধিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ প্রভৃতি বহু শাক্ত সাধক কালীর উপাসনা করিয়া ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত ক্রমে বৈষ্ণব সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, আমরা পরে ইহার উল্লেখ করিব।

বঙ্গের শাক্ত ও বৈষ্ণব ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও, তাঁহারা একই ভাব-রাজ্যের লোক বলিয়া দেশের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। এই শক্তির উপাসনা তান্ত্রিক উপাসনা, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক দিগের দ্বারা এই সাধনা বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীবুদ্ধদেবের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহার অলৌকিক শক্তিগুলিকে রূপ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিরাকারা শক্তিকে বাহ্য রূপের ভিতর ধরিয়া রাখিতে হইলে, রূপের প্রতিমা-গঠন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। "বুদ্ধং জ্ঞানম্ অনন্তং" ইহা বৌদ্ধদিগের মন্ত্র। যিনি অনন্ত জ্ঞানের আধার, তিনি অনন্ত ও আদি শক্তি। তান্ত্রিকগণ বুদ্ধকে উড়াইয়া দিয়া, এই আদি শক্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পৃথিবীর নানা অবস্থা, ঘটনা ও বিপদ সঙ্কটের ভিতর এই আদ্যা-শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইলেন। সেই শক্তি কখন দুর্গতি-নাশিনী হইয়া জীবের দুঃখ দুর্দশা মোচন করিতেছেন, কখন সরস্বতীরূপে জীবকে জ্ঞান দান করিতেছেন, কখন লক্ষ্মীরূপে পৃথিবীতে ধন ধান্য বিতরণ করিতেছেন, কখনও বা ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপাসুর বিনাশ করিতেছেন। এই শক্তি-উপাসনা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী হইয়া বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আদিতে এই উপাসনা বঙ্গে বৌদ্ধ সাধকদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই শক্তিপূজা অস্পৃশ্য জন-সাধারণের ভিতর অনুষ্ঠিত হইত। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণদিগের ভিতর প্রবর্ত্তিত হয়। (Modern Buddhism) বৈদিক যুগের যাগ যজ্ঞের চির অভ্যস্ত প্রবৃত্তি, শাক্তদিগের শক্তি সাধনার উদ্বোধনে, ব্রাহ্মণদিগের হৃদয় মনকে জাগাইয়া তুলিল। তাঁহাদিগের গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, দর্শন-শাস্ত্রের অপরিসীম বিচার ও মীমাংসা তন্ত্রের নূতন শাস্ত্র রচনা করিল। তন্ত্রকে একদিকে যেমন বৈদিক ধর্ম্মের উচ্চতর শাখারূপে জন-সমাজের নিকট প্রচার করা হইল, অন্য দিকে তদ্রূপ বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় মহাশাস্ত্র বলিয়া জন-সাধারণের মনে মুদ্রিত করা হইল। যাহা হউক, এই শক্তি-উপাসনার প্রভাব ও আড়ম্বর বঙ্গের বাহিরে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঙ্গালিগণ কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গের বাহিরে যথায় যথায় গমন করিয়াছেন, তথায় তথায় তাঁহারা বাঙ্গলার দুর্গোৎসবকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আশ্বিনের দুর্গোৎসব বাঙ্গালার নিজস্ব। বাঙ্গালীর কোমল হৃদয় মাতৃপূজার রস আস্বাদন করিয়া এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। এমন ক্ষেত্র বিনা আর কোথায় ভক্তিশতদল পরিস্ফুটিত হইবে? আর কোথায় স্বর্গের পারিজাত সৌরভ বিস্তার করিবে? মাতৃপূজার মহাভাবের স্পর্শে বঙ্গের স্নায়ুমণ্ডল এমন রূপান্তরিত হইয়াছে ও এক এক বিন্দু ভক্তির অমৃত স্পর্শে বাঙ্গালীর দেহ মনে এমন এক দিব্যোন্মাদ প্রকটিত হইয়াছে যে, তাহার তুলনা আর অন্যত্র দেখা যায় না। কমলার কোমল কর-স্পর্শে বঙ্গদেশ মাতৃবৎসলা রূপে নবজন্ম ধারণ করিয়াছে।

প্রেম ও ভক্তি বাঙ্গালার পরম সম্পদ্। এই পরম সম্পদ্, বৌদ্ধযুগের কঠোর বৈরাগ্য, সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভাব-সঙ্গীত, বাউলিয়ার দেহতত্ত্ব, শাক্তের শক্তি-পূজার প্রেমোন্মাদের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব মহাধারায় মিলিত হইয়া, শ্রীচৈতন্যযুগের প্রগল্‌ভা ভক্তি সৃষ্টি

করিয়াছে। বাষ্পকণা হইতে যেমন জলবিন্দুর সৃষ্টি হয়, অসংখ্য জলবিন্দু মিলিত হইয়া যেমন একটি ক্ষীণ জলধারায় পরিণত হয়, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-ধারার যোগে যেমন একটি মহাধারা প্রবাহিত হয় এবং এইরূপ সহস্র সহস্র ধারায় একত্র সমাবেশে যেমন একটি জল-প্রপাত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যুগযুগান্তরের অসংখ্য সাধনা, ভাব ও ভক্তির ধারা মিলিত হইয়া, বঙ্গে এই মহাভক্তির মহানদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই ভক্তির ভিতর দিয়াই বঙ্গদেশ গুপ্ত সম্পদের সন্ধান লাভ করিয়াছে। এই ভক্তি-সাধনই বাঙ্গালার বিশিষ্টতা। ভক্তির মধ্য দিয়াই বঙ্গদেশ সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, অলঙ্কার প্রভৃতি উচ্চ জ্ঞানরত্নের অফুরন্ত ভাণ্ডার হস্তগত করিয়াছে।

রামপ্রসাদ সেন শাক্ত ছিলেন, সুন্দর সুন্দর শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। এই শাক্ত সাধক প্রথম বয়সে বৈষ্ণবদিগের অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভক্তির বিরোধী ছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অনেক ভক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া ভক্তি-তত্ত্বের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলন হইয়াছে। দাশরথি রায় প্রভৃতি অনেক শাক্ত কবি, যাঁহারা পূর্ব্বে বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বৃদ্ধ বয়সে ভক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতগুলি আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বৈষ্ণবের ভক্তি শাক্তের ধর্ম্মজীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

রামপ্রসাদ কালী-উপাসনার ভিতর দিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলির ভিতর কয়েকটি এমন সঙ্গীত আছে, যাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, রামপ্রসাদ পৌত্তলিকতার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। যথা:—"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জান না। মাটির মূর্ত্তি গাড়য়ে মন, করতে চাও তাঁর উপাসনা।" এ গান শ্রবণ করিলে কে বলিবে যে, রামপ্রসাদ প্রতিমা-পূজার ভিতর অনন্তের আস্বাদন প্রাপ্ত হন নাই। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া রামপ্রসাদ পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নলিখিত গানটির বিষয় আলোচনা করিলে, তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাধক যে নৈবেদ্যের নানা উপকরণ দিয়া পূজার আয়োজন করিতেন, রামপ্রসাদের মন তাহাতে তৃপ্ত হইত না; তাই তিনি বাহ্য উপকরণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। যথা:—

"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয় আলোচাল আর
বুট-ভিজানা॥"

রামপ্রসাদ যে বৎসর পরলোক গমন করেন, সেই বৎসরের শেষ ভাগে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রাম মোহন রায় বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থ মন্থন করিয়া, যে নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞান দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, রামপ্রসাদ ভাব-সাগর মন্থন করিয়া সেই ব্রহ্ম-রত্ন কুড়াইয়া পাইলেন এবং বঙ্গের দ্বারে দ্বারে ভবিষ্যতের ব্রাহ্মধর্ম্মের আগমনী গান করিয়া বেড়াইলেন। কোন ঘটনা আকস্মিক নহে। একটি ঘটনার সহিত আর একটী ঘটনার যোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকদিগের সঙ্গীত ও সাধনার ভিতর প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, দেশের ভিতর ব্যক্তিগত ভাবে নিরাকার ব্রহ্মানুভূতি ফুটিয়া উঠিতে ছিল। সেই ভাব ক্রমশঃ প্রবল হইয়া রামমোহনের ভিতর প্রবলতর আকার ধারণ করিল। যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে নিরাকার উপাসনার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহারা দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি লাভ করেন নাই। রামমোহন একদিকে যেমন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন, অন্য দিকে বীরের ন্যায় দেশাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার অসাধারণ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ যে বৈষ্ণব গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম। যথা:—

"কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, মিছা তবে হইবে হে বেদ।" একজন সাধু বৈষ্ণবের কণ্ঠ বিনা এ গান উচ্চারিত হইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে নিরাকার উপাসনার ভাব যে দেশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। গাজীপুরে লালা হরবংশ রায় নামক একটি হিন্দুস্থানী বাস করিতেন। তিনি গাজীপুরে একটি নিরাকার উপাসনার স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্থানে আমাদের স্বর্গগত বন্ধু নিত্যগোপাল বাবু উপাসনা করিতে যাইতেন। তাঁদের উপাসনা-পদ্ধতি প্রায় ব্রাহ্ম-সমাজেরই মত। একদা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র যখন গাজীপুরে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন, তখন নিত্যগোপাল বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথা-প্রসঙ্গে নিত্যগোপাল বাবুর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা উত্থাপিত হয়। তিনি বলেন যে, তিনি নিরাকারবাদী। এখানে নিরাকারবাদীদের একটি সভা আছে, তিনি সেই সভায় যাতায়াত করেন এবং তন্মতাবলম্বী সকলে মিলিয়া নাম-গান, পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যখন নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস করেন, তখন একটি ব্রাহ্মসমাজ এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন। নিত্য-গোপাল বাবু আচার্য্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া গাজীপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিহার অঞ্চলে সৎনামী বলিয়া এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাঁহারা কোন মূর্ত্তি বা বিগ্রহের উপাসনা করেন না। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতে, দেশে ব্যক্তিগত-ভাবে এবং কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগত-ভাবে নিরাকার উপাসনার ভাব যে জাগ্রত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগত নিরাকার সাধনা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজে ঘনীভূত আকার গ্রহণ

করিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩য়) তৃতীয় ভিত্তি বিশ্বাস। আধ্যাত্ম জগৎ ও তাহার প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী, ব্রহ্ম-প্রকৃতি ও তাঁহার লীলা একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই অনুভূত হইয়া থাকে। সত্য সত্যই সেন্টপল্ বলিয়া গিয়াছেন যে, বিশ্বাস অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণ এবং আশ্বস্ত বস্তুর সার ভাগ। (Evidence of the things unseen and substance of the things hoped for.) বাহ্য জ্ঞান ও বাহ্য দৃষ্টির সমক্ষে যাহা আবৃত, বিশ্বাস-দৃষ্টিতে তাহা উজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান। মানব-দেহে যেমন নিশ্বাস, ধর্ম্মজীবনেও তেমনি বিশ্বাস। ব্রাহ্মসমাজ এই বিশ্বাসেই জীবিত আছে ও জীবিত থাকিবে। পাখীর ন্যায় মানুষ এই বিশ্বাস দ্বারা ঊর্দ্ধদেশে উড়িতে সমর্থ হইয়া থাকে। বিশ্বাসের শক্তি দেখাইবার জন্যে মহর্ষি ঈশা বলিয়া ছিলেন যে, "যদি তোমাদের মধ্যে সর্ষপকণার ন্যায়ও বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার বলেই তোমরা পর্ব্বত সকলকে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে।"

(৪র্থ) ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ ভিত্তি বিজ্ঞান ও দর্শন। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও দর্শন সমুন্নত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মত, বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপকে পরিপুষ্ট করিতেছে। ইহার ভিতরে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ও দর্শন-বিরুদ্ধ কোন কিছুর স্থান নাই। উনবিংশ শতাব্দী বৈজ্ঞানিক যুগ, উদারতার যুগ, বিশ্বজনীন ভাবের যুগ, সামঞ্জস্যের যুগ, সমন্বয়ের যুগ, একত্ব সাধনের যুগ ও Age of toleration। ব্রাহ্মসমাজে এই সমস্ত ভাবই স্থান লাভ করিয়া ইহাকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে।

(৫ম) হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান নির্ব্বিশেষে যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগের আদরের ও সম্মানের বস্তু। যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহার ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তত্তাবৎ স্তরে স্তরে ইহার ভিতরে সজ্জিত রহিয়াছে।

(৬ষ্ঠ) জনসাধারণের সেবা। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য-সাধন তাঁহার উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ বলিয়াই, ইহা সাধনে প্রথম হইতেই নিযুক্ত রহিয়াছে। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ইহাই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান কথা। জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজ যত্নপর রহিয়াছেন। কর্ম্মশীলতার অভাব, নিরুদ্যম এবং অলসতা দোষের আকর বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া আসিতেছেন। "ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ, প্রাণপণে করে কর্ত্তব্য পালন," "নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয়দমন, পর-উপকার, বৈরাগ্য-সাধন" ইহাই প্রতিদিনের সাধনের বিষয়। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন যে, "যিনি ৬ঘণ্টা কর্ম্ম না করিয়া অন্ন গ্রহণ করেন, তিনি ধর্ম্মের ঘরে চুরি করেন।" জন-সেবা ও সৎকার্য্যই ব্রাহ্মসমাজের গৌরব-মুকুট, এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই ইহার বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কার্য্যাবলীও নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পর-সেবা দ্বারাই জন-সাধারণের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, পর-সেবা দ্বারাই মানব-সমাজ দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরূঢ় হইয়া থাকে। নর-নারী-নির্ব্বিশেষে শিক্ষার ব্যবস্থা, অন্ধ আতুরদিগের সেবা, অনাথাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, মূক বধির বিদ্যালয় সংস্থাপন, অন্ধদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জল-প্লাবন এবং প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ক্লিষ্ট জন-সাধারণের সেবা, উপেক্ষিত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত ও অস্পৃশ্য নরনারীদিগের উন্নতি-সাধন, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমে জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা প্রভৃতি নানা ভাবের কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ তাহার কর্ম্মশীলতা ও কর্ম্মপটুতা দেখাইয়া আসিতেছে। অতীত যুগের সম্রাট্ অশোকের মহৎ কার্য্যাবলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব পর-সেবা ব্রাহ্মসমাজকে নিয়ত অনুপ্রাণিত করিতেছে। যে ছুৎমার্গ পরিহারের মহাবাণী আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে নিনাদিত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে পথপ্রদর্শকরূপে প্রতিষ্ঠিত।

(৭ম) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মসমাজের প্রধানতম ভিত্তি। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ভিতরে সম্মিলন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত, ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলসত্যগুলি পাঠ, চিন্তা, আলোচনা দ্বারা জীবনে সাধন, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন, ঈশ্বরের পিতৃত্বে বিশ্বাস করতঃ সকলের সহিত ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনে যত্নশীল। সকলকে প্রেমের ভিত্তিতে সংস্থাপিত রাখিয়া মানব-সমাজে শান্তি-সংস্থাপন করিবার প্রচেষ্টা ব্রাহ্মসমাজের প্রধানতম সাধন।

(৮ম) জগতের সমস্ত ধর্ম্মই আমাদিগের ধর্ম্মমতকে দৃঢ় করিতেছে। সমস্ত সাধু ভক্ত ও ধর্ম্মার্থে জীবনদাতৃগণ আমাদিগের দৃষ্টান্ত হইয়া আছেন। আমাদের যাবতীয় পরীক্ষায়, নির্য্যাতনে ও দুর্ব্বলতায় তাঁহারাই উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা প্রচার করিতেছি। ঋষিগণের দিব্যদৃষ্টি, সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান, মুষার বিবেকনীতি, শাক্যের বিশ্বপ্রীতি, মহম্মদের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, চৈতন্যদেবের প্রেম ও ভক্তি, জনকের অনাসক্তি, লুথারের মানবাত্মার স্বাধীনতা, পার্কারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এ সকল আয়ত্ত করতঃ রক্তমাংসে পরিণত করিবার সাধনা ইহার অন্যতম ভিত্তি।

(৯ম) স্বাধীন চিন্তা ব্রাহ্মসমাজের এক সুদৃঢ় স্তম্ভ। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথও বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রও সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাধনায় স্বাধীনতাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

(১০ম) মাতৃ-ভাষায় ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজ প্রচলন করিয়া এদেশে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশেষ কথা, ব্রাহ্মসমাজ এ যুগে জগতে বিধাতার এক নূতন বিধান। ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, "The religion of the Brahmo Samaj is called the New Dispensation." বিধাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এক অভিনব উদ্দেশ্য সাধন করিবেন, দিন দিনই ঐ অভিপ্রায় মানব-জাতির সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে। জগতে ক্ষুদ্র হইতেই বৃহৎ উৎপন্ন হয়। বীজের ভিতরেই পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষটি potentially লুক্কায়িত থাকে। ব্রাহ্মসমাজের গর্ভেও এক মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। যদি ইহাকে এ যুগে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া স্বীকার করি, তবে ইহাও সত্য যে, যতদিন ঈশ্বর আছেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজও থাকিবে। যদি এই সকল ব্রহ্মমন্দির মৃত্তিকাসাৎ হইয়া পড়ে, যদিইবা ব্রহ্মমন্দিরের ইষ্টক খণ্ড চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলায় পরিণত হয়, যদিইবা ব্রাহ্মসমাজ ঐ সেই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত Albigenees সম্প্রদায়ের ন্যায় এক বারেই মুছিয়া যায়, যদিইবা ব্রাহ্মবংশ শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তথাপি ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিবে। কেন না, ইহার প্রাণ বিধাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহার উপাদান জড়ীয় নহে। ইহাতে আজ পর্য্যন্ত যে বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্য নব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা কখনও ধ্বংস হইবার নহে। ইহার জন্য লোকের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই ঘোষিত হইবে, আশীর্ব্বাদ সর্ব্বত্র বর্ষিত হইবে, এবং এক সময়ে জাতীয় ধর্ম্মরূপে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যতই মানব ঈশ্বরের পিতৃত্বে ও মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ততই তাহার প্রাণে ব্রাহ্মসমাজের নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে। এক নামে না হয় অন্য নামে, এক ভাবে না হয় অন্য ভাবে, এই ব্রহ্মসমাজের মত, ভাব, বিশ্বাস, আদর্শ ও সাধনা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেই হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কতদূর গুরু স্বীকার করা যায়?

"নববিধানের গুরু" বিষয়ে ধর্ম্মতত্ত্বে ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের সমালোচনাও বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্মতত্ত্বের দুইজন সম্পাদক। ঐ প্রবন্ধের লেখক ধর্ম্মতত্ত্বের অন্যতর সম্পাদক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক। বিষয়টী গুরুতর। এ বিষয়ে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বোধে, সম্পাদকীয় ভাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধ আমাকে লিখিতে হইতেছে। এ প্রবন্ধ পূর্ব্ব কোন পক্ষের লেখার সমর্থন বা প্রতিবাদ নহে, ইহা একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে কতদূর মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায়, এ প্রশ্নে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কি উত্তর দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। ("সঙ্গত" ৪৯—৫১ পৃষ্ঠা)।

প্রশ্ন। গুরু স্বীকার কতদূর কর্ত্তব্য?

উত্তর। "গুরু স্বীকার দুই প্রকার:—প্রথম, মৃত মহাত্মাদিগকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা; দ্বিতীয়, জীবিত উপদেষ্টা প্রভৃতিকে গুরু বলিয়া সেবা করা। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যদি কোন মানুষকে গুরু বলা যায়, তাহা সহায় বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া নহে। লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর। ব্যক্তি বিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারে না। তাঁহার উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে পরিমাণে ধর্ম্মপথে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে গুরু বলা যায়। একটী পুস্তককে যদি সম্পূর্ণ শাস্ত্র বলি, তাহার কোন অর্থ হয় না। তাহার যে অংশ হইতে জ্ঞান পাই, সেই অংশটুকু মাত্র শাস্ত্র বলিতে পারি। সেইরূপ ব্যক্তি বিশেষের আদর্শ হইতে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উপকার পান, তিনি তাঁহাকে তাহার অধিক গুরু বলিতে পারেন না।

"দ্বিতীয়, জীবিত গুরু। এ কথা বলিলে আমার নিজের বিষয় আসিয়া পড়ে। আমার নিকট হইতে যাঁহারা অনেক দিন হইতে উপদেশ লইয়া উপকার পাইয়াছেন বোধ করেন, তাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করিবেন; অন্যান্য প্রচারকের নিকট হইতে যাঁহারা সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকেও শ্রদ্ধা করিবেন। আমাদের মধ্যে গুরু শব্দ আচার্য্য, উপদেষ্টা, প্রচারক নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি কিম্বা দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি না। এটী আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া চিঠি পত্র লিখেন, কিন্তু আমি যে কাহাকে একবারও শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, এরূপ স্মরণ হয় না। আমাদের মধ্যে ঠিক গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি এরূপ বিশ্বাস না করি, আমার সম্বন্ধে অন্যে যে সে বিশ্বাস করিবে, ইহা সম্ভব নহে। আমাকে কেহ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাঁহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই আমার শিষ্য হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি তাঁহার গুরু নহি, ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র গুরু। গুরু শব্দ হইতে কেবল জগতের অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছে এরূপ নহে, আমাদের

নিজেরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। আমার দুই পাঁচ কথা দেখিয়া শুনিয়া কেহ আমাকে গুরু বলিলে অসত্য হয়। কেননা আমার সম্পূর্ণ জীবন ত সেরূপ নয়।" (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ইহা সে সময়কার উক্তি)।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, ২২শে আগষ্ট, "জগজ্জননী এবং তাঁহার সাধু সন্তানগণ" শীর্ষক সেবকের নিবেদনে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র আপনার জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা ব্রাহ্ম হইয়া কদাচ সাধুদিগকে ঈশ্বর অপেক্ষা বড় অথবা ঈশ্বর তুল্য মনে করিতে পার না। তোমরা মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছ, কোন পুত্রের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখ নাই। পুত্রের পূজা করিয়া জননীর নিকটে তোমাদের আসিতে হয় নাই। কোন অবতার তোমাদের হাত ধরিয়া ব্রহ্মের নিকটে আনেন নাই। তোমাদের সঙ্গে মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমরা আগে মাকে পূজা করিয়াছি। তাঁহার কোন সন্তানকে পূর্ব্বে বিশেষ রূপে চিনিতাম না। মাকে বলিতাম, তুমি যাহা করাইবে তাহাই করিব, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেখানেই যাইব, তুমি যাঁহাদিগকে দেখাইবে তাঁহাদিগকে দেখিব, যাঁহাদিগকে সমাদর ও প্রীতি করিতে বলিবে তাঁহাদিগকে আদর ও প্রীতি করিব। পরে মা যখন তাঁহার এক একটি সাধু পুত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগকে চিনিতে লাগিলাম। * * * চৈতন্য-মাতা জগজ্জননীকে লইয়া যদি চৈতন্যকে দেখিতে যাও, তাহা হইলে যথার্থ শ্রীচৈতন্য দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। আর যদি পৃথিবীর চৈতন্যকে লইয়া মার কাছে যাও, তাহা হইলে দুয়ের কাহাকেও বুঝিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে।" ব্রহ্মানন্দ অন্যত্র বলিয়াছেন, "Our God is a Jealous God." আমাদের ঈশ্বর একটু অমান্য অবিশ্বাস সইতে পারেন না।

মানুষগুরু কতদূর স্বীকার করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "ব্যক্তি বিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারেন না। তাঁহার উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে পরিমাণে ধর্ম্মপথে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে গুরু বলা যায়।" যাঁহার নিকট যতটুকু শিক্ষা করা যায়, তিনি ততদূর গুরু, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? বাল্য জীবনে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে গেলে, পাঠশালার শিক্ষককে গুরু মহাশয় বলিতে হয়, এ সম্বোধনের ভিতরে মৌলিক গভীর অর্থ রহিয়াছে। ব্রহ্মানন্দও বলিলেন, একজনের উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে পরিমাণে ধর্ম্ম-পথের সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে গুরু বলা যায়। এ যুগে ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ও ধর্ম্ম-জীবন আমাদের ধর্ম্ম-পথের কত সহায়তা করিতেছে, এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার কি পরিমাণ করিতে পারিয়াছি? যদি উপদেষ্টা হইতে উপদেশ-লাভের কোন উপযোগিতা থাকে, তবে সেই উপযোগিতার পরিমাণ করিতে গেলে উপদেষ্টার হিসাবে এ যুগে কেশবচন্দ্রের মত এমন উপদেষ্টা তো আর দেখা যায় না। প্রত্যেকের জীবনের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন-সম্পর্কে, কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া, পবিত্রাত্মার যোগে যেরূপ বিচিত্র ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এমন আর তো কাহাকেও দেখা যায় না। আমরা তাঁহার উপদেশ ও প্রার্থনা, জীবনের দৃষ্টান্ত ও আচরণের ভিতর দিয়া, আমাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় যেরূপ সহায়তা পাইতেছি, সেরূপ আর কোথায় পাইব? এরূপ বিস্তৃত ভাবে, বিশদরূপে জগতে কোন্ মহাজনই বা ধর্ম্মের ক্ষুদ্র, বৃহৎ গূঢ়তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিয়া সকলের সহায়তার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন? তবে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রকে আমরা কি কোন অর্থে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে পারি না? ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র "অসাধারণত্ব" বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়া বলিলেন, "আমাদের সমাজ অসাধারণ সমাজ। আমরা অসাধারণ ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমরা অসাধারণ জীবন পাইতে ইচ্ছা করি। আমাদের লক্ষ্য অসাধারণ। আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ নূতন এবং অসাধারণ। যিনি আমাদের অগ্রজ ছিলেন, তিনি আপনাকে মহাত্মা বলুন আর না বলুন, আপনাকে অসাধারণ লোক বলিয়া জানিতেন।" শিক্ষক, আচার্য্য প্রভৃতিকে যদি গুরু বলিতে হয়, তবে কেশবচন্দ্র এ যুগে একজন অসাধারণ গুরু, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই নবযুগের নবধর্ম্ম নববিধান-সাধনার স্বরূপ-লক্ষণকে দ্বিধা-শূন্য, নিঃসংশয়রূপে প্রদর্শন জন্য, তিনি অসাধারণ শিক্ষক, অসাধারণ আচার্য্যগুরু হইয়াও, আচারে, আচরণে, বাক্যে, কার্য্যে, উপদেশে আপনাকে বিশেষ আবরণে আবৃত করিয়া রাখিলেন। সে স্বরূপ-লক্ষণ কি? সে স্বরূপ-লক্ষণ পবিত্রাত্মার একমাত্র পরিচালনে পরিচালিত হওয়া, অন্তরের পরম গুরুকে সকল শিক্ষার মূলে গ্রহণ করা। নববিধান-ক্ষেত্রে ছোট বড় সকলের পক্ষে ইহাই একমাত্র মৌলিক পথ। তিনি উপদেশ ও প্রার্থনায় ইহা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিলেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ জীবনের আচরণে ও অনুষ্ঠানে তাহা দেখাইয়া গেলেন। তাই তাঁহার প্রিয় সহকর্মী প্রচারক প্রসন্ন কুমার সেন যখন তাঁহাকে বলিলেন, "আমি একমাত্র তোমার কথা শুনিয়া চলিব," তখন কেশবচন্দ্র বলিলেন, "যদি আমার কথা শুনিয়া চলিবে, তবে আমি বলিতেছি, তুমি আমার কথা শুনিয়া চলিও না, একমাত্র পবিত্রাত্মার কথা শুনিয়া চল।" তাঁহার অন্য একটী প্রিয় অনুচর, সহচর ব্যক্তি প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আশা পোষণ করিতে লাগিলেন; কেশবচন্দ্র অনুমোদন করিলেই, তিনি প্রচার-ব্রত-সম্পর্কে

আপনাকে নিঃসংশয় অধিকারী মনে করিয়া, প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিবেন। কেশবচন্দ্র যখন প্রচার-ব্রত-গ্রহণেচ্ছুর মনোভাব জানিতে পারিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আপনার অন্তরের গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার উপদেশ ও অনুমোদন লইয়া কার্য্য কর। কোন এক ব্যক্তি কোন বিষয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিলে, সেই একটি লোকের নিকট তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হইতেন না, পাছে গুরু-শিষ্য-সম্পর্কের ভাব উপস্থিত হয়; প্রয়োজন হইলে সম্মিলিত দলের নিকটে সে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এ সব কেন তিনি করিতেন? পবিত্রাত্মার পথে তিনি কণ্টক না হন এই জন্য। মহাজনগণ পবিত্রাত্মার পথে কণ্টক হন, ইহা কি তিনি জানিতেন না? শ্রীঈশা চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিলেন, "It is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter will not come unto you." "তোমাদের নিকট হইতে আমি চলিয়া যাই, ইহা তোমাদের পক্ষে ভাল; কেন না, যদি আমি চলিয়া না যাই, পবিত্রাত্মা তোমাদের জীবনে আপনার অধিকার বিস্তারের সুযোগ পাইবেন না।" কেশবচন্দ্র জানিতেন, যুগে যুগেই মহাজনগণ পবিত্রাত্মার পথে কণ্টক হইয়া পড়েন। তাঁহাদের অনুগত শিষ্যগণ তাঁহাদের জীবন-প্রভাবের ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া, তাঁহাদিগকেই জীবনের পূর্ণাদর্শ ও পরম গুরুরূপে গ্রহণ করেন। অন্তরের গুরু পবিত্রাত্মার সহায়তা ভিক্ষা করিবার আর তাঁহাদের অবসর হয় না। কেশবচন্দ্র জানিতেন, এবার পবিত্রাত্মার পালা। সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যেকে আপনার অন্তরের গুরু পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইবে, তাঁহারই সাক্ষাৎ শিক্ষাধীনে সকল শিখিবে, জীবনে, যাঁহাকে যেরূপে গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করিবে, ইহাই স্বর্গের এবার ব্যবস্থা। তাই তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত হইয়াছেন, আপনি শিখাইতে গিয়াও আপনাকে আবরণে আবৃত করিয়াছেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে জন্মদিনের প্রার্থনায়, তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি কথার উল্লেখ আছে। যাঁহারা এই প্রার্থনাটি পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, তখনকার মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা উল্লেখ করিয়া, কেশবচন্দ্রের প্রাণের আক্ষেপময় উক্তিতে প্রার্থনাটি পূর্ণ। প্রার্থনার বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "আমি বুঝ্‌চি, একটা মাঝে খুঁটি চাই। কোথা থেকে আসবে আদেশ, মা? একটা গোড়া না হলে চলে না যে। * * ছেড়ে তো দিলাম, রাগ করে বল্লাম, এরা প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার কাছে যাক্। নানা মত হলো, একটা লোক চাই যে, শেষ কথা সকলকে মীমাংসা করিয়া দেবে। * * আমার এত দিনের কৌশল মিথ্যা হয়ে গেল, আমি এত দিনে এই ঘরের দুটো লোককেও এক করিতে পারিলাম না। ভগবতি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরা যদি তোমায় ডেকে ভাল হতো, পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো, আর গুরুর দরকার নাই। শ্রীহরি, ইঁহারা কেন ভাল হলেন না? তা হলে যে দুই দিক বজায় থাকতো। লোক-গুলো আবার গুরু গুরু বলে টানাটানি করিলে, পৃথিবীতে আবার কুসংস্কার আসিবে। হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কৃপা করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ কর। আমি যে লইব না, লইলাম না, তা তুমি দেখ্‌চ। গুরুকে গুরু বলা দূরে থাকুক, এঁরা যে ক্রমে আমাকে পায়ের নীচে ফেলিতেছেন। * * যাঁর যা খুসি কচ্ছেন্, আরও যদি কিছু দিন থাকি, কত স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে। প্রেমময়; এসব দেখে মনে হয়, গুরু হওয়া বুঝি ছিল ভাল। * * আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছে নিচ্ছেন, যেটা ইচ্ছে ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গরিব, বানের জলে ভেসে এয়েছি। কেবল যেন দুট কথা এঁদের শেখাতে এয়েছি। তা করিলে তো হবেনা। যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হবে। তা এক্তে একজন থাকুন্, দেড় জন থাকুন্। * * জগদীশ! এই কটি লোককে স্বেচ্ছাচার থেকে বাঁচাও, এখন এই আমার বিশেষ প্রার্থনা আর ব্যাকুলতার কথা হয়েছে। মা আজ তো জন্মদিন। ৪৪বৎসর পূর্ণ হয়ে ৪৫বৎসর আরম্ভ হলো। আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নব বিধানের ধর্ম্ম। অদ্য গুরু-লাভ। অন্যধর্ম্মের গুরুর মত নহে। নববিধানের গুরু। এক শরীরের সকলে অঙ্গ, এই বিশ্বাস। * * আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম সস্তা কর্ত্তে গিয়া-ছিলাম, আজ ৪৪ বৎসর পরে হিসাব মিলাতে পাল্লাম না। মা আমায় ধমক দিলেন। 'বল্লেন, তুই দেড় আনা, এক আনা, তিন আনা, যে যা দিয়াছে সকলকে এর ভিতর আন্‌লি; আমি বল্‌ছি, ষোল আনা যে দেবে, সে আসবে।' মা আজ বল্‌চেন, জন্মদিনে 'যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে, সেই আসুক, আর কেহ নয়।' এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।" এখন এই প্রার্থনার বিশেষ বিশেষ স্থান বিষয়ে আলোচনা করি-তেছি। প্রথম বল্লেন, "আমি বুঝ্‌চি, একটা মাঝে খুঁটি চাই," তার পরেই বল্লেন, "নানামত হ'লো, একটা লোক চাই যে, শেষ কথা সকলকে মীমাংসা করিয়া দেবে।" তিনি মণ্ডলীতে যে বিচ্ছিন্ন অবস্থা দেখিয়া, বিভিন্ন মতের প্রাবল্য দেখিয়া একথা বলিলেন, এখন কি সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন মতের প্রাবল্য নাই? অন্যান্য ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে কি বিচ্ছিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন মতের প্রাবল্য

উপস্থিত হয় না? এরূপ অবস্থায় কোন তর্কিত বিষয়ে একজনের কথা, কি এক জনের জীবনের পবিত্রাত্মার বিশেষ নিদেশ, বিশেষ আলোক অন্য ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত হয় না? তাই এরূপ গোলমালের অবস্থায় এরূপ একজনের মধ্যস্থ হওয়া প্রয়োজন হয়, যাঁহার জীবনে বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র মতের উচ্চ মীমাংসা, উচ্চ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, এবং যাঁহার জীবন মীমাংসা-শাস্ত্র হইয়া সকল গোলযোগের উচ্চ মীমাংসা করিয়া দিতে পারে। এখানে গুরু শিষ্যের কথা আসিল না, এখানে পবিত্রাত্মাকে খাট করা হইল না। যাঁহারা মহাজন বিশেষের জীবনের দৃষ্টান্তে, কোন বিশেষ খুঁটি ধরিয়া, কোন সত্য-মীমাংসায় উপস্থিত হইতে আসিবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে অন্তরে পবিত্রাত্মার সহায়তা লইয়াই আসিতে হইবে; নচেৎ বাহিরে সত্য ব্যাখ্যা থাকিলেও, অন্তরে সত্যের স্ফুরণ, তত্ত্বের বিকাশ পবিত্রাত্মার সহায়তা ভিন্ন কি সম্ভবে? তাই শ্রীঈশার জীবন সত্ত্বেও খৃষ্টীয় মণ্ডলীতে এত সম্প্রদায়, তাই শ্রীমহম্মদের জীবন সত্ত্বেও মুসলমান মণ্ডলীতে এত দলাদলী!

অন্য স্থানে বলিতেছেন—"আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার যা খুসি, যেটা ইচ্ছে নিচ্ছেন, যেটা ইচ্ছে ফেলে দিচ্ছেন। * * যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হবে। তা এতে এক জন থাকুন, দেড় জন থাকুন।" "প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সত্যং"। সাধু মহাজনগণের নিকট সত্য প্রাণ হইতেও প্রিয়। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র পবিত্রাত্মার যোগে নববিধানের যে সকল সত্য জীবনে লাভ করিলেন, তাহা কি তাঁহার নিকট অতি মূল্যবান, অতি আদরের সামগ্রী নহে? যদি কেহ আপনার মানবীয় রুচি বুদ্ধির প্ররোচনায় সেই সত্যের খানিকটা গ্রহণ করে, খানিকটা উড়াইয়া দেয়, অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে, তখন কেশবচন্দ্র ঈশ্বর-প্রদত্ত সত্য, জগতের প্রত্যেকের গ্রহণীয় সত্যকে সমর্থন করিতে যাইয়া যদি বলেন, "যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হবে, নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হবে", তবে তিনি অতিরিক্তটো কিছুই বলিলেন না, সত্যকেই ঘোষণা করিলেন, প্রচার করিলেন। সত্য-প্রচার করা যাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত, তিনি সত্য প্রচার করিতে কেনই বা ভীত বা পরাঙ্মুখ হইবেন? তিনি বলিলেন, "তা এতে একজন থাকুন, আর দেড়জন থাকুন।" এ সব কথার ভাবই গ্রহণ করিতে হবে, অক্ষর নহে। এ বাক্য দ্বারা কাহাকেও পরিত্যাগ করা বা কাহাকেও দল হইতে বিতাড়িত করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। যিনি পৃথিবীর সকলের সঙ্গে অখণ্ড পরিবার সাধন করিতে সমাগত এবং সেই সাধনে সিদ্ধির পথে যিনি বলিলেন, "'একমেবাদ্বীতিয়ম্' ব্রাহ্মসমাজ বলিলেন উপরে, 'একমেবাদ্বীতিয়ম্' নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে," তিনি কি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন? তবে তিনি সকলের গ্রহণীয় সত্য সকলকে অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহার ফলে যদি কেহ তাঁহাকে আপনার মানবীয় বুদ্ধি রুচি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাময়িক ভাবে পরিত্যাগ করে, তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। ঈশ্বর তো কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না; তবে আমার মত, আমাদের মত কত লোক আত্মভ্রান্তি বশতঃ কত বার তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কি আসে যায়? উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ সত্যই বলিলেন, "কেশব চন্দ্র কেবল একখানি না ছাড়িবার প্রবৃত্তি।" "তা এতে একজন থাকুন, দেড়জন থাকুন", এ বাক্যে তিনি লোক-সংখ্যা অপেক্ষা সত্যের সমাদর ও গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। প্রার্থনার শেষ বিশেষ কথা, "অন্য গুরু-লাভ, অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু।" এ গুরুর ব্যাখ্যা তিনি আপনি বিশদ ভাষায় করিয়া গেলেন, "এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। তাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।" বিশেষ অবস্থায় ষোল আনা বিশ্বাস তিনি দাবি করিয়াছেন, কোন মহাজন সে দাবী করেন নাই? শ্রীঈশা কি বলেন নাই, "Ye believe in God, believe also in me." "তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর, আমাকেও বিশ্বাস কর।" কেশবচন্দ্র ষোল আনা বিশ্বাস চাহিলেন, কিন্তু পবিত্রাত্মার কৃপা এবং সহায়তা ভিন্ন, পবিত্রাত্মার শিক্ষা ও আলোক ভিন্ন, আমরা কি কেশব চন্দ্রকে ষোল আনা বিশ্বাস করিতে পারি, না, প্রকৃত বিশ্বাস রক্ষণ করিতে পারি? যেমন অন্যান্য মহাজনদিগের সম্বন্ধে, তেমনই কেশবের সম্বন্ধে, সপক্ষে, বিপক্ষে কত কথাই উঠে এবং উঠিতে পারে। সঙ্কটের অবস্থায় পবিত্রাত্মা আমাদের অন্তরকে আলোকিত করিয়া, তাঁহার চিহ্নিত মনোনীত পুত্রকে সমর্থন করেন, পুত্রের জীবনের সকল আবরণ মুক্ত করিয়া, তাঁহারই দিব্যালোকে সে জীবনকে আমাদের অন্তশ্চক্ষুর গোচর করেন; তাই আমরা সে জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সে জীবনকে গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। তাই জন্মদিনের পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর প্রার্থনা হলো—"পবিত্রাত্মার বিধান।" কেশব প্রার্থনা করিলেন, "হে পরিত্রাণের মূল, ত্বরায় পবিত্রাত্মা প্রেরণ কর। আমরা যে শুনিলাম, মানিলাম, তৃতীয় বিধান নববিধান, পবিত্রাত্মার বিধান। এতে, ভগবন্, তুমি তো বড় হবে না, তোমার সাধক তো বড় হবে না, সে সমুদায় পুরাতন বিধান। গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে। * * * এবারকার গুরু সে, যে বলে, আমার কথা শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।" পবিত্রাত্মার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই কেশব-জীবনের বিশেষ কাজ। তবে সেই পবিত্রাত্মা কেশবের জীবনকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সর্ব্বসমক্ষে যে ভাবে পরিচিত করিতে চান, কেশব সে কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হইবেন কেন?

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

নূতন সঙ্গীত।

(১)

ললিত—ঝাঁপতাল।

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য দেব-নন্দন। (মেরী-নন্দন)

ধন্য হলে, ধরাতলে, করি আত্মসমর্পণ। (ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলে)

স্বর্গরাজ্য গুপ্তরতন, আছে যথা, দেখলে যখন, চুপে গিয়ে কিনলে তুমি, বেচিয়ে সর্ব্বস্বধন।

জীবের সর্ব্বস্ব প্রাণ, অবিকারে করিলে দান; (তুমি) পিতার পদে পড়ে, শত্রুর তরে, করিলে কত রোদন। (ক্ষম বলে)

একধন যা প্রয়োজন, যাহে অনন্ত জীবন; সে নহে অপর ধন, শুধু বিশ্বাস রতন।

অনন্ত জীবন, নহে পান ভোজন; পিতাতে নিয়ত স্থিতি, তাঁর সন্তোষ-সাধন।

গোধূম বীজ নষ্ট হলে, প্রচুর ফসল ফলে; আপনি দৃষ্টান্ত হলে, ক্রুশে ত্যজিয়ে পরাণ।

প্রাণের ঈশা থাক প্রাণে, এক হয়ে তোমার সনে, পিতার ইচ্ছা সম্পাদনে, করি আত্ম-বিসর্জ্জন।

---

(২)

ললিত—যৎ।

জাগ জাগ জাগ দেবন-ন্দন।

নূতন বিধানে দেখ শুভ উষার আগমন।

(স্বর্গের দ্বার খুলে গিয়ে)

তুমি পবিত্রাত্মা-জাত, সত্য, জ্যোতি, অমৃত; (তুমি) তবে কেন মৃতের মত, হয়ে আত্ম-বিস্মরণ।

যে পিতার আদেশ শুনে, পালন করে জীবনে; যতেক অমরগণে, দেন প্রেম-আলিঙ্গন। (ধন্য ভাই ধন্য বলে) (তারে)

শোন সে অভয়বাণী, চিদাকাশে হচ্ছে ধ্বনি; "তোমাতে সন্তুষ্ট আমি, পুত্র মনের মতন।" (তুমি)

কত মিষ্ট সম্বোধনে, বিস্নুদাস বিস্নু সনে; একসুরে একতানে, করিছেন আবাহন। (তোমায়)

আর কত কাল ভবে, মোহে ঘুমাইয়ে রবে; জয় ব্রহ্ম বলি এবে, কাট মায়ার বন্ধন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৪ই জুলাই, হাওড়ায়, শ্রীমান্ বিভূতি ভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহাদের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর জন্মদিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১লা আগষ্ট, কলুটোলার গৃহে, শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেনের জন্মদিন উপলক্ষে ও ৪ঠা আগষ্ট, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

পোষ্যপুত্র-গ্রহণ—গত ১২ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৬ সাল ও ইংরাজী ২৮শে জুলাই, ১৯২৯, ২৮ নং যুগীপাড়া লেনে, আমাদিগের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মিত্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শৈলবালা মিত্র একটী পোষ্যপুত্র-গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্রটী স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ প্রেরিতবর ভাই অমৃত লালের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পরলোকগত পঞ্চানন ও রাধারাণী দেবীর অনাথ শিশু। এই উপলক্ষে উক্ত শিশু-সন্তানের জ্যেষ্ঠতাত ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র নবসংহিতানুযায়ী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন ও শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র উপাসনা করিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে এবং তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—বারিপদা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, গত ২৪শে জুলাই হইতে ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস বারিপদায় গিয়াছিলেন। বেশ জমাট উৎসব হইয়াছে। উৎসবের বিবরণ হস্তগত হইলে, পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সেবা—শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা বসু বালেশ্বরে থাকা কালীন, বিগত ৭ই জুন বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় উপাসক-মণ্ডলীর বিশেষ আগ্রহে একদিন ব্রহ্মমন্দিরে উৎকলবাসী ও বাঙ্গালী মহিলাগণের সহিত বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমতী প্রীতিকণা রায় কয়েকটী মহিলার সহিত মিলিত হইয়া হারমোনিয়ম সহ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া উপাসনার সহায়তা করেন ও সকলকে তৃপ্তি দান করেন। সেখানকার উৎকলবাসী মহিলাগণের উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক ও নববিধানের জুবিলী উৎসবের প্রস্তাবসূচক, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, গত ২১শে জুলাই হইতে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময়, Forum Meeting হইতেছে, এবং উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। ২১শে জুলাই Dr. W. S. Urquhart "Broad Mindedness and Deep Mindedness in Religion"—ধর্ম্মের উদারতা ও গভীরতা বিষয়ে, ২৮শে জুলাই ডাঃ কালিদাস নাগ "The International Significance of Indian Culture" বিষয়ে, ৪ঠা আগষ্ট শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনা" বিষয়ে, ১১ই আগষ্ট ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ "Religious Consciousness" বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন।

বক্তৃতার পূর্ব্বে সঙ্গীত, পাঠ ও প্রার্থনাদি হয়। বক্তৃতান্তে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে বক্তা যথাসম্ভব উত্তর দান করেন। এই কয় রবিবার বক্তৃতাদি বেশ সুন্দর হইয়াছে। এরূপ সভার উপকারিতা সকলে অনুভব করিতেছেন।

রোগশয্যা—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক কিছুদিন হইল, প্লুরেসি ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হন, এবং এখনও চিকিৎসাধীনে আশ্রমে আবদ্ধ আছেন। তিনি সকলের প্রার্থনা ভিক্ষা করিতেছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৫শে জুলাই, ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠা কন্যা ত্রিনীতির স্বর্গারোহণ দিন ছিল। ৪১ দিন অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া, হঠাৎ মা মা বলিতে বলিতে স্বর্গারোহণ করে। এই দিন স্মরণে, যোগে যোগ ও মার মুখদর্শনে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে জয় করিয়া কেমনে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিতে হয়, ইহাই যে ত্রিনীতি-জীবনের শিক্ষা, উপাসনায় তাহা উপলব্ধ হয়।

গত ২৯শে জুলাই, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে, স্বর্গগত দেওয়ান টাহিলরাম লীলারামের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিনে, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হাসমতরায় টাহিলরাম শিবদাসানির আহ্বানে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২রা আগষ্ট, কলুটোলার সেন-পরিবারে, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বনাম-ধন্য পিতামহ ও বর্ত্তমান বংশধরগণের কাহারও প্রপিতামহ, কাহারও বৃদ্ধপ্রপিতামহ স্বর্গগত রামকমল সেনের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

বিগত ২০শে মে, ভাগলপুর লীলালয়ে, স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ বসুর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী বসু উপাসনা করেন, কন্যা কুমারী সুধাকণা বসু লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। কয়েকটি মহিলা উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব।

আহ্বান।

"হেন শুভ দিনে কে কোথা আছ ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।"

উৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১৫ই আগষ্ট, ১৯২৯, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৬, বৃহস্পতিবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গাদি।

১৬ই „ ৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার—যুবক-সঙ্ঘ।

১৭ই „ ১লা ভাদ্র, শনিবার—স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গাদি।

১৮ই „ ২রা ভাদ্র, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

১৯শে আগষ্ট, ৩রা ভাদ্র, সোমবার—হজরত মহম্মদের জন্মদিন। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গাদি।

২০শে „ ৪ঠা ভাদ্র, মঙ্গলবার—স্বর্গগত জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় মুক্তিফৌজদলের সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি।

২১শে „ ৫ই ভাদ্র, বুধবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ও বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গাদি।

২২শে „ ১৯২৯, ৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৩শে „ ৭ই ভাদ্র, শুক্রবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক—হীরক জুবিলী। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা, অপরাহ্ণ ৪॥০টায় পাঠ আলোচনা প্রভৃতি এবং সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৪শে „ ৮ই ভাদ্র, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্য উপাসনা।

২৫শে „ ৯ই ভাদ্র, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে **সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব**। প্রাতে ৭টায় কীর্ত্তন, ৮টায় উপাসনা। মধ্যাহ্নে ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা, ৬টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৬শে „ ১০ই ভাদ্র, সোমবার—সন্ধ্যা ৭টায়, আলবার্টহলে, আলোক-চিত্রযোগে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা।

২৭শে „ ১১ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক এবং জন্মাষ্টমী। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় কীর্ত্তনাদি।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
১লা আগষ্ট, ১৯২৯।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন
সহকারী সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য :—উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভক্তির অঞ্জলিরূপে যিনি যাহা দিবেন, তাহা ২৮নং নিউ রোড, আলিপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সহকারী সম্পাদকের নামে অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয় কুমার লধের নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

৭ই, ৮ই, ৯ই ও ১১ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগৃহীত হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৩রা ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 17th September, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনশরণ, আনন্দবর্দ্ধন, উৎসবের পরের সময় এই যে সময় বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম, তাহা যদি রাখিতে পারি, তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম, যদি অবহেলাতে হারাই, মহাবিপদ। এই জন্য তব সিংহাসনতলে মিনতি করি, যাহা পাইলাম, যেন অবহেলাতে না পলায়ন করে। এ যাত্রায় উৎসবধনকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে যেন সমর্থ হই। তুমি আর বাহিরের আড়ম্বর হয়ে থেকো না আমাদের কাছে। তুমি রসনায় রস হও, প্রাণের রক্ত হও। তুমি যদি সহায় হও, তবে এ বার জন্মের মত সংসারকে ফাঁকি দিলাম। তুমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভাব স্থাপন কর, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে দেখিবে তোমার ভিতর দিয়া। দুই জনের মধ্যে ব্রহ্ম। এমনি হবে পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগিনীর সম্বন্ধ! চক্ষে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন, তার পরে স্ত্রীদর্শন, পুত্রদর্শন, ভাইভগিনীদর্শন। যাহা দেখিব, হরিভাবে দেখিয়া তবে উপলব্ধি করিব। ব্রহ্মের ভাবে সকলকে দেখিব। তোমার পুণ্যের অঞ্জনে চক্ষুকে রঞ্জিত করিয়া তবে সকলকে দেখিব। এ বার ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়। এই প্রার্থনা করি তোমার কাছে, এবার চক্ষে চক্ষে, কর্ণে কর্ণে, রক্তের ভিতর বসিয়া যাও। এ বার আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হবে। মা জননী, তোমার প্রেম, তোমার ধর্ম্ম আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যাইবে। এ বার ধর্ম্ম সীমার অতীত হবে, হাত বাড়িয়ে ধর্ম্মের সীমা আর পাব না। পরমেশ্বর, একজন মহাজন খুব ধর্ম্মরত্ন সঞ্চয় করিয়া বাড়ীতে রাখিল, সিন্দুকে রাখিল, চাবি হাতে রাখিল, যখন দরকার হইল খুলিয়া খরচ করিল, ক্রমে ক্রমে সব শেষ হইল! আর এক জন সুচতুর সুরসিক মহাজন অনেক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া চাবি সমুদ্রে ফেলিয়া দিল, তার পক্ষে ইচ্ছা হইলেও ধনক্ষয় করা অসম্ভব। হরি, আমরা যদি উৎসবধন সঞ্চয় করিয়া, বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়া, চাবি হরির অতলস্পর্শপ্রেমসমুদ্রে ফেলিয়া দি, তবে ইচ্ছা করিলেও ধনক্ষয় করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব না। তিনি নিরাপদ, যাঁর চাবি নাই হাতে। প্রেমজলে চাবি ফেলে দি আজ। হে হরি, এমনি করে পাপ শেষ করে ফেল, যেন আর আসিতে না পারে। আপনার হাতে ধর্ম্ম যার, তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিন্ধু, মানুষের ধর্ম্মসাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও। ঠাকুর, সঙ্কটের সময় তোমার দাসদের রক্ষা কর। হরির পাদপদ্মে পড়িয়া আছি, আর যেন উঠিতে না পারি। পাপের

বাড়ী যাইতে পারিব না, আর পাপ করিতে পারিব না। ছেলেমানুষদের মত তোমার পদতলে পড়িয়া থাকিব। নরকে যাবার দ্বারটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। হে দয়াময়, এই যে তোমার প্রসাদে এত ধনসঞ্চয় করিলাম, তা যেন আমাদের চিরদিনের সম্পত্তি হয়। আমাদের পক্ষে পতন হওয়া যেন একেবারে অসম্ভব হয়; আর ভয় যেন না থাকে; কেহ যেন মনের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে। এবারকার ধন চাবিবন্ধ ধনের মত হইয়া রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব, মধুর ভাব, পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে, মা মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(কেশবচন্দ্রের দৈনিক প্রার্থনা—৫ম ভাগ)

ব্রহ্মোপাসনাপ্রতিষ্ঠা।

কোন্ অজানিত যুগে, কোন্ অজানিত প্রাণের ধর্ম্ম-ক্ষুধা-পিপাসার তৃপ্তি হেতু প্রথমে ভারতে ব্রহ্ম-পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু প্রাচীন ভারতের আমাদের পূজনীয় ধর্ম্ম-পিতৃপুরুষ ঋষিবংশের প্রাণগত যত্নে এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্ম-কৃপা-গুণে যে ভারতে একদিন পরিত্রাণপ্রদ ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ ঋষিবংশের নিবদ্ধ ও উচ্চারিত অগণ্য, অসংখ্য শ্লোক ও গাঁথা মধ্যে এখানে একটি মাত্র শ্লোকের উল্লেখই যথেষ্ট মনে করি। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" জানিনা, আমরা কোন্ দুরদৃষ্টচক্রে পড়িয়া সেই স্বর্গের অমূল্য ধন ব্রহ্ম-পূজা ও ব্রহ্মচর্য্য-মূলক ব্রত-বিধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। তাহার ফলে বঙ্গে, ভারতে ধীরে ধীরে কত অজ্ঞানতা, মোহ, কুসংস্কার জঞ্জাল আমাদের গৃহে, পরিবারে ও সমাজে প্রবেশ করিয়া, সমগ্র সমাজ-দেহকে বিবর্ণ, বিশীর্ণ ও প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত করিয়াছিল। সুধু বঙ্গে, ভারতে কেন, স্বদেশের, বিদেশের, প্রাচীন বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত উপাসনা-প্রণালী ক্রমে অল্পাধিক প্রাণহীন হইয়া পড়িল। নিম্ন পৃথিবীর অগণ্য অসংখ্য নরনারীর গূঢ় মর্ম্ম-বেদনামাখা ক্রন্দনধ্বনি, স্বর্গে বিশ্বপিতা বিশ্বজননী যিনি, তাঁহার কোমল প্রাণকে স্পর্শ করিল। তিনি জীবের দুঃখ দুর্গতি নিবারণ জন্য, এবং তাহাদের সকল প্রকার কল্যাণ ও উন্নতি বিধান জন্য, নব যুগে নবভাবে আবার সর্ব্ব-শুভ-বিধায়ক ব্রহ্মো-পাসনা তাঁহার প্রেরিত পুত্র রামমোহন রায় যোগে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ভাদ্র বঙ্গে ভারতে প্রতিষ্ঠার সূত্র-পাত করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১১ই মাঘ, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার দিনে, মহাত্মা রামমোহন তৎকৃত ট্রাষ্টডীডে ঐ উপাসনা-প্রণালীর একটা সার্ব্বভৌমিক আকার দান করিলেও, কার্য্যতঃ বহুদিন পর্য্যন্ত সেই উপাসনা হিন্দুশাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই ভাদ্র, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহাসমন্বয়ের সার্ব্বভৌমিক দৃঢ় ভিত্তিতে নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক নব যুগের নববিধানের ব্রহ্মোপাসনা নবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই ভাদ্র, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী মহা উপা-সনা-প্রতিষ্ঠার ৬০ বৎসরে হীরক জুবিলি উৎসব হইয়া গেল। এ সময়ে ব্রহ্মোপাসনার মহিমা গৌরব আমাদের ধ্যান চিন্তনের বিষয়, এ সময় ব্রহ্মোপাসনার মহিমা গৌরব ভাল করিয়া কীর্ত্তন করা আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দের বিষয়।

ব্রহ্মোপাসনার ভিতর দিয়াই জীবেতে ব্রহ্মের অবতরণ, প্রকাশ ও বিকাশ। উপাসনার ভিতর দিয়াই জীব-ব্রহ্মের মিলন। উপসনার ভিতর দিয়াই ব্রহ্মেতে জীবের ক্রমাগত অনন্ত জীবনের ক্রমবিকাশ। উপাসনা-প্রতি-ষ্ঠার সাক্ষাৎ ফল কি? ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত এবং পিপাসু আত্মা ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী হইয়া ঊর্দ্ধদিকে তাঁহার শ্রীমুখের পানে তাকায়; এই উপাসনার ভিতর দিয়া ঈশ্বর সুযোগ বুঝিয়া সেই ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তির অন্তরে আপনাকে প্রকাশ করেন, তাঁহার দেব প্রভাবে, তাঁহার দেবালোকে সে জীবনকে পূর্ণ করেন। তখন সে দেখিতে পায়, তাহার মলিন জীবনেও পূর্ণ ব্রহ্মের অবতরণ সম্ভব হইয়াছে। কোন একটী জিনিষের ভিতরে আগুন লাগিলে যেমন সে জিনিষটী প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা অগ্নিময় হইয়া যায়, অগ্নিই হয় তাহার অস্তিত্ব, অগ্নিই হয় তাহার আকার,

অগ্নিই হয় তাহার বর্ণ, শোভা ও সৌন্দর্য্য; তেমনি জীব-হৃদয়ে শুভ মুহূর্ত্তে যখন জীবন্ত ব্রহ্মের জীবন্ত অবতরণ সম্ভব হয়, তখন তাহার অন্তর ব্রহ্মময় হইয়া যায়, দেব ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, অন্ততঃ ক্ষণ কাল সে স্বর্গীয় জীবন পাইয়া স্বর্গে বাস করে, এবং স্বর্গীয় জীবন কি, স্বর্গ-বাস কি, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই স্বর্গীয় জীবনের গুরুত্ব গৌরব বুঝিবার, ধরণা করিবার তাহার অধিকার হয়। যদি সে অবস্থা বেশী সময় সে ধারণা করিয়া রাখিতে নাও পারে, কিন্তু সেই আস্বাদন পাইয়া স্বর্গীয় জীবন স্থায়ী ভাবে লাভ করিবার জন্য তাহার প্রয়াস উপস্থিত হয়। ক্ষুধিত ও পিপাসু আত্মাতে ঈশ্বরের যে জীবন্ত অবতরণের কথা বলা হইল, এ অবতরণ কখন্ কাহার জীবনে উপস্থিত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধা পিপাসাও তো সকল সময় আমাদের জীবনে সহজে উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা পিপাসার কথা গ্রন্থে পাঠ করি, সাধুর মুখে তাহার ব্যাখ্যা শুনি, কিন্তু সহজে কি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা পিপাসা উপস্থিত হয়? যখন সংসারের নানা অনিত্য বিষয়ে আমাদের প্রাণের গূঢ় টান বিদ্যমান থাকে, তখন ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, ক্ষুধা পিপাসা সে অবস্থায় জীবনে কি প্রকারে সম্ভবে? ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা পিপাসা বৃদ্ধি করিতে হইলে, ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভে সাধু-সঙ্গ চাই, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ চাই, অন্যের সঙ্গে পূজা বন্দনায় বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত যোগ দান করা চাই, স্মরণ, মনন ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করা চাই। এইরূপে সাধনের জীবন যাপন করিতে করিতে যথাসময়ে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, ক্ষুধা, পিপাসা উপস্থিত হয়, এবং যথাসময়ে জীবনে ব্রহ্মের অবতরণ সম্ভব হয়। উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাক্ষাৎ ফলই মানব-জীবনে ব্রহ্মের অবতরণ; উপাসনা-প্রতিষ্ঠার চরম ফল জীবনে, গৃহে, পরিবারে, মানব-সমাজে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা। মানব-সমাজে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা এবং ধরাতলে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠা একই কথা।

যুগে যুগে ধর্ম্মাবহ মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার মনোনীত সাধু মহাজনগণের জীবন-যোগে উপাসনা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, উপাসনার জীবন্ত শুভ ফল প্রদর্শন করিলেন; আর অসাধু আত্মাগণ সময়ে সময়ে সেই ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত উপাসনার ব্যাপারে কত বিঘ্ন উপস্থিত করিল, কত ভাবে সত্য উপাসনার উচ্ছেদ সাধন করিল, ধর্ম্মের নামে উপধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিল, সত্য উপাসনাকে বিকৃত করিল, ধর্ম্মাদর্শকে খর্ব্ব করিল, বিকৃত করিল, স্বর্গীয় ধর্ম্ম বিধি ব্যবস্থার স্থানে মনঃকল্পিত মানবীয় বিধি ব্যবস্থার গঠন করিয়া আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিল। তাই যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। প্রাচীন ভারতে কত বড় বড় ঋষি ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মগত জীবন-লাভের প্রকৃষ্ট বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিলেন। কালস্রোতে সকল ভাসিয়া গেল, সত্য উপাসনার স্থলে কত প্রকারে কত মনঃকল্পিত উপাসনা, পূজা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হইল। বিদেশের সাধু মহাজন শ্রীঈশা, শ্রীমহম্মদ প্রভৃতি কত পরীক্ষা বহন করিয়া, জীবন পাত করিয়া, বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; উপাসনার কত মহিমা গৌরব আপনারা জীবন দ্বারা প্রদর্শন করিলেন, কথায় ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীমহম্মদ উপাসনার সময় সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, উপাসনার ব্রত-পালনের জন্য, উপাসনার পূর্ব্বে আওজান ধ্বনিতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম হইতে সকলকে উপাসনায় আহ্বানের বিধি করিলেন এবং সেই আহ্বানের প্রণালী মুসলমান সমাজে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৫০০ বৎসর হইতে চলিল, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আত্মহারা হইয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইলেন, তাহাও গৃহ পরিবারে উপাসনা-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে সকল উপাসনার জীবন্ত ভাব চলিয়া গেল, সাধনের বিশুদ্ধতা তেমন রক্ষিত হইল না। তাই নব যুগে আবার নূতন করিয়া উপাসনা-প্রতিষ্ঠা। অতীতের, স্বদেশের, বিদেশের সকল প্রকার বিলুপ্ত উপাসনা-প্রণালীকে ও বর্ত্তমানের বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের মৃতপ্রায় উপাসনা-প্রণালীকে উদ্ধার করিয়া, তাহাতে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়া, সকল প্রণালীকে এক মহাপ্রণালীতে সমন্বিত করিয়া, মহাসমন্বয়ের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নব-উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই জন্যই ভাদ্রোৎসব বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার উৎসব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পণ্ডিত কে?

যিনি বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, বক্তৃতায় ও তর্কে সুনিপুণ, বক্তৃতায় ও তর্কে শব্দাড়ম্বর ও বাক্যবিন্যাস করিয়া পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে প্রয়াসী, বিচার বিতর্কে বহুলোককে পরাস্ত করিতে ইচ্ছুক, বক্তৃতার পারিপাট্যে লোকের মন মুগ্ধ করিতে যত্নশীল, সতত আত্মপ্রকাশেই যাঁর মতি ও বুদ্ধি, তিনিই কি পণ্ডিত? না, যিনি জ্ঞানানুযায়ী অনুষ্ঠান করেন, ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করেন, কথায় ও কাজে এক, ভাবের আতিশয্য বা কথার আড়ম্বর যাঁর নাই, অতি সন্তর্পণে সহজ ও সরল ভাবে যিনি প্রাণের কথা বলেন, কায়মনোবাক্যে সমতা রক্ষা করেন, আত্ম-প্রকাশ অপেক্ষা আত্মগোপনেই যাঁর সমধিক প্রয়াস, বাগ্মিতা বা বাচালতা অপেক্ষা যিনি মৌনভাবে থাকিতেই ভালবাসেন, তাঁর বিদ্যা অল্প হইলেও তিনি পণ্ডিত।

নির্ভর কি?

পূর্ণ বিশ্বাসের ধর্ম্ম পূর্ণ নির্ভর করা। যাঁকে যিনি বিশ্বাস করেন, বা যাঁর দ্বারা জীবনের সব অভাব পূর্ণ হইতে পারে জানেন, তাঁতেই তিনি নির্ভর করেন। পুত্র কন্যা পিতা মাতার উপর নির্ভর করে, সতী স্ত্রী সাধুপতির উপর নির্ভর করেন, প্রজারা প্রজারঞ্জক রাজার উপর নির্ভর করে, শিষ্যেরা গুরুর উপর নির্ভর করে, ছাত্রেরা শিক্ষকের উপর নির্ভর করে, মূর্খেরা পণ্ডিতের উপর নির্ভর করে, পাপীরা সাধুজনের উপর নির্ভর করে, দীন দুঃখীরা ধনীর উপর নির্ভর করে; এইরূপে একে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া লোকেরা জীবনের পথে চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাধু ভক্তেরা কাহার উপর নির্ভর করেন? তাঁহারা সংসারের কোন মানুষেরই উপর নির্ভর করেন না, কেননা তাহারা জীবনের অভাব দূর করিতে পারে না। যিনি ভুমা মহান্, যিনি সর্ব্ব-শক্তি অন্তরাত্মা অনন্তবলধারী, যিনি অনন্তকরুণাময় পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান্, যিনি অনন্ত জীবনের অভাব নিত্য দূর করিতে পারেন, ভক্তেরা তাঁহাতেই নির্ভর করেন। তাঁহার চরণ ভিন্ন ভক্তেরা আর কিছুই চান না।

অতীত ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ও এখনও যাহা তাঁহার লিখিবার আছে, সে সম্বন্ধে আমিও একটু নিবেদন করিতে আসিলাম। ভক্তি-ভাজন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অবশ্যই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের জনমণ্ডলীর ভাব এবং অপরাপর দিক সমুদায় চিন্তা করিয়া ভাবী ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্রাহ্মমণ্ডলীর বিশেষ চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কারণগুলি যে অমূলক ও ভিত্তি-শূন্য, তাহা কে বলিবে? প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের সেই অভ্যুদয়-যুগ এবং বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বাহিরের লোক আমাদের সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছেন, তাহা অমূলক নহে। প্রত্যেক ধর্ম্ম-বিধান একটা বিশেষত্ব লইয়া মানব-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। সমাজ-সংস্কার ধর্ম্মবিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের দিক ধীরে ধীরে উদীয়মান সূর্য্যের মত দেখা দিতেছিল। সেই সমাজ-সংস্কারের প্রভাব কেবল ব্রাহ্মসমাজে নহে, অন্যান্য ধর্ম্মসমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের দিকে তাকাইয়া দেখিলে তাহা বেশই বুঝা যাইবে। এমন কি, ইসলাম সম্প্রদায়েও তাহা প্রবেশ করিতেছে। আমার ষষ্ঠসপ্ততি বর্ষের ভিতর দেখিতেছি যে, এ সম্বন্ধে ভারতে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন বলিতে আসিলাম যে, এই সামাজিক জীবনের ক্রমোন্নতির উপর কি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভর করি-তেছে? কখনই নহে। সমাজ-সংস্কারের দিকে প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উঠিয়া যাইতেছেন, কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন-সংগঠন সম্বন্ধে কি সেইরূপ চলিতেছে? আমি দেখিতেছি যে, প্রবল সমাজ-সংস্কারের স্রোতের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্ম-জীবনের পথ ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ সামাজিক সংস্কারের চূড়ান্ত সীমায় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে পথে ধর্ম্মাত্মা-গণ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়া ধর্ম্ম-জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সে পথের পথিক এখন কই? ইসলাম জগতে আর হোসেন হাসেন কই? বিলাসিতা ও ধনমান-বৃদ্ধির স্পৃহার মুখে ধর্ম্ম কতটুকু দাঁড়াইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সত্য সত্য মহা সঙ্কটের অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ রোগাক্রান্ত। বল দেখি, ভাই ব্রাহ্ম, এখন ব্রহ্ম-চিন্তা, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মযোগে কত টুকু সময় ব্যয়িত হইতেছে? একবার জীবন-সংগ্রাম ভাবিয়া দেখ। কোথা হইতে আমাদের পিতৃমাতৃগণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া-ছিলেন, আর এখন আমরাই বা কোথায়! যাঁহারা কল্যকার চিন্তা পরিহার করিয়া ধর্ম্মের জন্য ছুটিয়া আসিলেন, যাঁহারা একটা নবধর্ম্মের নবীন প্রভাব অনুভব করিয়া, উচ্চ বেতনের চাকুরি পরিত্যাগ ও সেই পথে ভাবী উন্নতির আশা ভুলিয়া গিয়া, সেই ধর্ম্মের নবোন্মেষপূর্ণ ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিলেন, আজ আমা-দিগের মধ্যে সে প্রভাব কই? কই সে ব্রহ্মানন্দ-জীবনের সাধনা ভজনা, কই সে যোগ তপস্যা, কই সেই বৈরাগ্য, কই সেই উদ্যম ও উৎসাহ? ভাই, সে দিন কি মনে আছে, যখন ব্রহ্মানন্দ

কলিকাতার টাউন হলে দাঁড়াইয়া পঁচিশ ত্রিশ হাজার শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে নববিধানের নূতন সংবাদ ঘোষণা করিয়া সমগ্র ভারত ও পাশ্চাত্য প্রদেশকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন? ভাই, সে দিন কি মনে আছে, যখন তিনি সেই সুদূর পাশ্চাত্য ভূমিতে দাঁড়াইয়া, তদ্দেশবাসী সহস্র সহস্র ভক্ত ও মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের একটা নূতন প্রাণ দিয়া, তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার সেই বক্তৃতার স্রোত ভারতের উপকূলকেও স্পর্শ করিতেছিল? ভাই, সে দিন কি মনে আছে, যখন তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ জন্য, নানা সম্প্রদায়ের শ্রোতৃবর্গ বীডন পার্ক ও বীডন ষ্ট্রীটকে পূর্ণ করিয়াছিল? ভাই! সেই দিন কি মনে আছে, যখন তিনি সদলে শূন্যপদে কলিকাতার পথে নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইয়া নগরবাসীদিগের প্রাণে হরিনামের নবস্রোত সঞ্চারিত করিয়াছিলেন? আজ সেই কেশবের ভেরীরব কোথায়? আজ তাঁহার সেই একতারা, গৈরিক ও কমণ্ডলু কোথায়? সেই বঙ্গের সুলেখক বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাকে "ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ" বলিয়া তাঁহার পুস্তক বিশেষে লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ সে "ব্রাহ্মণ" কোথায়? সেই ভক্ত পরমহংস রামকৃষ্ণ, যাঁহার "ফাতনা" ডুবিতে দেখিয়াছিলেন, আজ সেই মগ্ন যোগী কোথায়? সেই বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বোহার-গ্রাম নিবাসী মৌলভী সদর উদ্দীন আহম্মদ যাঁহাকে "প্যাগম্বর" বলিয়া চিনিয়াছিলেন, আজ সেই নববিধানের "প্যাগম্বর" কোথায়! যাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই, তৎকালীন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক ভক্ত ডল্ (Dall) "Christ and Keshub Chunder Sen" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া "The Liberal and New Dispensation" পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ সে আত্মা কোথায়? আবার সেই ভারতের মহা সঙ্কটের মুহূর্ত্তে খৃষ্ট-ভক্ত ভারত-সন্তান রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাঁহার জীবনতত্ত্ব লিখিতে গিয়া "The Legacies of Keshub Chunder Sen" শীর্ষক প্রবন্ধ উক্ত পত্রে প্রকাশ করিলেন, আজ সে গুরু কোথায়? পাশ্চাত্য ভূমিতে ধর্ম্মাত্মা Martineu (মার্টিনো) যাঁহাকে "A soul congenial to Christ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, আজ সে আত্মা কোথায়? প্রাচীন কলিকাতা ইউনিভার্সিটির Convocation Meetingএ ভাইস্ চ্যান্সেলর Sir Reynold (সার রেনল্ড) যাঁহার আদর্শ পবিত্র চরিত্রের উল্লেখ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিত উপাধিধারী যুবকগণকে চরিত্র-শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং যাঁহার উচ্চ জীবনকে বুদ্ধ-জীবনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন, আজ সে আদর্শ পুরুষ কোথায়? কেশবের জীবন-প্রভাব এখনও সাধু সন্ন্যাসীরা স্বীকার করিতেছেন। কিছুদিন হইল, আমাদের পরিচিতা কয়েকটি ব্রাহ্মমহিলা নবদ্বীপ-দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন কোন একটি সন্ন্যাসীদের কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী কুটির হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা কি কেশব বাবার দলের লোক?" তাঁহারা "হাঁ" বলাতে তাঁহার মুখভাব যেন এক অদ্ভুত আনন্দে পূর্ণ হইল। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে সুবিধানুসারে তাঁহার নিকট আবার আসিতে বলিলেন। এই অবসরে আমাদের কালনা-নিবাসী ভক্ত ভগবান্ দাস বাবাজীর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি যখন Kalna Free Church Institutionএর ছাত্র, তখন আমি ও আমার সমকালীন বন্ধু বান্ধব অনেকেই বাবাজীর কুটিরে উপস্থিত হইতাম। এক দিন তিনি ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিতে গিয়া ভক্ত ব্রহ্মানন্দের কথা তুলিলেন এবং বলিলেন, "এ যুগে কেশব বাবা মহাপ্রভুর গৌরব রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।" এ কথা আজও হৃদয়ে জাগিতেছে।

তাহার পর যাহা বলিতে আসিলাম, সে দৃষ্টান্তই বা কোথায়? সেই ব্রহ্মানন্দের সহযোগী কর্ম্মবীর প্রতাপের প্রশস্ত প্রচার-ক্ষেত্র, সেই সাধু অঘোরনাথের অনাহারে শূন্যপদে পৃষ্ঠে বোচকা বাঁধিয়া পাহাড় জঙ্গলের পথে প্রচার-যাত্রা, সেই ঋষি কেদারের ঋষি ভাব, সেই উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দের মহাভাব, সেই কর্ম্মযোগী কান্তিচন্দ্রের কর্ম্মযোগ, সেই উৎসাহের অবতার গিরিশচন্দ্রের ইসলাম-প্রচার, সেই ভিখারীর জন্য ভিখারী উমানাথ, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথের মধুর সঙ্গীত, সেই শিখধর্ম্ম-বিশারদ মহেন্দ্রনাথের শিখশাস্ত্র-প্রচার, সেই ভাবোন্মত্ত কালীশঙ্করের নব নৃত্য, সেই সেবাধর্ম্মী প্রাণকৃষ্ণের অনাথ-সেবা, সেই উৎসাহী রামচন্দ্রের নবোৎসাহ, সেই ভক্ত দীননাথের প্রশস্ত বিহার ভূমি, সেই বঙ্গচন্দ্রের পূর্ব্ব-বঙ্গ এবং সেই জুতার মালা-পরিহিত বীরধর্ম্মী বলদেবের নিজ ভূমিতে নৃত্য ও হরিনামের সঙ্গীত, আর সেই তাঁহার "উপরছে হুকুম আয়া, হাম কেয়া করেগা" এই মহামন্ত্রের বীজ মাথায় লইয়া পারস্য ও তুরস্ক দেশে প্রচার-যাত্রা ও সমাহিত ইস্লামবাদীর সমাধি-গর্ভে চিরবিশ্রাম প্রভৃতি মহৎ দৃষ্টান্ত সকল এখন কোথায়!! ইঁহারা মতধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন নাই। ইঁহারা নববিধান-সাধক ব্রহ্মানন্দের সাধন-মন্ত্রে দীক্ষিত। আজ পৃথিবী এ দৃষ্টান্ত দেখিতেছে না। আজ ধর্ম্ম-সাধনের পথে সে পথিক পৃথিবী দেখিতেছে না। আজ বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্যের সে দৃষ্টান্ত সম্মুখে পড়িতেছে না। বিলাসিতা, অতৃপ্ত ধনমানের স্পৃহা, অভক্তি ও অপ্রেম প্রভৃতি শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সমাজের অস্থি মজ্জা চর্ব্বণ করিতেছে। মতের ধর্ম্ম পৃথিবীতে থাকে না ও মানুষকেও রক্ষা করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ সাধনের ধর্ম্ম আনিলেন, আর আমরা এখন তাহাকে মতের ধর্ম্ম করিয়া ফেলিতেছি। আমরা নববিধানবাদী কেশবকে মতে গ্রহণ করিলাম, সাধনায় গ্রহণ করিতে পারি নাই। হিন্দু সাধক পরমহংসদেব শিক্ষিত লোক ছিলেন না। তিনি তাঁহার শিক্ষায় ও পাণ্ডিত্যে এত লোককে আকর্ষণ করেন নাই। সাধনে আকর্ষণ করিলেন। আজ আমাদিগের ভিতর সাধনার কথা দূরে থাকুক, পরিবারে দৈনিক উপাসনাও অনেক পরিবারে নাই। হিন্দু পরিবারে পারি-

বারিক পূজা অর্চনায় গৃহের শিশু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতেছেন, আর আমাদের অনেক পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী একত্র হওয়াও কঠিন হইয়াছে। আজ নববিধানবাদী আমরা উপাসনা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আজ "নবসংহিতা" পর্য্যন্ত দূরে রাখিয়া দিলাম। তাই বলিতেছি, আমরা কেশবকে স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু সাধনার পথে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেশব মতে নহেন, কেশব সাধনাতে। একদল Revelation বুঝিতে না পারিয়া কেশবকে বুঝিতে পারিলেন না, আর আমরা তাঁহাকে বুঝিয়াও গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এই মহা সঙ্কটের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজ চলিতেছে। সুতরাং ইহা কোথায় গিয়া পড়িবে, একটা ভাবিবার বিষয়। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের জনমণ্ডলীর ব্রাহ্মসমাজ-সম্বন্ধে যে ভাব অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এখনকার যুগে শিক্ষিত সমাজের চক্ষু আছে, সুতরাং তাঁহাদের সে দৃষ্টিকে কল্পনায় পরিণত করিলে চলিবেনা। দারুণ সংসার-পিপাসা ও ধনমানের মরীচিকা ভুলিয়া গিয়া, উপাসনার যোগে যুক্ত না হইলে এবং জীবনে নবসংহিতা পরিণত না হইলে, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা-জনক। অবশ্য বিধাতার সত্য কোন দিন বিনষ্ট হয় না। তাঁহার বিধানে তাঁহার সত্য গ্রহণ ও পালন জন্য তিনিই মানুষ প্রেরণ করেন। তাঁহার বিধানে Millennium চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে। যদি আমরা দেখিতে না পাই, চীন জাপান দেখিবে। দশ হাজার বৎসর পরে লোক আসিবে। আজ এ সম্বন্ধে ইহাই নিবেদন।

নামকুম পোঃ (রাঁচি) ৭।৮।২৯ — সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

অনন্ত নরকে বিশ্বাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই বিশ্বাস। আত্মার মৃত্যু নাই। ঋষি পবিত্র ঋগেদের মন্ত্রে মৃতদেহ-দাহ-কালে বলিতেছেন যে, "হে অগ্নি, তুমি ইহার এই পাঞ্চভৌতিক দেহই ভস্ম করিতে সমর্থ, কিন্তু ইহার আত্মাকে তুমি স্পর্শ করিতে পারিবে না।" গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, মানবের মৃত্যু নাই, আত্মা চির অমর। বিজ্ঞান বলিতেছে, পরমাণু অবিনশ্বর, তাহার ধ্বংস নাই, পরিবর্ত্তনশীল মাত্র। আমার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হউক, বা মৃত্তিকায় প্রোথিত হউক, অথবা জলে নিমজ্জিত হউক, কিম্বা পক্ষিগণের সেবাই হউক, আমি সম্বন্ত, আমার ধ্বংস নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল, পাশ্চাত্য জগতের আত্মাবাদিগণ মৃত্যুর পরে আত্মার স্থিতি এবং পার্থিব লোকের সঙ্গেও তাহাদের সর্ব্বক্ষণ যোগা-যোগের এক গূঢ় রহস্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। আমাদের ব্রহ্ম-সঙ্গীতে এ সকল গূঢ় রহস্য বা তত্ত্ব নানা ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, মিশে রব চির দিন।" "অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে বিহরিব লোকান্তরে।" "জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর।" "সম্মুখে অমর ধাম, আমাদের গম্য স্থান।" "তোমার অসীমে, প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই, কোথায় দুঃখ, কোথায় মৃত্যু, কোথায় বিচ্ছেদ নাই।" ইত্যাদি বহু সঙ্গীতে, আমি অনন্ত উন্নতির পথে যাত্রী রূপে ক্রমাগত চলিয়াছি, এ আশাই সর্ব্বক্ষণ পাইয়া থাকি। পারস্যের ভক্ত হাফেজের উক্তির অনুবাদে বঙ্গের কবি গাহিয়া বলিয়াছেন যে,—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যে অম্লান কুসুমের মধু পান তরে,
নিয়ত লোলুপ মম মন মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
ওহে মৃত্যু, তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত।"

এই যে অমরধামে আত্মার অবস্থিতি বিশ্বাস করিতেছি, এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, আমি যখন দেহ-মুক্ত হইয়া অশরীরী অবস্থাতে অবস্থিতি করিব, তখন আমার "আমিত্বের" ভিতরে কি কি গুণের সন্নিবেশ থাকিবে? এই দেহে অবস্থিত আত্মার স্নেহ, মমতা, প্রেম, আসঙ্গ-লিপ্সা প্রভৃতি যে সকল জ্ঞান (Faculties of soul) ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং অনবরত বহির্জ্জগতে নানা ভাবে নানা কার্য্যে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, সে সকলের কি তখন বিলোপ সাধিত হইবে? আত্মা অমর হইলে তাহার স্বীয় গুণাবলীও (Faculties of soul) চির দিনই তাহাতে নিবিষ্ট থাকিবে। এই যে দয়া, মমতা, আসঙ্গ-লিপ্সা প্রভৃতি লইয়া আমি দেহে অবস্থিতি করিতেছি, এ সকলের সহিত আমার স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং আমি আমার এই স্মৃতি (Memory) অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান লইয়া পরলোকে যাইব।

মনে করুন, অতি ঘৃণিত হত্যাপরাধে মৃত্যু-দণ্ডের পরিবর্ত্তে আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইল, আমাকে এ দণ্ড ভোগ করিবার জন্য আণ্ডামান লইয়া চলিল। আমি চলিতে বাধ্য হইতেছি, পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় কেহই আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেছে না, আমাকে একাকীই যাইতে হইল। তখন সকলেই আমার দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছে, আমিও তাহাদের দিকে তাকাইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিতে বাধ্য হইলাম। পথে বাহিরে আমার কেহ সঙ্গী রহিল না, আমি সম্পূর্ণ একাকী, কিন্তু সঙ্গীহীন নহি। আমার প্রাণের মধ্যে এক অদৃশ্য, অব্যক্ত, অপূর্ব্ব বস্তু সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। সে কি? সে বস্তু আমার প্রথম সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে,

কিন্তু স্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, এ স্মৃতি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। স্মৃতি আমার জীবন-ব্যাপী যাবতীয় কার্য্যের ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ এক যেন জীবন্ত মূর্ত্তি! ঐ স্মৃতি আমার অপত্য-স্নেহ ও দাম্পত্য-প্রেম-জনিত, দয়া, মায়া, আসঙ্গ-লিপ্সা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট এক এক উজ্জ্বল চিত্র সর্ব্বদাই আমার সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে। এখন ঐ সুদূর দ্বীপান্তরে আমার প্রাণের অবস্থাটা আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন! আমি যেন সেখানে স্বাধীন। মহা সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া হউক বা বসিয়াই হউক, আমি ক্রমাগত অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছি। দিগদিগন্তব্যাপী মহাসাগরের অফুরন্ত তরঙ্গমালা ভিন্ন দৃষ্টিতে আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। আকাঙ্ক্ষা ও আশা, অথবা কল্পনা তখনও আমাকে ছাড়ে নাই, উহা আমার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িতই রহিয়াছে। আমি কল্পনা করিতেছি যে, পূর্ব্বের ন্যায় সকলেই যেন আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে! দেখুন, আমার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কেমন প্রবল রহিয়াছে, দেখিবার যন্ত্র স্বরূপ দুইটী চক্ষুও আছে, কিন্তু যাহাদিগকে দেখিতে চাই, তাহারা কেহই কাছে নাই। কথা শুনিবার আগ্রহ রহিয়াছে, শুনিবার দুইটি যন্ত্র কর্ণও রহিয়াছে, অথচ যাহারা কথা বলিবে, তাহারা এখন আর সেখানে নাই। ধরিতে ইচ্ছা হইতেছে, দুইখানি হাত বাড়াইয়াও দিতেছি, কিন্তু যাহাদিগকে প্রাণে ধরিব, তাহারা কেহই সেখানে নাই। যাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে কত সাধ, তাহারা আর সেখানে নাই! আমার প্রাণের ভিতরের ঘোর আন্দোলিত অবস্থা এবং তজ্জনিত এক বিষম অব্যক্ত অশান্তি আমাকে নিয়ত যেন অধীর করিয়া রাখিয়াছে। এই যে আমার বিষম যাতনা, ইহাই এক নরক-যন্ত্রণা! কত দিনে এ যাতনার নিবৃত্তি হইবে? উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এমন ভাবে প্রতি নিয়ত এ যাতনা ভোগ করিতে করিতে যখন ক্রমে ক্রমে এই অশান্তিময় অবস্থার ভিতরে থাকিয়া বুঝিতে পারিব যে, যাহাদিগকে দেখিতে চাই, ধরিতে চাই, যাহাদের কাছে যাইতে চাই, তাহাদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাতের আশা নাই; ইহা বুঝিতে সময় লাগিবে বটে, কিন্তু যখন বেশ বুঝিতে পারিব, তখন আমার প্রাণের প্রবল আন্দোলন ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকিবে। এ অবস্থাটি জ্ঞান-মার্গের সাধকগণের মনকে ক্রমশঃ স্ববশে আনিবার সাধনার ন্যায় কঠোর সাধ্য। আবার যখন আমি এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিবার পরে, সেখানে একটী বিবাহ করিতে সুযোগ পাইলাম, নূতন করিয়া সংসারটি আবার সেখানে পাতিয়া বসিলাম, আমার ক্ষুদ্র কুটির খানি ক্রমশঃ পুত্র কন্যাতে পূর্ণ হইতে চলিল, তখন আমার হৃদয়ের স্নেহ, দয়া, মায়া ও আসঙ্গ-লিপ্সা, অপত্য-স্নেহ ও দাম্পত্য-প্রেম প্রভৃতি পুনরায় চরিতার্থ করিবার সুযোগ লাভ হইল। তখন হইতে আমার ঐ সেই পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। সেই পূর্ব্বেকার তরঙ্গায়িত অবস্থা প্রশমিত হইয়া পড়িল। আমি সেখানে সংসারী হইলাম, দশজনের সঙ্গে একজন হইয়া গেলাম। কিন্তু এই নূতন সৌভাগ্যের ভিতরে অবস্থিতি করিয়াও, একজন যখনই আমাকে বিরলে পায়, তখনই সে আমার পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলী আমার সমক্ষে ধরিয়া দেয়, আমাকে আবার তীব্র ভাবে জ্বালাতন করিয়া তুলে—সে আর অন্য কেহই নয়, ঐ আমার সঙ্গের সঙ্গী পুরাতন স্মৃতি! এ স্মৃতি পরিত্যাগ করে নাই, কখন কখন যেন নিদ্রিত থাকে, আবার সুযোগ পাইলেই ফুটিয়া উঠে! আমার অনুষ্ঠিত পাপের চিত্র আবার সম্মুখে ফুটাইয়া তোলে, এবং তাহার জন্যেই আমি নিয়ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করি।

এখন অন্য দিকে যাই। ঐ আণ্ডামান গমনের সময়ের মত আমার যেন মহা প্রস্থানের সময় উপস্থিত। আমাকে ঘিরিয়া পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশিগণ সকলেই উপবিষ্ট। সকলেই কি যেন এক অব্যক্ত ব্যথায় ব্যথিত! আবেগপূর্ণ-নেত্রে আমার পানে তাকাইয়া আছেন, আমি সজ্ঞানে তাঁহাদের পানে তাকাইয়া 'বিদায় বিদায়' বলিতে বলিতে চির বিদায় লইলাম। দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম। পাখীটি যেন খাঁচা ছাড়িয়া কাহার উদ্দেশ্যে কোথায় উড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করি, এখন আমার সঙ্গে কে কে রহিল? শরীরের সঙ্গে শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি অভূত, ভূতাতীত পদার্থ, চিন্ময় বস্তু, অবিনশ্বর। এখানে আমার চির সঙ্গী স্মৃতি। এক জন জার্ম্মান দেশীয় পণ্ডিত মৃত্যুর পরে আত্মার প্রথম অবস্থাটা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ আমি আণ্ডামান থাকা কালীন আমার আসঙ্গ-লিপ্সা প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আমি দেখিতে, শুনিতে ও ধরিতে চাহিতাম, তখন আমার দেখিবার, শুনিবার ও ধরিবার যন্ত্রগুলিও আমার দেহেই ছিল, কিন্তু যাহাদিগকে দেখিতে, ধরিতে ও যাহাদের কথা শুনিতে আমি সর্ব্বদাই অধীর ছিলাম, তাহাদিগকে পাইতাম না। পরলোকে এই অশরীরী অবস্থায় অদেহী রাজ্যে প্রবেশ করিবার পর হইতেই আমার এক নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; এখানে শুধু আমার দেখিবার ইচ্ছাই রহিয়াছে, কেননা স্মৃতি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্তই আমার আত্মাতে প্রতিফলিত করিতেছে। কিন্তু আমার দেখিবার ইন্দ্রিয়ের অভাব ও দেখিবার ব্যক্তিরও অভাব, এখানে এই উভয় অভাব মিলিয়া আমাকে এক বিষম যন্ত্রণায় ফেলিয়াছে। এই আমার পরলোকে এক অভিনব নূতন যন্ত্রণার আরম্ভ হইল। ইহা নরক-যন্ত্রণা। তবে কি নারিকেল গাছের শুষ্ক ডগার ন্যায় এই আমার আমিত্ব হইতে আসঙ্গ-লিপ্সা এবং তজ্জনিত স্নেহ মায়া প্রভৃতি খসিয়া পড়িবে? যতদিন এ সকল থাকিতেছে, ততদিন আমাকে নিয়ত এবম্বিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইতেছে। গ্রামোফোনের প্লেটের ভিতরে যেমন নানা প্রকারের ধ্বনি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে, আমার এই স্মৃতির ভিতরে

তাহা অপেক্ষা শত প্রকারের বিষয় স্তূপীকৃত হইয়া আছে। সেই শৈশবের পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইতে, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থার যাবতীয় চিন্তা, কার্য্য ও ক্রীড়া কৌতুক, অন্য দিকে আমার যাবতীয় পাপানুষ্ঠান অথবা আমার অনুষ্ঠিত পুণ্য কার্য; সমস্তই স্মৃতি-পথে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াই থাকে। দেহে বাস করিবার সময়ে স্মৃতিই যেমন সুযোগ ও সময় বুঝিয়া আমার সমক্ষে আমার অনুষ্ঠিত নানা ভাবের কার্য্য প্রকাশ করতঃ, কখনও বিষাদিত এবং কখনও বা পুলকিত করিয়া তোলে, ইহা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার। এই স্মৃতিই পরলোক গমনের সময়ও আবার সমস্ত কার্য্যের ছবি লইয়া আমার সঙ্গী হইল, সেখানেও সুযোগ পাইলেই স্মৃতি তাহার কার্য্য যথানিয়মে করিতেই থাকিবে। অশীতিপর বৃদ্ধকেও যেমন জীবিতকালে বাল্যস্মৃতিতে অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য সময় বিশেষে ব্যথিত ও অনুতপ্ত করে, তাহার যৌবনের অনুষ্ঠিত পাপের চিত্রাবলী মানস চক্ষের সম্মুখে ভাসাইয়া তুলে, দেহ-মুক্ত অবস্থাতেও ঐ স্মৃতি পূর্ব্ববৎ তাহার কার্য্য করিতে থাকে। এই যে সেখানে আমার অনুতাপ ও বিষাদ, ইহাই আমার ঘোর নরক-যাতনা। হায়! তবে কি আর আমার এ পাপ-যন্ত্রণা বা নরক-যন্ত্রণার অবসান হইবে না? স্মৃতি কি কখনও বিস্মৃতি-গর্ত্তে ডুবিয়া যাইবে না? যদি তাহা না হয়, তবে আমায় চিরদিনই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। যদি আমি শত শত পুণ্যের কার্য্য করি, তবেও কি ঐ একটি পাপের স্মৃতি তাহাতে ডুবিয়া যাইবে না? এ বড় বিষম সমস্যা। শরীরে থাকিয়া ইহা অপেক্ষা যে উচ্চ-স্তরের অবস্থা আছে, তাহা অনুভব করা অতি কঠিন সাধন। স্মৃতি যখন আমার অনন্ত কালেরই সঙ্গী, স্মৃতি যখন আমাকে কখনও ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, স্মৃতিতেই যখন আমার ক্ষুদ্র চিন্তাও, মোহ-জনিত বা অজ্ঞানতা-জনিত অথবা অসাবধানতা-প্রযুক্ত কোন সামান্য কার্য্যও গ্রথিত থাকিল, তখন আমার সময়ে সময়ে ঐ ক্ষুদ্র পাপের স্মৃতিও জাগিয়া উঠিয়া লজ্জিত করিবেই করিবে। রসগোল্লার অভ্যন্তরে যাবতীয় অণুতে অণুতে যেমন মিষ্ট রস অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সুমিষ্ট করিয়া তোলে, তেমনি ভাবে অশরীরী আত্মা আনন্দ-স্বরূপের অনন্ত রস-ভাণ্ডারে ক্রমশঃ ডুবিয়া ডুবিয়া, আনন্দে ওতপ্রোত ভাবে নিমগ্ন হইলে, এই চিন্ময়, অদ্ভুত নিরাকার আত্মা যে কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িবে, এত দিনের সঙ্গী স্মৃতি হইতে আমার কলঙ্কের দাগগুলি কি ভাবে মুছিয়া যাইবে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করতঃ অভিব্যক্ত করিবার শক্তি, দেহে অবস্থিত আত্মার পক্ষে সম্ভব কি অসম্ভব, ইহা এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ভক্ত কেশব চন্দ্র ও পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি কতিপয় সাধুর দর্শন-লাভ ঘটিয়াছে, তাহাতে মাত্র "জীবন্মুক্ত ভক্তগণের" উন্নত অবস্থা অর্থাৎ দেহে অবস্থিত আত্মা কতদূর উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই যে স্মৃতি পরলোকগত আত্মার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায় এবং আমাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় ক্ষুদ্র পাপকার্য্যেরও চিত্রাবলী অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দেয় ও তদ্দরুণ অব্যক্ত অথবা সুস্পষ্ট এক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহাই খৃষ্টীয় অনন্ত নরক-যন্ত্রণার মূল ভিত্তি। পাপের দাগ মুছিয়া যায় না। জলেও ধৌত হয় না। যখন প্রাণে অনুতাপের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন নদী কি সরোবরের বারি শত শত কলসী ঢালিলেও সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। মহাকবি সেক্সপিয়ার ম্যাকেথের চিত্রে যথার্থই দেখাইতেছেন যে, সাবান দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়াও হাতের রক্তের দাগ উঠিতেছে না। পাপের দাগ এমনি জিনিস। পাপ ও পুণ্য গড়ে কাটাকাটি হইবার ব্যবস্থা জগতে কোথায়ও নাই; অতএব পাপের স্মৃতি আমাকে চিরদিনই অনুতপ্ত করিবেই করিবে, ইহাই অনন্ত নরকের মূল ভিত্তি।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিত ভাই কেদার নাথ দে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যখন ভাই কেদার নাথ প্রিয় উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়কে আপনার শেষ সময়ের জন্য থাকিয়া যাইতে বলিলেন, তাহার পর অতি অল্প সময়ই অবশিষ্ট ছিল। আশ্চর্য্য, তিনি কি সকলই বুঝিয়া লইতে ছিলেন? আজ মনে হয়, আমরা কেমন করিয়া যাইব প্রিয় সন্নিধানে? প্রতিদিন যেমন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন, সেদিনও তেমনি করিলেন, সমস্ত দিনটি নিস্তব্ধ ভাবে একরূপ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা সময়ে সেদিনকার রবিবাসরীয় উপাসনা খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে হইতেছে কি না, তাহারও সংবাদ লইলেন। সে দিন রবিবার, মঙ্গলালয়ের পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র মোহন দত্ত প্রতিষ্ঠিত সেই খাঁটুরা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, উপাধ্যায় মহাশয় ও আর আর সকলে ভাই কেদার নাথের শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া রহিলেন। সকলকে তিনি আহারাদি করিয়া আসিতে বলিলেন। কাহাকেও কষ্ট দেন নাই। সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, সকল পুত্র কন্যা শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া মাতৃ-স্তোত্র, ব্রহ্ম-স্তোত্র ও পরলোক-গমনোন্মত আত্মার উপযোগী সঙ্গীত সকল গাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে বন্ধু-মণ্ডলী ও পরিবারস্থ সকলে যখন ব্রহ্ম-নাম ও গান শুনাইতেছিলেন, ঠিক সেই নীরব শান্ত রজনীর শান্তিপূর্ণ সময়টিতে শান্ত সাধক ঋষি পুণ্যাত্মা সুরলোকে মিলাইয়া গেলেন। ৮ই মার্চ, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, শিবচতুর্দ্দশী তিথি, তিনি ধর্ম্ম-নেতৃগণের সম্মুখে ধীরে ধীরে স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃদেবের প্রকৃতির ভিতর মহাদেবের অনেক ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত; মা সেই সময় বলিয়াছিলেন, আজ মহাদেবকে লইয়া আমরা রাত্রি যাপন করিতেছি। প্রভাতে সর্ব্ব আয়োজন

সমাধা করিয়া, ভাই উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনাদি করিলে, পরে পুত্রগণ ও বন্ধুবর্গ মিলিয়া যথারীতি নদীতীরে লইয়া গেলেন। যে নদীতে অবগাহন করিতে পিতৃদেব বড়ই ভালবাসিতেন, সেখানে তাঁহার পবিত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই সময়কার মাতৃদেবীর সহিষ্ণুতা চির জীবন স্মরণে থাকিবে।

পরিশিষ্ট।

প্রেরিত ভাই কেদার নাথের মুক্তার মত হস্তাক্ষরযুক্ত চিঠি অনেকগুলিই হারাইয়া গিয়াছে। পুত্র কন্যা এবং অন্য সকলকেই তিনি ধর্ম্ম উপদেশ এবং ধর্ম্ম-ভাবপূর্ণ পত্র লিখিতেন। প্রেরিত ভাই কেদার নাথ নববিধানের ইংরাজি ও বাঙ্গালা কাগজে কত যে লিখিতেন, কত ধর্ম্ম-বার্ত্তা বিবৃত করিতেন, তাহা যে কোথায় গিয়াছে, জানি না। সেগুলি থাকিলে এবং এই জীবন চরিতে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে কত মূল্য হইত। জীবনের কত ধর্ম্ম বিভাগ সকলে দেখিয়া মোহিত হইত। দুঃখের বিষয়, সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিব কি না, জানি না। সকল ভক্তদিগের জীবনই অতি উপাদেয় রত্ন-বিশেষ এবং বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যে সকল অমূল্য সামগ্রী লিখিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া যান, তাহাতে যে শিক্ষা ও উপদেশ থাকে, তাহাতে যুগযুগান্তরের লোক কত স্বর্গীয় ধন লাভ করিয়া উপকৃত হয়, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীআচার্য্যদেব কেশব চন্দ্র সেন বলিয়া ছিলেন, লেখক-শ্রেণী চির স্মরণীয় হইবেন এবং জগতের ধন্যবাদ পাইবেন; কারণ তাঁহাদের নিকট হইতেই ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে ও নববিধান সমাদৃত হইবে। আমাদের প্রেরিত ঋষি ভাই কেদার নাথের যাহা কিছু লিখিত পত্র বা ধর্ম্মলিপি আছে, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার প্রিয়তম জামাতা শ্রীরমণী কান্ত চন্দকে যে যে পত্র লিখেন, তাহার কয়েকখানি এখানে দেওয়া যাইতেছে।

১৬ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
২৭শে মে, ১৮৮৭।

প্রাণাধিক বৎস! তোমার বিনীত শান্ত মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, আমাদের এবং আমাদের কন্যার যত প্রকার শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট, সমুদায় বিস্মৃত হইতেছি। আমরা বাহিরে ৮ জন এবং ৩ জন করিয়া দুই স্থানে বিভক্ত, কিন্তু অন্তরে সর্ব্বক্ষণ এক স্থানেই আছি, যেমন ঐ ছবিতে; ছবি শীঘ্রই পাইবে। সর্ব্বদা পত্র দ্বারা কথা কহিবে, মনোনীতকে দেখিবে, যেন কুসঙ্গে না যায় এবং বৃথা সময় নষ্ট না করে। মা তোমাদিগকে সুখে রাখুন।

শুভাকাঙ্ক্ষী—কেদার নাথ দে।

১৬ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
১৬ই জুন, ১৮৮৭।

পরম স্নেহাস্পদ প্রিয়তম সন্তান-তুল্য রমণীকান্ত, তোমার এক খানি পত্র ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি, আজ আর এক খানি পাইলাম। তোমাদের থাকিবার কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। চাকর পাওয়া গিয়াছে, কেবল এই মাত্র শুনিলাম। সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধা আনুপূর্ব্বিক লিখিবে, শুনিতে চাই। সুখে দুঃখে দয়াময়ের চরণ সার করিয়া সন্তুষ্ট থাক, এই প্রাণের আকিঞ্চন। কেদার নাথ দে।

১৬ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৪।

প্রিয়তম বৎস, করুণাসিন্ধু শ্রীহরির শুভ আশীর্ব্বাদ সহস্র ধারে তোমার মস্তকে নিয়ত বর্ষিত হউক। তোমার পত্র খানি যথা সময়ে পাইয়াছি, উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। চরিত্রের শুদ্ধতাই সাধনের শেষ ফল। ব্রহ্ম-দর্শন, ক্রমে ব্রহ্ম-সহবাস, তার পর ব্রহ্ম-প্রাপ্তি, যোগে একতা, তবে চরিত্র নির্ম্মল হয়। ব্রহ্ম-কৃপায় বিধান-মাহাত্ম্যে এই সোপানত্রয় পর্য্যায়ক্রমে আরোহণ করিয়া মানব-জন্ম সার্থক কর, ইহাই প্রাণগত ইচ্ছা। হেমলতাকে শীঘ্র দেখিবার ইচ্ছা, সহজেই হইতে পারে, কিন্তু তোমাকে বিব্রত ও ঋণগ্রস্ত করিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ করা আমার একটুও ইচ্ছা নয়। হেমলতাকে তোমার হস্তে হরির চরণে সমর্পণ করিয়াছি। সেই অভয়-চরণ-প্রসাদে তুমি তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে, ইহাই হৃদয়ের আশা ও বিশ্বাস এবং তাহাতেই প্রাণের যথেষ্ট সান্ত্বনা ও আরাম। কষ্ট ও অধিক ব্যয় করিয়া আনারস পাঠাইবার আর প্রয়োজন নাই। তবে যদি এমন সুবিধা হয় যে, কোন আত্মীয় বন্ধু এখানে আসিতেছেন, অনেক দ্রব্যাদি সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে গুটিকতক আনারস আনিলে বিশেষ কষ্ট না হয়, তবে পাঠাইতে পার, নতুবা নয়। শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীকেদার নাথ দে।

Mangalganj Mission,
P. O. Anismali (Nadea).
28th March, 1888.

স্নেহাস্পদ সন্তান! তুমি কেমন আছ? তোমাকে অনেক দিন পত্র লেখা হয় নাই, সেজন্য কি কিছু মনে করিয়াছ? আমার ঐ দশা—বিশেষ প্রয়োজন না হইলে প্রায় কাহাকেও পত্র লেখা ঘটে না। গত উৎসব রাত্রে মন্দিরে যে হৃদয়-বিদারক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, সকলই শুনিয়াছ। সেই অবধি বড়ই মনস্তাপে পুড়িতেছি, কলিকাতায় থাকিতে আর প্রাণ চায় না। সে মহাপাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে আর মন স্থির হইতেছে না।

শ্রীহট্টের আধ্যাত্মিক বায়ু কি প্রকার? তোমার বিষয়-কার্য্যে যে প্রকার অনেক সময় দিতে হয়, তাহাতে তোমার সাধনের তো ব্যাঘাত হয় না? আনন্দময়ী মায়ের প্রসাদে

তোমার চিত্ত সদানন্দে পূর্ণ হউক। আমি আজ কলিকাতায় যাইব, মনে করিতেছি। শ্রীকেদার নাথ দে।

64, Upper Circular Road,
18 May, /88.

প্রাণপ্রিয় রমণীকান্ত!

সে দিন তোমার পত্রখানি পাইয়াছি। হেমলতার যাওয়া হইবে। চন্দ্রবাবুর ছুটীর শেষ ভাগে যেন যাওয়া হয়, যাহাতে ষ্টীমার শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারে, এমন সময় হইলে ভাল হয়। আমরা এখন বাবু অম্বিকা চরণ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে আছি। আশা করি, এখন শারীরিক ভাল আছ। পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং উন্নতি বিধান করুন। শ্রীকেদার নাথ দে।

কলিকাতা,
৬৪নং অপার সারকুলার রোড়;
১২ই জুন, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

প্রিয় সন্তান! মঙ্গল হউক। গত রাত্রিতে হেমলতা এবং মনোরথধন চন্দ্রবাবু এবং হরিদাসীর সঙ্গে এ স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন। চন্দ্রবাবুদের বাড়ী হইয়া যাইতে বোধ হয় পথে দুই এক দিন বিলম্ব হইতে পারে, শ্রীহট্ট পৌঁছিলে তার যোগে সংবাদ দিলে হয়। মনোমতের সঙ্গে ইহাদের দেখা হয় নাই, মনোমত এখনও অম্বিকাবাবুদের সঙ্গে ঢাকা অঞ্চলে রহিয়াছেন, ত্বরায় আসিবার কথা আছে। মনোরথের মা মনোরথকে কোন মতে পাঠাইতে সম্মত হন নাই, কেবল তাহার একান্ত ইচ্ছায় তাহাকে যাইতে না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

তোমার প্রশ্নের উত্তর ঐ উপরে। সকল সাধনের মূলে ব্রহ্মকৃপা, কৃপাহীন সাধন—যেমন মূলহীন বৃক্ষ—অসম্ভব; চিদাকাশ এই কৃপা-বায়ুতে পরিপূর্ণ। যখন নিস্তব্ধ তখন পাখা সঞ্চালন করিয়া সেবন করিতে হয়, যখন মৃদু মন্দ গতিতে বহিতে থাকে তখন গৃহদ্বার খুলিয়া বসিলেই হয়, আর যখন প্রবল ঝড় উঠে তখন দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং ইচ্ছা অনিচ্ছা না মানিয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া যায়; অতএব এই ত্রিবিধ প্রণালীতেই দেব প্রসাদ ধারণ করিতে হইবে। কেবল ঝড়ের আশায় অলস হইয়া থাকিলে কি জীবনের কার্য্য চলে? বায়ু অনুকুল থাকিলে কেবল পাল তুলিয়া দিলেই হয়, না হ'লে দাঁড়্ টানিতে হয়, এইরূপে ভবনদী পার হইতে হইবে—দৈব শক্তি এবং মানব যত্ন উভয়ে মিলিয়া মুক্তি-পথে অগ্রসর করে। দেব কৃপাই সার বস্তু, সাধন কেবল তাহা ধারণের প্রণালী মাত্র। এখন এই পর্য্যন্ত।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শ্রীকেদার নাথ দে।

ঋষি কেদার নাথের আর কোন লেখা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সেই অমূল্য বস্তু ধর্ম্ম-তত্ত্বের পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিব।

সেবিকা—শ্রীহেমলতা।

জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে গীত।

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ১১ই ভাদ্র, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস কর্তৃক)

কীর্ত্তন।

(ঝাঁপতাল)

কি ফল দেহধারণে, বিফল দেহধারণে,
ধারণ যে নাহি করে নিখিল-জগ-কারণে॥
ক্রীড়ন-মৃগ-মূর্দ্ধ সম শির কিরীটমণ্ডিত।
ভব-তরণ-চরণে যেই নাহি হয় লুণ্ঠিত॥ ১॥

(সে শিরের মূল্য কিবা? হোক না কেন মুকুট-শোভিত—সে যে খেলা বানরের সাজ সম—হোক না কেন মহারাজা—ধূলায় লুটায় তার ধ্বজা—যদি না মানে সেই বিশ্বরাজা—যেমন কংসের ধ্বজা লুটাইল—বিশ্বরাজে না মানিল)

(একতালা)

জান নাকি কি বলে পুরাণ?
করেন দুষ্ট দমন স্বয়ং ভগবান্॥
কংসরাজ অভিমানী, বিশ্বরাজে নাহি মানি,
ভাসাইল রাজ্য পাপ-অনাচার-ধারে রে॥
না বুঝিয়া হিতাহিতে, বসুদেব সুচরিতে,
রাখিল করিয়া বন্দী লৌহ কারাগারে রে॥ ১॥

(প্রেম বন্দী হয় কি কারামাঝ? বলরে বলরে কংসরাজ—হরি-প্রেমী বসুদেবের)

শমন অত্যাচারীর, দুষ্ট দমন কৃষ্ণবীর,
ভূমিষ্ঠ হইলা সেই কারাগার মাঝে রে।
খুলিল কারার দ্বার, লইয়া সন্তান তার,
বসুদেব রাখে নিয়া গোপের সমাজে রে॥ ২॥

(হরি-ভক্ত-গোপ-ভবনে— বাড়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে—ভক্ত গোপীর প্রেমক্ষীরে)

সপাত্রে হইল ধ্বংস, কৃষ্ণ-করে সেই কংস,
লুটাল ধরায় সেই অত্যাচারী শির রে।
তাই বলি থাকিতে দিন, ত্যজ মান হও লীন,
চরণ-কমলে সেই শ্রীশ্রীহরির রে॥ ৩॥

(হরি-পদে মজ মজ— দিন থাকিতে ভজ ভজ—নইলে মানব জনম বিফল হল)

(ঝাঁপতাল)

(কি ফল দেহ-ধারণে ইত্যাদি)

বৃথা নয়ন যথা ময়ুর-পুচ্ছপরি অঙ্কিত।
মনোমোহনরূপসুধাপানে যেই বঞ্চিত॥ ১॥

আবর্জ্জনাকুণ্ড সম শ্রবণ-গহ্বর।
নাহি বহে যাহে নাম-অমিয়-নির্ঝর ॥ ২ ॥
ভেক জিহ্বা সম মরণ ডাকি আনে।
ধিক রসন বিরত হরিনাম-গুণ-গানে ॥ ৩ ॥
(নিজেই ডাকে নিজ মরণে—ভেক যেমন সাপ ডেকে আনে—
গাও রসনা অবিরাম—তারকব্রহ্ম হরিনাম, মরণ-হরণ হরিনাম)

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার, ২নং ছকু খানসামা লেনে, শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের নবজাত শিশুকন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৮ই জুন (২৪শে আষাঢ়) জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

দীক্ষা—গত ৫ই সেপ্টেম্বর, প্রাতে, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে, ভক্ত ব্রহ্মানন্দের পৌত্র, মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মাল্য চন্দ্রের নবসংহিতানুসারে পবিত্র দীক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। পিতৃদেব সন্তানকে দীক্ষার্থ উপস্থিত করেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মণ্ডলীর পক্ষ হইতে গ্রন্থাদি এবং শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ আসন দীক্ষার্থীকে প্রদান করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ধর্ম্মমণ্ডলীর পক্ষ হইতে দীক্ষার্থীর জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। শ্রীমান্ নির্ম্মাল্য অধ্যয়নার্থ বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই দীক্ষা উচ্চতর শিক্ষাকে ধর্ম্মজীবনের অনুগামিনী করুক। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও সমস্ত ভক্ত পরিবারের আশীর্ব্বাদ শ্রীমানের মস্তকোপরি বর্ষিত হউক।

বিদেশযাত্রা—গত ৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেন (Mrs. N. C. Sen) বিদ্যাশিক্ষার্থ স্নেহের পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মাল্য চন্দ্রকে লইয়া ইংলণ্ডে, বোলপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু দর্শনাদি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান-লাভার্থ জার্ম্মাণীতে এবং তাঁহার পত্নী ভাগলপুরের স্কুল সমূহের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা বোস পাশ্চাত্য উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। নববিধান-জননী তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ দান করুন এবং ও দেশের প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত করুন।

সান্ধ্য-সম্মিলন—বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চাটার্জ্জীর গৃহে, বন্ধুগণের উদ্যোগে, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন হয়। স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এবং কতিপয় হিন্দু বন্ধু আনন্দ সহকারে যোগদান করেন। চা ও জলযোগের পর শ্রীমান্ ভক্তভূষণ হারমোনিয়ম যোগে একটী সঙ্গীত করেন। এখানকার সর্ব্বজন-পূজ্য রেভারেণ্ড ক্যানন এস, কে, তরফদার মহাশয় সময়োচিত একটী প্রার্থনা করেন। তৎপরে ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু তাঁহার বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়া সকলের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

বন্ধু-সম্মিলন—গত ২৭শে আগষ্ট, অপরাহ্ণে, ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেনের উদ্যোগে, Rev. Herbert Andersonকে বিদায় দান উপলক্ষে বন্ধু-সম্মিলন হয়। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিশনারীরূপে তিনি বহুদিন এদেশে থাকিয়া, মাদকতা-নিবারণ প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্য দ্বারা এদেশের সেবা করিয়া, দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। মণ্ডলীর অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নববিধানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মিশনারীদিগের অমূল্য জীবন-চরিত পুস্তকখানি তাঁহাকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করা হয়। তিনিও এদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে "আসি" বলিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

পরলোকগমন—গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২রা সেপ্টেম্বর, স্বর্গীয় হরকালী দাসের কনিষ্ঠ পুত্র, হাওড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দাস বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া, বৃদ্ধা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বালকবালিকাদিগের শিক্ষা প্রভৃতি হাওড়ার সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ও প্রাণগত চেষ্টা ছিল। তাঁহার অভাব পরিবারের সঙ্গে, মণ্ডলীর সঙ্গে, জনসাধারণও অনুভব করিতেছেন। চরিত্রবান্, নীতিমান্, সৎকর্ম্মশীল, ভগবদ্বিশ্বাসী আগ্রা কর্ম্মবীরের মত আজীবন সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি ফেলিয়া চিরবিশ্রামের রাজ্যে চলিয়া গেলেন। ভগবান্ ওখানে তাঁকে সুখশান্তিতে রাখুন এবং শোকার্ত্ত-জনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, প্রাতে ৮॥টার সময়, ভাগলপুরস্থ লালাজ বাসভবনে, স্বর্গীয় শ্রীমতী বিধুমুখী বসুর আদ্য শ্রাদ্ধ তাঁহার পৌত্র ও পৌত্রীগণ কর্ত্তৃক গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমান্ ভক্তভূষণ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করিলে পর, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু কাতর প্রার্থনা করেন। ভক্তভূষণ তাঁহার পিতামহীর জীবনের কয়েকটি কথা শোক-বিগলিত হৃদয়ে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ শ্রদ্ধাসহকারে

উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেনের সেবার্থ ৫৲ টাকা, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের সেবার্থ ৫৲ টাকা, ভাই চন্দ্রমোহন দাসের সেবার্থ ৫৲ টাকা, ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার্থ ৫৲ টাকা, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায়ের সেবার্থ ৫৲ টাকা, মোট ২৫৲ টাকা দান স্বীকার করা হইয়াছে।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতায়, ৫১।১ দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ তাঁদের মাতৃদেবী স্বর্গীয়া বিধুমুখী বসুর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ ও শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র রায় শ্লোকপাঠে সাহায্য করেন। শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র হৃদয়স্পর্শী একটী সুন্দর প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র রায়ও একটী প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানটী গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে :—

কলিকাতা নববিধান ব্রহ্মমন্দির ২৲, কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রম ৫৲, বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দির ২৲, মুঙ্গের নববিধান আশ্রম নির্ম্মাণ ৫৲, কলিকাতা নববিধান সমাজের পুস্তকাবলী মুদ্রাঙ্কণ ২৲, কলিকাতা নববিধান Trust Fund ২৲, হিন্দুসমাজের জনৈক বিধবা ২৲, বঙ্গের জলপ্লাবন ২৲, আর্য্যনারী সমাজ কলিকাতা ২৲, বারাশত নমঃশূদ্র বিদ্যালয় ২৲, ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার্থ ২৲, কলিকাতা ভগ্নি-সমিতি ২৲, নববিধান সমাজের জনৈক বিধবা সাধিকার সাধন ভজনে সাহায্য ১০০৲, মোট ১৩০৲ টাকা।

নববিধান জননী তাঁহার সতী কন্যাকে অমরধামে সুখ-শান্তিতে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ প্রিয়জনদিগের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে আগষ্ট, ১১৫ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গগত ভাই ব্রজ গোপাল নিয়োগীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন সুন্দর একটী প্রার্থনা করেন।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৩৬নং হ্যারিসন রোডে, ডাঃ জগন্মোহন দাসের গৃহে, তাঁহাদের প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র "পান্নার" সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা হয়; ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ডাঃ দাস ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করেন এবং মাতৃদেবী শোকোচ্ছলিত কণ্ঠে সঙ্গীত করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৩।১নং হরলাল দাস ষ্ট্রীটে, শ্রীমতী শশাঙ্কপ্রভা দত্তের গৃহে, তাঁদের পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় সাহেব বিপিন মোহন সেহানবিশের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১১।এ ভুবন মোহন সরকার লেনে, স্বর্গীয় রাজকুমার চন্দ্র রায়ের প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রাতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্ল কুমার রায় প্রার্থনা করেন, এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস প্রার্থনা করেন ও তৎপর কীর্ত্তনাদি হয়।

কোচবিহার—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন :—

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার, প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়, স্বর্গগত মহারাজা রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পরলোক গমন দিবসে, "কেশব আশ্রম উদ্যানে" তাঁহার সমাধি পার্শ্বে যথারীতি উপাসনা হইয়াছে। এ অনুষ্ঠানে যথাযথ রাজ-নির্দ্দিষ্ট বিধি ও ব্যবস্থানুসারে রাজকর্ম্মচারিগণ অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি গাত্রে প্রস্তর-ফলকে তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী মুদ্রিত "My mission is fulfilled and my call has come." এ বাক্যটি আমাদের সকলের পক্ষেই বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। আমরা সকলেই যেন সাহস ভাবে বলিয়া যাইতে পারি যে, "আমার জীবনের ব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে, এখন আমার যাইবার আহ্বান আসিয়াছে।" এই ভাবে প্রার্থনাদি হইয়াছিল। পর দিন ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার, প্রাতে, সেখানে উপাসনা ও সায়ংকালে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় জমাটভাবে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, স্থানীয় নববিধান-সমাজের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করতঃ দার্জিলিং যাইবার উপলক্ষে, যাঁহারা তাঁহার এই সঙ্কট সময়ে বিশেষ ভাবে সেবা শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করতঃ, কৃতজ্ঞতা-সূচক উপাসনা হইয়াছিল। মাননীয় সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতি বহুব্যক্তি উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। কেদার বাবুও সকলের সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বিধাতা সমীপে প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উৎসব—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

গত ৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার হইতে ৯ই ভাদ্র, বুধবার পর্য্যন্ত ৪ দিন কাকিনা ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব হইয়াছিল। মন্দিরে উপাসনা ও কীর্ত্তন এবং ছাত্রসমাজে একটি বক্তৃতা হয়। পুরুষগণ ও অনেক মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৩রা আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। ১৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd October, 1929. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

হে অনন্ত-রূপা অদ্ভুত-কর্ম্মকৌশলা পরমা জননি! শরৎকালে ভারতের, বিশেষ ভাবে বঙ্গের অগণ্য নক্ষত্র-খচিত মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের, বিমল জ্যোতিঃ ভরা উর্দ্ধে হাস্যময় আকাশ, নিম্নে শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা হাস্যময়ী বিচিত্রবর্ণা বসুন্ধরা তোমার অসীম কারু-কার্য্য, জ্ঞান-কৌশল, তোমার স্নেহ করুণা, তোমার হৃদয় মনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য কত ভাবেই প্রকাশ করে, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্যদান কত ভাবেই প্রদান করে। তাই তো ভারতের, বিশেষ ভাবে বঙ্গের, তোমার ভাবুক ভক্ত সন্তান সকল, ফল-ফুল-শস্যপূর্ণ মাঠ ঘাট দর্শন করিয়া, নদীর বক্ষঃ-ভরা জলরাশি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উজ্জ্বল সাক্ষী নানা-শস্যপূর্ণ সুবৃহৎ তরণী-শ্রেণী দর্শন করিয়া, জীবের দুর্গতি-নাশিনী শ্রীদুর্গা-রূপে, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতির স্বরূপে বিভূষিতা জগজ্জননী-রূপে, ভক্তি অনুরাগে তোমার পূজা করিয়া আপনাদের হৃদয়ের ভাব-রাশির চরিতার্থতা সাধন করেন, মনের সাধ পূর্ণ করেন। এই সসীম বাহ্য প্রকৃতিতে, মা, অসীম তোমারই শোভা সৌন্দর্য্য। কিন্তু অসীম অন্তর্জ্জগতে অসীম তোমার যে বিচিত্র প্রকাশ, অনুপম শোভা সৌন্দর্য্য, তাঁহার তুলনা কোথায়? অসীম অন্তর্জ্জগতে অসীমের বিচিত্র প্রকাশ, অসীমের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, মহিমা, গৌরব ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই, শরৎকালের আগমনের পুরোভাগে নববিধানের ক্ষেত্রে তোমারই প্রতিষ্ঠিত ভাদ্রোৎসব। ভাদ্রোৎসব বিশেষ ভাবে তোমার সত্য পূজা ভারতে, বঙ্গে, পৃথিবীতে আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসব। ভাদ্রোৎসব স্বদেশের, বিদেশের, অতীতের, বর্ত্তমানের সকল বিচিত্র প্রণালীর পূজাকে সামঞ্জস্যের ভূমিতে এক মহাপ্রণালীতে পরিণত করিয়া, অনন্ত আয়োজনে অনন্তের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসব। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও মণ্ডলীগত জীবনে ত্রুটী, অপরাধ ও অপ্রস্তুতির তো সীমা নাই। এ সকল সত্ত্বেও এবারকার ভাদ্রোৎসবে তুমি তোমার নবযুগের পূজা-প্রতিষ্ঠার মহিমা গৌরব মৌলিক ভাবে প্রকাশ ও প্রচার করিলে; পৃথিবীর নানা প্রদেশের, বিশেষ ভাবে ভারতের বক্ষে, এখনও ধর্ম্মের কত ধন রত্নের খনি আমাদেরই গ্রহণের জন্য, আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সঞ্চয়ের জন্য, তুমি কিরূপ যত্নে রক্ষা করিয়াছ, করিতেছ, তাহা প্রদর্শন

করিয়া, কত ভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে অবাক্ করিলে; এসকল স্মরণ করিয়া, অবলুণ্ঠিত হইয়া তোমার চরণে বারবার কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে প্রণাম করিতেছি। আমাদিগকে তোমার মহাপূজা ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্যই এ যুগে তোমার প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজনদিগের আগমন, বিশেষ ভাবে তোমার নবভক্ত ও ভক্ত-দলের আগমন। এখনও কত ভাবে কত দেব-দূত তোমা দ্বারা প্রেরিত হইয়', নানা পরিত্রাণের সুসংবাদ সহ আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছেন ও তাহা মধুর ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। মা, আশীর্ব্বাদ কর, এই সকল ব্যাপারের মধ্যে তোমার অযাচিত কৃপা দর্শন করিয়া, স্বীকার করিয়া, তোমার চরণে ভাল করিয়া আত্ম-সমর্পণ করি ও তোমার প্রেরণাধীন হইয়া তোমার লীলা-স্রোতে ভাসিয়া যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতে পূজার উচ্চপরিণতি মাতৃ-পূজাতে।

কথা আছে, ভয়ে ধর্ম্মের আরম্ভ, ভক্তি প্রেমেতে ধর্ম্মের পরিণতি। ভারতে ধর্ম্মের বাল্য ইতিহাস দেখাইয়া দেয়, ভয় হইতেই পূজার আরম্ভ। মানুষের যখন আত্মিক দৃষ্টির সামান্য বিকাশও হয় নাই, তখন বাহ্য দৃষ্টিই প্রবর্ত্তক হইয়া মানুষকে দেব-পূজায় প্রবর্ত্তনা দান করিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে যেখানে অমানুষিক শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ লক্ষিত হইয়াছে, সেখানেই মানুষ ভয়েতে প্রণত হইয়াছে। বাহ্য বস্তুতে অমানুষিক শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া, সেই বাহ্য বস্তুকেই দেবতা-জ্ঞানে মানুষ পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইতে শক্তি সহায়তা ভিক্ষা করিয়াছে, সেই দেবতার প্রসন্নতা লাভ জন্য নানা আকারে নৈবেদ্য দান করিয়াছে। এই ভাবে সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার পূজা গৃহ-পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে দেবতা হইতে ভয়, সে দেবতা হইতে অভয় লাভ না করিলে প্রাণ শান্ত, সুস্থ হয় না। তাই জীবন-সঙ্কটে সে দেবতা হইতে অভয়-লাভ এবং তাঁহার প্রসন্নতা, সহায়তা-লাভ জন্য, সেই দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য-সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্য সভ্যতার প্রথম স্তরে প্রতিগৃহে যজ্ঞ-কুণ্ড নির্ম্মাণ করা হইত। যজ্ঞ-কুণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। একভাগ সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের তৃপ্তি ও তাঁহাদের প্রসন্নতা-লাভের জন্য, অন্য ভাগ স্বর্গগত পিতৃলোকের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ-লাভের জন্য। সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণের ন্যায় অগ্নিও এক দেবতা। অগ্নি যেমন অন্য দেবতার ন্যায় একটী দেবতা, তেমনই তিনি অন্য দেবতাদের নিকট অর্ঘ্য-দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিবার পরম সহায় এবং যন্ত্রস্বরূপ। স্বর্গস্থ পিতৃলোকের নিকট অর্ঘ্য-দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিবার সহায়ও অগ্নি। তাই গৃহস্থের গৃহে যজ্ঞকুণ্ডে দুই ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত। স্বয়ং অগ্নিকে যে দ্রব্য দেওয়া হইত, অগ্নি তাহা নিজে গ্রহণ করিতেন, এবং অন্যান্য দেবগণের উদ্দেশ্যে যাহা প্রদান করা হইত, তাহা অগ্নি গ্রহণ করিয়া, তাহা আত্মস্থ করিয়া অথবা ভস্ম করিয়া, তাহার সার ভাগ ঊর্দ্ধলোকে দেবগণের নিকট ধূমরাশি যোগে পৌঁছাইয়া দিতেন। পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে সকল দ্রব্য, ঘৃত, যব, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রদান করা হইত, তাহাও যজ্ঞকুণ্ডের অপর ভাগের অগ্নিতে অর্পিত হইত; বিশ্বাস ছিল, অগ্নি তাহা পিতৃলোকে পৌঁছাইয়া দিবেন। তখন মানব-সমাজের শৈশবাবস্থা। বর্ত্তমান সময়ে মানব-সমাজের এত উন্নত ও পরিণত অবস্থাতেও, যখন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবনে এত ভয়, বিভীষিকা, বিপদ, পরীক্ষার কারণ বিদ্যমান, তখন মানব-সমাজের সেই শৈশবাবস্থাতে, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রজীবনে, ভয়, বিভীষিকা, বিপদ, পরীক্ষার কারণ যে সমধিক ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তাই তখন পরিবারে পরিবারে দেবতাদিগের সহায়তা ও প্রসন্নতা, পরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ-লাভের জন্য, প্রতিদিন অগ্নিযোগে দেবযজ্ঞ ও পিতৃ-যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল। যজ্ঞের সেই আদিযুগে গৃহীর গৃহে নিত্য পূজা জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, গৃহী ব্যক্তি সস্ত্রীক দৈনিক যজ্ঞের ক্রিয়া সমাপন করিতেন। বিশেষ উপলক্ষে পুরোহিত প্রয়োজন হইত। এখনও অন্য আকারে সেই বিধি, সেই প্রয়োজন। ক্রমে আর্য্যজাতি সমাজের শৈশব কাল ছাড়িয়া যখন ধ্যান, চিন্তনের যৌবনে প্রবেশ করিলেন, তত্ত্ব-নির্ণয়ে

যখন মনোনিবেশ করিলেন, তখন আকাশে চড়াৎ করিয়া হঠাৎ যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তেমনি তাঁহাদের প্রাণাকাশে, চিদাকাশে, হৃদয়াকাশে ক্রমে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে, বিচিত্র তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিল। তাঁহারা দেখিলেন, আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যেন একই বিশেষ লক্ষ্য সাধনের জন্য কোন এক বিশেষ মহতী শক্তির অধীনে আপনাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইতেছে, সমস্ত জগৎ যন্ত্র এক বিরাট যন্ত্রীর হাতে পরিচালিত হইতেছে। সে যন্ত্রী কে? গবেষণা আরম্ভ হইল, ধ্যান, চিন্তন, ব্যাকুল স্মরণ, মনন আরম্ভ হইল। তত্ত্ব সকল ক্রমে চিদাকাশে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। একজন ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।" হে অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি সেই মহান্ পরম পুরুষকে জানিয়াছি। ক্রমে সকলে আরও গভীরে প্রবেশ করিলেন, আবার হৃদয়াকাশ হইতে ধ্বনি হইল, "ন তত্রসূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল, আধ্যাত্মিক লোকে সূর্য্যও জ্যোতি দান করে না, চন্দ্র তারকাও জ্যোতি দান করে না, বিদ্যুৎও জ্যোতি দান করে না, অগ্নিও জ্যোতি দান করে না, সেই জ্যোতির জ্যোতি, আদি জ্যোতি, পরম জ্যোতির জ্যোতিতে সকলই জ্যোতিষ্মান্, তাঁহারই প্রকাশে সকল প্রকাশিত। ক্রমে ঋষি-আত্মাগণ যতই অনন্তের টানে, অনন্তের পানে ছুটিতে লাগিলেন, ততই গভীর হইতে গভীরে ডুবিয়া, তাঁহারা কত সত্যরত্ন, তত্ত্বরত্ন উদ্ধার করিলেন। অনন্তের আবির্ভাব প্রথমে তাঁহাদের নিকট অনেকটা নির্গুণ, ব্যক্তিত্ববিহীন ছিল, যেন সত্তামাত্র ছিল; ক্রমে যিনি অনন্ত, তিনি নানা গুণের আধার, বাহিরে অরূপ হইয়াও নানা রূপের আধার ব্যক্তি রূপে ধরা দিতে লাগিলেন। যিনি অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, তিনি অনন্ত প্রেম। আপনার অনন্ত প্রেমের তৃপ্তির জন্যই মানবাত্মাকে আপনার ছাঁচে, আপনার স্বরূপে, পরিমাণে অতি সামান্য হইলেও, শক্তিখণ্ড, জ্ঞানখণ্ড, প্রেমখণ্ড রূপে সৃজন করিলেন এবং ক্ষুদ্র মানব-প্রাণে অনন্তের পিপাসা নিহিত করিয়া দিলেন। আমরা তাঁহা কর্ত্তৃক এমনই ভাবে গঠিত হইয়াছি, রচিত হইয়াছি যে, পৃথিবীর সম্পর্ক যতই শ্রেষ্ঠ, যতই মধুর হউক না কেন, তাহা আমাদের প্রাণে পূর্ণ তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না। আমরা পার্থিব নানাপ্রকার সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ হইতে যতই কেন পাই না, তাহাতে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না; আপনার জনগণের নিকট হইতেও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কোন উপদেশে বলিয়াছেন, "দীক্ষার্থিগণ! ব্রহ্ম-পূজা কর, তোমাদের অন্তরে ঈশ্বর যে ভক্তি-সামগ্রী নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর পিতামাতা, গুরুজন, প্রিয়জন, যাঁহাকে যত দেওনা কেন, দিয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাইবে না। ভক্তির পূর্ণ তৃপ্তি অনন্তের পূজায়, অনন্তকে ভক্তি অর্পণে পূর্ণতৃপ্তি।" সর্ব্বসাধারণ মানব-প্রাণেই দেবপূজার সামগ্রীগুলি, দেবপূজার বিবিধ আয়োজন, পরম দেবতা স্বয়ং আপনার রুচি, আপনার ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু মানব-প্রাণের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সামগ্রীর উন্মেষ, বিকাশ যত্ন-সাপেক্ষ। তাই তো শিক্ষা দীক্ষা, যুগে যুগে সাধু মহাজনদিগের আগমন, বিধানের পর ধর্ম্মবিধানের অগমন। ধর্ম্মার্থীর জীবনে তাই তো সাধুসঙ্গ ও সদ্গ্রন্থ-পাঠের প্রয়োজন; সাধন-পথে প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

পৃথিবীতে আসিয়া আমরা সেই পরম পিতা মাতা ঈশ্বরের নিগূঢ় বিধানে পার্থিব পিতা পাই, মাতা পাই, কত ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন পাই; তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসায় যতদূর গড়িয়া উঠিবার, গড়িয়া উঠি। কিন্তু সে গড়িয়া উঠায় আমাদের গড়িয়া উঠাতো যথেষ্ট হয় না। ধন্য সেই পৃথিবীর পিতা মাতা, যাঁহারা সন্তানের উচ্চ নিয়তি স্মরণ করিয়া, উচ্চ নিয়তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সন্তানকে যথাকালে সেই পরম পিতা মাতা, সখা সুহৃদ যিনি, তাঁহাকে চিনাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, ব্যবস্থা করেন; যথা সময়ে তাঁহার চরণে সন্তানদিগকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই শুভ পালনা-শক্তির উপর সন্তানের সকল ভার অর্পণ করিয়া, আপনারা অবসর গ্রহণ করেন। সম্পর্কের নৈকট্য, আত্মীয়তা ও মধুরতা হিসাবে পৃথিবীতে মায়ের মত আপনার আর কে আছে? ধর্ম্মরাজ্যেও মায়ের মত এমন আপনার, এমন পরম আত্মীয়, অন্তরঙ্গ আর কেহ নাই। পিতা মাতা উভয়ই অতি শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। কিন্তু মায়ের কাছে যেমন আপনার সকল প্রয়োজনে, সকল কথা

লইয়া সহজে যাওয়া যায়, প্রাণ খুলিয়া আব্দার করা যায়, পিতার নিকটে তেমন করা যায় না। আবার মাও সন্তানের জন্য কি কষ্ট, কি ত্যাগই না সহ্য করেন, স্বীকার করেন! প্রেমের পরাকাষ্ঠা মাতৃরূপে। অনন্ত প্রেমের আধার যিনি, তিনিই তাই আপনার প্রেমের দায়ে, অপর দিকে মানবপ্রাণের উচ্চ তৃপ্তির জন্য মাতৃরূপে প্রকাশিত। তাই ভারতে মাতৃপূজায় এত আনন্দ, মাতৃপূজাই মহাপূজা, মাতৃপূজায় জাতীয় মহামহোৎসব। আদ্যাশক্তি অনন্ত স্নেহ-রূপিণী যিনি, তিনি ভারতে সকল দুর্গতি-হারিণী শ্রীদুর্গা। অনন্তরূপা জননী শক্তি-দায়িনী, জ্ঞান-বিদ্যা-দায়িনী, অসুর ও শত্রুকুলসংহারিণী, ধন-ধান্য-লক্ষ্মীশ্রী-প্রদায়িনী, অভয়দায়িনী, বিজয়রূপিণী। তাই, বঙ্গে ভারতে সর্ব্বসাধারণের স্থূল দর্শন ও বাহ্য পূজার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। অসুর-নাশিনী, অভয়-দায়িনী, দুর্গতি-নাশিনী শ্রীদুর্গার পার্শ্বে বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, ধন-ধান্য-দায়িনী শ্রীলক্ষ্মী, বিজয় ও কল্যাণের মূর্ত্তি কার্ত্তিকেয় এবং গণপতি। কিন্তু বঙ্গে ভারতে বাহিরের পূজা বাহিরের আড়ম্বরে পরিণত হইল, মানব জীবনের যথার্থ দুর্গতি দূর করিতে পারিল না। দুর্ব্বল বাঙ্গালী ক্রমে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, শক্তি, জ্ঞান, বল, বিজয়ের অধিকারী হইল না। ভক্ত কবি গাহিলেন, "শক্তি-পূজা কথার কথা না।" বঙ্গ, ভারত এবং পৃথিবীর নানা দুর্গতি দূর করিবার জন্য, নবযুগে নববিধানে সত্য চিন্ময়ী, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, পুণ্যের আধার পরমা জননী, দুর্গতি-নাশিনী নবদুর্গা, শ্রীদুর্গা রূপে অবতীর্ণ। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ এই মাকে দর্শন করিয়া, এই মায়ের পূজা করিয়া, এই মায়ের অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া, মাতৃপ্রেমে মত্ত হইয়া মাতৃগুণ কত করিয়া কীর্ত্তন করিলেন, নিজ জীবনে, গৃহে, পরিবারে, মণ্ডলীতে মাতৃপূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বাক্য ও আচরণে প্রকাশ করিলেন। যদি পূজা করিতে হয়, তবে মাতৃ-পূজার তুল্য পূজা নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তাপস আহমদ এন্তাকীর উক্তি।

সেই দীনতাই অধিকতর উপকারিণী, যাহাতে তুমি গম্ভীর-প্রকৃতি ও প্রসন্ন থাক।

যে জ্ঞান তোমাকে নিজের সম্বন্ধে ঐশ্বরিক সম্পদ্ প্রদর্শন করে ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাদানে সহায়তা করিয়া থাকে, এবং কামনার বিরুদ্ধে সমুত্থাপিত করে, সেই জ্ঞানই অধিকতর উপকারী।

যে অনুরাগ তোমা হইতে কপটতা, কৃত্রিম ভাব ও আড়ম্বর দূর করে, সেই অনুরাগই অধিকতর উপকারী।

যে বিনয় তোমা হইতে উচ্চ ভাব দূর করে, এবং তোমার অন্তরে ক্রোধকে বিনাশ করিয়া থাকে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিনয়।

অজ্ঞানান্ধতায় সাধনা করাতে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পাপ করা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র পাপকে সহজ মনে করে, এবং ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, অচিরে সে গুরুতর বিপদে পতিত হয়।

বিশেষ ব্যক্তি অধ্যাত্মচিন্তার সাগরে নিমগ্ন হন, সাধারণ লোক আলস্য ও ঔদাস্যের প্রান্তরে বিভ্রান্ত ও ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে।

সমুদায় ক্রিয়ার অগ্রবর্ত্তী জ্ঞান এবং জ্ঞানের অগ্রবর্ত্তী ঐশ্বরিক কৃপা।

বিশ্বাস এক জ্যোতি, যাহা ঈশ্বর ধর্ম্মসাধকের অন্তরে সঞ্চারিত করেন। সেই জ্যোতিতে সাধক সমুদায় পারলৌকিক ব্যাপার দর্শন করেন, তাঁহার ও পরলোকের মধ্যে যে সকল আবরণ থাকে, সেই জ্যোতির তেজে তিনি তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তখন সেই জ্যোতির সাহায্যে পারলৌকিক সমুদায় ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শনবৎ তিনি অবলোকন করেন।

যখন তুমি সদনুষ্ঠান কর, লোকে সেই সদনুষ্ঠানের জন্য যেন তোমাকে স্মরণ করে এবং সেই সৎকার্য্যের জন্য যেন তোমাকে গৌরবান্বিত করে, তুমি এই ভাব কখনও আদর করিয়া মনে স্থান দান করিবে না। অপিচ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে সৎকার্য্যের পুরস্কার প্রত্যাশা করিবেনা, ইহাই সাত্ত্বিকতা এবং ইহাই আনুষ্ঠানিক সাত্ত্বিক ভাব।

তুমি সদনুষ্ঠান কর, কিন্তু এরূপ মনে করিও যে, ভূতলে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ নাই, এবং স্বর্গলোকে তিনি ব্যতীত কেহ নাই।

প্রশ্ন।—তুমি কি ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল?

উত্তর।—না, যেহেতু অনুপস্থিতের প্রতি ব্যাকুলতা হয়, কিন্তু অনুপস্থিত যখন উপস্থিত হন, তখন ব্যাকুলতা কোথায় থাকে? ঈশ্বর যে উপস্থিত।

প্রেমের লক্ষণ কি?

সাধনার আড়ম্বর অল্প, নিরন্তর অধ্যাত্মচিন্তা, নির্জ্জনতা অধিক, সর্ব্বদা মৌনভাব। লোকদিগকে প্রেমিক দর্শন দান করেন না, ডাকিলে তিনি শ্রবণ করেন না, কোন দুঃখ বিপদ্ উপস্থিত হইলে বিষণ্ন হন না, কোন সম্পদ্ উপস্থিত হইলে তাঁহার আহ্লাদ হয় না। তিনি কাহাকে ভয় করেন না, কাহারও নিকটে কোন আশা রাখেন না।

ভয় ও ভরসা কাহাকে বলে, উভয়ের লক্ষণ কি?

ভয়ের লক্ষণ পলায়ন, ভরসার লক্ষণ অন্বেষণ। যে ব্যক্তি ভয়শীল বলিয়া পরিচয় দেয় ও পাপ হইতে পলায়ন করে না, সে

মিথ্যাবাদী; এবং যে ব্যক্তি ভয়সাযুক্ত বলিয়া পরিচয় দান করে, কিন্তু তাহার প্রার্থনা ও অন্বেষণ নাই, সেও মিথ্যাচারী।

(তাপসমালা)

দুঃখে সান্ত্বনা।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

(গীতা—২য় অঃ, ১৩ শ্লোঃ)

কৌমার, যৌবন, জরা এ সকল (অবস্থা) যেমন দেহীর, দেহীর দেহান্তর-প্রাপ্তিও তেমনি; সুতরাং ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহ-প্রাপ্ত হয়েন না।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

(গীতা—২য় অঃ, ২২ শ্লোঃ)

মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নবীন দেহ প্রাপ্ত হয়।

"দেহীর দেহের যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই তিন অবস্থা, মৃত্যুর পর দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয়ও সেইরূপ অবস্থা বিশেষ মাত্র। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেহের নাশ বা উৎপত্তিতে কখন মোহপ্রাপ্ত হয়েন না।" শ্রীমদ্ভগবদগীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন্ শোকার্ত্ত জনের মনে আশার সঞ্চার না হয়? এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে হইলে, অনিত্য কি এবং নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় কি, তাহা যে কেবল পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে তাহা নহে; কিন্তু নিত্য যাহা, তাহার সহিত জীবনের গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। নিত্যের মধ্যে জীবন বর্দ্ধিত হইবে। ভাব চিন্তা নিত্য আকার ধারণ করিবে। সচরাচর মানুষের মন নিত্য বস্তুর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া, অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী যাহা, আশু সুখপ্রদ যাহা, সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। সংসারের অনিত্যতার ধারণা যাহাতে আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়, এজন্য বিধাতা দুঃখ ও মৃত্যুর বিচ্ছেদ প্রেরণ করেন। বিশ্বাসী ব্যক্তি দুঃখকে ঈশ্বরপ্রেরিত জানিয়া অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করেন। যাঁহারা দুঃখকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে জানেন, তাঁহাদের জীবনে ইহা সুফল প্রসব করে। আমরা শুনিয়াছি, আফ্রিকায় নীল নদীর জল মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া তীর দেশ সকলকে জল-প্লাবিত করে। ইহাতে ঐ সকল স্থান উর্ব্বরা হইয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। কিন্তু যে সকল স্থান প্রস্তরাচ্ছন্ন, তাহা কখন উর্ব্বরা হইয়া ফল প্রসব করে না। তাহা প্রস্তরই থাকিয়া যায়। যে হৃদয় ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রেমে কোমল নয়, তাহা দুঃখের প্রবাহে কখন পরিবর্ত্তিত হয় না। আরও কঠিন নীরস আকার ধারণ করে। সময়ে সময়ে ঝটিকা উঠিয়া অগ্নিদাহ উৎপাদন করে; কিন্তু ঝটিকার সহিত যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চালিত না হয়, তাহা হইলে কখন অগ্নিদাহ হইতে পারে না। তেমনি অন্তরে যদি ঈশ্বর-প্রেমের স্ফুলিঙ্গ না থাকে, তাহা হইলে দুঃখ-ঝটিকায় প্রেমস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হইয়া, জীবনে কখন উচ্চ ধর্ম্ম-জীবনরূপ প্রবল অগ্নিদাহ আনিতে পারে না। সত্যই যদি অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি পবিত্র আকর্ষণ না থাকে, তাহা হইলে মানুষ দুঃখে পড়িয়া আরও নিরাশ ও ঈশ্বর-বিরোধী হইয়া উঠে। মনের মধ্যে প্রকৃত বিনয় স্থান পায় না। আপন ইচ্ছা মত সকল হইল না বলিয়া, সে মানুষ প্রর্থনার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর-নিন্দাই করে। অনেকে দেখিয়াছেন, কোন আচ্ছাদিত স্থানে পুষ্পিত বৃক্ষ থাকিলে, যে দিক দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসে, পুষ্প সেই দিকেই হেলিয়া পড়ে। সেইরূপ যে হৃদয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রেম আছে, তাহা দুঃখের রজনীতে ঈশ্বরের দিকেই হেলিয়া পড়ে। সে অন্ধকার হৃদয়ে তখন কাতর প্রার্থনা জাগিয়া উঠে। প্রকৃত কথা, পবিত্রাত্মা অন্তরে থাকিয়া জীবের প্রকৃত অভাব কি, তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনিই উচ্চ আকাঙ্ক্ষী হইয়া কাতর প্রার্থনায় তাহা ব্যক্ত করেন, এবং তিনিই বিশ্বাস ও প্রেমপূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন বর্দ্ধিত করিয়া এবং আপনার সত্যরূপ প্রকাশ করিয়া সে প্রার্থনার পূর্ণতা বিধান করেন।

সাধক এ অবস্থায় গীতার আর একটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অবধারণ করেন:—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

(গীতা—২য় অঃ, ১৬ শ্লোঃ)

যাহা অসৎ, তাহা থাকে না; যাহা সৎ, তাহার কখনও অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎ, এ দুয়ের চরম দেখিয়াছেন।

মনুষ্য-দেহ ক্ষণস্থায়ী অসৎ, এবং মনুষ্য-আত্মা চিরস্থায়ী সৎ। এইরূপে দুঃখ ও মৃত্যুর বিচ্ছেদ আসিয়া বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-প্রেমিকের অন্তরকে সত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ আরও গাঢ়তর করে।

দুঃখ বিচ্ছেদের সময় যীশু খ্রীষ্টের এই অমর বাণী, যাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া শত শত হৃদয়ে শান্তিদান করিয়াছে, তাহা যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখি:—

"Let not your heart be troubled: Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a

place for you. I come again, and will receive you unto myself; that where I am, *there* ye may be also. * * * I will not leave you comfortless: I come unto you. Yet a little while, and the world beholdeth me no more; but ye behold me: because I live, ye shall live also. * * * Peace I leave with you; my peace I live unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be fearful. Ye heard how I said to you, I go away, and I come unto you. If ye loved me, ye would have rejoiced, because I go unto the Father: for the Father is greater than I"—St. John, Ch. 14.

যীশু পরলোক-গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন :—

"তোমাদের হৃদয় যেন কাতর না হয়; তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাকেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার আলয়ে অনেক গৃহ আছে; যদি তাহা না থাকিত, আমি তোমাদিগকে সে বিষয়ে বলিতাম; কারণ আমি তোমাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। এবং আমি যদি সেখানে যাই এবং তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তাহা হইলে আমি ফিরিয়া আসিব এবং তোমাদিগকে আমার নিকট লইব, যাহাতে আমি যেখানে থাকিব, তোমরাও সেখানে থাকিবে। * * * আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনাশূন্য করিয়া রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকট আসিব। আর অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে, ইহার পর পৃথিবী আমাকে আর দেখিতে পাইবে না; কিন্তু তোমরা আমাকে দেখিবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকিবে। * * * আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমার শান্তি তোমাদের দিতেছি; পৃথিবী যেমন দেয়, তেমন আমি তোমাদিগকে দিতেছি না। তোমাদের হৃদয় যেন কাতর না হয়, এবং ইহা যেন ভীত না হয়। তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদিগকে বলেছি, আমি চলে যাচ্ছি, এবং আমি তোমাদের নিকট আসিব। যদি তোমরা আমাকে ভালবেসে থাক, তাহা হইলে তোমরা আনন্দ করিবে, কারণ আমি পিতার নিকট যাচ্ছি; কারণ পিতা আমা অপেক্ষাও মহৎ।"—(সেন্ট জন, ১৪ অধ্যায়)

যীশুর শান্তি কোথা হইতে আসিল? পিতার ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছার মিলনেই তাঁহার শান্তি। এই অক্ষয় সম্পত্তি তিনি জগদ্বাসীকে দিয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ, ২৭।৮।২৯ শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু।

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রামমোহনের অব্যবহিত পূর্ব্ব যুগ অরাজকতার যুগ। একদিকে গৃহযুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের বৃহৎ অট্টালিকার এক এক খণ্ড ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার অল্পে অল্পে রাজ্যাধিকারে পরিণত হইতেছিল। দেশ এই অনিশ্চিত অবস্থার ভিতর পড়িয়া, মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত শাসনের কল্যাণপ্রদ সংরক্ষণ হইতে, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতেছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই সময়ে রাজ্য-শাসন ও প্রজা-পালন-বিষয়ক সকল ভার গ্রহণ করিবার মত শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। পাপ, ব্যভিচার, চৌর্য্য, পরস্বাপহরণ, গৃহবিবাদ, লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি নানা বীভৎস ব্যাপারে লোকের মন কলঙ্কিত হইয়া উঠিল। বহুবিবাহ, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা ভাসাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশাচারের নিষ্ঠুর প্রপীড়নে লোকের অস্থিমজ্জা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। দেশের এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় বঙ্গদেশ অরাজকতার লীলা-ভূমি হইয়া উঠিল। দেশ-ভ্রমণ ও তীর্থ-ভ্রমণ এবং সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র-শিক্ষার জন্য, এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের যে জ্ঞান, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও রীতি নীতির আদান প্রদান চলিতেছিল, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন ও নরহত্যার ভয়ে দেশের বাহিরে আর কেহ যাইতে সাহস না করাতে, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। ধন-ধান্য-রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, নারীজাতির সম্মান রক্ষা ও প্রাণ-রক্ষা মহাবিপজ্জনক হইয়া উঠিল। এই মহা সঙ্কট হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হইল। রামমোহন জাতির জীবন মরণের মহা প্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। দেশের ব্যাকুল প্রার্থনা রামমোহনের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বীরের ন্যায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। একদিকে দেশের ধর্ম্ম সংস্কার করা তাঁহার পক্ষে যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল, অন্য দিকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিষয়ক অযথা আইন কানুনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করাও তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর নামক একটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত একটী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্রাট্ আরঙ্গজীবের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ

রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট হইতে "রায় রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। "রায় রায়" উপাধি সংক্ষিপ্ত হইয়া "রায়" উপাধিতে পরিণত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ব্রজবিনোদ, ব্রজবিনোদের পুত্র রামকান্ত, রামকান্তের, পুত্র রামমোহন। অতি শৈশবেই রামমোহনের ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়। উইলিয়ম এডামের লেখা হইতে জানা যায় যে, তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন; কিন্তু তাঁহার জননীর ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি সেই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। পিতার সহিত তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে, পঞ্চদশবর্ষ বয়সে পরিব্রাজক হইয়া তিব্বতে গমন করেন এবং সেখানে নরপূজার (লামা) বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। পাঠশালার বাঙ্গালা লেখাপড়া শেষ করিয়া, দেশে থাকিয়াই পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপর পাটনায় আরবি ভাষা শিক্ষা করিয়া কোরাণ পাঠ করেন, এবং কাশীধামে গিয়া সংস্কৃতে সুপাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি অল্প বয়সেই সকল ধর্ম্মের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পারস্য ভাষায় একটী পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "তুহ্ফতুল মহাদ্দীন" রাখা হয়। "তুহ্ফতুল মহাদ্দীনের" অর্থ একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার। ঐ পুস্তকে তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত, মুসলমান মৌলবী ও খৃষ্টান পাদরীদের সকল প্রকার অযথা ও অসঙ্গত ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রথার আলোচনা করিয়া সত্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যেন তিনি সকল প্রকার মিথ্যা ও কুসংস্কার হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি রংপুরের কালেক্টার ডিগবী সাহেবের অধীনে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, সেই সময়ে রংপুর, দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া তিনটী জিলার ভার ডিগবী সাহেবের উপর পতিত হয়। রামমোহন ডিগবীর দেওয়ান, বস্তুতঃ রামমোহনের উপরই তিনটী জিলার গুরুতর ভার আসিয়া পড়িল। জমীর মাপ, কর নির্দ্ধারণ, স্বত্বাধিকার ঠিক করা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়-কার্য্যে এমন জড়িত হইয়া পড়িলেন যে, ইহার মধ্যে একটী মুহূর্ত্তও অন্য কার্য্যে ব্যয় করা এক প্রকার অসম্ভব; কিন্তু ডিগবী সাহেব বলেন যে, রামমোহন এই গুরুতর কার্য্যভার স্কন্ধে লইয়া, ঘোরতর ব্যস্ততার মধ্যেও, 'কেন' উপনিষদের ও বেদান্তের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিষয়-কর্ম্ম তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, শাস্ত্র-সংকলন ও গ্রন্থ-প্রণয়নের পথে বাধা উৎপাদন করিতে পারে নাই।

আর একটী বিশেষ কথা এখানে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, তাঁহার এই রংপুরে অবস্থান কালে কর্ম্ম হইতে একটু সময় কাটিয়া লইয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। কয়েকটি মারোয়াড়ী এই সভায় যোগদান করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কল্পসূত্র প্রভৃতি কতকগুলি জৈন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। একদিকে যেমন প্রাচীন শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে ব্যস্ত থাকিতেন, বন্ধুবান্ধবদের প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন, অন্যদিকে নূতন জ্ঞানলাভের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। রামমোহন নির্ব্বিবাদে এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। রংপুরের তাৎকালিক জজসাহেবের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য, তাঁহার বহু পৃষ্ঠপোষক লোক লইয়া, রামমোহনের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে প্রতিপদে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রামমোহন যে সময়ে সংস্কার-কার্য্যে হস্তার্পণ করেন, সে সময়ের দেশের অবস্থা, তাঁহার জীবন-চরিত-রচয়িত্রী মিস্ কলেটের গ্রন্থ হইতে, পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"How formidable that work was, can with difficulty be realised at the present day. Thick clouds of ignorance and superstition hung over all the land; the native Bengali public had few books, and no newspapers. Idolatry was universal and was often of a most revolting character; polygamy and infanticide were widely prevelant and the lot of Bengali women was too often a tissue of ceaseless oppressions and miseries, while as the crowning horror, the flames of the suttee (Satee) were lighted with almost incredible frequency even in the immediate vicinity of Calcutta. The official returns of the years immediately following thither, give the number of suttees (Satees) in the suburbs of Calcutta alone as 25 in 1815, 40 in 1816, 39 in 1817 and 43 in 1818. The ages of these victims ranging from 80, 90, and 100, down to 18, 16, and even 15. All these inhumanities deeply afflicted the heart of Rammohan Ray. An ardent lover of his country he longed to deliver her from degradations, and to set her feet on safe paths, and to that end he devoted his whole energies from this time forth. He did not however confine his activity to one or two subjects. His alert and eager mind ranged with keen interest over the whole field of contemporary life, and in

almost every branch thereof he left the impress of his individuality. Alike in religion, in politics, in literature and in philanthopy his labours will be found among the earliest and most effective in the history of native Indian reform."

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে "তাঁহার কার্য্য কিরূপ শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন, কয়েকখানি মাত্র পাঠোপযোগী বাঙ্গলা পুস্তক পাওয়া যাইত, একখানিও খবরের কাগজ প্রচলিত ছিল না। প্রতিমা-পূজাই দেশের সাধারণ ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জন-সাধারণ অতিশয় বীভৎস কাণ্ড করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। বহুবিবাহ ও শিশুহত্যা অবাধে অনুষ্ঠিত হইত এবং নারী জাতিকে অবিশ্রান্ত অত্যাচার ও নির্ম্মম ব্যবহার সহ্য করিতে হইত। এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর কাণ্ড এই যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সতীদাহের চিতানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিত। কলিকাতার আশে পাশে যে সকল সতীদাহ হইয়াছিল, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাঁহা জানা যায়, যথা:—১৮১৫ খৃঃ ২৫ জন, ১৮১৬ খৃঃ ৪০ জন, ১৮১৭ খৃঃ ৩৯ জন, ১৮১৮ খৃঃ ৪৩ জন; তাঁহাদের বয়স, ১০০, ৯০, ৮০, হইতে ১৮, ১৬ ও ১৫ বৎসর। এই সকল অমানুষিক ও নৃশংস অত্যাচার দেখিয়া রামমোহনের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। প্রবল স্বদেশ-প্রেমের তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, এই সকল নিন্দনীয় পাপ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য, তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময় দান করিয়াছিলেন। দেশের সকল কার্য্যেই তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাৎকালিক সকল কর্ম্মেই তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও জনহিতকর সকল কর্ম্মের ভিতর আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে সময়ের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।"

রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১৬ বৎসর ধরিয়া যে সকল সংস্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দান করিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস।

মরণের পরপারে অমরধামের সন্ধান যখন মানুষ পায়, এ সংসারে থাকিতে থাকিতেই অমরলোকের অমৃতের পূর্ব্বাস্বাদ যখন লাভ করে, তখন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন এই দেহের কথা একেবারে ভুলে যায়, দেহের জ্বালা, যন্ত্রণার কথা আদৌ মনে থাকে না। মানুষের দেহ ছাড়া যে আর একটা জিনিষ আছে, সে যে অক্ষয়, অব্যয়, অমর আত্মার অধিকারী, তা সে বেশ বুঝ্তে পারে; এ সংসার যে পান্থনিবাস, দু'দিনের তরে, তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করে। তখন ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সুমধুর সঙ্গীত ভেসে আস্‌ছে শুনতে পায়, তখন ঐ অমরলোকের বাতাস গীতিগন্ধ-ভরা অনুভব করে, মৃত্যু তখন এক অপূর্ব্ব বিমল আলোকে ভূষিত হ'য়ে তাকে দেখা দেয়। তখন দেহ বিসর্জ্জন করা তার পক্ষে সহজ হ'য়ে পড়ে। সে মুক্তবেশে চিদাকাশে উড়ে যায়। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত সে দিন আমরা বঙ্গের বিজয়ী বীর যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে দেখেছি। মানুষ দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে, দীর্ঘকাল রোগে ভুগে, হয়ত রাজার রাজ্য-রক্ষার্থে যুদ্ধে মরে। নানা রকমে মরে। কিন্তু অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের প্রতিকারকল্পে মৃত্যুকে বরণ করা, স্বইচ্ছায় আত্মবলিদান দেওয়া, দেহ বিসর্জ্জন করা, তার গৌরবের তুলনা নেই। ধীরে ধীরে, পলে পলে, তিলে তিলে, মরণের দ্বারে অগ্রসর হ'তে হ'লে, মনের অমানুষিক বলের দরকার হয়, বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন হয়। যতীন্দ্রনাথ ৬৩ দিন না খেয়ে, মৃত্যুর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে, জগতের কাছে সেইটা ভাল ক'রে দেখিয়ে গেলেন। কি করে অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌তে হয়, নিজের অমূল্য প্রাণ দিয়ে তার আশ্চর্য্য সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন। জগতের ইতিহাসে এইটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। প্রথম আয়র্লণ্ডের ম্যাক্‌সুইনীর দৃষ্টান্ত। যাহাহউক, যতীন্দ্র নাথের মরণে, যতীন্দ্র নাথের আত্মত্যাগে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, কলিকাতা নগরীতে যে দৃশ্য দেখেছি, তা ভুল্‌বার নয়। ভারতবাসী যে একজন অজ্ঞাত ভারতবাসীর জন্য অকপটে কাঁদ্‌তে শিখেছে, তার অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহত্ত্ব বুঝ্‌তে পেরেছে, তা দেখে সে দিন প্রাণ বিগলিত হয়েছিল। সেদিনকার শোভাযাত্রা দেখে মনে হ'ল, "আহা কি সুখের মরণ, কে বলে মরণ, এ যে নূতন জীবন।" হাওড়া Town Hall হইতে কালীঘাটের কেওড়াতলার শ্মশানঘাট অবধি, এই দীর্ঘপথব্যাপী জনসঙ্ঘ যে দেখেছে, সেই বিস্ময়রসে মগ্ন হ'য়ে গেছে। সকলেই বলেছে, এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখিনি এবং ভবিষ্যতে দেখ্‌বো কি না জানি না।

যতীন্দ্র নাথের রাজনৈতিক মতের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। বিপ্লববাদীদের কার্য্য-কলাপের সহিত আমাদের সহানুভূতি নেই। তা না হলেও, এই ২৫ বছরের যুবকের অদ্ভুত আত্মবলিদানের দৃষ্টান্তে আমরা মুগ্ধ ও মোহিত হয়েছি। জড়ের উপর চৈতন্যের বিজয়-লাভে, রক্ত মাংসের

স্বাভাবিক ধর্ম্ম ক্ষুৎপিপাসার ইচ্ছাকৃত বিসর্জ্জনে, পরম পরিতোষ লাভ করেছি। এই বাঙ্গালী যুবকের আত্মত্যাগে, বীরত্বে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া পড়ে গেছে। আশাকরি, ইহা ভারতে নবযুগ আনয়ন করবে এবং তারও সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সুসময়ে যতীন্দ্রনাথের জীবন স্পষ্ট করে ব'লে গেল, "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।" ধন্য যতীন্দ্রনাথ, তুমি ধন্য! নিশ্চয়ই সেই অমরধাম থেকে তুমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছ এবং তোমার জন্ম ও মৃত্যু সার্থক হ'য়ে তোমার দেশবাসীকে কল্যাণের পথে, শ্রেয়ের পথে, মাতৃসেবার পথে নিয়ে যাচ্ছে দেখে কত সুখী হচ্ছ, কত গৌরব অনুভব কর্‌ছ। শুধু কি তাই? দেবদেবিগণ, এখানকার মত, কত ফুলের মালায় তোমাকে সাজিয়ে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। আমরা কেবল সেই দৃশ্য দেখ্‌ছি, আর চোখের জলে সুখে ভাস্‌ছি ও ভারতবাসী বলে গর্ব্ব অনুভব কর্‌ছি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

ধর্ম্মবিধানের ক্রমবিকাশ ও ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন।

কাল একই, কিন্তু অবস্থার ভিন্নতায় প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যা নামে উপলব্ধ বা অভিহিত হয়। একই সূর্য্য সকালে একভাবে, মধ্যাহ্নে অন্যভাবে, সন্ধ্যায় ভিন্নভাবে দৃষ্ট হয়; এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও তাহার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লক্ষিত হয়।

ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধানও এইরূপ। ঈশ্বর যেমন এক, তাঁর ধর্ম্মও তেমন এক। কিন্তু সূর্য্যের আলোক-প্রকাশের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাহা উপলব্ধ বা গৃহীত ও আচরিত হইয়া আসিতেছে। বিধাতা তাঁহার ধর্ম্মবিধান-প্রবর্ত্তন বা তাঁহার সুসংবাদবহনের জন্য, এক একজন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া, অপর সাধারণ মানবগণের মধ্যে তাহা বিস্তার করেন।

প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ আছে। হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্ম্মবিধান বিভিন্ন মহাপুরুষ বিভিন্ন শাস্ত্র দ্বারা প্রচার করিলেন। য়িহুদীস্থানেও য়িহুদী ধর্ম্মবিধান সেইরূপ বিভিন্ন মহাপুরুষ বিভিন্ন শাস্ত্র দ্বারা প্রচার করেন। এইরূপে শ্রীবুদ্ধ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মবিধান, ঈশা দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্মবিধান, মোহম্মদ দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মবিধান প্রচারিত হইল। এক এক দেশে ও এক এক জাতি মধ্যে এই বিভিন্ন ধর্ম্ম আপন আপন অধিকার বিস্তার করিয়া রাজ্য করিতেছে।

আবার ক্রমশঃ যত এই সকল জাতি পরস্পরের সহিত বিভিন্ন কার্য্য-সূত্রে মিলিত হইতে লাগিলেন, পরস্পরের আচার ব্যবহার, বাক্য-কথন, ব্যবসায় বাণিজ্যের বিনিময় হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-ভাবেরও আদান প্রদান হইল। ইহাতে নূতন নূতন ধর্ম্মশঙ্কর-সম্প্রদায়ও গঠিত হইল। বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং পাঞ্জাবে গুরুনানক-প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সংমিশ্রিত ধর্ম্মভাব হইতেই যে উদ্ভূত, ইহা বিধাতারই বিধান।

ভারতে মুসলমান-রাজ্য-স্থাপনে, যেমন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের আদান প্রদান হেতু, শিখ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল, তেমনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যখন ভারত অধিকার করিলেন, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের মিলন হইল, তখন নূতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইল।

বলা বাহুল্য, এই সমুদয় ধর্ম্মের মূল উপাস্য একই ঈশ্বর, সুতরাং দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে এই সকল ধর্ম্ম বিভিন্ন আকারে আচরিত ও সাধিত হইলেও, ইহাদের মূলে যে একতা আছে, ইহা নিঃসন্দেহ। একই সূর্য্যের প্রকাশ যেমন দেশ-কাল-ভেদে ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি ধর্ম্মের বিকাশ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভিন্নরূপ হইলেও, মূলে একই, ইহাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হিন্দুস্থানে মুসলমান অধিকার অবসান হইলে পর, যখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন, সেই সময় রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়া, এই সকল ধর্ম্মেরই উপাস্য দেবতা যে একই ঈশ্বর, ইহা ঈশ্বরেরই প্রেরণায় সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিলেন এবং অলৌকিক মেধা-বলে বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন। এই একেশ্বরবাদই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-রূপ বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের ভিত্তি।

হুগলীজেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ইং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ্চ তারিখে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, পারস্য ও আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। বাল্যকালেই পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা হেতু তাঁহার পিতার বিরাগ-ভাজন হইলেন এবং তজ্জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হন। ষোড়শ বৎসর বয়সেই তিনি পদব্রজে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিব্বত যাত্রা করেন, এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ফিরিয়া আসিলে পিতা পুত্রে পুনঃ মিলন হইল, কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া, ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করেন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর অধীনে রংপুরে জজের সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের কার্য্য গ্রহণ করেন। এই সময় স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম্ম-মত

প্রচার করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইলেন। পারস্য ভাষায় একেশ্বর-প্রতিপাদক একখানি পুস্তক প্রথম প্রকাশ করেন এবং ক্রমে ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেকগুলি পুস্তিকা প্রচার করেন। তিনি ১৭টী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য-রচনার প্রধান পথ-প্রদর্শক তাঁহাকেই বলা যায়।

ইংরাজী ১৮১৪ সনে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্ম-বিচার-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। একজন ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকেও আপন মতে আনয়ন করেন এবং তাঁহার সহযোগিতায় একটি একেশ্বরবাদী সমাজ গঠন করেন। আপনার বাস-ভবনেও আত্মীয়-সভা নামে একটি ধর্ম্মালোচনা-সভা স্থাপন করেন। ক্রমে তাহা হইতেই কয়েক জন বন্ধুর উৎসাহে একটি ব্রহ্ম-সভাও গঠন করেন। এখানে গোপনে বেদ-পাঠ হইত, কিন্তু তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। সাধারণের জন্য সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত। তাহার পর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্ব্বসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি যাহাতে একত্রে মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের ভজনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করেন। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা। এবং এই প্রতিষ্ঠানের জন্য রামমোহন যে ট্রাষ্টডীড লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে নব-বিধানের বীজ নিহিত।

রাজা রামমোহন এই সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তার, সতীদাহ-নিবারণ ইত্যাদি দেশহিতকর অনুষ্ঠান-সম্পাদানেও নিরত হন। পরে রাজা উপাধি লাভ করিয়া, মুসলমান সম্রাট্-বংশধরগণের পক্ষে ইংরাজরাজ-সমীপে দৌত্য কার্য্য করিবার জন্য, ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু অচিরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ব্রিষ্টল নগরে নশ্বরদেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলেন, "আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞায় রাম-মোহনকে নমস্কার করিব। শত সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি আমাদের ভক্তি-ভাজন, কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কোথায় থাকিত এই ব্রাহ্মসমাজ, যদি ব্রহ্মসন্তান রামমোহন না আসিতেন? আমরা তাঁহার নিকট একটী বিস্তীর্ণ জমিদারী পাইয়াছি। সেই তালুকের প্রজা আমরা। ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। জর-বিকারে কণ্টক-বনে লোকে মরিতেছিল। এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড, ইহা হইতে ব্রহ্ম-আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কয়েকটি লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল। ভগবান্ তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইয়া-ছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্ম-পিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব। পরাৎপর পরব্রহ্ম তাঁহার ঈশ্বর। তাঁহার ও আমাদিগের ঈশ্বরের নিকট তাঁহার জন্য শুভইচ্ছা উত্থিত হউক। তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার স্তব স্তুতিতে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। এজন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতা-ফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি। সেই ধর্ম্ম-পিতামহ এত উপকার করিয়া গেলেন, তিনি হাতে হাতে ধর্ম্মধন দিয়া গেলেন। যখন ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া, প্রজা হইয়া, শস্য সংগ্রহ করিতেছি, তখন যাঁহার নিকট এই তালুক লাভ করিলাম, যিনি ৫০ বৎসর আগে অন্ধ-কারের মধ্যে বসিয়া সহস্র লোকের তীব্র নির্য্যাতনে ব্যথিত হইয়া, 'জয় জগদীশ, জয় জগদীশ' বলিয়া ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রহ্মের ঘর প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি জয়ী হইলেন, ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন, 'প্রিয় সন্তান, ঘরে এস।' তিনি ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।"

সংবাদ।

পারলৌকিক—আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে নিম্ন-লিখিত পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ২২শে শ্রাবণ, বুধবার, আমাদের প্রিয়বন্ধু বাগনান-নিবাসী ভ্রাতা রসিকলাল রায়ের সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী মানবলীলা সম্বরণ করিয়া মার অমৃতময় শান্তি-ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি যথার্থই অতি শান্তস্বভাবা, সতী সাধ্বী, সন্তানবৎসলা, পরসেবাপরায়ণা, গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে পল্লীস্থ সকলেই আত্মজন-বিয়োগ শোক অনুভব করিতেছেন। তাঁহার সুশিক্ষিতা কন্যাগণ, পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ স্বামীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করিতেছি। মা আনন্দময়ী জননী তাঁহার দেবকন্যাকে অনন্ত শান্তি এবং সন্তান সন্ততি ও স্বামীকে সান্ত্বনা দান করুন। গত ২রা ভাদ্র, তাঁহার আত্মশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রাতা ললিতমোহন দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করা হয় :—

বাগনান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয় ২৲, বাগনান অসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বালিকা-বিদ্যালয় ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲ নববিধান সমাজ ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ Flood Relief Commitee ১০৲, অনাথাশ্রম ২৲, অন্ধ-বিদ্যালয় ২৲, আতুরাশ্রম ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ ৪৲, স্থায়ী ফণ্ড ২০০৲ টাকা।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২রা আশ্বিন, ঋষিকল্প স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ীর পুত্রবধূ, প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা স্বর্গীয় শরৎ কুমার

লাহিড়ীর (S. K. Lahiri) সহধর্ম্মিণী, হৃদ্‌রোগে বহুদিন ভুগিয়া, অমৃতধামে পরমা জননীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। কয়মাস হইল, তাঁহার স্নেহের ধন মধ্যম পুত্রের অকস্মাৎ পরলোকগমনে, শোকভগ্নহৃদয়ে যে শয্যাশায়ী হন, আর ভাঙ্গা শরীর লইয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন অমরলোকে সেই প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিয়া, পৃথিবীর রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া, পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি পরের উপকার করিতে, দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে, সকলের খোঁজ খবর লইতে সদাই তৎপর ছিলেন। মণ্ডলীতে এমন সতী সাধ্বী গুণবতী নারীর অবির্ভাব যেমন সৌভাগ্যের বিষয়, তিরোধানও তেমনি দুঃখের বিষয়। আমরা তাঁহার সন্তান সন্ততি ও পরিবার-বর্গের সহিত তাঁহার অভাব গভীরভাবে অনুভব করিতেছি।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, গিরিদিতে, প্রাচীন ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নিয়োগী পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে এলবার্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তিনি আদর্শ চরিত্রবান্ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার জীবনের স্মৃতি অনেকের প্রাণেই অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, হাজারিবাগে, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী দয়াময়ী দেবী ৭৮ বৎসর বয়সে পরমা জননীর কোলে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সত্যই দয়াময়ী ও সেবা-পরায়ণা ছিলেন। তিনি মধুর মিষ্ট ব্যবহার ও সেবায় সকলকে তুষ্ট করিতেন। তিনি বহুদিন ভ্রাতৃসেবা করিয়া সেবাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গেছেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, কলিকাতায়, ৩৪ নং মদন মিত্রের লেনে, নববিধান-বিশ্বাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে, বহুমূত্ররোগে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি একজন সরল বিশ্বাসী ভক্তিমান্ ব্রাহ্ম ছিলেন। দুঃখ দৈন্যের ভিতরেও বিশ্বাস-বলে হাসিমুখে সব সহ্য করিয়া জীবনের ধর্ম্ম সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরিবারের মধ্যে তাঁহার সরল বিশ্বাস ও ধর্ম্ম রক্ষিত হউক।

আমরা শোকার্ত্ত পরিবার-বর্গের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১২ই সেপ্টেম্বর, হাওড়ায়, ২৮নং নর সিংহ দত্ত লেনে, ডাঃ শরৎ কুমার দাসের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পুত্রকন্যাদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় ও ভাই অক্ষয় কুমার লধ শ্লোক-পাঠে সহায়তা করেন। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় শরৎ বাবুর সুন্দর জীবনী পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার দাস প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানটি গম্ভীর ভাবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে,—

পুত্রগণের দান—নববিধান প্রচার আশ্রম ৫৲, নববিধান ব্রহ্মমন্দির ৫৲, ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার্থ ২৲, হাওড়া অনাথ-বন্ধু-সমিতি ২, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, হাওড়া ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম ২৲, মোট ২৫৲ টাকা।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবীর দান—কলিকাতা অনাথ আশ্রম ৫৲, শান্তিপুর অনাথ আশ্রম ৫৲, ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার্থ ৩৲, দরিদ্রদের জন্য বস্ত্র ১৭৲, মোট ৩০৲ টাকা।

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অমিয়া সরকারের দান—নববিধান প্রচার আশ্রম ১০৲, অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, হাওড়া অনাথ-বন্ধু-সমিতি ৪৲, হাওড়া জয়দেব কুণ্ডু লেনস্থ সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয় ৫৲, হাওড়া ব্রাহ্মসমাজ ২৲, কাঙ্গালী বিদায় নগদ ও মিষ্টান্ন আদি বাবত ৯০৲, মোট ১১৬৲ টাকা।

তৃতীয়া ভগ্নী কাঁথির শ্রীমতী শান্তশীলা পালমলের দান—নববিধান প্রচার আশ্রম ৫৲, নববিধান ব্রহ্মমন্দির ৪৲, হাওড়া ব্রাহ্মসমাজ ২৲, কলিকাতা অনাথ আশ্রম ২৲, অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, মোট ১৫৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত ভোজ্য, পাদুকা, ছাতা, জলপাত্র, অন্নপাত্র, ঘড়া, ঘটি, বস্ত্র, উত্তরীয় আদি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও মেজর সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রকন্যাগণ মাতামহীর (Mrs. S. K. Lahiri) শ্রাদ্ধ, গত ২২শে সেপ্টেম্বর, ৩৩৩ ল্যান্সডাউন রোডে সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অক্ষয় কুমার লধ শ্লোকপাঠে সহায়তা করেন। ভাইবোনদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ অমিয় কুমার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে নববিধান প্রচার আশ্রম ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারাশ্রম ১০৲, অনাথ আশ্রম ১০৲, আতুর আশ্রম ১০৲, অন্ধ-বিদ্যালয় ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ ফণ্ডে ১০৲, কালাবোবা স্কুল ১০৲, গরিবদের জন্য বস্ত্র ৩০৲, মোট ১০০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভোজ্য, বস্ত্র, বিনামা, বাসনাদি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে ও তাঁহাদের শোকার্ত্ত প্রিয়জনদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং এই সকল দানকে সার্থক করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ৮৩।১ আপার সার্কুলার রোডে, মঙ্গলপাড়ার বাড়ীতে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র রায় উপাসনা

করেন। শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে ৬৭।২ হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথদত্তের শ্বশুরের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, দেরাদুনে, স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, কন্যাদের গৃহে, ভাই বিহারী লাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যাগণ প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২০শে ভাদ্র, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে, বাগনানে, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

গত ৩১া ভাদ্র, স্বর্গীয় শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর, সাম্বৎসরিক দিনে, বাগনানে তাঁর বাড়ীতে, শ্রীযুক্ত রসিক লাল রায় উপাসনা করেন।

গত ৯ই আশ্বিন, ৬৭।২ হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার স্বর্গগতা কন্যা সুপ্রভা ঘোষের প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী শকুন্তলা সেন উপাসনা করেন, এবং দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুহাসি ঘোষ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শিলংএ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দত্তের গৃহেও উপাসনাদি হইয়াছে।

জন্মদিন—গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায়, ৬৭।২ হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে, ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। নববিধান-জননীর বিশেষ আশীর্ব্বাদে তিনি একাশীতি বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্ব্যশীতিতম বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

গত ১লা আশ্বিন, বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে, উক্ত আশ্রমের সেবিকার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

২রা অক্টোবর, ১৬ই আশ্বিন, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, স্বর্গগত প্রেরিতপ্রবর প্রতাপচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন, বাঁকিপুরের ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন।

উৎসব—ঢাকায়, পূর্ব্ববাঙ্গালা নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের একোনপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, গত ২২শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৬ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর) পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অনুসারে, নববিধান জননীর অযাচিত কৃপানন্দ সকলেই সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উৎসবের বিবরণ আমাদের হস্তগত হইলে, পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্মৃতিসভা—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, দার্জ্জিলিং নৃপেন্দ্র নারায়ণ হিন্দু পাব্লিক হলে, কুচবিহারের স্বনামধন্য মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সাম্বৎসরিক দিনে, বিরাট স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ সন্তোষ কুমার ব... M. L. C. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ জে, সি, ঘোষাল "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" গানটী সুন্দরভাবে করিলে, Mr. N. C. Sen, Mr. S. Sanyal, Mr. J. C. Mazumdar ইংরেজীতে, এবং এক জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলায় বক্তৃতা করেন; তৎপর শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় একটি প্রার্থনা করিলে, সভাপতি ইংরেজিতে সুন্দর অভিভাষণ করেন। সকলেই মহারাজার চরিত্রের উদারতা প্রভৃতি রাজোচিত মহৎ গুণের উল্লেখ করিয়া সুন্দর বক্তৃতা দান করেন। সভায় যোগদান করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। বক্তৃতান্তে মিস বীণা চক্রবর্ত্তী একটি সুন্দর গান করেন, তৎপর ডাঃ শিশির কুমার পাল সভাপতিকে ধন্যবাদ দান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

রাজস্মৃতি—ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টায়, ব্রহ্মমন্দিরে Forum Meetingএ, "রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ" বিষয়ে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ সত্যানন্দ রায় বক্তৃতা দান করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত সেপ্টেম্বর মাসের ১লা, ৮ই, ১৫ই ও ২৯শে রবিবার, অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন এবং ২২শে রবিবার, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টায় Navavidhan fourm Meetingএর সপ্তম অধিবেশনে, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ "নবযুগে বৃন্দাবন-সাধন" বিষয়ে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সভাপতির কার্য্য করেন।

নিবেদন।

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইতে চলিল। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত কাতর নিবেদন, যাঁহারা এবৎসর এখনও মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক আপন আপন দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৭ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ২০শ সংখ্যা। ১৬ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd November, 1929. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে পবিত্রাত্মন্! এই পরীক্ষাময় ধর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে একমাত্র তোমার পরিচালনা আমাদের অবলম্বন। তোমার অযাচিত কৃপায় কত উৎসবের পর উৎসব, মহোৎসবের পর মহোৎসব সম্ভোগ করিতেছি, কত সাধু ভক্ত মহাজনদিগের জীবনের স্পর্শ পাইতেছি, দৈনিক আনুষ্ঠানিক কত উপাসনা, প্রার্থনার মধ্যে তোমার বিচিত্র দর্শন, তোমার অভয়বাণী-শ্রবণের স্বর্গীয় অধিকার লাভ করিতেছি; চতুর্দ্দিকে যখন মৃত ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান ও আড়ম্বরের কোলাহল, সেই সময় কত অপরাধে অপরাধী আমাদের নগণ্য জীবনেও যখন তুমি, জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত ভাবে স্বয়ং জীবন্ত লীলার ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছ, ইহা দেখিতে পাই, তখন উচ্চৈঃস্বরে তোমার মহিমাগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকের ভাই ভগ্নীদিগকে বলিয়া ফেলি, দেখ জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা এ যুগের সাধু মহাজন ও ভক্তমণ্ডলী মধ্যে, দেখ জীবন্ত ব্রহ্মের জীবন্ত লীলা আমাদের মত নগণ্য মলিন জীবনে।

কিন্তু, হে জীবন্ত দেবতা! তোমার দিক্ হইতে এত কৃপাবৃষ্টি সত্ত্বেও, যখন দেখি, আমাদের জীবন সময় সময় শুষ্ক হইতেছে, একটু ফাঁকের ঘর পাইলেই নির্য্যাতিত সয়তান আসিয়া মস্তক উত্তোলন করিতেছে, লম্ফ ঝম্পে অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, তখন আর আক্ষেপের সীমা থাকে না। তখন জীবনে গূঢ় অসংযম, আনুগত্যের অভাব দেখিয়া প্রাণ এই বলিয়া ক্রন্দন করে, কেন ধর্ম্মের অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া, ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সর্ব্বদা তোমার পরিচালনাধীন থাকি না। হে জীবন্ত ধর্ম্মাগ্নি, হে জীবন্ত পরিচালক, তোমার অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া তোমার পরিচালনাধীন থাকিলে তো আর ভয় নাই, তখন যে জীবন নিরাপদ্। তাই কাতর-প্রাণে ভিক্ষা করিতেছি, তোমার অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া জীবনের সকল অবস্থায় যেন তোমার পরিচালনাধীন থাকি, তুমি কৃপা করিয়া সেই ভাবে জীবনকে প্রস্তুত কর, এবং একমাত্র তোমার পরিচালনে পরিচালিত রাখিয়া আমাদিগকে নিরাপদ্ কর, আশা বিশ্বাসে পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

নানা উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কেহ অসত্য অন্ধকারে পড়িয়া সত্যের সন্ধানে, কেহ

পাপ-ভারাক্রান্ত হইয়া আপনার মুক্তির সন্ধানে, কেহ ঈশ্বর-পিপাসু হইয়া ঈশ্বরের সন্ধানে ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বড় বড় সাধু মহাত্মাগণ নিজের জন্য তত নয়, জগতের মঙ্গলের জন্য, সর্ব্ব জীবের উদ্ধারের জন্য, মানব-সমাজে পাপী, তাপী, ধনী, নির্ধন সকলের সদ্গতি-বিধান জন্য, তাঁহারা আপনার জীবনকে ধর্ম্মক্ষেত্রে উৎসর্গ করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টি লইয়া পরিবার গঠিত হয়, কতগুলি পরিবার লইয়া সমাজ গঠিত হয়। আবার কতগুলি সমাজ, কতগুলি জাতি, কতগুলি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় লইয়া একটি বিশেষ সাম্রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপিত হয়। এ সকল দৃশ্য স্বর্গরাজ্যেরই অনুরূপ, প্রতিরূপ, অথবা এ সকল ছায়া, স্বর্গরাজ্য যথার্থ কায়া।

ক্ষুদ্র মানুষ সংসারে অধিকাংশ সময় আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, ধর্ম্মরাজ্যেও ক্ষুদ্র মানুষ ব্যক্তিগত সাধন ভজন, আপনার সদ্গতি, আপনার পরিত্রাণ লইয়া ব্যস্ত। মানব সমাজের রাজ্যে এই জন্য ব্যক্তিগত-সাধন-প্রধান ভাব প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মন যাঁহাদের উদার, আশয় যাঁহাদের বড়, হৃদয় যাঁহাদের সমধিক প্রশস্ত ও কোমল, যাঁহারা শুধু আপনার সম্ভোগ লইয়া সন্তুষ্ট নন, কিন্তু পরকে বিলাইয়া, পরকে সম্ভোগ করাইয়াই বিশেষ সন্তুষ্ট, পরের জন্য জীবন-ধারণ যাঁহাদের জীবনের স্বাভাবিক ও মৌলিক ভাব, তাঁহারা মানব-সমাজের ছোট বড় সকলের জন্য ব্যস্ত হন, মানব-সমাজে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের জীবনের ব্রত হয়; এই শ্রেণীর লোকই সাধু ভক্ত বলিয়া, মহাজন বলিয়া চিহ্নিত। ইঁহারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা জন্য জীবন পাত করিলেন। অতীত ভারতে কোন কোন ঋষি আত্মা ও শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনানক প্রভৃতি মহাজনগণ সামাজিক ধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অন্য দেশে শ্রীমুষা, শ্রীঈশা, শ্রীমহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তৎপ্রচারে প্রাণ পাত করিলেন। বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-নেত্রে স্বর্গলোকে পরম পিতার রাজ্যের সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিয়াই শ্রীঈশা ঘোষণা করিলেন, "স্বর্গস্থ পিতার সুবিস্তৃত বাড়ীতে তোমাদের জন্য বিভিন্ন গৃহ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।" এবং পৃথিবীতে ছোট বড় মানব আত্মার উচ্চ নিয়তি, উচ্চ গতি প্রত্যক্ষ করিয়াই ঘোষণা করিলেন "স্বর্গ-রাজ্য আসিতেছে।" শ্রীঈশা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী শুনাইয়া গেলেন। সাধু মহাজনদিগের ভবিষ্যৎ বাণী তো ব্যর্থ হইবার নয়। স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে আসিবেই আসিবে, স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। কিন্তু কত দিনে তাহা বাহিরের আকারে পরিণত হইবে, অদৃশ্য রাজ্য দৃশ্য জগতে, দৃশ্য আকারে লোক-চক্ষুর গোচর হইবে, কে জানে?

বাহিরে স্বদেশে, বিদেশে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বাহ্য গতি বিধি যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, পর্য্যালোচনা করি, তখন অনেক সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বলিতে হয়, "কত দিনে পৃথিবীতে স্বর্গের অদৃশ্য রাজ্য পরিদৃশ্যমান আকার ধারণ করিবে, কে জানে?" কিন্তু বর্ত্তমান যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত কার্য্য যখন আমরা পর্য্যালোচনা করি, তখন স্বীকার করিতে হয়, স্বর্গরাজ্য আর বহু দূরের ব্যাপার নয়। স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত আধ্যাত্মিক লীলার ব্যাপার যদিও বাহিরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যদিও তাহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার, শুধু আত্মিক দৃষ্টিতে দর্শনের ব্যাপার, কিন্তু আত্মিক ব্যাপারগুলি যখন ঈশ্বরের গূঢ় ব্যবস্থাতে বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়, তখন বলি, অদৃশ্য রাজ্যের ব্যাপার দৃশ্য লোকে দৃশ্যাকারে পরিণত হইয়া বাহিরের লোক-চক্ষুর গোচর হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্যের ব্যাপার বাহিরে কি আকার ধারণ করিয়া দৃশ্যমান হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। রাজ্য বলিতে, সাম্রাজ্য বলিতে আমরা তাহাকেই বলি, যে রাজ্যে নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন রুচি ও বিভিন্ন ভাবের লোকশ্রেণী একটি রাজা কি মহারাজা অথবা একটি সম্রাটের আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শাসন ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীনে বিশ্বস্ত ভাবে বাস করে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য তখনই বাহিরের আকার ধারণ করে বলি, যখন এই বিশ্বের সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, সকল দেশ কালের ব্যবধান ভুলিয়া, দেশ কালের সীমাতে আপনাদিগকে আবদ্ধ না করিয়া, সেই একমাত্র বিশ্বের ঈশ্বর বিশ্বকর্ত্তাকে কর্ত্তা বলিয়া, প্রভু বলিয়া, রাজার রাজা বলিয়া, সম্রাটের সম্রাট, পরম

সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করে, এক মাত্র তাঁহার অধীন হয়, এবং একমাত্র স্বর্গীয় বিধি ব্যবস্থায় শাসিত, নিয়মিত ও পরিচালিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মহাপুরুষ-যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ঈশ্বরের খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, খণ্ড রাজ্য কোন না কোন আকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পরম পিতা ভূমা মহান্ ঈশ্বর যেমন অখণ্ড, অদ্বিতীয়, তেমনি ভূমণ্ডলে তাঁহার অখণ্ড অদ্বিতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। খণ্ড ভাব লইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে মানুষ গণ্ডিবদ্ধ হইয়া নানা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং খণ্ড রাজ্য সকল আপন আপন ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া একে অন্যকে হনন করিল; তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তিনি চান, ধরাতে শান্তি ও প্রেমের অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে।

পৃথিবীতে অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা জন্য স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার বক্ষ হইতে আপনার মনোনীত দল সহ এই নব যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমে তাঁহার মনোনীত সন্তান রামমোহন যোগে ঘোষণা করিলেন, যে সকল বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ ও বিভিন্ন মহাজনদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে অস্বীকার করিতেছে, সেই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থের উপপাদ্য এক ঈশ্বর, সকল সাধু মহাজনদিগের জীবনের স্বর্গীয় আলোকও একমাত্র তিনিই। তাই সেই একের পূজায়, একের স্তুতি গীতি বন্দনায়, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল নর নারীর মিলনক্ষেত্র রূপে রামমোহন যোগে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাই পৃথিবীতে ঈশ্বরের অখণ্ড সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপনা। সেই পত্তন-ভূমিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপনার জীবনের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট অভিনয় করিয়া গেলেন। তৎপর ভক্ত কেশবচন্দ্র সদলে, সর্ব্ব খণ্ড ভাবের সমন্বয় সাধন দ্বারা ঈশ্বরের অখণ্ড সাম্রাজ্যকে জীবনে, গৃহ পরিবারে ও মণ্ডলীতে দৃশ্যমান করিতে, অদৃশ্য মণ্ডলীর যথাসম্ভব একটা দৃশ্যমান আকার দান করিতে আসিলেন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বর্গের এই নব ধর্ম্ম, নব ভাব, নব সাধন আপনার জীবনে দৃশ্যমান করিয়া, স্বর্গের মনোনীত অল্পসংখ্যক লোক মধ্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণ পাত করিলেন, এবং সমস্ত জগতে নব ধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনি এই দৃশ্যমান জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন, "পিতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ভ্রাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত কবে হইবে?" তিনি ভ্রাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন, সকল সাধন-সম্পদ রাখিয়া গেলেন, কিন্তু ভ্রাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠা বাকি রহিল। ঈশ্বর স্বয়ং পবিত্রাত্মারূপে তাঁহার মনোনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানদিগের জীবন ধরিয়া, এই স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কার্য্য, ভ্রাতৃ-মণ্ডলী-স্থাপনের কার্য্য-পরিচালনে ব্যস্ত। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা আপনাদিগের মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতার দিকে সজাগ থাকিয়া, এই পবিত্র বিধানক্ষেত্রে পবিত্রাত্মার পরিচালনের মহিমা ও গৌরব প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হাতের যন্ত্ররূপে সেই স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে প্রাণ পাত করিয়া যান।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পূর্ণ বিশ্বাস।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, দুর্য্যোধনের সর্ব্বাঙ্গ প্রায় লৌহময়, কেবল জানুর মধ্যে একটু স্থান দুর্ব্বল ছিল, শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম সেই স্থানে গদাঘাত করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। বাস্তবিক আমাদের জীবন বহু ধর্ম্ম-বর্ম্মে আবৃত হইলেও, যদি কোথাও একটু মাত্র দুর্ব্বলতা থাকে, সংসারের গদাঘাতে অচিরেই আমাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। পূর্ণ-বিশ্বাস-বর্ম্মে আবৃত না হইলে কিছুতেই আমাদের রক্ষা নাই।

কাণ মলা।

সেতার বা একতারার সুর ঠিক করিতে হইলে, তাহার কাণ মলিয়া ঠিক করিতে হয়। মনের চঞ্চলতা বা অন্যমনস্কতা নিবারণ করিতে হইলেও, মাঝে মাঝে নিজের কাণ মলিয়া দিলে মন চাঙ্গা হয়। কোন কোন হিন্দু সাধক অপরাধ-স্বীকারের মন্ত্র-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার কাণ মলা, নাক মলা সাধন করেন। আমাদের সঙ্গীতাচার্য্য চিরঞ্জীবও তাই গাহিয়াছেন, "কাণ মলে আমাদের তেমনি, বাজাও ওহে বাদ্যকর।"

মৃগয়া।

সম্রাট্ বা রাজার এক বিশেষ আমোদ মৃগয়া করা বা বন্য জন্তু শিকার করা। বন্য হিংস্র জন্তুদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা রাজার এক বিশেষ ধর্ম্ম, ইহা বিশ্বাস করিয়াই তাঁহারা মৃগয়া করেন, বন্য পশু শিকার করেন। রাজরাজেশ্বর অদ্বিতীয় পরম দেবতারও পুণ্য স্বভাব এইরূপ।

আমরা যখনই তাঁহাকে এক অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বর রূপে হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করি, তখনই তিনি তাঁহার পুণ্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া, আমাদের মনোবনের কাম ক্রোধাদিরূপ হিংস্র জন্তু সকল বিনাশ করেন এবং যাহাতে আমরা নিষ্কণ্টক পুণ্য শান্তি অর্জ্জন করিতে পারি ও সুখে বাস করিতে পারি, তাহাই বিধান করেন।

নিশ্বাস-যোগ।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারাই আমাদের প্রাণ বাঁচিতেছে। এই নিশ্বাস বন্ধ হইলেই আর প্রাণ বাঁচে না। স্থিরচিত্তে এই নিশ্বাসের শব্দ শুনিলে শুনিতে পাই, প্রাণ বলিতেছে, "আমি আছি" "আমি আছি।" ইহা শুনিতে শুনিতে মন যখন তন্ময় হয়, তখনই সেই প্রাণের প্রাণ যিনি, যিনি এই প্রাণ-বায়ুর কল চালাইতেছেন, তাঁহারই শব্দ কর্ণগোচর হয়। তাহাতেই মন সহজ যোগে মগ্ন হয়। এই নিশ্বাসে প্রশ্বাসে মন সংযোগ করা, তাই যোগ-সাধনের এক প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া যোগিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে কতই সাধ্য সাধনার প্রণালী বাহির করিয়াছেন। আমরা সে সমুদয় কষ্টসাধ্য সাধন-প্রণালীর অবশ্যই পক্ষপাতী নই। তবে সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইলে মন যে বেশ সংযত হয় এবং অন্যমনস্কতা দূর হয়, ইহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। নিশ্বাসে "মা", প্রশ্বাসে "মা" বলিতে বলিতেও মাতৃ-আবির্ভাব অতি সহজে উপলব্ধি হয়, ইহাই আমাদের সহজ নিশ্বাস-যোগ। যখন তখন এই যোগ সাধন করা যায়।

স্মৃতির সৌরভ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যেমন ব্যক্তিগত জীবনে একটার পর একটা শোক আসতে থাকে, যেমন প্রতি পরিবারেও একটার পর একটা আঘাত আসে, তেমনি মণ্ডলীগত জীবনেও দেখি, একটার পর একটা শোক আসে। সকলের মৃত্যুতেই যে মণ্ডলী শোকার্ত্ত হয়ে পড়ে তা নয়, কিন্তু এক একজনের মৃত্যুতে দেখেছি, সমস্ত মণ্ডলী মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। যাঁরা মণ্ডলীর সেবা করেছেন, নানা সূত্রে সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, নিজেদের চরিত্রগুণে সকলের প্রিয় হয়েছেন, তাঁহাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে যে শোকের ধ্বনি ওঠে, তাতেই তাঁদের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি যত সেবা করেন, তিনিই তত প্রিয় হন। কেহ বা বিদ্যা দিয়ে, কেহ বা ধন দিয়ে, কেহ বা চরিত্র দিয়ে, কেহ বা আধ্যাত্মিকতা দিয়ে, আবার কেহ বা সঙ্গীত দিয়ে সেবা করেন। যে ভাবেই যিনি সেবা করুন না কেন, এই সেবার ভিতর দিয়েই মণ্ডলীতে তাঁর বিশেষ স্থান হয়। স্বর্গীয় মনোমতধন যে ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার প্রিয় হয়েছিলেন, তা কেবল এই সঙ্গীত দিয়ে সেবা করে। মনোমতধনের সঙ্গীতের কি মাধুর্য্য ছিল, তা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই জানেন। কিন্তু কেবল সঙ্গীতেই তাঁর বিশেষত্ব ছিল না; তাঁর মিষ্ট স্বভাব, নির্ব্বিবাদী প্রকৃতি, সকলকে স্নেহ করিবার গুণ সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। মনে হয়, তিনি তাঁর পিতা শান্তসাধক ভাই কেদার নাথের শান্ত স্বভাব অনেকাংশে পেয়েছিলেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না, সকল সময়ে একটা শান্ত ভাব তাঁর মধ্যে দেখতাম। শুনেছি যে, তাঁর গান বাজনার শক্তি স্বাভাবিক ছিল না, কেবল অধ্যবসায়ের গুণে এতটা উন্নতি করতে পেরেছিলেন; জানি না, এ কথা কতদূর সত্য। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সকলে তাঁর গুণের আদর করছে। তাঁর সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই দেখতাম যে, তাতে কেবল যে সুরবোধ বা তালবোধ ছিল তা নয়, তার মধ্যে গভীর ধর্ম্মভাবের আস্বাদন তিনি নিজে পেতেন এবং অন্যদের দিতে পারতেন। এই জিনিষই তাঁর গানকে সকলের প্রিয় করেছিল, এই কারণেই প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, কান্তিচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই অন্য আরও সুকণ্ঠ গায়কদের গানের চেয়ে মনোমতধনের গান ভালবাসতেন। সে সময়ে অনেকে বলতেন যে, প্রতাপচন্দ্রের উপাসনা আর মনোমতধনের গান হলে মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়। এই সঙ্গীতের গুণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখায় আদৃত হয়েছিলেন, সকলেই তাঁকে চাইতেন। তিনিও যথাসম্ভব সকলের অনুরোধ রক্ষা করতেন, কেননা তাঁর মধ্যে সঙ্কীর্ণতা কিছু ছিল না, বরং অনাড়ম্বর উদারতা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। নিজের মণ্ডলীর সেবা তো তিনি করতেনই, অন্যদিক থেকেও যখন অনুরোধ এসেছে, আনন্দে সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছেন। এই উদারতার সঙ্গে তাঁর আর একটা গুণ ছিল—সহিষ্ণুতা। যাঁরা উপাসনার সময়ে গানের ভার নেন, তাঁদের বড় কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হয়; কারণ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যখন সকলে গানে যোগ দেন, তখন সুর বেসুরে, তাল বেতালে, নানাজনে নানাভাবে একই গান করতে থাকেন, সুতরাং গানের নেতা যিনি, তাঁকে বিপদে পড়তে হয়। অনেকে এ অবস্থায় অত্যন্ত বিরক্ত হন, কিন্তু দেখতাম, মনোমতধনের কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি হত না; এ সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সুন্দর ভাবে গানের কাজ করে যেতেন, কখনও বিরক্তি প্রকাশ করতেন না বা কাহাকেও বাধা দিতেন না। গান সম্বন্ধে কাহাকেও উপহাস বা বিদ্রূপ করতে তাঁকে কখনও শুনিনি। এতগুণ যাঁর ছিল, তিনি যে সকলেরই প্রিয় হবেন, তাতে আশ্চর্য্য কি—ছোট বড় সকলেই তাঁকে আপনার মনে করত। ছোটদের কাছে তিনি "মন্মথ-দা" নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ ছোটদেরও তাঁর কাছে অবাধ গতি ছিল, কাউকে তিনি অবহেলা

করতেন না। এই সব কারণে যখন তাঁর অপঘাত মৃত্যু হল, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজে একটা হাহাকার উঠলো। তখন কলিকাতায় নতুন বিদ্যুতের ট্রাম হয়েছে, ভবানীপুর থেকে ফিরিবার সময়ে ট্রাম ধরতে গিয়ে পা পিছ্‌লিয়ে পড়ে ট্রামের চাকায় তাঁর মৃত্যু হয়। আমরা যখন এ সংবাদ শুনলাম, তখন মনে হল, যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল, কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না যে মনোমতধন নেই। মেডিক্যাল কলেজ থেকে যখন তাঁর মৃতদেহ প্রচারাশ্রমে নিয়ে আসা হল, তখন যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর বৃদ্ধা মাতা তখন বিদেশে, এ দৃশ্য তাঁকে দেখতে হয় নি; কিন্তু তাঁর বিধবা পত্নী, ভাই বোনেরা শোকবিহ্বল হয়ে যখন তাঁর মৃতদেহের উপরে পড়লেন, তখন সমস্ত সংসারকে শ্মশান মনে হল। তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনে প্রচারাশ্রমের প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছিল। উপাসনার পর সকলে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষ কর্ত্তব্য করে এলাম, সকলে হৃদয়ে একটী নতুন শোকের আগুন নিয়ে ফিরলাম। যে দিন এ দুর্ঘটনা ঘটে, সে দিন সকালে বাড়ী থেকে বার হওয়ার আগে মনোমতধন "জানি হে যবে প্রভাত হবে" গানটী বেহালায় বাজিয়ে গান করেছিলেন। সেই সময় থেকে তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে এ গানটী একটী নূতন বেদনার স্মৃতিতে ভরে গিয়েছে।

এ মৃত্যুতে মণ্ডলীর কত ক্ষতি হয়েছে, কে তার পরিমাণ করবে! দুর্ভাগা মণ্ডলীকে কতবার এই শোক পেতে হয়েছে! আশার স্থল যাঁদের সকলে মনে করেছিল, তাঁরা জীবনের পথ অর্দ্ধেক যেতে না যেতে ইহলোক থেকে চলে গিয়েছেন, আমাদের আশা সব নির্ম্মূল হয়েছে। যাঁদের আমরা আমাদের প্রতিনিধি বলে ভরসা করেছিলাম, তাঁরা তাঁদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে গিয়েছেন; যাঁরা আমাদের মধ্যে আদর্শ হয়েছিলেন, সে আদর্শের প্রভাব ভাল করে সকলের ওপর পড়বার আগেই মৃত্যুর যবনিকা তাঁদের অদৃশ্য করে ফেলেছে। স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্রের কাছে সমাজ কত জিনিষ আশা করেছিল। মোহিতচন্দ্রের ন্যায় চরিত্র বাস্তবিকই দুর্লভ। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরলতা এমন ভাবে মিশতে পারে, তা সহজে ধারণা কর যায় না। তাঁর পড়াশুনা এত বেশী ছিল যে, শুনেছি কেউ কেউ তাঁকে Walking Encyclopœdia বলতেন; ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন এসকল বিষয়ে তাঁর যেমন অধিকার ছিল, তেমনি আরও জ্ঞান-প্রসারের জন্য আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল। আবার অন্য দিকে একেবারে বালকের মতন সরল, হাসিতে মুখখানি ভরা; একটা আনন্দের ভাব যেন তাঁর দীর্ঘ প্রকাণ্ড শরীরকে সব সময়ে পূর্ণ করে থাকত। যখন কথা বলতেন, তখন মনে হত যে, তাঁর মনে বহুভাব আসছে, সব যেন তিনি প্রকাশ করে উঠতে পারছেন না। তাঁর সরল স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তখনকার যুবকেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁকে অত্যন্ত আপনার মনে করতেন এবং তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। অধ্যাপনার কাজেও তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। এমন একটী সুসন্তান পেয়ে মণ্ডলী নিজেকে কত গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। কত আশা হয়েছিল যে, জনসাধারণের কাছে আমাদের আদর্শ উপস্থিত করতে তিনি সক্ষম হবেন। নববিধানের আদর্শ মোহিতচন্দ্রকে ক্রমেই সাধনের গভীরতর অবস্থায় নিয়ে চলেছিল এবং সেই ইঙ্গিতের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি সাধকব্রত গ্রহণ করেছিলেন। যখন দেশে রাজনীতির সাড়া পড়ে গেল, আর যুবকদের মধ্যে আন্দোলন এল, তখন মোহিতচন্দ্র তাতে যোগ দিলেন; যাতে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব আসে, তার চেষ্টা করতে লাগলেন। আধ্যাত্মিকতা, দেশপ্রীতি, শুদ্ধ চরিত্র, গভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে সকলের প্রিয় করেছিল। বক্তৃতাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং অনেকবার সাধারণের সম্মুখে আমাদের আদর্শ উপস্থিত করেছেন ও গভীর অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন। শুনেছি যে, ব্রতগ্রহণের সময়ে প্রার্থনায় তিনি একটী গানের দুটী পদ উল্লেখ করে প্রার্থনা করেছিলেন :—

"ডেকে লও, দয়া করে, আমারে ভিতরে;
কত দিন আর পরের মত থাকব বাহিরে।"

যখন নতুন ভাবে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন, সমাজের সেবা বিশেষ ভাবে করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, আর সমাজের সকলের মন আশায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে বিধাতা মোহিতচন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন, তাঁকে ভিতরে ডেকে নিলেন। এ সময়ে মণ্ডলীর অবস্থা কি হয়েছিল, ধারণা করা কিছু কঠিন নয়। হঠাৎ বজ্রাঘাতে লোকে যেমন অবসন্ন হয়ে পড়ে, মোহিতচন্দ্রের মৃত্যুতেও যেন তাই হল, কারণ সুস্থশরীরের যুবা অতি অল্পকাল রোগ ভোগ করে হঠাৎ চলে গেলেন; সংসার পড়ে রইল, মণ্ডলীর সেবা পড়ে রইল, যাঁর ভরসা সকলে এত করেছিলেন, তিনি চলে গেলেন। মণ্ডলীর আশা চূর্ণ হল, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হল।

মোহিতচন্দ্রের চরিত্রের মাধুর্য্য সকলকে মোহিত করেছিল, মণ্ডলীর যুবকদের পক্ষে একটা আদর্শের বস্তু হয়েছিল। সকল জিনিষের একটা আদর্শ আমরা সম্মুখে দেখতে চাই, এইটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সচ্চরিত্রের বিষয় পড়ে যতটা ফল না হয়, চরিত্রবান্ একজনকে দেখলে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হয়; সেই জন্যে আমাদের যিনি যে বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করেছিলেন, তাঁরাই আমাদের মনে আদর্শের স্থান পূর্ণ করে আছেন। মণ্ডলীর ইতিহাসের নানা অবস্থার মধ্যে অনেক বিভিন্ন প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। যাঁরা মণ্ডলীর কাজে যোগদান করেন, তাঁদের কর্ত্তব্য বড় কঠিন, অনেক বাধা ও তীব্র সমালোচনার ভিতরে তাঁদের কাজ করতে হয়; এ কাজে কত

সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়, তা যাঁরা সে অবস্থায় পড়েন, তাঁরাই জানেন। কার কতটা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আছে, তার কষ্টি-পাথর মণ্ডলীর কাজ, কেননা তর্ক বিতর্কে অনেক সময়েই ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। কিন্তু এক এক জনকে এ বিষয়ে সিদ্ধ দেখা গিয়াছে। স্বর্গীয় পরেশরঞ্জনকে যাঁরা সভাসমিতিতে দেখেছেন, তাঁদের মনে থাকতে পারে যে, তিনি এ সকল সময়ে কি সুন্দর শান্তভাব রক্ষা করতেন। তিনি যে মণ্ডলীর কোনো বিশেষ ভার নিয়ে কখনও কাজ করেছেন, তা আমার মনে নেই; মনে হয়, তাঁর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, কারণ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার যাঁর ওপর, তাঁর অন্য কাজের অবসর থাকার কথা নয়। তাহলেও দেখেছি, যখনই তিনি সময় করতে পারতেন, অথবা প্রয়োজন মনে করতেন, সভা-সমিতিতে উপস্থিত হতেন এবং সুপরামর্শ দিতেন। অনেক সময়ে দেখেছি যে, উপস্থিত সকলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, কেবল পরস্পরের তীব্র সমালোচনা করছেন, সদ্ভাবের একান্ত অভাব হয়ে পড়েছে, কিন্তু পরেশরঞ্জন তাঁর শান্তভাব রক্ষা করেছেন। কোনো সভাসমিতিতে তাঁকে উত্তেজিত হতে দেখিনে। তাঁর এই শান্তভাব অনেক সময়ে উত্তেজনা দমন করেছে। বেশী জোরে তিনি কথা বলতেন না, বিনীত ভাবে, ধীরে ধীরে, প্রাঞ্জল করে, এমন সুন্দর ও মিষ্ট ভাবে তাঁর বক্তব্য বিষয় বলতেন যে, সকলের মনে সেই শান্ত ভাব এসে পড়ত। তাঁর ভিতর অতি মিষ্ট একটা বিনয়ের ভাব ছিল, এবং যদিও উচ্চপদে কাজ করতেন, বেশ ভূষায় কোনো আড়ম্বর ছিল না, বরং অতি সামান্য বেশ ভূষাতেই তাঁকে অধিকাংশ সময় দেখা যেত। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করা তাঁর স্বাভাবিক একটা গুণ ছিল; বাহ্য আড়ম্বর এ বিষয়ে কিছু ছিল না, অথচ যে সদ্ভাব প্রকাশ করতেন, সেটা যে তাঁর হৃদয়ের কথা, তা সহজেই বুঝতে পারা যেত। মণ্ডলীর সকল কাজে তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি পাওয়া যেত এবং যে বিষয়ে যতটা পারতেন, সাহায্য করতেন। একদিকে যেমন বিধানে তার গভীর বিশ্বাস ছিল, অন্যদিকে তেমনি উদারপ্রাণ ছিলেন, সমাজের দলাদলির ভাব মনে আসতে দিতেন না, সকল শাখার লোকের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তাঁর সুন্দর চরিত্রের প্রভাব সকলের উপর পড়বার আগেই, অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই তিনি পরলোকে চলে গেলেন। প্লেগের সময়ে তাঁর কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদনে রোগের বীজ তাঁর শরীরে প্রবেশ করিল, তাতেই তাঁর জীবন গেল। এমন শান্তপ্রকৃতি মিষ্টচরিত্র সন্তানকে হারিয়ে মণ্ডলী আরো দরিদ্র হয়ে পড়লেন।

আমাদের মণ্ডলী সত্য সত্যই হতভাগ্য, নইলে এমন উপযুক্ত সন্তানেরা অসময়ে চলে যান কেন। একবার দুবার নয়, বার বার আমাদের এই অবস্থা হয়েছে, এবং বার বার এই রকম হওয়াতে মনে একটা নিরাশা আসে যে, আমাদের বুঝি উত্থানের আশা আর নেই। স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ যখন মণ্ডলীর সেবা আরম্ভ করেছিলেন, তখন সকলের কত আশা হয়েছিল যে, আমাদের আদর্শ আবার সকলের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। বিনয়েন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই উচ্চ জীবন গঠন করতে সচেষ্ট ছিলেন। একদিকে যেমন দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চ্চা করে তিনি নতুন নতুন জ্ঞানলাভে ব্যস্ত থাকতেন, তেমনি অন্যদিকে ধর্ম্মসাধন ও গভীর আধ্যাত্মিক সত্যের অনুভূতিও তাঁর প্রিয় বস্তু হয়েছিল। একটা উদার Culture এর আদর্শে তিনি তাঁর সমস্ত জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, আর এই উদার Culture এর প্রভাব তাঁর সকল কথায়, বক্তৃতায় ও উপাসনায় প্রকাশ পেত। তাঁর উন্নত চরিত্র, সুসংযত জীবন, জ্ঞানের পিপাসা জনসমাজে তাঁকে একটা বিশেষ স্থান দিয়েছিল। অধ্যাপনায় তাঁর মতন সুখ্যাতি লাভ করতে খুব কম লোকেই পেরেছিলেন, এবং চরিত্র ও বিদ্যা মিলিয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। কলিকাতার গত ২৫।৩০ বৎসরের অধ্যাপকদের বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ জানি. কিন্তু ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিনয়েন্দ্রনাথের মতন শ্রদ্ধা আর কেহ কখন পেয়েছেন বলে জানি না। তাঁর মুখের প্রশান্ত ভাব, স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও সস্নেহ ব্যবহার সহজেই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত এবং তার ফলে তাঁর গুণমুগ্ধ অনেক শিক্ষিত যুবকের উপর তাঁর জীবনের প্রভাব পড়েছিল। বক্তৃতাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সকল বিষয়ই নূতন ভাবে উপস্থিত করার সুন্দর ক্ষমতা ছিল; সুতরাং সকলেই আশা করেছিলেন যে, প্রতাপচন্দ্রের পর বিনয়েন্দ্রনাথই ব্রাহ্মসমাজের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন। নববিধানের আদর্শ অনেকবার অনেক স্থানে দেশ বিদেশে তিনি প্রচার করেছিলেন এবং মনে হয়, আরো ভাল করে প্রচার করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু উৎকট ব্যাধি এসে অন্তরায় হল। দীর্ঘকাল তাঁকে এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের যাতনা ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু এই যাতনাকেই তিনি তাঁর চরম সাধনের বস্তু করে নিয়েছিলেন। এক এক সময়ে যাতনা এমন তীব্র হত যে, তাঁর রোগাক্লিষ্ট মুখ শাদা হয়ে যেত, তবু সে যাতনা কোন অস্থিরতায় প্রকাশ না করে, সাধনার ভাবে নীরবে সহ্য করতেন। কোনো চিকিৎসা এ যন্ত্রণা নিবারণ করতে পারল না, মৃত্যু এসে তাকে অব্যাহতি দিল, সকলের সকল আশা ভস্ম হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুতে মণ্ডলীর ও ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হয়েছে, এ পর্য্যন্ত তা পূর্ণ হয়নি, তাঁর স্থান শূন্য রয়ে গিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ এখন প্রতিনিধিহীন, জগতের কাছে তার আদর্শ উপস্থিত করে এ রকম কেহ আর নেই; ব্রাহ্মসমাজে সুবক্তা অনেকে আছেন বটে, কিন্তু জ্ঞানে, চরিত্রে, সাধনে, ভাষার লালিত্যে এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিতে উন্নত এমন কেহ নাই, যাঁকে আমরা আমাদের উদার ও বিশাল আদর্শের প্রবক্তারূপে উপস্থিত করতে পারি। বিনয়েন্দ্রনাথ

সে স্থান পূর্ণ করবেন বলে আশা হয়েছিল, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তা হল না

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী।

—•—

কেশবচন্দ্র সেন ও বাল্য-বিবাহ।

কালের কি পরিবর্ত্তন! ভারতে ঐ সেই স্বর্গীয় জ্যোতির বিকীরণ! দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া আজ আমাদের জাতীয় জীবনের গতির ধারা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। যাহা এক সময়ে অনুমান করিতেও পারা যায় নাই, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বহু ব্যক্তিই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কল্পনার তুলিতে আঁকিয়াছিলেন, সেই তাঁহার ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির আদর্শ পরবর্ত্তী সময়ে মহাত্মা কেশব চন্দ্র তত্তাবৎকে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির ৩টী নিশান এক হস্তে ধারণ করিয়া, এক অভিনব ব্যাপারের একটা নূতন আদর্শ দেখাইয়া ছিলেন; কেশবচন্দ্র ঐ আদর্শগুলিকে আকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আজ এখানে সামাজিক আদর্শের নূতন মূর্ত্তির কথাই বলিতে যাইতেছি। ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র ১৮৭২ সনের ৩ আইন প্রণয়ন করাইয়া ছিলেন, উহা সে কালে শুধু ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও, এ দেশে এক অভিনব আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ আইন "সিভিল ম্যারেজ" আইন বলিয়া আখ্যা-প্রাপ্ত হইলেও, সমস্ত ভারতে এক বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র আজ ৪৫ বৎসর হইল, দেহমুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা যেন রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার প্রাণে এক নব অনুপ্রেরণা উপস্থিত করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, রায় সাহেব সর্দ্দার নূতন বাল্য-বিবাহ-নিষেধক আইনটি পাশ হইয়া গেল। বিগত ১লা অক্টোবর মহামান্য রাজ-প্রতিনিধি মহোদয় ঐ বিলে স্বাক্ষর করতঃ উহা এখন আইনে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। আগামী বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতেই এই আইনের বিধান সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রতিপালিত হইবার বিধি ও ব্যবস্থা হইয়া যাইতেছে।

যখন অতীত ইতিহাসের কথা মনে করি, স্মৃতি তখন আমাদিগের সমক্ষে কত ঘটনা ও কত অবস্থার ঐ সেই প্রাচীন চিত্র দেখাইয়া দেয়। মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার পর হইতেই, বাল্য-বিবাহ দূষণীয় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মে। ইহার বিষময় ফল তখন ভারতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের দুই দিক, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, অর্থাৎ খোসা ও শাঁস। এক নিরাকার অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্মের মানস পূজাই ইহার প্রকৃত শস্য। এই শস্য বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন আবরণে আবৃত রহিয়াছে। এখানে আমরা আজ বহিরাবরণের বিষয়েই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ১৮৭২ সনে যখন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনকার কথাই বলিতেছি। কেশবচন্দ্র তদানীন্তন দেশীয় ও বিদেশীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মত গ্রহণ সংগ্রহ করিতে যাইয়া অনুকূল মতই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তখনকার কাশী নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের মতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ অপরিহার্য্য অনুষ্ঠানের উপরে হিন্দু বিবাহের বৈধতা নির্ভর করে, তত্তাবৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ আইনে পুরুষের ১৮ বৎসর এবং মেয়েদের ১৪ বৎসর নিম্নতম বিবাহ-যোগ্য বয়স বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। এতকাল যাবৎ উহা ব্রাহ্ম-সমাজেই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, যদিও বা কখন কখন ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরেও ইহার বিধান প্রতিপালিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই, বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল ব্রাহ্মগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত সমস্ত বঙ্গের ব্রাহ্মগণ সর্ব্বত্র এই দেশব্যাপী বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম ঘোষণা করেন। পূর্ব্ববঙ্গের তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারকগণ মহা উৎসাহে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ দলের অগ্রণী স্বনাম-প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "মহাপাপ বাল্য-বিবাহ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করতঃ শিক্ষিত মণ্ডলীর ভিতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল সংস্কারকগণের সমবেত চেষ্টার ফলে, তখন বঙ্গের স্কুল ও কালেজের সহস্র সহস্র যুবকের প্রাণে তাঁহাদের বক্তব্য ও মন্তব্য সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র যখন "Young Bengal this is for you" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন শত শত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা-মূলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিল। তখনই সঙ্গীতে বাজিয়া উঠিল, "কেনহে বিলম্ব আর, সাজ সত্যের সংগ্রামে" "ক'রে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী, এস যাই ওসেই শান্তি-নিকেতনে। সংসার-সংগ্রামে, কি আর ভয় এ জীবনে, ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে। এস এস ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি, প্রেমালোক দেখ প্রেমনয়নে।" এই সামাজিক যুদ্ধে সেনাপতি কেশবচন্দ্রের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া • বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যুবকগণ তেজস্বী সৈনিকের ন্যায়, শুধু বাল্য-বিবাহ নহে, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, জাতি-ভেদ, কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অন্য দিকে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, পর্দ্দাপ্রথার দূরীকরণ, বালবিধবাদিগের পুনঃ বিবাহ প্রদান, সমুদ্র-যাত্রা, মাদক-নিবারণ, ছুৎমার্গ পরিহার ইত্যাদি সংস্কার-কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে ভূমিকম্পের ন্যায় প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করতঃ, এ দেশকে আন্দোলিত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ বিগত ৭০ বৎসর কাল হইতেই প্রতিনিয়ত নানা ভাবে এ সকল আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, যখন দণ্ডবিধি আইনে বালিকাদের সম্মতির বয়স (Age of consent) ১০ বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে উড়িষ্যা, বোম্বে ও বাঙ্গলার কতিপয় লোমহর্ষণকর দুর্ঘটনা পরিদৃষ্টে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে সম্মতির বয়স বাড়াইবার প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সুখের বিষয়, তখন দেশীয় ও বিদেশীয় বহু সংবাদ-পত্রই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একমত হইয়া তুমুল আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শুধু সংবাদ-পত্র নহে, ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গণ্য মান্য ব্যক্তিও এ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সে সময়ে মাননীয় লর্ড ল্যান্সডাউন রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, এখনও আমাদের প্রাণে সেই সমস্ত স্বপক্ষ ও বিপক্ষের আন্দোলনের বিষয় জাগিয়াই রহিয়াছে। কলিকাতায় গড়ের মাঠে ৩ লক্ষ লোকের প্রতিবাদের চীৎকারধ্বনি এখনও যেন কাণে বাজিতেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গভর্ণর জেনেরেলের আইন সভায় সম্মতির বয়স ১২ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। বহুকাল পরে পুনরায় ১৯২৫ সনে এই সম্মতির বয়স ১৩ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তখন কিন্তু আর সেরূপ ভাবের প্রতিবাদের প্রবল আন্দোলন হইতে দেখা যায় নাই। পুনরায় ১৯২৯ সনে এই বয়স ১৫ বৎসর করিবার জন্যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। তখন ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকমত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এক কমিটী গঠন করিয়া দেন। ঐ কমিটী ভারতের যাবতীয় প্রধান প্রধান নগরে, নরনারী-নির্ব্বিশেষে লোকমত সংগ্রহ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সুবিস্তৃত এক খানি রিপোর্ট নানা প্রকারের ঘটনার উল্লেখ করতঃ, প্রবল যুক্তি সহকারে মুদ্রিত হইয়া আইন সভার সদস্যগণের ভিতরে বিতরিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণও ঐ রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাল্য-বিবাহ-নিরোধক আইন বিধিবদ্ধ হইতে ঐ রিপোর্ট বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছে। এখনও Age of consent Bill খানি কাউন্সেলে Pending রহিয়াছে। যাহা হউক, আমরা অতি মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগণ আজ দেখিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি যে, এতকাল পরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে ছেলেদের ও মেয়েদের যে নিম্নতম বিবাহের বয়স ১৮ ও ১৪ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাই ভারতের যাবতীয় জন সাধারণের জন্য বিবাহের বয়স স্থিরীকৃত হইয়া গেল। এখন সকলেই দেখিতে পাইতেছেন এবং স্বীকারও করিতেছেন যে, যে সকল সমাজ-সংস্কারের কার্য্যগুলি এ যাবৎ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, কেশবচন্দ্র অথবা ব্রাহ্মসমাজ তাহার সমস্তেরই অগ্রদূত (Pioneer)।

ইতিপূর্ব্বে আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, এই যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর শিক্ষিত-মণ্ডলী একত্র হইতেছেন, এই যে তাঁহারা জাতীয় মহাসভার (Congress) সৃষ্টি করিয়া আজ ভারতে যাবতীয় শিক্ষিত-মণ্ডলীর জন্য এক অভিনব জাতি-সংগঠনের আয়োজন করিতেছেন, কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬৮ সনে বোম্বে নগরের "প্রার্থনা-সমাজে" দাঁড়াইয়া "Indian Social Reconstruction" নামক বক্তৃতাতে ইহার বিষয়ে ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যতীন্দ্রনাথের আত্মোৎসর্গ।

আজ কেবল কবির এই গানটি মনে হইতেছে, "সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, তুমি কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসো"। প্রাণে কোন্ অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি ধারণ করে তুমি আজ জীবন-সংগ্রামে বিশ্বজয়ী হইলে? কয় বৎসর আগে কোন শুভদিনে মাহেন্দ্রক্ষণে, নির্জ্জনে নিভৃতে জননীকোলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন কেহ জানিত না, সেই সন্তান আজ বিশ্বপ্রেমিক হইয়া পরহিত-ব্রতপালনে সম্মুখ সমরে অকাতরে জীবনদান করিয়া জগজ্জয়ী হইবেন। অপরের দুঃখমোচন, অন্যের মঙ্গলের জন্য যে জীবন পাত হয়, সেই জীবনই ধন্য। সে জীবন বিফল হয় না, সে জীবন সামান্য নহে। তাহা আজ বিশ্বজগতের সকলের প্রাণভরা শ্রদ্ধা, ভক্তি, আদর, স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিয়া, সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইয়া, বিজয়-মাল্য কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক, গৌরবের মুকুট মস্তকে পরিধান করিয়া, পুণ্যবসনে শোভিত ও সজ্জিত হইয়া স্বর্গদ্বারে উপস্থিত। আজ স্বর্গের জননী স্নেহের সন্তানকে আদরে হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, তাঁর স্বর্গের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই আজ জগতের অসংখ্য অগণ্য মানব-প্রাণ তাঁর কাছে ভক্তি ভালবাসায় লুণ্ঠিত। তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা, পরহিত-কামনার কথা মনে করিয়া আজ সকলের হৃদয় ব্যাকুল, সকলের চক্ষে জল। সকলে আজ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি এই অলৌকিক কঠিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সকলের অসীম স্নেহভক্তি লাভ করিলেন। আজ তাঁর সকল কঠোর তপস্যা সার্থক হইল। সকলে দেশকালের ব্যবধান ভুলিয়া, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ নির্ব্বিশেষে তাঁর জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। কিসের জন্য? তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেম, অসীম ভ্রাতৃস্নেহ, তাঁহার উদার হৃদয়ের অদ্ভুত পরহিত-কামনা, আর আশ্চর্য্য ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণ এবং নিদারুণ নির্ম্মম দুঃখ দৈন্য অভাব কষ্টের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রামে অপূর্ব্ব বীরত্বের জন্য। মানব-জীবনের স্বাভাবিক দুর্বিষহ ক্ষুধার তাড়না, প্রাণসংহার-কারী অসহনীয় তৃষ্ণার যাতনা তুচ্ছ করিয়া, নীরবে সহ্য করিয়া,

বীরের ন্যায় দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, তিলে তিলে প্রাণের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দু দানে জীবনের মহাব্রত পালন করিলেন কোন্ দৈব-শক্তিতে? কোন্ মহাযোগে নিমগ্ন থাকিয়া, কোন্ শান্তির সাগরে দুঃখাগ্নিতে জর্জ্জরিত অশান্ত প্রাণকে ডুবাইয়া রাখিয়া, এ জনহিত-ব্রত উদ্যাপন করিলেন? তাঁহার পরমারাধ্য স্নেহময় পিতার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার স্বর্গীয়া স্নেহময়ী জননীর অনন্ত অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ, সর্ব্বোপরি তাঁর পিতার পিতা, জননীর জননী সেই জগৎপিতা ও জগজ্জননী তাঁর প্রাণে দিব্য শান্তি ও অক্ষয় অব্যর্থ শক্তি দান করিয়া, এই পরহিত-ব্রত-পালনে, এই সম্মুখ-সমরে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করাইলেন। তাই আজ ভগবৎ-প্রসাদে অসংখ্য অগণ্য ভাই বোন পাইলেন, কত স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে নিজের সন্তান জ্ঞানে, তাঁহার অভাবে, তাঁর বীরত্বের কাহিনী স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, সকলেই তাঁহাকে আজ নিজের পরমাত্মীয় স্নেহের ধন বলিয়া মনে করিতেছেন। পৃথিবী আজ কি অমূল্য রত্ন হারাইল! অদ্ভুত কর্ম্মবীর, স্নেহপরায়ণ, স্বদেশ-বৎসল, উদার-হৃদয়, পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে এই অল্প দিনের মধ্যে, এমন অসময়ে, এত শীঘ্র বিদায় দান করিতে হইল বলিয়া, সকলেরই হৃদয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত। মনে হয়, সে সুন্দর পবিত্র জীবন পৃথিবীতে থাকিলে, এই দুঃখে কত জগজ্জনের প্রাণে কত শান্তি মিলিত। এখন দয়াময় ভগবানের কাছে বিনীত কাতর অন্তরের এই প্রার্থনা, এমন জীবন যেন বিফল না হয়, তাঁর এমন আশীর্ব্বাদ যেন নিষ্ফলে না যায়! আজ থেকে সবাই যেন নিজেদের জীবনকে সুন্দর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগী বিশুদ্ধ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক বিশ্বপ্রেমিক করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি। করুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান্ সবাইকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীসরলা দাস।

স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসু।

(১২ই কার্ত্তিক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

সুদূর অখ্যাত পল্লীগ্রামের এক নিভৃত নিরালা কোণে জন্মগ্রহণ করিয়া, দেশের নবজাগ্রত ব্রাহ্মধর্ম্মে যে প্রবল অনুরাগ বিধাতা পিতার জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার উৎস শিশুকাল হইতেই প্রবহমান হইয়াছিল তাঁহার অন্তরের মণিকোঠায়। সঙ্গীদিগের তাস পাশার রসগ্রহণ, ধূম্র বা গাঁজিকার প্রসাদ-সেবন কিম্বা কুৎসিত কদাচার পরিগ্রহণ কোনটীই পিতার জীবনে উপ্ত হইতে অবসর পায় নাই।

পিতার যখন আনুমানিক বয়স ১৭।১৮, তখন পিতামহের স্বর্গারোহণ হয়। কলিকাতায় সুবৃহৎ আলুর কারবার তখন উন্নতির মুখে। সেই ব্যবসারে সেই বয়স হইতেই তিনি নামিয়া পড়েন। বহুদিন পরে উক্ত ব্যবসায়টী ঋণগ্রস্ত হওয়ায় ফেল হইয়া যায়। পিতা যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ের সুবৃহৎ দোকান ঘরখানি, যাহার মাসিক আয় অন্যূন দুই শত টাকা হইতে পারিত, তাহা বেনামীতে রাখিতে পারিতেন; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অন্যায় হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার যে সঙ্কল্প তাঁহার অন্তরে চিরদিন প্রজ্বলিত ছিল, তাহা তাঁহাকে উক্ত মৃত্যুর পথ হইতে রক্ষা করে।

মনে পড়ে, সেই সময় দেশের উপর দিয়া যে স্বদেশী বন্যার ঢেউ চলিয়া গিয়াছিল—দেশ যখন কর্জ্জনের বঙ্গ-বিচ্ছেদে ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে, গর্জ্জায়মান, তখন রাখিবন্ধন উপলক্ষে যে সভা সমিতি হইত, তাহার সহিত পিতার যোগ ছিল। তিনি পোস্তার দুই তিন শত লোকের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া উদাত্ত কণ্ঠস্বরে যখন গাহিতেন, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক", তখন সেই জনমণ্ডলীর চক্ষে যেন উৎসাহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিত। অনাহারে নগ্নপদে সেই প্রৌঢ়বয়সেও, তাঁর এই দেশের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার উৎসাহ তিলমাত্র কমে নাই।

প্রতি বৃহস্পতিবারে দোকান গৃহের উপর তালায় দোকানের কর্ম্মচারী ও বন্ধুবান্ধব লইয়া নিয়মিত ব্রহ্মের উপাসনা হইত। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় কালীনাথ ঘোষ ও আশুতোষ রায় প্রভৃতি প্রায়ই আসিতেন ও আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, এবং পিতাও আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। এই সাপ্তাহিক উপাসনার একটু ইতিহাস আছে। সেই পোস্তার অধিকাংশ ব্যক্তিই অনাচারী ও চরিত্রহীন ছিল। পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যাহাতে উহারা সৎপথে সদ্ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং তদনুসারেই তিনি সাপ্তাহিক উপাসনার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে যখন তিনি আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার প্রার্থনাই ছিল, যেন ঐ সমস্ত ব্যক্তির জীবন ব্রহ্মের অগ্নিতে পুড়িয়া তপ্ত স্বর্ণের আভা পরিগ্রহণ করে। অবশ্য ফল কি হইয়াছিল, তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন, কিন্তু পিতার বাক্যের সার্থকতাই ছিল পিতার প্রেয় ও শ্রেয়। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই হল তাঁর প্রার্থনার মূল সূত্র। এই উপলক্ষে প্রমত্ত কীর্ত্তন হইত এবং সমস্ত লোকই পরম উৎসাহে উহাতে যোগদান করিয়া ধন্য হইতেন।

নববর্ষের ১লা দিবসে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে তিনি হালখাতা সম্পাদন করিতেন। তদুপলক্ষে অনেকেই গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া বিবিধ ভোজ্য পরিবেশিত হইতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বহু নির্যাতন ও দুঃখ সহিতে হইয়াছে। স্বগ্রামে সকলের ধিক্কার-ধ্বনি, আপন জননীর কাতর অশ্রুমোচন, কিছুই তাঁহাকে তাঁহার সুসঙ্কল্প হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ছিলেন পিতার গুরুদেব। গুরুদেবের কোনও পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন

না। এই গুরুদেবের প্রচেষ্টায় তিনি আমাদের মাতামহ শ্রীকুঞ্জবিহারী দেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমাদের এই ধার্ম্মিক মাতামহের স্পর্শে আসিয়া তিনি জীবনে নূতন স্বাদ পাইলেন, ব্রহ্মের নামে নিজকে বিলাইয়া দিলেন।

দোকানের সহস্র কার্য্য, অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও, তিনি কোনও রবিবার সমাজে অনুপস্থিত বড় হন নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাত্যহিক উপাসনা না করিয়া তিনি মরণকাল পর্য্যন্ত অন্নগ্রহণ করেন নাই, রোগে, শোকে, দুঃখে, বিপদে প্রাত্যহিক প্রার্থনার কোনই ব্যাঘাত হয় নাই, বরং বিপদ যত নিকটতর হইয়াছে, দুঃখ যত কঠিনতম হইয়া বাজিয়াছে, ততই তাঁর ঈশ্বরের আরাধনা যেন বাড়িয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় তিনি করতাল বাজাইয়া, "হরি দিনত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে" এই সঙ্গীতটী গাহিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর প্রভাতেও তিনি ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

এমন অক্রোধী লোক সংসারে খুবই অল্প দেখিয়াছি। কটু-বাক্য, অশ্লীল কথা শুনি নাই। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, হিংসা, বিদ্বেষ ছিল না বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হবে না। এই কথা ভাবাতিশয্যে বলিতেছি না, ইহা যথার্থই খাঁটী সত্যি কথা। পিতার জীবনের মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য্য ও চরিত্রের শুচিতা বাস্তবিকই আচরণীয়।

ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রীকেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিধাতা যাঁদের পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, যদিচ পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের পথেই সারাজীবন ধৈর্য্যের সহিত, প্রেমের সহিত চলিয়াছেন। এই চলার কোনও অহঙ্কার ছিল না, কোনও বাহ্যাড়ম্বর ছিল না—একান্ত নীরবে, নিতান্ত নিরালায় এই চলার যাত্রা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

প্রতিদিন ভোরে মাতৃস্তোত্রম্ এবং "নিশি প্রভাত হল, মা বলে ডাক" ও "জয় ভবকারণ জগত-জীবন" এই দুইটী সঙ্গীত প্রায়ই গাহিতেন এবং উপাসনা করিতেন। পুনরায় মধ্যাহ্নে উপাসনা ও সন্ধ্যায় সঙ্গীত "হরি দিনত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে" গাহিতেন। পূর্ব্বে সন্ধ্যায় দুতিনটা সঙ্গীত করিতেন, কিন্তু ইদানীং "হরি দিনত গেল" কেবল এই সঙ্গীতটীই সম্বল ছিল। একদিন মা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আজকাল আর অন্য সঙ্গীত করেন না কেন? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "যাবার সময় এখন আর অন্য সঙ্গীত কি গাই।"

ব্রাহ্ম-সমাজের কীর্ত্তনে পিতার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান যদিচ ছিল না, কিন্তু তিনি সমান ভাবে নিজেকে এই কীর্ত্তনের ভিতর বিলাইয়া দিতেন। কণ্ঠে মিষ্টতা ছিল না, সুরের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপও মগজে স্থান পায় নাই। কিন্তু কীর্ত্তনের ভিতর একেবারে ডুবিয়া যাওয়া যাহাকে বলে, তিনি তাহাই হইয়া যাইতেন। প্রাণের ভক্তির সরসতায় বাহিরের কোন অভাব তাঁহাকে কীর্ত্তন-সম্ভোগে বাধা দিতে পারে নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সমন্বয়ের ধর্ম্ম, তাহা অনেকেই ভুলিয়া বিবাদ বাধাইয়াছেন। পিতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান-সমাজ বা ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কোনও পার্থক্য করিতেন না। তাঁহার উদার অন্তরে কোনও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, তবে প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের গুণগান করিতেন।

পোষাকে, পরিচ্ছদে পিতা খাঁটী স্বদেশী ছিলেন। অনেক সময় শুভ্র উত্তরীয় স্কন্ধে ও চরণে চটীজুতা পরিয়াই সমাজে যাইতেন। জীবনের ভিতর বিলাসিতা বলিয়া যে পদার্থ তাঁর ছিল, অতিবড় শত্রুও তাহা বলিতে পারিবে না। সরল, শান্ত এবং অনাড়ম্বর জীবনই ছিল তাঁর আচরণীয়।

শেষ জীবনে তিনি বড় বেশী কথা বলিতেন না। কেহ প্রণাম করিলে বা কুশল সংবাদ জানিতে চাহিলে, তিনি হাস্যের সহিত দুই চারটী কথায় জবাব দিতেন—সে হাসি বাস্তবিকই যেমন অনাবিল স্বচ্ছ, তেমনই শান্ত। মানুষের অন্তরে কতখানি প্রসন্নতা থাকলে, মানুষ এইরূপ হাসিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শেষ জীবনে পিতার একটানা সুখে কাটে নাই সত্য, কিন্তু তাঁর বাহিরের কথায় ও কার্য্যে ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইত না। হৃদয়ের কোন অতল তলে ডুবিতে পারিলে যে এই শান্তরূপ পাওয়া যায়, তাহা উপলব্ধির বিষয়। এই শান্ত ভাব পিতার জীবনে স্থায়ী হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে এই কথাই বলিতে চাই যে, মৃত্যুভয় তাঁর কোন দিনই ছিল না—তিনি শেষ জীবনে যেন মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্যই আপনার দীর্ঘজীবনের তপস্যার পূর্ণ ডালা লইয়া প্রীতি-হাস্যে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মৃত্যু সত্যই যখন দুয়ারে তার ভিক্ষাঝুলি পাতিল, তখন অমৃতধাম-যাত্রী তাঁর সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে ঢালিয়া দিলেন। কোনও খেদ নাই, কোনও ক্ষোভ নাই, কোনও অনুতাপ নাই। ধরিত্রীর কোলে যে জীবন একদা দীনের মত আসিয়াছিল, আজ বিদায় বেলা শেষে তাহার পরিপূর্ণ দানের আনন্দে উদ্বেল হইয়া, আপনাকে তাঁরই চরণে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া, অমৃতলোকে প্রয়াণ করিল—পিছনে পুঞ্জিত মেঘদল তাঁহার স্তবগান রচনা করিল।

সংবাদ।

আই, সি, এস—আমরা শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম, আমাদের মণ্ডলীর সকলের প্রিয়, স্বর্গগত শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দের পৌত্র, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুশীল কুমার দে আই, সি,

এম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা এজন্য ভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা দান করি। ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং ইঁহাকে দেশের, মণ্ডলীর ও পরিবারের গৌরব করুন।

জন্মদিন—গত ২১শে আশ্বিন, হাওড়ায়, শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ তপনের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জন্মদিন ও আরোগ্য-লাভ—গত ১০ই অক্টোবর, ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে, স্বর্গগত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বিকাশেন্দ্র নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র কুমার আলোকেন্দ্রের আরোগ্য-লাভে এবং তৃতীয় পুত্র কুমার সুখেন্দ্রের জন্মদিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। পিতামহী শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

নামকরণ—গত ৭ই অক্টোবর, বাঁকিপুরে, "করুণাকুটিরে", শ্রীযুক্ত দামোদর পালের পৌত্র, শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ পালের প্রথম শিশু পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। দামোদর বাবু উপাসনা করেন এবং শিশুর নাম "ঋতানন্দ" রাখেন। এই উপলক্ষে দামোদর বাবু কর্ত্তৃক যে নূতন সঙ্গীত রচিত ও গীত হইয়াছিল, তাহা গতবারে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই অনুষ্ঠানে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শুভবিবাহ—গত ১০ই অক্টোবর, ২০শে আশ্বিন, হাওড়ায়, ১৯৮নং বেলিলিয়স্ রোডে, স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার দাসের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী সুধাংশুপ্রভার শুভ পরিণয় লক্ষ্ণৌ-নিবাসী স্বর্গীয় নীলমণি ধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ শর্ব্বরী-কান্ত ধরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয় কুমার লধ এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। ভগবান্ এই নবদম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

আরোগ্য-লাভ—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রায় দুইমাস কাল শয্যাগত থাকিয়া, মার কৃপায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরীতে গিয়াছেন। চিকিৎসা, সেবা ও অর্থাদি দ্বারা যাঁহারা এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ভগবান্ তাঁদের আশীর্ব্বাদ করুন।

পরলোক-গমন—আমরা গভীর-শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে নিম্ন-লিখিত পরলোক-গমন-সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি:—

গত ২২শে অক্টোবর, পাটনায়, পাটনা সেক্রেটারিয়েটের রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্ম্মিণী, স্বর্গীয় রামকুমার বিদ্যা-রত্নের কন্যা শ্রীমতী রমা দেবী প্রিয়তম স্বামী, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারিণী, পতি-প্রাণা, সন্তান-বৎসলা, ভক্তিমতী নারী ছিলেন। স্বীয় পবিত্রতা ও সাধুশীলতার গুণে সকলের ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অভাব পাটনার ব্রাহ্মমণ্ডলী বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছেন।

গত ২৪শে অক্টোবর, রাঁচিতে, আমার স্বর্গগত সাধক ডাঃ নৃত্যগোপাল রায়ের সাধ্বী ভক্তিমতী ভগ্নী শ্রীমতী ক্ষীরোদমোহিনী বসু নববিধান-জননীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ অনুকূল চন্দ্র মিত্রের সঙ্গে কলিকাতা হইতে রাঁচিতে, অপর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র মিত্রের গৃহে, জল-বায়ু-পরিবর্ত্তন-মানসে গিয়াছিলেন। এখন চিরসুস্থতার রাজ্যে মহানন্দে অমর সতীদলে বিচরণ করিতেছেন। মৃত্যু-শয্যা-পার্শ্বে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুমতি মজুমদার উপাসনা করেন। সুবর্ণরেখার তীরে তাঁহার পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হয়। ইনি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। পিসীমাকে হারাইয়া আবার ইঁহারা মাতৃহীন হইলেন।

গত ২৭শে অক্টোবর, বসিরহাটে, চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গগত রায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ফণীন্দ্রভূষণ দত্ত হঠাৎ অনন্ত লোকে পিতামাতার বক্ষে চলিয়া গেলেন। বিনীত শান্ত ফণীন্দ্রভূষণ নীরব জীবন সাধন করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে অমৃতলোকে নিত্য স্নেহ-বক্ষে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২০শে অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক, চট্ট-গ্রামের স্পেশ্যাল সাবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাসগুপ্তের সহধর্ম্মিণীর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অশোকা বর্ম্মার অন্তর্গত টাঙ্গুতে, তথাকার অ্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বানার্জির গৃহে উক্ত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সুরেন্দ্র বাবুই উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী অশোকা নববিধান-প্রচার-আশ্রমে ৫৲, ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ডে ৫৲, শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থে ৫৲, এবং অন্যান্য স্থানে ২০৲ টাকা, মোট ৩৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। চট্টগ্রামে "আশাকুটিরেও" পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জানকী নাথ দাস উপাসনা করেন। শ্রাদ্ধের অন্যান্য বিবরণ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

গত ২৯শে অক্টোবর, ১২ই কার্ত্তিক, কলিকাতায় ৩৩নং মদন মিত্রের লেনে, স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসুর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান গম্ভীর-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোক-

পাঠে সহায়তা করেন। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় স্বর্গগত বন্ধুর সঙ্গে আত্মযোগে যুক্ত হইয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ সুহাসচন্দ্র বসু পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমান্ মনোমোহন বসু পিতৃতর্পণ উদ্দেশে সুন্দর একটী কবিতা পাঠ করেন, এবং এই উপলক্ষে তদ্রচিত সুন্দর পবিত্রভাবপূর্ণ চারিটি নূতন সঙ্গীত গীত হয়। সংক্ষিপ্ত জীবনীটি স্থানান্তরে দেওয়া গেল। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে:—

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, নববিধান প্রচারাশ্রম ৫৲, নববিধান ট্রাষ্ট ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের সেবার্থে ২৲, ভাই প্যারীমোহনের সেবার্থে ২৲, গিরিধি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, মুঙ্গের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, বালেশ্বর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ভবানীপুর সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজ ২৲, যতীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডার ২৲, অনাথাশ্রম ২৲, আতুরাশ্রম ২৲, মহানাদ পুওর সোসাইটী ২৲, নারীরক্ষা-সমিতি ২৲, কালাবোবা বিদ্যালয় ২৲, অন্ধ বিদ্যালয় ২৲, বিধবাশ্রম ২৲, আর্য্যসমাজ ২৲, বৌদ্ধ সমাজ ২৲, Salvation Army ২৲, Sunday School ২৲ টাকা. মোট ৫৩৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত ভোজ্য, বাসন, বিনামা, ছাতা, বস্ত্রাদিও দান করা হইয়াছে।

ভগবান এই সকল অনুষ্ঠানকে সফল করুন, পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের মঙ্গল শান্তি বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—বিগত ১১ই ও ১৬ই অক্টোবর, আরা-নিবাসী সাধক স্বর্গগত ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী দেবীর একত্রিংশ সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্রের যুগীপাড়াস্থ বাস-ভবনে সম্পাদিত হইয়াছে। ১১ই ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং ১৬ই স্বর্গস্থ সাধুর কনিষ্ঠা ভগ্নি শ্রীমতী ক্ষিরোদমোহিনী বসু উপাসনা করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই আশ্বিন, আণ্টনী বাগানে, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় বরদা প্রসাদ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৬ই আশ্বিন, ১০নং নারকেলবাগান লেনে, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে, স্বর্গগত প্রেরিতপ্রবর ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৩০শে ভাদ্র, স্বর্গীয় প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে ব্রহ্মানন্দাশ্রমে তাঁহার পরিবারবর্গ সহ বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণ দিনে, ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ রোগমুক্ত হইয়া দুর্ব্বল শরীরে প্রথম আশ্রম-দেবালয়ে উপাসনা করেন, শ্রীযুক্তা হেমকুসুম মল্লিক (মিসেস্ ডি, এন, মল্লিক) রাজার সম্বন্ধে আচার্য্য-দেবের উক্তি পাঠ করেন।

২রা অক্টোবর, শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্রের ও ভ্রাতা নন্দলালের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণেও ব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২৭শে অক্টোবর, ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে, কুচবিহারের স্বর্গগত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী হৃদয়-স্পর্শী সুন্দর প্রার্থনা করেন।

গত ৩১শে অক্টোবর, ৭৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস একটী সুন্দর প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দাস প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১২নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, উয়ারী, ঢাকা, শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদার গৃহে, গত ২৬শে অক্টোবর, তাঁহাদের স্বর্গগত পিতৃদেব শশিভূষণ মল্লিকের নবম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ এবং শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থ ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে। তাঁহার ডায়েরী হইতে নিম্ন ভাবাংশ পঠিত হয়:—"পুণ্য শান্তির আলয় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌ই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিপূরণের কর্ত্তা। তিনি পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা, পতিহীনার পতি। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি আত্মদান করিয়া একগুণ ক্ষতি সহস্র গুণে পূর্ণ করেন। তিনিই সর্ব্বস্ব হরণ করেন, আবার তিনিই ক্ষতি পূরণ করেন।" তিনি ২৭ বৎসর বয়সে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের উপায়স্বরূপ উন্নতিপ্রদ সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করিয়া প্রচারক-ব্রত অবলম্বন করেন। তৎপর যে সকল অসহায়া অবলা সংসারে নিগৃহীতা, সমাজ-পরিত্যক্তা হইয়া কি ভীষণ ও বিষময় জীবন যাপন করে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য 'মাতৃ-নিকেতন' স্থাপন করেন। কত বাধা বিঘ্ন অত্যাচার অপমান দুঃখ পরীক্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া, ২৫ বৎসর কাল অক্লান্ত-ভাবে, শতাধিক পরিত্যক্তা শিশু বালক ও বিপদগ্রস্তা নিরাশ্রয়া বিধবাদের আশ্রয় ও শিক্ষা দীক্ষা দিয়া সেবা করিয়াছেন। জীবন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা তাঁহার সকল কার্য্যের সহায় ছিল।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২০শে কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 17th November, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, আমাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাস দাও। অবিশ্বাস, অল্পবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস যেমন, তেমনি ভীরুতা, কাপুরুষতা, সংশয়-বাদিতা, বিচার-বুদ্ধি-প্রবণতা আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। মা, তুমি আমাদিগকে এমন সার্ব্বজনীন মহান্‌ নববিধান দান করিলে! কোথায় আমরা ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া, জীবন দ্বারা ইহার সাফল্য দান করিব, না, লোকের মন যোগাইতে বা পাছে আমরা কাহারও অপ্রিয় হই, এজন্য কতই ভয়ে ভয়ে, সকলকার মনস্তুষ্টি করিয়া, ধর্ম্মপ্রচার করিতে চেষ্টা করি। ইহা দ্বারা প্রমাণ এই হয় যে, আমাদের এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, পূর্ণসত্য-প্রচারে সৎসাহস জন্মায় নাই। নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাসের অর্থ, মা, তোমাতে পূর্ণ বিশ্বাস, তোমার প্রত্যাদেশে পূর্ণ বিশ্বাস, তোমার ভক্তে পূর্ণ বিশ্বাস এবং তোমার বিধানে পূর্ণ বিশ্বাস। এই চতুর্ব্বিধ বিশ্বাস কি যুগপৎ আমাদিগের হইয়াছে? নিঃসংশয়ে নির্ভয়ে কি বলিতে পারি, এই তুমি নিত্য বিদ্যমান, তোমাকে দেখা সহজ, তুমি ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করি না, তোমার অভ্রান্ত প্রত্যাদেশ-বাণী বিবেক-কর্ণে শুনিয়াছি, তোমার প্রত্যাদেশ বিনা আর কাহারও কথা মানি না। তোমার নববিধান সার্ব্বজনীন বিধান, অভ্রান্ত সনাতন ধর্ম্ম, ইহাই পূর্ণ ধর্ম্ম। ইহা সমগ্র মানব-পরিবারকে এক পরিবার করিয়া, এক ধর্ম্মদানে ধন্য করিতে অবতীর্ণ এবং তোমার নবভক্ত নববিধান-মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তোমারই প্রেরিত। একমাত্র এই বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা অবলম্বনেই নববিধান-জীবন লাভ করা যায়। মা, যদি নববিধানের আশ্রয়ে তুমিই আমাদিগকে আনিয়াছ, তবে এই পূর্ণ বিশ্বাস দানে আমাদিগকে রক্ষা কর। ইহাই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা। আমরা যেন এই এক পূর্ণবিশ্বাসাবলম্বী দল হইয়া তোমার নববিধানের যথার্থ সাক্ষ্য দান করিতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাসী।

নববিধানের পঞ্চাশত্তম বর্ষোৎসব আগত প্রায়। আমরা এই মহামহোৎসব সাধন ও সম্ভোগের জন্য কি প্রস্তুত হইয়াছি? আমরা কি নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাসী দল বলিয়া সাক্ষ্য দান করিতে পারি?

আমরা পাপী, আমরা অপরাধী, সহস্র প্রকার ত্রুটী দোষ দুর্ব্বলতা যে আমাদের আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা কেহই শুদ্ধ নই, খাঁটি নই; জ্ঞানের অভাব, শিক্ষার অভাব, সাধনের অভাব, পাপ প্রবণতা আমাদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহা সত্বেও, তাহা জানিয়াও, নববিধান-বিধায়িনী জননী যিনি, তিনি আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার মহানববিধানের আশ্রয়ে শুধু স্থান দিয়াছেন তাহা নয়, আমাদিগকে তাহার সাক্ষ্য দান করিতে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

আমরা যে নববিধানের কত অনুপযুক্ত, তাহা কে না জানি, কে না জানিতেছে? তথাপি বিধান-জননী যে কেন আমাদিগকে এত বড় উচ্চ ধর্ম্ম প্রচার ও প্রমাণ করিতে ডাকিলেন, আমরা ত ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে বিশ্বাস করিয়া ডাকিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি না ডাকিলে, কে এখানে আসিত? যাহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না, আপনার লোকেরাও যাহাদের শত দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়া অবিশ্বাস করে, অকর্ম্মণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে, বিধানপতি যিনি, তিনি কেমন করিয়া তাহাদিগকে সেবকত্বে নিয়োগ দান করিলেন? তাঁর অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায় কে বুঝিবে? পঙ্কের ভিতর হইতে যিনি পদ্মফুল প্রস্ফুটিত করেন, যুগে যুগে যিনি কতই অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন, কতই অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছেন, এবারও হয়ত এই সকল মূর্খ, অকর্ম্মণ্য, অনুপযুক্ত ও পাপী অধমদিগের দ্বারা তাঁহার এই উচ্চ ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন মহাবিধান প্রমাণ করিয়া লইবার জন্যই, এই নূতন লীলার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা তাই একান্ত-হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হই এবং সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনুপযুক্ততা ও নিতান্ত হীনতা স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হই।

আমাদের পাপ অপরাধ যেমন, আমাদের বিশ্বাসের অভাবও তো তেমনি। ঈশ্বর আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া এত বড় নববিধানের ভার দিলেন, আমরা কই তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি? তাঁহাকে যদি প্রকৃত বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আমরা ভাইকেও বিশ্বাস করিতে পারিতাম। তিনি যেমন আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন, আমার ভাইকেও তো তেমনি বিশ্বাস করিয়া ডাকিয়া আনিয়া বিধানের ভার দিয়াছেন। তবে ঈশ্বর যাঁকে বিশ্বাস করিয়াছেন, আমি যদি তাঁকে বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে কেমনে আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলাম? বাস্তবিক ভাইকে বিশ্বাস করাই যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার প্রমাণ এবং প্রধান প্রমাণ।

আমি যদি আপনাকে বিশ্বাস করি যে, আমি অধম পাপী অনুপযুক্ত হইলেও, আমাকে ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নববিধান-রথ টানিতে নিযুক্ত করিয়াছেন, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেন না বিশ্বাস করিব, আমার ভাইয়ের সহস্র দোষ দুর্ব্বলতা ত্রুটী সত্বেও তিনি যখন নববিধানে ডাকিয়াছেন, তিনি যখন নববিধানে আশ্রয় দিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকেও বিশ্বাস করিয়াছেন যে, তাঁহার দ্বারা তাঁহার বিধানের কার্য্য হইবে। এই ভাবে পরস্পরকে বিশ্বাস ও গ্রহণই নববিধানের প্রমাণের লক্ষণ।

আবার মা যেমন, বিধান-প্রবর্ত্তকও তেমনি আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও নববিধানের এক বিশেষ কথা। পরস্পরে আমরা একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। নববিধানে বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব এই যে, নববিধানে আহূত যাঁরা, তাঁহারা এক অখণ্ড-দেহ। বাস্তবিক নববিধান ব্রহ্মের একত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেই প্রধানতঃ সমাগত। স্বয়ং বিধাতা পুরুষই নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দকে এক অখণ্ড মানবরূপে দাঁড় করাইয়াছেন; তাইত তিনি নির্ভয়ে বলিলেন, "সকল মানব আমাতে, আমি সকল মানবে" "শত শত হস্ত, শত শত নাসিকা, শত শত চক্ষু, এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ, সেই আমি। আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যে যেখানে থাকেন আমি সেখানে যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন।" ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস চাই।

নববিধানে "স্বতন্ত্রতা, ভিন্নতা, আমি আমি" নাই। যথার্থ নববিধান-বিশ্বাসী হইলে "আমি তুমি" বলিতে পারি না। আমি আমার যেখানে, আমার মত, আমার ভাব, আমার ধর্ম্ম যেখানে, নববিধান নাই সেখানে। নববিধানে সকলে মিলিয়া একজন, একপুরুষ, এক বিশ্বমানব।

অতএব আমাদের নিজ অহঙ্কৃত আমিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বলিদান করিয়া, আমরা যে সেই এক-জন, এক ব্রহ্মানন্দের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইহা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা হইতে পারিতেছে না বলিয়াই, নববিধান জয়যুক্ত হইতেছে না।

তাই ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবে এবার যার বলে যাহাতে আমাদের প্রতি জনের ব্যক্তিত্ব আমিত্ব এক অখণ্ড মানবত্বে বিসর্জ্জন দিয়া, পুরাতন "আমি আমার" সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া, নববিধানের নব শিশু-জন্ম গ্রহণ করিতে পারি, তাহারই জন্য কৃতসংকল্প হই।

যেমন সেনাদল সৈন্যাধ্যক্ষের চিহ্নিত সাজেই সজ্জিত হয়, পদাতিক পুলিশ পাহারাওয়ালাগণ একই চিহ্নিত উর্দ্দি পরিলেই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনে অধিকারী হয়, তেমনি নববিধান-প্রবর্ত্তকের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া, তাঁহার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম, তাঁহার জীবনই আমার জীবন, তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার প্রার্থনা, তাঁহার যাহা কিছু সাজ সজ্জা, তাহাই আমার, আমার আর স্বতন্ত্র কিছুই নাই, এই বলিতে পারিলেই তবে আমরা নববিধানের লোক। উর্দ্দি ছাড়িলে যেমন পাহারাওয়ালা আর পাহারাওয়ালা থাকে না, তেমনই অখণ্ড মানব ব্রহ্মানন্দকে ছাড়িয়া আমার জীবন আর নববিধানের নয়, আমি নিজে কিছুই নই। এই ভাবে যদি আমরা যাহারা নববিধানে আহূত, সকলে একবাক্যে নববিধান-ঘোষণা ও জীবনে নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তবেই নববিধানের পঞ্চাশত্তম বর্ষোৎসব সম্পাদনে ধন্য হইব।

আর ভয়ে ভয়ে লোকের মন যোগাইয়া কথা বলিলে চলিবে না। লোকে যে যা বলে বলুক, সত্যকে আর গোপন করা চলে না। অনুমানের সুরে, বাদ সাদ দিয়া, লোকের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া আমরা যথেষ্টই সর্ব্বনাশ করিয়াছি; নববিধানে প্রজ্বলিত দীপ নির্ব্বাণপ্রায় করিয়া তুলিয়াছি। আর না।

সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।

আত্মত্যাগ ধর্ম্ম, আত্মহত্যা অধর্ম্ম। প্রতিজ্ঞা, সংকল্প, সত্য-নিষ্ঠা ধর্ম্ম, বৈষয়িক স্বার্থসন্ধি বা রাগ দ্বেষ হিংসার বশ্যতা অধর্ম্ম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বা আদেশে আত্ম-বলিদান ধর্ম্ম, আপন ইচ্ছায় বা কল্পনার বশে আত্মবলিদান অধর্ম্ম। স্বাধীনতা ধর্ম্ম, স্বেচ্ছাচার অধর্ম্ম। বাধ্যতা ধর্ম্ম, অবাধ্যতা অধর্ম্ম।

স্বাধীনতা ও অধীনতা।

স্বাধীনতা চাও, স্বাধীনতা দাও। যদি আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বদ্ধ-পরিকর হও, অন্যেও যাহাতে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে, তৎপ্রতি সহানুভূতি ও সম্মান দেখাইবে। যে অন্যকে আপনার ইচ্ছা বা মতের অধীন করিতে ব্যস্ত, তিনি যথার্থ স্বাধীনতার মর্য্যাদা জানেন না। স্বাধীনভাবে, সজ্ঞানে, সত্যের অনুরোধে অন্যের অধীনতা পরাধীনতা নয়, আত্ম-মর্য্যাদাহীনতাই যথার্থ পরাধীনতা।

সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ।

প্রস্তর খণ্ডের ভিতর হইতে কেমন সুন্দর দেব দেবীর মূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি, শঙ্করমূর্ত্তি গঠিত হয়। কিন্তু এই সকল মূর্ত্তি খুদিয়া বাহির করিতে, প্রস্তর খণ্ডকে স্থপতি কতই কাটা ছাঁট করে, গঠন পিটন করে। আর শোঁয়া পোকা হইতে যখন প্রজাপতি বাহির হয়, তখন অলৌকিক ভাবে সহজেই হইয়া থাকে। মানুষ নিজ পুরুষকার ও সাধনবলে আত্ম-জীবনকে উন্নত করিতে চায়, কতই তাহাকে সাধ্য সাধনা করিতে হয়, কতই তাহাকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়; কিন্তু যা স্বয়ং তিনি কৃপাগুণে বিষাক্ত লোমশ পোকাকেও প্রজাপতিরূপে বাহির করিয়া দেখান, আমাদের পাপ জীবন হইতেও শুদ্ধ ও সৌন্দর্য্য-পূর্ণ জীবন বাহির করিতে পারেন।

স্মৃতির সৌরভ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সকলের জীবন কিছু এক ভাবে গঠিত হয় না—কেহ বিদ্যা-চর্চ্চা বা Culture এর ভিতর দিয়ে "সত্য, শিব, সুন্দরের" অনু-সন্ধানে অগ্রসর হন, কেহ বা নীরব, জীবনগত, সহজ সাধনার ভিতর দিয়ে "সৎ, চিৎ, আনন্দকে" পাওয়ার প্রয়াসী হন—বিশ্বের চক্ষুর কাছে দুই পথই সমান। প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, চরিত্রের বিশেষত্ব আছে, সেই অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধনার পথ হয়। এই নীরব সাধনা স্বর্গীয় অমৃতা-নন্দের জীবনে বেশ সুস্পষ্ট হয়েছিল। প্রথম যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন প্রচারাশ্রম ২০নং পটুয়াটোলায় ছিল, তখন আমরা কয়েকজন স্কুলে পড়ি। অমৃতানন্দকে "অমদা" বলিতাম এবং তিনিই আমাদের এক প্রকার অভিভাবক ছিলেন—পড়ায় অমনোযোগ, ব্যবহারের উচ্ছৃঙ্খলতা সব শাসনের

ভার তাঁর ওপরে ছিল। তাঁর শাসনও বড় কঠিন ছিল. মনে হয়, আমাদের মনে ভীতি জন্মিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি তাঁর স্বাভাবিক কোমল প্রকৃতিকে একটা রুদ্র আবরণে ঢেকে রাখতেন, কাজেই আমরা তাঁকে খুব ভয় করে চলতাম। প্রচারাশ্রমের দোতলার একটী কোণের ঘরের উপর আমাদের পাশের বাড়ীর একটী জামরুল গাছ এসে পড়েছিল, সুতরাং যখন জামরুল পাকিতে আরম্ভ হত, আমরা নানা কৌশল উদ্ভাবন করে সে গাছের উপর উপদ্রব করতাম। এ তস্কর-বৃত্তিতে ফললাভের চেয়ে অলাভই বেশী হত, তবু এর উপস্বত্ব যেটুকু পাওয়া যেত, তা-ই আমাদের কাছে অতি মিষ্ট ছিল। কিন্তু গৃহস্বামীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রতাপে আমরা সুযোগ বেশী পেতাম না এবং প্রায়ই ধরা পড়তাম। তখন গৃহস্বামী বাধ্য হয়ে "কাকা বাবুর" কাছে নালিশ করতেন এবং ক্রমে "অমীদার" উপরে আমাদের শাসনের ভার পড়ত, কারণ এ সবের আপীল ডিক্রি ডিস্‌মিস্ সবই তাঁর হাতে ছিল। তাঁর শাসনে আমরা কিছুদিন চুপ করে থাকতাম বটে, কিন্তু তাতে যে স্থায়ী কোনো উপকার হত, তা এখন স্মরণ হচ্ছে না। "অমীদা" এই সব শাসনের ভার নিয়েছিলেন বলে সে সময়ে তাঁকে ভয় করেই চলতাম, কিন্তু পরে যখন তাঁকে বন্ধুভাবে পেলাম, দেখলাম, তাঁর ভিতরে কত স্নেহ, ভালবাসা, মিষ্টতা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর বেশী ছিল না, তাঁর পিতা উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের পাণ্ডিত্যও তিনি লাভ করতে পারেন নি; কিন্তু ধর্ম্মসাধন বিষয়ে ইংরাজি বাংলা বই অনেক পড়তেন এবং সেগুলি থেকে যা পেতেন, সাধনের সম্বল করে নিতেন। তাঁর নির্ম্মল চরিত্র, সরল সাদা মন সকলকে আকৃষ্ট করিত, আর তাঁর সাংসারিক বিষয়ে অপটুতা সকলের আমোদের বস্তু ছিল। সহজ একটা বৈরাগ্য ও সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি তাঁর যেন মজ্জাগত ছিল; দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম তাঁর কাছে দুরদৃষ্ট বা বিরক্তির কারণ না হয়ে সাধনের সহায় হয়েছিল, তারই ভিতর দিয়ে তিনি নীরবে সাধনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে গান আরো মিষ্ট হত এবং সেই গানের ভিতর দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যেত। সভাসমিতিতে কখনও তাঁকে বেশী কথা বলতে শুনেছি তা মনে হয় না, কিন্তু ব্যক্তিগত আলোচনায় প্রাণ খুলে কথা বলতেন এবং তর্ক বিতর্কের মধ্যে অন্যপক্ষের বক্তব্য খুব ভাল করে শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করতেন, যাতে যুক্তিতে বিপক্ষের প্রতি কোনো অবিচার না হয়, সে বিষয়ে খুব সাবধান হতেন। আর একটী বিশেষত্ব তাঁর দেখতাম যে, নিজে কারও নিন্দা করতেন না, এবং কেহ কারও নিন্দা করলে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেষ্টা করতেন যে, বিষয়টা নিন্দার কারণ না-ও হতে পারে। এই সব থেকে বুঝতে পারা যেত যে, তাঁর ভিতর কতটা মিষ্টতা ছিল, সে মিষ্টতার পরিচয় যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরাই তাঁর গভীরতা বুঝেছিলেন। ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁর বন্ধু বান্ধবের তো কথাই নেই, পরিচিত সকলকেই স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে আপনার করে নিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়ের কোমলতা, স্নেহস্নিগ্ধ ব্যবহার ও চরিত্রের মিষ্টতায় খানিকটা বুঝতে পারতাম যে, ধর্ম্মপ্রাণ সাধক কতটা মোহিত ও আকৃষ্ট করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-সাধন তাঁর জীবনকে আরও উন্নত কচ্ছিল এবং তিনি বিনা আড়ম্বরে প্রচার-ব্রত-গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর এখানকার সাধনা শেষ হয়ে গেল, বিদেশে আত্মীয়-স্বজনহীন স্থানে, অল্পকাল জ্বর ভোগ করে, পরলোকে চলে গেলেন। উপাধ্যায়ের সন্তান তিনি, মণ্ডলীর গৌরবের বস্তু, সকলের প্রিয় হয়েছিলেন, মণ্ডলী গভীর শোক পেলেন। আমাদের মনে হল যে, এত মিষ্টতা, এত সরলতা, এত ভালবাসা বিধাতা এমন করে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিলেন কেন।

প্রচারাশ্রমের ছাত্রাবাসে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের ওপর কয়েকটা সাধকের প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়েছিল। উপাধ্যায়ের কঠোর বৈরাগ্য, কান্তিচন্দ্রের স্নেহকোমল ভালবাসা এবং গিরিশচন্দ্রের একনিষ্ঠা অলক্ষ্যে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত এবং ইহার প্রভাব কিছু না কিছু সকলেরই মনে স্থান পেয়েছিল। সে সময়ে নানাস্থান থেকে যুবকেরা এসে এই ছাত্রাবাসে থাকতেন এবং এই ভাবে অনেকে পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বাল্যকালের ও ছাত্রাবস্থার স্মৃতি সকলেরই কাছে মিষ্ট ও প্রিয়, আমরা যারা সে সময়ে এক সঙ্গে ছিলাম, আমাদের কাছেও সে সময়কার স্মৃতি খুবই আদরের; ছাত্রাবাসের মুক্ত আনন্দে সে সময়কার ঘটনাগুলি এখন উৎসবের আকার ধারণ করেছে। কতজনে এক সঙ্গে ছিলাম, এখন কত স্থানে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি—দেশ, বিদেশ, ইহলোক, পরলোক সব জায়গাতেই আমাদের দল ছড়িয়ে পড়েছে। এই ছাত্রাবাসে বাস করার আরম্ভ থেকেই স্বর্গীয় শরৎকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে সময়ে আমরা স্কুলে পড়ি এবং তিনি কলেজে পড়েন, সুতরাং আমরা তাঁকে সমীহ করেই চলতাম, কিন্তু তখন থেকেই তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব বুঝতে পেরেছিলাম। নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিয়মিত ভাবে করতে তাঁর চিরকাল যত্ন ছিল এবং যাতে প্রচারাশ্রমের মর্য্যাদা সকলের ব্যবহারে রক্ষা পায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নির্দ্দোষ হাসি আমোদ খুবই ভালবাসতেন, খেলা ধুলাতেও সুনাম হয়েছিল, লোক সঙ্গে এত সহজে বন্ধুতা স্থাপন করতে খুব কম লোক দেখেছি; কিন্তু অন্যদিকে নীতির বিষয়ে তাঁর কঠোর শাসন ছিল, কোনো দুর্নীতি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা যে কত ছিল, তা বলা যায় না, কিন্তু কোনো নীতিহীন বা চরিত্রহীন লোক তাঁর বন্ধু হতে সাহস পেয়েছে, তা দেখিনি।

নতুন জিনিষ শিখতে বা নতুন জ্ঞানের পথে যেতে কখনও ক্লান্ত হতেন না, বিফলতায় কখনো বিষণ্ন হতেন না। এটি তাঁর চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল যে, কখনও কোনো বিফলতা তাঁকে নিরাশ করতে পারেনি, সব সময়েই তিনি প্রফুল্ল থাকতেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করাটাকেই যথেষ্ট পুরস্কার মনে করতেন। বহুকাল তাঁকে বিদেশে বাস করতে হয়েছিল, কাজেই সব সময়ে তিনি মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ রাখতে পারেন নি, কিন্তু যখন এ দেশে থাকতেন, যথাসাধ্য মণ্ডলীর সেবা করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর বিদেশবাসের পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় বর্ত্তমান উপাসকমণ্ডলী গঠিত হয়, তখন সে কাজে তিনি বিশেষ সাহায্য করেন; পরে মধ্যে কিছুকাল যখন দেশে ছিলেন, মণ্ডলীর যুবকেরা যাতে মন্দিরে সঙ্গীতের কাজে ভাল করে সাহায্য করতে পারেন, তার জন্যে গান বাজনা শিখবার ভাল ব্যবস্থা তিনিই উদ্যোগ করে করেছিলেন ও সে বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। সকল অবস্থার ভিতরেই মণ্ডলীর জন্য কিছু করতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতেন। সকল বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্যম, সকলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করার আগ্রহ, পবিত্র চরিত্র, বিদ্যানুরাগ—এই সকল গুণ তাঁকে লোকপ্রিয় করেছিল, এবং এই সকল গুণে তিনি আমাদের মণ্ডলীর গৌরবের বস্তু ছিলেন; কিন্তু অসময়ে কঠিন রোগে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় থেকে, শান্তভাবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি চলে গেলেন, তাঁর অসংখ্য বন্ধুর দল বিশিষ্ট একজন বন্ধু হারালেন।

সুপুত্র যেমন পিতার মুখ উজ্জ্বল করেন, মণ্ডলীর যুবকগণ তেমনি মণ্ডলীর গৌরব বাড়িয়ে দেন। যাঁদের কথা বলবার সুযোগ পেলাম, এঁরা নানা ভাবে, নানা প্রকার সেবার ভিতর দিয়ে মণ্ডলীর গৌরব বাড়িয়েছিলেন। এঁদের যে দোষ ত্রুটি ছিল না, সে কথা বলি না; এঁরা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাও বলব না; অন্যান্য যুবকেরা যেমন, এঁরাও তাই ছিলেন। প্রকৃতির নিয়মে কারও শক্তি বেশী থাকে, কারও বা কম থাকে, তা'দিয়ে ছোট বড় আমরা বিচার করব না; যে সকল গুণে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় হয়, তা-ই দিয়ে বিচার করে দেখি যে, পবিত্র চরিত্র, সততা, বিনয়, শ্রদ্ধা, নম্রতা—এই সকল এঁদের মধ্যে ছিল বলে এঁরা আমাদের আদর ও গৌরবের বস্তু। শ্রদ্ধা ও পবিত্রতাই সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এঁদের দৃষ্টান্ত দেখে যদি আমাদের যুবকেরা এই শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হতে উৎসাহিত হন, তা'হলেই যাঁদের স্মৃতি আমার অতীতকে সৌরভময় করে রেখেছে, তাঁদের কথা লেখা সার্থক মনে করব।

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একোনপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বিগত ২২শে ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দিরে জগজ্জননীর আরতি হইয়া উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনার কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে তিনটী নূতন সঙ্গীত রচিত হইয়া গীত হয়। ২৩শে ভাদ্র, মন্দিরে দুই বেলা উপাসনা হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ২৪শে ভাদ্র, দিগ্‌বাজারে স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র দাসের ভবনে উপাসনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং "ধর্ম্ম জীবনে ও চরিত্রে" এ বিষয়ে উপদেশ দেন। ২৫শে ভাদ্র, নিমতলী শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের গৃহে সায়ংকালে উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। ২৬শে ভাদ্র, সন্ধ্যাকালে মন্দিরে সঙ্গত-সভার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক 'ব্রহ্ম-দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শ' বিষয়ে পাঠ, ব্যাখ্যান ও আলোচনা হয়। ২৭শে ভাদ্র, পূর্ব্বাহ্ণে বিধান-পল্লী ও দেবালয়-প্রতিষ্ঠার উৎসব। সায়ংকালে ফরাসগঞ্জে স্বর্গীয় আনন্দমোহন দাসের ভবনে উপাসনা হয়। পূর্ব্বাহ্ণে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং সায়ংকালে ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। তিনি বলেন, স্বর্গরাজ্য এবং প্রেম-পরিবার মানবের আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই আত্মা সত্য, জ্যোতিঃ এবং অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরেরই অংশ অর্থাৎ মানবের আত্মাও সত্য, জ্যোতিঃ এবং অমৃত। ২৮শে ভাদ্র, নববিধানসমাজ-প্রতিষ্ঠার দিন পূর্ব্বাহ্ণে ভাই দুর্গানাথ রায় এবং সায়ংকালে ভাই মহিমচন্দ্র সেন মন্দিরে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করোনেশন পার্কে বক্তৃতা করেন। ২৯শে ভাদ্র, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী "ব্রাহ্মসমাজ—দৃশ্য ও অদৃশ্য" বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ৩০শে ভাদ্র, সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে ভাই মহিমচন্দ্র সেন এবং সায়ংকালে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে ভাই দুর্গানাথ শাস্ত্র পাঠ করেন। তৎপর আলোচনা হয়। "ঈশ্বরের সহিত আমরা কি সম্বন্ধ অনুভব করি" এই বিষয়ে ভাই মহিমচন্দ্র সেন প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, অনেকে আপন আপন অনুভূতি প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী ও রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় আপন আপন অনুভূতি প্রকাশ করিলে আলোচনা শেষ হয়। তৎপর রায় বাহাদুর ললিতমোহন

চট্টোপাধ্যায় ধ্যানের উদ্বোধন করিয়া উপাসকমণ্ডলীর মনোযোগ ধ্যানে আকৃষ্ট করেন। তিনি প্রার্থনা করিলে অন্যেরা ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। তৎপর কীর্ত্তন হইয়া সায়ংকালে উপাসনা আরম্ভ হয়। ৩১শে ভাদ্র, সুদূর হাজারিবাগ হইতে যুবকদিগের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস সমাগত হন এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে প্রচার-যাত্রিদল সহ নারায়ণগঞ্জে গমন করেন। সেখানে সমাজ-প্রাঙ্গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও ভাই মহিমচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র দাস উকিলের ভবনে উপাসনা ও "জীবন্ত ঈশ্বর" বিষয়ে উপদেশ হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। ১লা আশ্বিন, মন্দিরে সায়ংকালে সমাজের সম্পাদক ভাই মহিমচন্দ্র সেন ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে নববিধান-বিস্তারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংরেজীতে পাঠ করেন। ২রা আশ্বিন, সায়ংকালে মন্দিরে কীর্ত্তন হয়। ৩রা আশ্বিন, সায়ংকালে যুবকদিগের উৎসবে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস উপাসনা করেন ও একটী সুন্দর উপদেশ দেন। ৪ঠা আশ্বিন, সায়ংকালে ভ্রাতা রমেশচন্দ্র সমাদ্দারের গৃহে উপাসনা শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস করেন। ভ্রাতা রমেশচন্দ্র সকলকে ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ৫ই আশ্বিন, সায়ংকালে মন্দিরে কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। ৬ই আশ্বিন, পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে মহিলাদের উৎসবে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং মহিলাদিগের উপযোগী একটী সুমিষ্ট উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে বালক-বালিকাদিগের সম্মিলন হয়, তৎপর কীর্ত্তনান্তে সায়ংকালের উপাসনা ভাই মহিমচন্দ্র সেন সম্পাদন করেন। "পূর্ব্ব-বাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব" বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। দাস-মণ্ডলীর উপাসনা-কালে রচিত সঙ্গীত হইতে তিনি প্রদর্শন করেন যে, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ এবং ব্রহ্ম-পাদস্পর্শ করা এ সমাজের বিশেষত্ব। ৭ই আশ্বিন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত ভূপতি-মোহন দাসের ভবনে (রাজার দেউড়ী) উপাসনা ও ভোজন এবং সায়ংকালে কায়েৎটুলিস্থ প্রকাশচন্দ্র শীলের ভবনে উপাসনা হয়। ৮ই আশ্বিন, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার নন্দীর ভবনে উপাসনা হয়। ৯ই আশ্বিন, স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন সেনের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার ওয়ারিস্থ ভবনে উপাসনা হয় ও সন্ধ্যায় মন্দিরে কীর্ত্তন হয়। ১০ই আশ্বিন, নগর-সংকীর্ত্তন মন্দির হইতে বাহির হইয়া ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, বাঙ্গালা বাজার হইয়া, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস বি, এল্ এর বাড়ীতে শেষ হয়। সংকীর্ত্তনে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের রচিত কীর্ত্তনের গানটী গীত হয়। ১১ই আশ্বিন, সায়ংকালে মন্দিরে ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভা হয়। ১৩ই আশ্বিন, মন্দিরে শান্তি-বাচনের উপাসনা ভাই দুর্গানাথ রায় সম্পাদন করিলে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

উৎসব উপলক্ষে লালমণির হাট, ময়মনসিংহ, মত্ত এবং নারায়ণগঞ্জ হইতে বন্ধুরা আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।
সম্পাদক।

—•—

কেশবচন্দ্র ও নববিধান।

(৮ই জানুয়ারী, খৃঃ ১৯২০, চট্টগ্রাম কলেজহলে, স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের নিবেদনের সারাংশ)

কেশবচন্দ্র যুগের লোক বা যুগাবতার। এই যুগের সকলেই তাঁহার ভিতরে এবং তিনি সকলের প্রকৃতির ভিতরে অবস্থিত। এই যুগের লোক কিরূপ হইবে, তাহারই জীবন্ত মূর্ত্তি তিনি ছিলেন। তিনি যুগের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহার জীবনে নানা বৈচিত্র্য ছিল, জীবনের নানাদিক ছিল। আমি কেবল তাঁহার উদ্ঘোষিত নববিধানের কথা বলিব। নববিধানে তিনি কি দেখিলেন, কি পাইলেন, তাহাই আমার সংক্ষেপে বলিবার ইচ্ছা।

নববিধান-ঘোষণার সঙ্গীতে গাওয়া হইয়াছে—"শোন হে নূতন বিধি আনন্দের সমাচার। পাপী উদ্ধারিতে স্বর্গ হতে এসেছে ভবে এবার। অনাদি পুরুষ ব্রহ্ম, বেদে গায় যাঁর মর্ম্ম, অতি অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, বিবিধ লীলা বিহার......পুরাতন ব্রহ্মবাদী, শিব শুক জনকাদি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, নানক, চৈতন্য প্রেমের আধার। কবীর, শঙ্করাচার্য্য, বাসুদেব যোগাচার্য্য, ঈশা, মহম্মদ, মূষা, শাক্য, এক ভক্ত-পরিবার।"

এই ঘোষণা-সঙ্গীত হইতে আমরা তিনটী বিষয়ের সন্ধান পাই :—(১ম) নববিধান স্বর্গ হইতে আসিয়াছে, (২য়) নববিধানের দেবতা বা ব্রহ্ম অনাদি পুরুষ তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও বিবিধ লীলা বিহার, এবং (৩য়) পুরাতন ব্রহ্মবাদী শিব, শুক, জনক, নানক, বাসুদেব, মূষা, শাক্য, ঈশা, মহম্মদ, শঙ্কর, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি এক ভক্ত-পরিবার। "ভক্ত-পরিবার" নববিধানের নূতন জিনিষ। এই ভক্ত-পরিবার পৃথিবীর ঐতিহাসিক ভক্তগণ নন্। এই পরিবার—স্বর্গের পরিবার। ঐতিহাসিক ভক্তগণ সেই স্বর্গের পরিবারের প্রতিনিধি। ভগবানের অনন্ত পূর্ণ প্রকৃতির ভিতরে এই সকল মহাপুরুষ বা এক এক প্রকৃতি প্রসুপ্ত ছিল। সেই সেই প্রকৃতির ভাব লইয়া তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে প্রকটিত হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহারা অবতার। কিন্তু অবতার হইলেও, তাঁহারা কেহই স্বয়ং ব্রহ্ম বা ব্রহ্মলাভের মধ্যবর্ত্তী নন। ব্রহ্মস্থ প্রকৃতির এক এক দিক্ এক এক জনে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

স্বর্গের ভক্ত-পরিবার—নিখুত আদর্শ পরিবার। এই পরিবারের প্রতিজন এক এক দিক্ দিয়া পূর্ণ—বিন্দুমাত্রও

অপূর্ণতা সেই সেই প্রকৃতির মধ্যে নাই। এই জন্য ঐতিহাসিক বাসুদেব, শাক্য, মুষা, ঈশা, মহম্মদ, শঙ্কর, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির সঙ্গে, স্বর্গীয় পরিবারের বাসুদেব, ঈশা, শাক্য, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতির তুলনা হয় না। পৃথিবীতে জাত প্রত্যেকের ভিতরেই অপূর্ণতা রহিয়াছে; পৃথিবীর মানুষই হউক, আর দেবতাই হউক, প্রত্যেকেই অনন্তোন্মুখীন নিত্য বর্দ্ধনশীল, সুতরাং অপূর্ণ। আর স্বর্গের দেবগণ প্রত্যেকে পূর্ণ, সুতরাং স্বর্গের ভক্ত-পরিবারও পূর্ণ। এই পূর্ণতা মানুষের ধারণা অনুসারে যেমন প্রতিজনের নিকট, তেমনি সমগ্র মানব-জাতির নিকট ক্রমশঃ উপচীয়মান বা বর্দ্ধমান। আবার যুগে যুগেও সে পূর্ণতার ধারণা তদ্রূপ বর্দ্ধমান বা Progressive, সুতরাং পূর্ণতার ব্যাখ্যা যুগে যুগে নূতন হইয়াছে এবং হইবে। যেমন পূর্ণ অনন্ত ভগবান্ ক্ষয়-বৃদ্ধি-রহিত, স্বর্গের ভক্ত-পরিবারের প্রতিজনও তেমনি পূর্ণ, হ্রাস বৃদ্ধির অতীত। তাঁহারা ব্রহ্মস্থ এক এক প্রকৃতি।

ঐতিহাসিক ভক্তগণ পৃথিবীর লোক, উন্নতিশীল ও অপূর্ণ। ইঁহারা যত উন্নত হউন, অপূর্ণই থাকিবেন। ইঁহারা স্বর্গস্থ পূর্ণপ্রকৃতির অংশাবতরণ ও চির অপূর্ণ। পৃথিবীস্থ ভক্তকে উন্নত করিয়া চিত্রিত করিতে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। যে ভক্তের প্রতি যত শ্রদ্ধা হইবে ও যত শ্রদ্ধা বাড়িবে, তাঁহার দোষ ত্রুটী বা অপূর্ণতা ততই অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে, এবং স্বর্গীয় প্রকৃতি উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় ক্রমে বড় দেখাইবে, এবং পরিশেষে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। ইহা শ্রদ্ধার সাধনা।

স্বর্গের সাধনা অন্যরূপ। স্বর্গ বিশ্বাসের ভূমি—সেখানের সমুদয়ই বিশ্বাস-চক্ষে দেখা যায় এবং দেখিতে হয়। চক্ষু ফুটিলে যেমন দৃশ্য বিশ্ব দেখা যায়, তেমনি বিশ্বাস ফুটিলে অদৃশ্য বা স্বর্গরাজ্য প্রতিভাত হয়। স্বর্গের কিছু দেখিতে হইলেই বিশ্বাসে দেখিতে হয়। যাঁহার বিশ্বাস-চক্ষু ফোটে নাই, তিনি শ্রদ্ধার সহিত পৃথিবী দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। এই দৃশ্য বিশ্বও তাঁহার নিকট কত আদরের, কত প্রেম-মাখা ও সুন্দর প্রতীয়মান হয়। কিন্তু স্বর্গের ভক্ত ও ভক্ত-পরিবার বিশ্বাস-চক্ষে দেখা যায় এবং বিশ্বাস-চক্ষেই দেখিতে হয়।

যেমন পৃথিবীর ভক্তগণকে চিন্তার সাহায্যে কল্পনার তুলিতে চিত্রিত করা হয় এবং যে যুগের যে প্রভাব, তদনুরূপ করিয়া প্রতীয়মান করান হয়; স্বর্গের ভক্ত-পরিবারকেও ছবি আঁকিয়া তদ্রূপ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অনেকের নিকটে, অনেক সময়ে স্বর্গের ছবি দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেমন গানে আছে, "এইতো স্বর্গের ছবি, হেরিলে জুড়ায় আঁখি!......কিবা যুবা বৃদ্ধ নরনারী, ব্রহ্ম-পাদপীঠ ঘেরি, করে স্তুতি মধুর বচনে।" স্বর্গের এই ছবি পৃথিবীর তুলিতেই চিত্রিত করা হইয়াছে। এই ছবি কখন কখন কাহারো কাহারো নিকটে বায়স্কোপের ছবির মত সত্য বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। কিন্তু বিশ্বাসে স্বর্গ-দর্শন, কি ভক্ত পরিবার-দর্শন সেরূপ নয়। অন্ধকারে যে চলিতেছে, কখন কখন তাহার নিকটে হঠাৎ এক জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া অনেক কিছু প্রদর্শন করে। এই জ্যোতিঃ স্বর্গের জ্যোতিঃ, এই জ্যোতির নামও বিশ্বাস, এই জ্যোতিতে যাহা দেখা যায়, সবই স্বর্গের। প্রথম প্রথম বিদ্যুৎ চমকে—Warning Bell এর মত জাগরিত করিয়াই আলো নিভিয়া যায়; ক্রমে দর্শকের নিকট এই আলোক স্থায়িত্ব লাভ করে। তখনই সে স্বর্গ ও স্বর্গস্থ সমুদয় দর্শন করিতে দিব্য চক্ষু লাভ করে। এই চক্ষুর নামই বিশ্বাস-চক্ষু, এবং যে রাজ্য দেখা যায়, তাহার নাম বিশ্বাসের রাজ্য।

জন্মান্ধ যেমন শুনিয়া শুনিয়া, চিন্তার সাহায্যে জ্ঞান-চক্ষে এক বিজ্ঞানময় রাজ্য দর্শন করে, এবং ক্ষণিক অন্ধ যেমন কল্পনার সাহায্যে পূর্ব্ব দৃষ্ট জগৎ ও জগতিস্থ বস্তুজাত চিত্রিত করে, সেইরূপ স্বর্গ না দেখিয়াও অনেকে চিন্তার সাহায্যে, পৃথিবীর বস্তুজাত হইতে স্বর্গের ছবি আঁকিয়া, কখন বা কল্পনার সাহায্যে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বর্গের অনুভূতি লইয়া স্বর্গ দর্শন করিয়া থাকে। চিন্তার সাহায্যে পৃথিবীর বস্তু বা অবস্থা দেখিয়া, উপমা প্রতিমা প্রভৃতি দ্বারা, স্বর্গের পদার্থ-দর্শনের বা ঐ সকলের অনুভূতির মধ্যে একটা বর্দ্ধমান অবস্থা আছে। পৃথিবীর জ্ঞান যেমন দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা বাড়িয়া যায়, স্বর্গের জ্ঞানও তেমনি বাড়িতে থাকে। কিন্তু স্বর্গের দর্শন একবার লাভ করিবার পরে, যাঁহাদের নিকট সে স্বর্গ অন্ধকারে আবৃত হয় এবং যাঁহারা কল্পনার তুলিতে তাহা অঙ্কিত করিয়া পুনঃ দর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট সে স্বর্গ ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া অবাস্তবিকরূপে প্রতীয়মান হয়—সে স্বর্গ ক্রমশঃ হ্রসমান হইয়া শূন্য হইয়া পড়ে।

বাস্তব ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধেও এইরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁহারা জগৎ হইতে ঈশ্বর-সত্তা উপলব্ধি করেন, তাঁহাদিগকে এতদ্রূপ বিপন্ন হইতে হয় না। তাঁহাদের জগদ্বিষয়ক জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানও বাড়িয়া যায়। এই জন্য জ্ঞানে ঈশ্বরানুভূতি, ভাবে বা ভক্তিতে ঈশ্বর-দর্শন হইতে নিরাপদ্। কিন্তু বিশ্বাসে দর্শন যদি কল্পনায় পরিণত না হয়, সে দর্শন সারবান্ এবং সর্ব্বপ্রকার দর্শনের মহাসমন্বয় সাধন করে। জ্ঞান কর্ণধার থাকিলে ভাব বা ভক্তি বিপথগামী করিতে পারে না; অধিকন্তু বিশ্বাসের ভূমির সন্নিধানে আনিয়া মানবকে উপস্থিত করে।

যাঁহারা চিন্তা বা বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বর্গ রচনা করেন, তাঁহাদের স্বর্গ অপূর্ণ স্বর্গ; কিন্তু অবাস্তব বা কল্পিত স্বর্গ নয়। যাঁহারা বিশ্বাসে স্বর্গ দর্শন করিয়া সে আলোক আর পান না—স্বর্গ-দর্শনে অক্ষম হইয়া স্বর্গ কল্পনা করেন—স্বর্গের ছবি

দর্শন করেন, তাঁহারা নিত্য নূতন দর্শনের অভাবে নির্জীব হইয়া, সে স্বর্গ কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দেন এবং একেবারে অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন।

চিন্তায় বড় করিয়া ফুটাইয়া উঠাইলে মহাপুরুষের ঐতিহাসিক মহাপুরুষ থাকেন না, স্বর্গের মহাপুরুষও হন না। যাঁহারা পৃথিবী-জাত, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ নন, তাঁহারা পূর্ণ নন—যত বাড়ান হউক, তাঁহাদের ভিতরে অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। সেই অপূর্ণতা সারিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহাদের রূপান্তর করা হয়। অথচ ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়াই তাঁহাদিগকে প্রতিপাদন করা হয়।

স্বর্গের মহাপুরুষেরা ব্রহ্মের মানস পুত্র। ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। তাঁহারা অনন্ত ভগবৎ-প্রকৃতির এক এক অংশ বা ইচ্ছা, তাই পূর্ণ। অবশ্য এই পূর্ণ প্রকৃতির বিকাশ বা পূর্ণতার ধারণা পৃথিবীর নিকট যুগযুগান্তর ধরিয়া বাড়িতে থাকে। বিশ্বাসে ইঁহাদের দর্শন স্থূলতঃ হইয়া থাকে, যেমন দেহীকে দেহের দ্বারায় দর্শন করা হয়, কিন্তু তাঁহাদের পরিচয়াত্মক দর্শন ক্রমশঃ হইতে থাকে। বিশ্বাসে ভগবদ্দর্শন, কি ভক্ত-পরিবার-দর্শন, অন্ধ চক্ষু পেলে যেমন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চিন্তার দর্শনের পূর্ণতায় একখানি প্রতিমা দেখা যায়, বিশ্বাসের প্রথম দর্শনেই প্রকৃত বস্তু বা প্রকৃত পদার্থের দর্শন হয়।

বিশ্বাসে প্রকৃত বস্তুর দর্শন হইলেও, ঘোর অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে তাহা প্রথমে প্রতিভাত হয়। সেই দর্শনে, তাহার অন্বেষণে যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে বিদ্যুৎ চমকটি স্থিরত্ব লাভ করিয়া ও প্রসারিত হইয়া Search Light এ পরিণত হয়—ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এক নূতন রাজ্য প্রকাশিত করে। ক্রমে তাহা নিত্য স্থির হইয়া সূর্য্যালোকে পরিণত হয়। তখন পৃথিবীর সূর্য্যালোকে নয়, এই নূতন সূর্য্যালোকে যেমন দ্যুলোক, তেমনি ভূলোকও দেখিয়া তিনি আনন্দিত হন।

স্বর্গের দর্শন অন্ধকারের ভিতরে, ঘন গভীর অন্ধকারের ভিতরে, বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সেই আলোক প্রথমে বিজুলীর ঝলার মত, পরে Search Lightর মত, ক্রমে উহা স্থির দিনমণির মত হইয়া উঠে, এবং বিশ্বাসী দিনের মত সমুদয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁহার নিকট ইহ জগৎ নূতন জগৎ হইয়া এবং জগতিস্থ বস্তুজাত, জীবজন্তু নর নারী নূতন হইয়া প্রতিভাত হয়। বিশ্বাসীর দর্শনে জড়-রাজ্যও ইচ্ছাময়ীর মহালীলার অভিনয়—প্রকৃত অভিনয়রূপে জাগিয়া উঠে।

স্বর্গের ভক্ত-পরিবারে অনন্ত ভগবৎ-প্রকৃতিরই ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র প্রকাশ। সুতরাং সে সকল ভগবানের সঙ্গেই সহাবস্থিত। ভগবান্ যেমন অনাদি, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি; সুতরাং ভক্ত-পরিবারও অনাদি। এই ভক্ত-পরিবার ও ভগবান্ একই। ভক্তগণ ভগবানের ইচ্ছা রূপে তাঁহাতেই শয়ান আছেন। চিরকাল, অনন্তকাল থাকিবেন এবং অনাদি কাল ছিলেন। এই জন্য যাঁহারা আপনাদের উদ্ভব ভগবৎপ্রকৃতি হইতে গণনা করেন, তাঁহারা বলেন, "মা হতে যখন, আমার জনম, পুনঃ আমি তবে মিশিব মায়।" আরো বলেন, "এব্রাহেমের পূর্ব্বে আমি ছিলাম।" কেহ বলেন, "আমি ব্রহ্মখণ্ড"; আরো অগ্রসর হইয়া বলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" আবার ভগবান্কে বিশ্লেষণ বা মন্থন করিয়া যাঁহারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন ও লয় নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারা—"জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে,"—দেখিতে পান।

ঐতিহাসিক মহাপুরুষেরা স্বর্গের মহাপুরুষদিগেরই খণ্ডে বা ছায়ায় বা অংশতঃ প্রকৃতিতে গঠিত—ভগবন্নিষ্ঠ প্রকৃতিরই ক্ষুদ্র অপূর্ণ খণ্ড। বলিতে গেলে, ঐতিহাসিক মহাপুরুষদেরই ব্যক্তিত্ব—পৃথিবীতে যে ব্যক্তিত্ব গণিত হয়। স্বর্গের মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্ব নাই; তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরনিষ্ঠ—ভগবানের সহিত এক। যেমন পৃথিবীর প্রতি জনের ব্যক্তিত্ব, তেমনি পৃথিবীস্থ মহাপুরুষেরও ব্যক্তিত্ব আছে—তাহা যত বড়ই হউক, পরিমিত—কিন্তু অনন্তোন্মুখীন।

স্বর্গের ভক্ত-পরিবারের ছায়াতলে পৃথিবীর ভক্ত-পরিবার অবস্থিত। যদি বলি, "তাঁরাই ফিরে এসেছেন," সেও "কায়ার ছায়ার মতন", প্রকৃত কায়া নয়। স্বর্গের ভক্ত-পরিবার আদর্শ, পৃথিবীতে ভক্ত-পরিবার-গঠন সাধন। স্বর্গের আদর্শে ভগবান্ পৃথিবীতে ভক্ত-পরিবার গঠন করিতেছেন এবং মানব-পরিবারকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন, "তোমাদিগকেও ঐরূপ হইতে হইবে।" বিশ্বাসে যাঁহারা সে ভক্ত-পরিবার দর্শন করেন, তাঁহারা ভগবৎ ইচ্ছায় "তথাস্তু" বলিয়া আত্মোৎসর্গ করেন।

যেমন ভক্ত-পরিবার, তেমনি ভক্তও। স্বর্গের ঈশার এক কণা ঐতিহাসিক ঈশা। ঐতিহাসিক ঈশা কখনও স্বর্গের ঈশা হইতে পারিবেন না। তেমনি ঐতিহাসিক শাক্য কি গৌরাঙ্গ, তাঁহাদের সমগ্র বিভূতি লইয়াও কখন স্বর্গের শাক্য কি গৌরাঙ্গ হইতে পারিবেন না। ঐতিহাসিক যাঁহারা, তাঁহারা চিরদিনই উদয়োন্মুখ, কখনও পূর্ণ হইতে পারেন না, কি পারিবেন না। স্বর্গের যাঁহারা, তাঁহারা চিরদিনই ঐতিহাসিকদের আদর্শ বা সম্মুখে থাকিবেন। ঐতিহাসিকেরা পৃথিবীতে জাত, যুগযুগান্তর ধরিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে, কল্পনার তুলিতে তাঁহারা চিত্রিত হন। স্বর্গের যাঁহারা, তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবজ্জাত, তাঁহাতেই অবস্থিত এবং বিশ্বাসের আলোকে প্রতিভাত। এই জন্য স্বর্গের কিছুরই জন্ম মৃত্যু নাই, ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। স্বর্গের মহাপুরুষেরা অজাত ও অজরামর, নিত্য বস্তু ও নিত্য স্থায়ী।

যাহার জন্ম নাই, ইতিহাস নাই, পৃথিবীতে তাহা অসত্য; কিন্তু স্বর্গে তাহাই সত্য, কারণ স্বর্গীয় বস্তু জন্মবিহীন, তাহার ইতিহাস নাই, পূর্ণ। যেমন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এক নয়, তেমনি স্বর্গের ভক্ত ও

ভক্ত-পরিবার এবং পৃথিবীর ভক্ত ও ভক্ত-পরিবার এক নয়। কখনও এক হইবে না। স্বর্গ ও স্বর্গ্য আদর্শ, পৃথিবী ও পার্থিব সেই আদর্শে রচিত হইতেছে। চিরদিনই রচিত হইবে—উহার রচনা কখনও সমাপ্ত হইবে না—উহারা কখনও পূর্ণ হইবে না। স্বর্গে ও মর্ত্তে এই প্রভেদ, স্বর্গের ভক্ত ও ঐতিহাসিক ভক্তেও সেই বিভিন্নতা, স্বর্গের ভক্ত-পরিবার ও পৃথিবীর ভক্ত-পরিবারেও সেই দূরতা।

বিশ্বাসে স্বর্গের এই আদর্শ ভক্ত-পরিবারের দর্শনেই নববিধানের অবতরণ হইল, একটি নূতন রাজ্য খুলিয়া গেল। এই রাজ্যের ভগবান্ যেমন সত্য ও পূর্ণ, তেমনি অদ্ভুত-কর্ম্মা। পৃথিবী হইতে জ্ঞানে আমরা যে ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, ইনি সে ব্রহ্ম নন, অথচ স্বর্গের ব্রহ্মপ্রকৃতির মধ্যে ইঁহার সত্তা অনুভূত হয়, তালাস করিলে পাওয়া যায়। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক ভাব, প্রতি প্রকৃতি স্বর্গের প্রতিমা বা ছায়া এবং পৃথিবীর ভাবে সত্য, ঐতিহাসিক সত্য এবং অপূর্ণ। দুইটির দুই বিভিন্ন সত্তা। ছায়া হইতে কায়ার অনুভূতিবৎ, এই চক্ষু কর্ণের রাজ্য, পদার্থ ও ঘটনা হইতে, বিশ্বাসের রাজ্যের, পদার্থের ও ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। এই জন্য উপমা বা Parablea মর্য্যাদা। স্বর্গ-রাজ্যের তত্ত্ব জানিতে উপমার মূল্য কম নয়। দৃশ্য রাজ্যের প্রকৃতিই উপমা-পরম্পরা অদৃশ্য রাজ্যের প্রথম সমাচার মানবলোকে প্রচার করিয়াছে। বরং প্রত্যেক মানবে এখনও দান করিতেছে, বলা যাইতে পারে। বিশ্বাসের আলোকে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইলেও, উপমা স্বর্গের ও স্বর্গ্য পদার্থের পরিচয় দান করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

ছায়ায় কায়ায় সমতা দেখিয়া, মানব, এমন কি সাধক ভক্ত পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে ভিন্নতা হারাইয়া, একত্ব অনুভব করেন এবং তাহা প্রচার করেন। কিছুকাল "দ্বৈতাদ্বৈত ভাব" থাকিয়া, শেষে "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে" তাহা পরিণত হয়। কিন্তু আমরা এই সকল অদ্বৈতবাদ বিচার করিবার সময়ে "ছায়া কায়ার" তত্ত্ব ভুলিয়া যাইতে পারি না। একটী উপমান, আর একটী উপমেয়—দুইটি পৃথক পদার্থ—ভুলিতে পারি না।

নববিধানের ব্রহ্ম স্বর্গের, সুতরাং স্বর্গের ভক্ত-পরিবার ও সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সহিত তিনি বর্ত্তমান। এই জন্য অতি অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম এবং বিবিধ বিচিত্র তাঁহার লীলা-বিহার। বিশ্বাসীরা স্বর্গের ভগবান্‌কেই দৃশ্য বিশ্বে অবতীর্ণ দর্শন করিয়া, "নমো নমো নিরঞ্জন হরি........." বলিয়া প্রণিপাত করেন। প্রতিদিন উপাসনা কালে ভক্ত-পরিবার সহ ভগবান্ বিশ্বাসীদিগকে দর্শন দিয়া, তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। পৃথিবীতে বিশ্বাসীরা সমবেত হইয়া উপাসনা করিলেই, নববিধানের দেবতা সপরিবারে অবতীর্ণ হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হন। কেবল একাকী বিজনে বিরলে বসিয়া উপাসনায় সে সুযোগ হয় না—নববিধানের দেবতা প্রকাশিত হন না—অগম্য অনন্ত ব্রহ্ম "আনন্দরূপমমৃতং" রূপে প্রতিভাত হইয়া সাধকের সাধ পূর্ণ করেন না। কেশবচন্দ্র বিশ্বাসী ভক্ত-মণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়াই, স্বর্গের ব্রহ্ম—নববিধানের দেবতা ভক্ত-পরিবার সহ অবতীর্ণ হইবার পথ পাইলেন—নববিধান প্রকাশিত হইল।

মধুর-স্বভাব কেশবচন্দ্র।

আগামী ১৯শে নভেম্বর ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী হ'তে আজ পর্য্যন্ত, নানা জনে নানাদিক্ থেকে, আচার্য্যদেবের জীবনী আলোচনা করেছেন এবং সে সম্বন্ধে লিখেছেন ও বলেছেন। তবুও মনে হয়, সেই বিশাল বিচিত্র দেবচরিত্রের কিছু বলা হয় নি। তাঁর জীবন-বেদ একটী অফুরন্ত রত্নের খনি, অমূল্য রত্নের অতলস্পর্শ সাগর। তার মধ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই দুর্লভ মণিমাণিক্যাদি লাভ করা যায়। তবে, প্রবেশ করবার যোগ্যতা থাকা চাই। কিন্তু আমার যে কিছুই নেই, কোনও যোগ্যতাই নেই; না আছে ভক্তি শ্রদ্ধা, না আছে বিদ্যা বুদ্ধি। তবে কি এই শুভ-জন্মদিনে চুপ করে থাক্‌বো? অন্তরের অকৃত্রিম পুষ্পাঞ্জলি সেই দেবতার চরণে অর্পণ করবো না? শুষ্ক প্রাণের অবশিষ্ট প্রেমে মেখে, ভক্তি মাটি দিয়ে, সেই রাতুল চরণ দুটী গড়্‌বো না এবং তাতে শ্রদ্ধার মালা পরিচয় দেবো না?

বিধাতার সৃষ্টির ভেতর বড় কে? মানুষ। মানুষের ভেতর শ্রেষ্ঠ কে? যিনি কুলীন। কুলীন কাকে বলে? যাঁর ন'টি গুণ আছে। কুলীনের ন'টি লক্ষণ কি কি? আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দান এই ন'টি কুলীনের লক্ষণ। আচার্য্যদেবের চরিত্রে এই সদ্‌গুণগুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল, তাই তিনি আদর্শ-মানুষ। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটা জিনিষ আমাকে বড়ই মুগ্ধ ও মোহিত করেছে। সেটা হচ্ছে তাঁর স্বভাবের মিষ্টতা, মধুমাখা আচরণ, সুমিষ্ট ব্যবহার। অনেক জিনিষ মিলে, কিন্তু এ জিনিষটা প্রায় সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। অনেক লোক দেখ্‌লুম, অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো, অনেকের সঙ্গে একত্রে বাস করলুম, কিন্তু এমন লোক দেখলুম না, (দু'এক জন ছাড়া) যাঁর সঙ্গে কখনও কারুর তর্ক বিতর্ক, কি বাদানুবাদ, বচসা বা কলহ হলো না। ঘর করতে গেলে পরস্পর ঠোকাঠুকি হয়ই হয়। কথায় বলে, Familiarity breeds contempt—ঘনিষ্ঠতাধিক্যই তাচ্ছিল্য বা অবহেলার প্রসূতি। দুই বন্ধু যদি অধিকদিন একত্রে বাস করেন, তাঁদের ভেতর প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটে। সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করতে খুব অল্প লোকেই পারে। কুসুমের মত কোমল আচরণ বড়ই বিরল। শাস্ত্রে আছে, "মধু ক্ষরতু তে মুখং,

মধু ক্ষরতু তে চিত্তং। মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে।" বাক্য মধুমাখা হবে, আচার ব্যবহার মধুমাখা হবে, জীবন মধুমাখা হবে; যার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে, তারও জীবন মধুময় হয়ে যাবে, ভুবন সুধাময় হবে, জীবে কত স্নেহ সমাগত হবে। আচার্য্যদেবের জীবন ঠিক সেই রকম ছিল। তাঁর মুখ দিয়ে অমিয় ঝরতো, তাঁর ব্যবহারে প্রাণ জুড়াইত, তাঁর দৃষ্টিতে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হ'ত। সে মুখের হাসি কখনো ম্লান হতো না, সে হাত সদাই বরাভয় দানে উদ্যত থাকতো, সে প্রাণে তিল মাত্র তিক্ততার স্থান ছিল না। তাঁর চিত্ত দ্বিধাশূন্য, তাঁর মন হিংসাশূন্য, তাঁর বাক্য বিরক্তিশূন্য, তাঁর আচরণ পক্ষপাতশূন্য, তাঁর স্বভাব রাগশূন্য, তাঁর কাজ দোষশূন্য। তাঁর কণ্ঠে অমৃত, বক্ষে প্রীতি, নয়নে শান্তি, হস্তে সিদ্ধি, জীবনে বিজয়। তিনি ছিলেন অসহায়ের বন্ধু, আর্ত্তের ত্রাণ, ব্যথিতের সান্ত্বনা, তাপিত প্রাণের শান্তি, কঠোর হৃদয়ের কোমলতা, কিংশুকের সৌরভ, ঔজ্জ্বল্যের মধুরতা। এক অভিনব মহিমাময় সুসংযত সৌন্দর্য্য-বিভূষিত চরিত্র।

ছেলে বেলায় একবার তিনি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান। শিশু কেশবকে ঘাটের উপরে কাপড় ছাড়িবার ঘরের কাছে একটী নিরাপদ স্থানে রেখে মেয়েরা জলে নাবেন এবং স্নানান্তে উপরে এসে, কাপড় ছেড়ে অন্যমনস্কতা বশতঃ বাড়ী চলে আসেন। এসে কেশবের কথা মনে পড়ে। তখন সকলেই ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং নানারকম আশঙ্কা করতে থাকেন। ক্রমে এ খবর বাড়ীর কর্ত্তা হরিমোহন সেনের কাণে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কেশবের খোঁজে সরকার, দরওয়ান, লোকজন, চাকর বাকর প্রভৃতিকে পাঠান। তারা গিয়ে দেখে, যে জায়গায় মেয়েরা কেশবকে রেখে এসেছেন, ঠিক্ সেই জায়গায় কেশব চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নড়াচড়া নেই, সাড়া শব্দ নেই, চিৎকার নেই, আর্ত্তনাদ নেই। ইহা কি ধীর, শান্ত, কোমল স্বভাবের পরিচয় দেয় না? বাল্যকালে কেশব, মহিন্ (মহেন্দ্রনাথ সেন যিনি জয়পুরে কাজ করতেন) ও নরীন (বোধ হয়, মিরার-সম্পাদক রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন) এই তিন জনে ৩৫নং ঝামাপুকুর লেনের কালী পণ্ডিত নামে একজন পণ্ডিতের কাছে পড়তেন। আমি তাঁর বৃদ্ধা পত্নীর কাছে শুনেছি, তিন জনের মধ্যে কেশবচন্দ্রই সমধিক শান্ত-শিষ্ট-স্বভাবাপন্ন ছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রায়ই পণ্ডিত মশাইকে ফাঁকি দিতে চাইতেন; তাতে পণ্ডিত মশাই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলে, পৈতের সময় প্রাপ্ত নূতন জুতা জোড়াটী কিম্বা নূতন ছাতাটি, কোন দিন বা বাড়ীতে অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে মহাভোজের খাদ্য সামগ্রী হতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন উপহার-দানে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করতেন। পণ্ডিত মশাইও আশাতিরিক্ত উৎকোচ প্রাপ্তিতে পরম পরিতুষ্ট হয়ে, বিনা বাক্যব্যয়ে, নিঃশব্দ পাদ-সঞ্চারে স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করতেন এবং কেশবচন্দ্রের সহাস্য বদন, প্রফুল্ল আনন, অমিয়মাখা-বচন-বিন্যাসে তাঁর সেই প্রজ্বলিত ক্রোধানল কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যেত। সেই স্বভাবে কি এক স্বর্গের অপূর্ব্ব পারিজাত-কুসুম-সৌরভ মাখান ছিল, সেই মুখখানিতে কি যে অমায়িকতা, বিনয়নম্রতা, শীলতা প্রতিফলিত ছিল, তা বাক্যে বলা যায় না। যে কেউ সংস্পর্শে আসতো, সেই মুগ্ধ হয়ে যেত এবং সকলের সব রাগ পড়ে যেত। তাঁর বচনে সঙ্গীতের গুঞ্জন, তাঁর চলনে নূপুরের নিক্কণ, তাঁর নয়নে অপরূপ জ্যোতি, তাঁর বদনে অতুল শোভা, তাঁর জীবনখানি যেন একটী তান-লয়-সুস্বর-সম্মিলিত সমধুর রাগিণী।

কুচবিহারের বিবাহের পর এক ব্যক্তি আচার্য্যদেবকে একখান চিঠি লেখেন; তাতে তাঁর প্রতি যথেষ্ট কটূক্তি ও তাঁহার চরিত্রের অযথা নিন্দাবাদ ছিল। যখন সেই চিঠিখানি খুলে পড়া হল, উপস্থিত প্রচারকবৃন্দ বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং লেখকের উদ্দেশে যথোচিত বাক্যবাণ প্রয়োগ করতে লাগলেন। কিন্তু আচার্য্যদেব কেবল হেসে বল্লেন, "তোমরা যাই বলো, লেখবার বেশ বাঁধুনী আছে।" চিত্ত স্থির, অবিচলিত, উত্তেজনাশূন্য তাঁর বাড়ীতে "নববৃন্দাবন-নাটকের" প্রথম অভিনয়-রাত্রিতে খুব লোকের ভিড় হয়েছিল; এমন কি রাজা, মহারাজা, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি বড় লোকেরাও বসবার জায়গা পান নি। অনেক অনিমন্ত্রিত লোক এসে জায়গা দখল করেছিল। দ্বিতীয় রাত্রিতে যাতে এ রকম গোলযোগ না হয়, তার জন্যে শ্রদ্ধেয় প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় পুলিশ মোতায়েন রাখবার কথা বল্লেন। তিনি হেসে বল্লেন "আচ্ছা, সেই বন্দোবস্তই করা হোক্; তবে যদি পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে লোক আসে?" অমৃত বাবু উত্তর করলেন, "Trespassers বলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।" আচার্য্যদেব হেসে বল্লেন, "ওহে কেশব সেনের বাড়ী, সাধারণের বাড়ী, এ বাড়ীতে ঢুকলে Trespasser হয় না।" সে মুখে হাসি ছাড়া বিরক্তির চিহ্ন কেউ কখন দেখেনি।

তাঁর অন্তিম শয্যায় একদিন শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই দেখতে গেছিলেন। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ ছিল রোগীর সঙ্গে দেখা করবার। কাজেই শাস্ত্রী মশাই ফিরে আসছিলেন। আচার্য্যদেব জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রী মশাইকে ডাকতে বলেন। শাস্ত্রী মশাই কাছে গেলে, তিনি গলা জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। কি অপরূপ দৃশ্য! এতেও কি বিশ্বাস হয় না যে, কেশব-হৃদয় রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, অসূয়ার অতীত ও অসাধারণ দুর্লভ কোমল ধাতুতে গঠিত? ক্রমশঃ রোগের যাতনা যতই বাড়তে লাগলো, যোগ ও সমাধির মাত্রা ততই গভীর হতে লাগলো। দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ অসহ্য রোগযন্ত্রণা

কিন্তু সে মুখের হাসি দূর করতে পারল না। রূপরসগন্ধভরা প্রকৃতি যেন পথ ছেড়ে দিল, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে ঐ মহাসিন্ধুর ওপারে চলে গেলেন। "দেখরে জগদ্বাসী, কেশবচন্দ্রের হাসি, হাসি হাসি যায় চলে অমর ভবন।" পৃথিবী আঁধার হয়ে গেল, স্বর্গে হাসির বাজার বসে গেল। মা হাসে, ছেলে হাসে, মায়ের আশে পাশে মুনি, ঋষি, যোগিগণ হাসে, হাসি সবার মুখে, আনন্দপুরে হাসির বাজার বসে গেছে। কেশবচন্দ্রের "আনন্দ চিত্ত মাঝে, আনন্দ সর্ব্বকাজে, আনন্দ সর্ব্বকালে, দুঃখে বিপদ-জালে, আনন্দ সর্ব্বলোকে, মৃত্যু বিরহে শোকে।" কতকাল পরে আজ সেই কোমল মধুর স্বভাবের কথা যত ভাবছি, ততই প্রাণ অপূর্ব্ব প্রেম-সৌরভে ভরে যাচ্ছে, চিত্ত স্বচ্ছ নির্ম্মল পুণ্য সলিলে ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, জীবন অমরাবতীর বিমল, অতুল শোভায় ও চিরপ্রবাহিত আনন্দ-ধারায় ডুবে যাচ্ছে। তাই শুভ জন্মদিন উপলক্ষ করে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, এই অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য অর্পণ করলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নূতন সঙ্গীত।

(ভাই মহিমচন্দ্র সেন বিরচিত)

ঝিঁঝিট—যৎ।

ধন্য ধন্য ধন্য মাতঃ বিশ্বমোহিনী।
তোমার আরতি শুনি দিন-যামিনী।

রবি শশী গ্রহ তারা, ঘুরে ঘুরে গায় তারা, তোমার মহিমা-গীত জগদ্ধারিণী।

অনল অনিল জল, সাধে জীবের মঙ্গল, ডালি দেয় ফুল ফল, বিশাল ধরণী; পশু পাখী তরু লতা, কহিলে তোমার কথা, প্রেমিক জনের কিবা মনোরঞ্জনী।

ঘরে ঘরে নর নারী, পতি সতী রূপধারী, সে তো প্রতিমা তোমার, বহুরূপিণী; পুরুষরূপেতে হার, আদ্যাশক্তিরূপে নারী, কিবা শোভা আহা মরি, ভুবনমোহিনী।

শাক্য ঈশা শ্রীচৈতন্য, প্রেম পুণ্যে হয়ে ধন্য, গাহিলেন জগতে তব গুণকাহিনী; তোমার রূপমাধুরি, হৃদে পশি করে চুরি, প্রাণ মন ধন জন, মনোমোহিনী।

নূতন বিধানে তব, লীলা হেরি অভিনব, শিশুকোলে মহাসতী, ভক্ত-জননী; আশা পেয়ে পাপীর দলে, নাচে গায় মা মা বলে, অভয় পদ হৃৎকমলে, হৃদয়বাসিনী। (পেয়ে)

পাপী উদ্ধারের তরে, এলে নরক ভিতরে, ডাকিতেছ বারে বারে পতিতপাবনী; 'আমি জীব তোর, তুই আমারি, আমি তোরে ছাড়তে নারি,' আহা কি আশার কথা মোক্ষদায়িনী॥

(স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসুর আদ্যশ্রাদ্ধে তৎপুত্র মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক রচিত)

উদ্বোধন।

যত ফুল হায়, ঝরে ঝরে যায়,
ঠাঁই পায় পায়ে তাঁর;
যত শিখা হায়, নিভে নিভে যায়,
প্রাণ পায় শতবার।

কণ্টক যত, যতেক বেদনা,
তাঁহার পরশে হয়ে যায় সোনা,
রাঙা হয়ে ওঠে কলুষ-কালিমা,
লুকায় যা কিছু আঁধার।

হৃদয়ের ধন করি লুণ্ঠন,
তাঁহার ভবনে রাখে,
সুদূরের যারা তাদেরও তিনি,
আপন চরণে ডাকে;

পথের সাথীরা, জীবনের আশা,
সঞ্চয় যত, ছোট ছোট বাসা,
সব তুলে লয়, নিজে সবই বয়,
ঝরে দয়া শতধার॥

আরাধনা।

ছোট গৃহকোণে, ভীরু দীপালোকে,
হে বিশ্ব-রাজন্‌, আরতি করি হে;
মৃত্যু-মুখর শূন্য জীবনে,
অনন্ত, তোমার মন্দির গড়ি হে।

তোমার অসীম দেবালয় মাঝে—
বিদায় আরতির ঘণ্টা যে বাজে;
গোধূলির আলো যাত্রা রাঙালো,
চঞ্চল হল জীবন-তরী হে।

তব পদলেখা ভুবনে ভুবনে,
তব প্রেমশিখা বেদজ্ঞ বেদনে,
তোমার পরশ অমৃত সরস,
দুঃখ হরষে পড়িছে ঝরি হে।

গানে গীতে এই অশ্রু-সাগর
নিয়ত যে প্রভু, রাখ ভর ভর;
ব্যথার কোরক টুটিয়া ফাটিয়া,
বিকশিত প্রাণ-বৃন্ত পরি হে।

দিবসে নিশীথে আলোকে আঁধারে,
পার হতে তুমি লয়ে চল পারে;
নাহি জানি কবে তব পাদদেশে,
ফুরাবে দীর্ঘ শর্ব্বরী হে।

আজি দেখা যায় কুয়াসা ভাঙ্গিয়া,
আসিছ, দেবতা, হৃদয়ে নামিয়া;
শূন্য বেদী এ পূর্ণ কর গো,
অভয় চরণে প্রণতি করি হে॥

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ২রা নভেম্বর, হাওড়ায়, শ্রীমান্ বিভূতি ভূষণ বসুর চতুর্থ সন্তান দ্বিতীয় কন্যার জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১লা নভেম্বর, গিরিধিতে, তৃপ্তিকুটীরে, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শ্যামলাল ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্লোকাদি পাঠ ও সহধর্ম্মিণী প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১০ই নভেম্বর, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ নবীন চন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় ফণীন্দ্রভূষণ দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ, পার্কসার্কাসস্থ ৫৪নং ঝাউতলা রোডে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ বিনয়শেখর দত্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে বসীরহাট সেবাসমিতিতে ৫০৲, নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২৫৲ এবং ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার্থে ২৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদের ও শোকার্ত্ত পরিবারের কল্যাণ বিধান করুন। ৲

পারলৌকিক—গত ১লা নভেম্বর, হাওড়ায় শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৩রা নভেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণে, লক্ষ্ণৌর স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী ঘোষের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ দেরাদুনে, ২৪নং লিটন রোডে, কন্যাদের গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মধ্যমপুত্র ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ তথায় গিয়াছিলেন। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে "মা" নাম অঙ্কিত ৫০টী গেলাস পরিচিত বন্ধু ও শ্মশান বন্ধুদিগকে দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে। অদ্য স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারের পুত্র স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদারেরও সাম্বৎসরিক দিন ছিল। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সেই উপলক্ষেও বিশেষ প্রার্থনাদি হইয়াছে।

গত ৩রা নভেম্বর, প্রাতে, দেরাদুনে, মেজর জ্যোতিলাল সেনের গৃহে, তাঁহার দাদা-শ্বশুর (শ্বশুরের মাতুল-শ্বশুর) স্বর্গীয় পি, এল, রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

গত ৫ই নবেম্বর গিরিধিতে, তৃপ্তিকুটীরে, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নব দুর্গোৎসব—শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে শ্রীমৎ আচার্য্য অনুগমনে তিন দিন সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী নব দুর্গোৎসব সাধন করিয়া সেবক ও সেবিকা পুরী যাত্রা করেন।

শারদীয় উৎসব—গত ১৮ই অক্টোবর শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে সমাগত কয়েকটী বিশ্বাসী আত্মা মিলিয়া পুরী জগন্নাথধামে শারদীয় উৎসব সম্পাদন করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ও পাঠ করেন এবং কটকের ভক্ত মধুসূদন রাওএর কন্যা, অধ্যাপক সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত স্বরে সঙ্গীত করেন।

পুরীতে মিলিত উপাসনা—ভাই প্রিয়নাথ ও ভাই গোপালচন্দ্র এবার কয়দিন পরস্পরের প্রবাস আশ্রমে মিলিত ভাবে উপাসনা করিয়া বিশেষ সুখী ও উপকৃত হইয়াছেন। ২৯শে ও ৩১শে অক্টোবর প্রাতে ভাই গোপালচন্দ্রের প্রবাস "অটম ভিলায়" ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও ভাই গোপাল চন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন, এবং ৩০শে অক্টোবর ভাই প্রিয়নাথের প্রবাস "বিশ্রামকুটীরে" ভাই গোপালচন্দ্র উপাসনা করেন ও ভাই প্রিয়নাথ পাঠাদি ও প্রার্থনা করেন। ৩১শে অক্টোবর, ভাই গোপালচন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করেন।

আধ্যাত্মিক কালী-পূজা—গত ১লা নভেম্বর পুরীতে "বিশ্রাম কুটীরে" কালী-পূজা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেনাপতি, মিসেস সেনাপতি, সস্ত্রীক রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু, উকীল বাবু হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পুরীর ষ্টেট রিসিভার প্রভৃতি অনেকগুলি গণ্য মান্য ব্যক্তি যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও আচার্য্যদেবের উপদেশ পাঠ করেন। মিসেস্ সেনাপতি ও তাঁহার কন্যা মধুর সঙ্গীত করেন এবং একজন সন্ন্যাসী বাদক মধুর এসরাজ বাদন করেন।

ভ্রম-সংশোধন—১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে, ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের অষ্টম লাইনে "নৃত্যগোপাল রায়ের" স্থানে "নৃত্যগোপাল মিত্র" হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৪ঠা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৪ ভাগ। ২২শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৩৬ সাল, ১৮৫১ শক, ১০০ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd December, 1929. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

১৯শে নভেম্বর, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। মা, এই দিনের মাহাত্ম্য আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দাও। বৎসর বৎসর আমরা শ্রীকেশবের জন্মোৎসব করি, অথচ সে জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল না। আমরা এক কাল্পনিক কেশবের জন্মোৎসব করি, জীবন্ত কেশবের জন্মোৎসব করি না, মনে হয়। তোমার বক্ষঃস্থিত জীবন্ত কেশব, আর আমাদের মনঃকল্পিত কেশব, এই দুইয়ে অনেক প্রভেদ। আমাদের কাল্পনিক কেশব মিথ্যা, আর তোমার বক্ষঃস্থিত শ্রীকেশব জীবন্ত সত্য। আমরা মিথ্যা নিয়ে আছি, মিথ্যা নিয়ে উৎসবাদি করি, তাই আমাদের জীবনে কোন ফল ফলে না। আমরা শ্রীকেশবের জীবন নিয়া কত আলোচনা করি, তাঁহার কত কথা পড়ি, কত তর্ক-বিতর্ক করি, নিজের মনের মত করে কেশবকে চিত্রিত করতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের গড়া শ্রীকেশবের চিত্র কাহারও জীবন-পটে পড়ে না। ইহার অর্থ আর কিছু নহে, আমরা কেশবকে প্রকাশ করতে গিয়ে কেশবকে মিথ্যা করে ফেলি। মা, তুমি আজ কি বলছ, একবার শুনি। তুমিতো বলছ, "আমার বুকের কেশবকে আমিই প্রকাশ করবো। আমিই জানি, আমার কেশব কি এবং কে। তোমরা আমার সন্তানকে জানবে কি করে? আমার কেশবের পরিচয় যদি জানতে চাও, তবে আমার কাছে কেশবের জীবনবেদ শুন। কেশবের জীবনবেদ আমিই প্রকাশ করেছি। সে জীবনবেদ নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে পড় না, বুঝতে পারবে না। আমার আলোকে পড়, বুঝবে।" মা, তোমার কেশবকে আমাদের জীবনে তুমিই প্রতিফলিত কর। বায়স্কোপের ছবি যেমন বায়স্কোপের আলোতেই পটে পতিত হয়, বাহিরের অন্য কোন আলোকে হয় না, তেমনি, মা, তোমার বক্ষঃস্থিত শ্রীকেশবের ছবি তোমার আলোকেই আমাদের জীবনপটে প্রতিফলিত কর, অন্যথা সম্ভবপর নয়। তোমার কেশবকে নিয়ে আর যেন পৃথিবীর ভাবে আমরা নাড়া চাড়া না করি, যাঁরা করতে চান, করুন। আমাদিগকে তোমার বক্ষঃস্থিত স্বর্গের পূর্ণ কেশবকে দেখতে দাও। আমরা তোমার আলোকে তাঁর জীবন্ত সত্য রূপখানি দেখি, ভক্তি ও বিশ্বাসে তাঁকে গ্রহণ করি, তাঁর প্রকৃত জন্মোৎসবের আশীর্ব্বাদ লাভ করে জীবন সার্থক করি। আজ তোমার চরণে এই বিশেষ ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব।

নভেম্বর মাস কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের মাস। এ সময় কেশবচন্দ্রের জীবন-পাঠ ও আলোচনা দ্বারা কেশবচন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝিবার সময়, গ্রহণ করিবার সময়। কেশবচন্দ্রের আগমনে বঙ্গের, ভারতের ও সমস্ত পৃথিবীর কি কিছু উপকার হইয়াছে? কেশবচন্দ্রের আগমনে বঙ্গ, ভারত ও সমস্ত পৃথিবীর কি কিছু লাভ হইয়াছে? যে জীবনকে পাইয়া যত লাভ হয়, কুশল হয়, মঙ্গল হয়, সে জীবনকে লইয়া লোকের তত আনন্দ। যে জীবনকে পাইয়া ধন, মান বৃদ্ধি হয়, সে জীবনের জন্মোৎসবে মানুষের বিশেষ উৎসবানন্দ। ধর্ম্মধন, ব্রহ্মধন, হরিধন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন। কেশবচন্দ্র বঙ্গ, ভারত ও পৃথিবীকে ধর্ম্মধন, ব্রহ্মধন বিতরণ করিতে আসিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবন দ্বারা বঙ্গ, ভারত এবং সমস্ত পৃথিবী বিশিষ্টভাবে লাভবান্ হইয়াছে, ধর্ম্মধনে, হরিধনে ধনী হইয়াছে। যাঁহারা কেশবের জীবন-যোগে সত্য ধর্ম্মের সত্য সংবাদ পাইয়াছেন, যাঁহারা কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-দীক্ষা-যোগে সত্য ঈশ্বরের আস্বাদন জীবনে লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মধনে ও হরিধনে বহু পরিমাণে সত্যই ধনী হইয়াছেন, সে সত্য ধনের সত্য সন্ধান পাইয়া, দর্শন পাইয়া, স্পর্শ পাইয়া, তাঁহার দিব্য বাণীতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া, ক্রমে সেই ধন জীবনে সমধিক সঞ্চয় করিবার জন্য, পৃথিবীর লাভালাভ ও ক্ষতি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না করিয়া, ধর্ম্মের পথে সত্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারাইতো ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব ভাল করিয়া করিবেন। সে উৎসবের আড়ম্বর বাহিরে তেমন প্রকাশ না পাইলেও, সে উৎসবানন্দে স্বর্গ মর্ত্ত মিলিত হইবে। সে উৎসবানন্দে স্বর্গে যেমন ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীমহম্মদ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু মহাজন একপ্রাণ, এক-হৃদয় হইয়া নৃত্য করিবেন, সে উৎসবে তেমনি পৃথিবীর হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, সকল সম্প্রদায় প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া নৃত্য করিবেন। বাহিরে সে নৃত্য-জনিত আনন্দের তরঙ্গ প্রকাশ না পাইলেও, প্রাণ রাজ্যে, হৃদয়-রাজ্যে সে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, সকল সাম্প্রদায়িকতাকে বিনাশ করিবে, দেশ কালের সকল প্রকার ব্যবধান দূর করিবে, অদৃশ্য প্রেম-পরিবারের স্বর্গীয় দৃশ্য ক্রমে পৃথিবীতে দৃশ্যমান করিয়া সকলকে মিলনানন্দে পূর্ণ করিবে। কেন না তিনি আসিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে, স্বদেশ বিদেশকে, স্বর্গ এবং পৃথিবীকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া, ঈশ্বর-সাধনার ভিতর দিয়া, ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, ইচ্ছা-পালনের ভিতর দিয়া, স্বর্গের মিলনে মিলিত করিতে, এক অখণ্ড প্রেম-পরিবারে পরিণত করিতে। বঙ্গ, ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অল্পাধিক বিকীর্ণ হইয়াছে; তাই বর্ত্তমানে স্বদেশ বিদেশে এত দ্বন্দ্ব ও অমিলনের মধ্যে সার্ব্বভৌমিক মিলনের আন্দোলন এবং মিলন-চেষ্টা। ব্রহ্মানন্দের জীবনের সার্ব্বভৌমিক উদার সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে, অতি মৃদুভাবে বিকীর্ণ হইলেও, কতকগুলি বিশ্বাসী পরিবারে, বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী নরনারীর জীবনে তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইতেছে। এখনও সেই বিশ্বাসী পরিবার ও বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী নরনারীর সংখ্যা অতি অল্প, তাঁহাদের জীবনে দোষ দুর্ব্বলতাও অনেক। কিন্তু এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে, সত্যকে সাক্ষী করিয়া, স্বদেশে বিদেশে ঘোষণা করিব, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা যদি কিছু দেখিতে চাও, তবে তাহা দেখ এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে, প্রত্যক্ষ কর এই ক্ষুদ্র দলে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাসকালে এই জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়া ও লীলার কথা এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—"If you desire to see the living God carrying on the work of national redemtion in a living manner, you should go to India. You will see there a spectacle which in simple beauty and grandeur has, I believe, no parallel in any other part of the world at the present moment."

পুরাণে বর্ণিত আছে, সগরবংশ উদ্ধার করিবার জন্য ভগীরথ জয়-শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে গঙ্গা-দেবীকে পৃথিবীতে আনিলেন; এই নব যুগে বঙ্গ, ভারত ও সমস্ত পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জয়-শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া, প্রার্থনা-যোগে, সাধন-

যোগে, তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম-যোগে, পবিত্রাত্মরূপী জীবন্ত দেবতাকে, মানব-জীবনের সত্য গুরু ও পরিচালককে সকলের নিকট উপস্থিত করিলেন। স্বদেশে বিদেশে ধর্ম্মগ্রন্থ-যোগে, মানুষ-গুরু মহাপুরুষদিগের মধ্যবর্ত্তিতা-যোগে, নানাধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন পরোক্ষ ধর্ম্ম-সাধন নিবু নিবু করিয়া জ্বলিতেছিল, ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "এই তুমি, এই আমি, মাঝে কেহ নাই" এইরূপ সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর-সাধনের ধর্ম্ম জগতে ঘোষণা করিলেন, প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রার্থনাদি-যোগে সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর-দর্শন, তাঁহার বাণী-শ্রবণ, তাঁহা দ্বারা ধর্ম্ম-জীবন-পথে পরিচালন, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শিক্ষায় শিক্ষালাভ, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দীক্ষায় দীক্ষালাভ, কেশবচন্দ্র জীবন দ্বারাই জীবন্ত ঈশ্বরের এই জীবন্ত ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিলেন। এই জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত পবিত্রাত্মার পরিচালনে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, অতীতের ও বর্ত্তমানের সকল সাধু ভক্ত মহাজনদিগকে জীবনে গ্রহণ করিয়া, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মভাব জীবনে সাধন করিয়া, ইহলোকে পরলোকে সকলের সঙ্গে, সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কেমনে মহামিলনে মিলিত হইতে হয়, এক প্রেম-পরিবারে পরিণত হইতে হয়, এটী জীবনে সাধন ও জগতে এই সাধন-প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত। তিনি এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেন, এই সাধন আমাদিগকে, বঙ্গ, ভারত এবং সকল জগৎকে দিয়া গেলেন। এ সাধন এখনও বঙ্গে, ভারতে, স্বদেশে, বিদেশে অনেকের দ্বারাই গৃহীত হয় নাই জানি, কিন্তু অল্প-সংখ্যক বিশ্বাসী পরিবারে, অল্প-সংখ্যক বিশ্বাসী, বিশ্বাসিনীদের জীবনে এ সাধন বদ্ধমূল হইয়াছে, এ সাধন জীবন্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া ক্রমে জয়যুক্ত হইতেছে; তাই ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের জীবন্ত উৎসব। তাই বিশ্বাস করি, এই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব বর্ত্তমানে না হইলেও, অদূর ভবিষ্যতে, স্বদেশের উৎসব, বিদেশের উৎসব, সকলের আনন্দোৎসবে পরিণত হইবে।

আমরা জানি, এদেশের অনেক লোক তাঁহাকে এবং তাঁহার সহকর্ম্মী দলকে বিধর্ম্মী বলিয়া অতীতে সন্দেহ করিতেন, এখনও সন্দেহের চক্ষে দর্শন করেন; যদিও ব্রহ্মানন্দের সেবকের নিবেদন প্রভৃতি গ্রন্থকে প্রাচীন সমাজের নিরপেক্ষ উচ্চ সাধকশ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি বেদস্বরূপ দেববাণীপূর্ণ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া প্রশংসা করেন, কিন্তু দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত অনেকেই, পাছে তাঁহাদের আচরিত ধর্ম্মের হানি হয়, এই ভয়ে ব্রহ্মানন্দের এবং ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রেষ্ঠ সাধকদিগের প্রণীত ও তাঁহাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ও গৃহে স্থান দিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ভক্তের জয় নিঃসংশয়। ব্রহ্মানন্দ জীবনবেদে আপনার জীবনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন, "জন্মের পর যার জন্য ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে 'জয়লাভ' লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার জয়লাভ কে খণ্ডন করিতে পারে? ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'এরা জয়ী হইবে; ধূলিমুষ্টি ধরিবে, স্বর্ণমুষ্টি হইবে।' হরিনাম করিয়া যা করিবে, তাহাতেই পৃথিবীর মঙ্গল হইবে। স্বার্থপর হইয়া কাজ করি নাই, দুই টাকার লোভে উপার্জ্জন করিতে আসি নাই। দেশের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছিলাম। হরি সকালবেলাই বলিলেন, 'বর লও'। ভক্ত কি বর চাহিলেন? এই বর চাহিলেন, যেন জয়ী হই। তখন নিজ হস্তে হরি লিখিয়া দিলেন, 'ভক্তের জয় নিঃসংশয়'।" বিশ্বাসী মণ্ডলী যদি নিজ নিজ জীবনে সেই শ্রীহরির কৃপায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের ধর্ম্মের জয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, "স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি, এ রথের সারথি, নিমেষে গতি যার কোটি যোজন" ভক্ত কবির এ গাথার সাক্ষ্য যদি বিশ্বাসিগণ জীবনে অল্পাধিক পাইয়া থাকেন, তবে এস, বিশ্বাসী মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীগণ, নিজের জীবনে মণ্ডলীর জীবনে, দেশের জীবনে, বিদেশের জীবনে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের জয়ে স্বয়ং নিত্য লীলাময় শ্রীহরির জয় দর্শন করিয়া, আমরা প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব করি, জন্মোৎসব করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

(ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের উক্তি হইতে সঙ্কলিত)

ভয়।

"ভয়ের সহিত শক্তির পূজা। ঘোর কালবর্ণ অনন্তকালের, যে রং মিশিয়া যায় কালের সঙ্গে, সেই রং কালী। এই কা...

রূপ অনন্তরূপ অন্ধকারে মিশিয়া আছে। তাই ভয়ের সহিত পূজা। মহাদেবী, মহাশক্তি ভয়ঙ্করা দেবী। পাপ করিয়া মানুষ ভয় করিবে না? হরিদাস প্রেমেতে পাপ ছেড়ে ভাল হন, কালিদাস ভয়ে পাপ ছেড়ে ভাল হন। কালী-পূজার আগাগোড়া ভয়ের ব্যাপার। ঐ খড়্গখানি চক্‌মক্ করিতেছে। অন্ধকার রাত্রি, সাধকেরা শবসাধন করিবে, শব হবে, জিতেন্দ্রিয় হবে। সমস্ত পাপগুলি বলি দিতে হবে। আত্মার ভিতর ভয়, মনের ভিতর ভয়, পরস্পরকে ভয়, পরিবারকে ভয়, সমাজকে ভয়, সব ভয়। যত ভয়, তত ধর্ম্ম। তার পর অভয়া এসে সকল ভয় বারণ করেন।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

"বৎসরের এই দিন হিন্দু উৎসর্গ করেছেন ভ্রাতৃ-প্রেমে। ভগ্নী বসিলেন, আদর, স্নেহ, যত্ন, প্রণয় দিলেন। ভগ্নীর স্নেহ, ভক্তি, আশীর্ব্বাদে ভাই অমর হইল। ভ্রাতৃভাব কি পবিত্র ভাব! দলের ভিতর ভাই, সম্প্রদায়ের ভিতর ভাই, ধর্ম্মে ভাই। আমার হৃদয়ের ভাই, প্রাণের ভাই, আদরের ভাই, স্বরের ভাই, মার পেটের ভাই, আমার অনেকগুলি ভাই। ভাই ধন ভালবাসার ধন, বুঝেছে কেবল ভগ্নীর মন। ভাইফোঁটা আরম্ভ হল আপনার ভাইতে, কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবী শুদ্ধ লোকের কপালে গেল। পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগতের কপালে ফোঁটা দিলেন। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইল। কার সম্পর্কে ফোঁটা? জগজ্জননী যে সকলের মা। তিনিই বলছেন, ফোঁটা দে। সব মার খেলা। একটীকে ভাই, একটীকে ভগ্নী সাজিয়ে খেলা দেখছেন। পবিত্র স্বর্গের প্রেমের এক কোণ কেটে পৃথিবীতে ফেলে দেওয়া হল, সেটা হল ভাইফোঁটা। পবিত্র স্বর্গীয় জিনিষ যেমন ঘরে ঘরে হইতেছে, তেমনি যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয়, বেশ হয়।"

জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিক।

"সকলে দুর্গাপূজা কর। অসুর নাশ হইল, পাপ দূর হইয়া বিজয় নিশান উড়িল, মার পূজার ফল হইল। মার পূজার জয়, মার নামের জয়। মার সন্তান কার্ত্তিকের নাম বিজয়। হে কার্ত্তিক, তুমি সৌন্দর্য্য, তুমি বীরত্ব, তুমি শক্তি। কে সুন্দর? যে ধর্ম্মেতে জয়ী, যে শক্তিশালী, স্বর্গীয় বল যার ভিতরে। দেবী শক্তিরূপে যার ভিতর প্রকাশিত, সেই সুন্দর। আদ্যাশক্তি ভগবতীর সৌন্দর্য্যশক্তি কার্ত্তিকের ভিতর। কার্ত্তিক না আসিলেতো কিছুই হল না। জয়ী না হইলে পূজায় লাভ কি? শ্রীরামচন্দ্র মাকে পূজা করিলেন, রাবণকে বধ করিলেন। মার কাছে বর পেয়েছ? বিজয়ী হয়েছ? তোমার রাবণ বধ হয়েছে? তবে পূজার ফল পেয়েছ। সুন্দর হও, জিতেন্দ্রিয় হও। কার্ত্তিকের মত জয়ী হয়ে নববৃন্দাবনের দিকে উড়ে যাব, এমন শুভদিন কি হবে? 'সত্য শিব সুন্দর।' 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' যত সৌন্দর্য্য ঘনীভূত। সৌন্দর্য্যে ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি।"

মহামিলন।

(১৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ খৃঃ, চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের বক্তৃতার সারাংশ)

মিলন প্রকৃতির নিয়তি। প্রকাণ্ড বিশ্ব প্রকৃতির মিলনের মহাপ্রদর্শনী। যেমন বিশ্ব-সম্বন্ধে, তেমনি প্রতি পদার্থ-সম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত সত্য। প্রত্যেকটি জড় পদার্থ কতগুলি পরমাণুর সমষ্টি, পরমাণুগুলির মিলনে উহার জন্ম ও স্থিতি। অণুপরমাণুগুলির মিলনের নিদান উহাদের আকর্ষণ বা উহাদের অন্তর্নিহিত বিধাতার ইচ্ছা। ভিন্ন ভিন্ন জড় পদার্থগুলির একত্র সমাবেশেরও এই ইচ্ছাই নিদান। নৈশ আকাশ-তলে অগণ্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের মহাপ্রদর্শনীরও মূলে এই মিলনের ইচ্ছা। এই জন্যই বলিতেছি, "মিলন প্রকৃতির নিয়তি" বা ভগবানের মহালীলা।

আবার প্রতি পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে, উহার উপাদানগুলির মধ্যেও মিলনের মহতী ইচ্ছার বিদ্যমানতা এবং তন্নিবন্ধনই উহার একীকরণ প্রতিপন্ন হয়। এই ইচ্ছা এমনি যে, রেখামাত্রও উহার এদিক ওদিক হইতে পারে না। কোন উপকরণ বেশী দাও, পড়িয়া থাকিবে এবং কম দাও, মিলন সম্পাদিত হইবে না—ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে।

প্রকৃতির প্রত্যেক ক্রিয়াই মিলনের জন্য ব্যবস্থাপিত। সে সকল মিলনের তত্ত্ব লোক-জ্ঞানের অগোচর ছিল; বিজ্ঞান তাহাই ঘোষণা করিয়া আত্ম-বিদ্যমানতা জাগাইয়া তুলিয়াছে। বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব ও গৌরব মিলনের মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠায়। এই যুগের ধর্ম্ম—মিলনের তত্ত্ব আয়ত্ত করা—তাই জগৎ ও জীবন, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সকলই বিজ্ঞানময়। অনেক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে, আরো কত বিজ্ঞান আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাই বলিতেছি, এই যুগ বিজ্ঞানময়—ইহার পরেও যুগযুগান্তর বিজ্ঞানময়ই থাকিবে।

অনেকের ধারণা, বিজ্ঞানময় হইয়া গেলেই আধ্যাত্মিকতার বিলোপ হইল। তাঁহারা এইজন্য বিজ্ঞানকে ভয় করেন এবং বিজ্ঞানের নামে দুটি চক্ষু মুদিয়া রাখেন। চক্ষু মেলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিলেই তাঁহারা দেখিবেন, সম্মুখে নূতন আলোক পড়িয়াছে এবং নূতন দেখিবার জিনিষ রহিয়াছে; নূতন আধ্যাত্মিক বিষয় আসিয়াছে বলিয়াই, পুরাতনটি বিজ্ঞানময় বা গোলা-

জাত হইয়াছে। জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভরিয়া রাখার নামই বিজ্ঞান—অক্ষয় অমর হইয়া সে রত্ন মনুষ্যত্বের রত্নাগারে সঞ্চিত হইয়া রহিল। ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবার আগে, প্রথম দর্শনাবধি আধ্যাত্মিক আলোকে (Inspirationএ) তাহা উদ্ভাসিত হইয়া বিজ্ঞানময় হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সেই আলোকই উহার সমুদয় দিক প্রকাশিত করিয়া, বিজ্ঞান-রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া, সে আলোক অন্তর্হিত হয়। যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া ভয় করেন এবং সেই আলোকেই থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহারা পুরাতন আলোক লইয়াই দেখিয়া শুনিয়া সুখী হন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিশালতা এবং আলোকের উত্তরোত্তর নব নব উজ্জ্বল্য-দর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। বিজ্ঞান-দর্শন নবালোকের অরুণোদয়-কাল সূচনা করে—আরো উজ্জ্বলতর আলোকে, আরো নূতন বিস্তৃত ব্যাপার সম্মুখে বুঝাইয়া দেয়।

Inspiration বা নবালোক দূরবীক্ষণের ন্যায়। এই আলোকের শক্তি বা Power যত বাড়িয়া যাইবে, ততই আধ্যাত্মিক রাজ্যের দূরতর ও দূরতম প্রদেশগুলি নিকট হইবে এবং জাজ্বল্যতররূপে প্রতিভাত হইবে—যাহা দেখি নাই, তাহা দেখিতে পাইব—যাহা শুনি নাই, শুনিতে পাইব। Inspiration বা Revelation Progressive—ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া নূতন হইতেছে, তেজস্বী হইতেছে। ক্রমেই বিশ্বাসালোকে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য প্রতিভাত হইয়া, দর্শন শ্রবণ উভয়কেই একেবারে নূতন করিয়া দিতেছে। পুরাতন দর্শন শ্রবণ লইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাপার গুলি যেমন বিজ্ঞানময় হইতেছে, অমনি বিশ্বাসে নূতন দৃশ্য, বিবেকে নূতন সংবাদ আসিতেছে। বিজ্ঞান-দর্শন আধ্যাত্মিকতাকে পশ্চাৎ হইতে গ্রাস করিতেছে, আর সম্মুখে নূতন আধ্যাত্মিকতা ফুটিয়া উঠিতেছে—যাহা পূর্ব্বের আধ্যাত্মিকতা হইতে নূতনতর ও শ্রেষ্ঠতর; সুতরাং বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ই অফুরন্ত ও চির নূতন। কেহই কারো বিলোপকারী নয়, প্রত্যুত সাহায্যকারী। একে অন্যকে মার্জ্জিত করিয়া ফুটাইয়া তোলে।

মিলনের জন্য ভাঙ্গা গড়া দুইটি উপায়ই প্রযুক্ত হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র বস্তুকে আর একটি ক্ষুদ্র বস্তুর সঙ্গে মিলাইবার বা একটীর সঙ্গে অন্যটি যোগ করিবার বিধি এই যে, উহাদের গুড়ো করিয়া, গুড়োগুলি মিশাইয়া, বড় একটি করিতে হয়। সেই মিলিতটীর সঙ্গে আর একটিকে মিলাইবার বিধিও সেইরূপ। সুতরাং ভাঙ্গিয়া নূতন বা বড় করিয়া গড়া মিলনেরই একটী ব্যবস্থা। এইজন্য ভাঙ্গা দেখিয়া আমরা ভীত হইব না; বরং আনন্দিত হইব যে, নূতন ও বড় করিয়া গড়িবার সূত্রপাত হইল।

কখন কখন ভাঙ্গা গড়া শনৈঃ শনৈঃ সম্পন্ন হয়। দুইটি বস্তু শনৈঃ শনৈঃ ঘনিষ্ঠতর হইয়া মিলিত হয়; কিন্তু উভয়েরই বিভিন্নতা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মত স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রমে উভয়েই উভয়কে গ্রাস করিয়া আর একটি নূতন কিছু হইয়া পড়ে। প্রথমটি আপনার মধ্যে আপনি বাড়ে, দ্বিতীয়টি রূপান্তরিত হয়। প্রথমটী স্থূল, দ্বিতীয়টী সূক্ষ্ম; প্রথমটী তড়িৎ-গতি, দ্বিতীয়টীর গতি মৃদু-মন্দ—যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া। একটী যোগ, আর একটী সমন্বয়; একটীতে পরিবর্জন বা বিসর্জন অধিক, আর একটীতে অল্প।

যেমন জড় পদার্থ সম্বন্ধে, তেমনি দেশকাল সম্বন্ধেও। দেশ নানারূপে আত্ম-বিশালতা পরিত্যাগ করিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইতেছে। জলযান, উড়োকল, বৈদ্যুতিক শক্তি দূরতর দেশগুলিকে কত নিকট করিয়াছে! আরো নিকট করিবে। মিলন বা একত্র করিবার ইচ্ছা সমস্ত পৃথিবীকে, ক্রমে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে একটী রাজ্যে পরিণত করিবে। এখন যেমন একখানি কাগজে মানচিত্র আঁকিয়া পৃথিবীকে দেখান যায়, তেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব একটী মায়াপুরীর মত প্রতিভাত হইবে। আমাদের নিকট এখন কল্পনায়ও সে দৃশ্য স্থান পায় না। এখন আমরা বলি, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড! কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে আমাদের ভবিষ্যবংশ বলিবে, ব্রহ্মাণ্ড কি ক্ষুদ্র।

দেশের মিলন আর জড় পদার্থের মিলন একরূপ নয়। দুইটি জড় বস্তু মিলিয়া এক হইয়া যায়, কিন্তু দেশের মিলন মানুষের চোখের দূরত্ব, কর্ণের দূরতা, জ্ঞানের দূরতাকে বিনষ্ট করিয়া একটী চুঙ্গির মধ্যে সমুদয় প্রদর্শন করে এবং করিবে। জগৎটা যেন একটা Automatic আত্মনিতিক পদার্থ—আপনি কখন প্রকাণ্ড, কখন ক্ষুদ্রকার ধারণ করে। জগৎ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম হইয়া যাইতেছে—মানবের দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞানের নিকটে। বিশাল জগতের ধারণা করিতে যাইয়া মানব একদিন 'কি দেখিব, কি শুনিব, কি বুঝিব' বলিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িত; এখন সে বিহ্বলতা নাই, মানব বুঝিতেছে—একদিন সে ইহার বিশালতা মাপিয়া উঠিতে পারিবে। মানব একদিন বুঝিবে, তাহার দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞানের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য জগৎ পর্য্যাপ্ত নয়। সুতরাং একদিন যাহা বিশাল বিপুলায়তন ছিল, ক্রমেই তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই জগৎ অটোম্যাটিক—উহার বিপুলতা ও সূক্ষ্মতা কেবল ধারণা-মাত্রে পর্য্যবসিত। ধারণা-বৃদ্ধির সহিত উহার আয়তন ক্ষুদ্র হইতেছে। মানবীয় ধারণাই আয়তনের মাপদণ্ড—ধারণা-দণ্ডের ক্ষুদ্রতার সময়ে যাহার আয়তন বিশাল, মাপকাঠির বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। দেশ ও ধারণার মধ্যে বিলোম সম্বন্ধ। এই জন্যই মানবীয় ধারণা ও শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব দেশ ঘনসন্নিবিষ্ট ও মিলিত হইতেছে।

কাল সম্বন্ধেও দেশের সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। "ভূত ভবিষ্যত কাল হলো বর্ত্তমানরে। মিশিল নববিধানে প্রাচীন

বিধানরে।" বর্ত্তমানের ভিতরে ভূত ভবিষ্যৎ প্রবেশ করিলেই, অনাদি অবিরত অনন্তকাল এক মধ্যবিন্দুত্ব বা বর্ত্তমানতা প্রাপ্ত হইল। অবিরত কাল তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, এখনই মূর্ত্তিমান হইয়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। এই মুহূর্ত্তের ভিতরেই কালের সমগ্র মহিমা বিদ্যমান।

কথাটা আর একরূপে বলা আবশ্যক। কালের মাপদণ্ড ঘটনা, যেমন দেশের মাপদণ্ড ধারণা। অতীতের ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি যদি বর্ত্তমান ঘটনাবলির সঙ্গে চিত্রপটে তুলিয়া দেখি, তাহা হইলেই সমগ্র ঘটনার রাজ্য একপটে আমার চক্ষের সম্মুখে বর্ত্তমান হইয়া প্রতিভাত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে আসিয়া প্রবেশ করে, এবং এক সঙ্গে দেখা যায়, এক মুহূর্ত্তের—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ব্যাপার হইয়া উঠে। একদিকে ইতিহাস অতীতের, আর একদিকে ভূরিদর্শন-জনিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবিষ্যতের চিত্র সুচিত্রিত করিয়া দেখায়; তাই সমগ্র ঘটনা-রাজ্যের সুবিস্তৃত পরিসর সূক্ষ্ম চিত্রে মিলিত হয়। দেশের ন্যায় কালও মিলিত হইয়া এককালে পরিণত হয়, একই বিন্দুতে দাঁড়ায় এবং মিলনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে।

এক মৃত্তিকার রূপান্তর ভূতত্ত্বে, বিবিধ উদ্ভিদের একতা উদ্ভিদ্-তত্ত্বে এবং নানা জীবের এক প্রকৃতি জীবতত্ত্বে প্রদর্শিত হইয়া, উহাদের মিলন সম্পাদিত হইয়াছে। এইরূপ প্রাকৃত বিজ্ঞান জগতের সমস্ত ব্যাপারে পরস্পরের সম্পর্ক বা এক একটী ব্যবস্থায় সকলকে বা অনেককে বাঁধিয়া, সকলের দূরতা বা পার্থক্য তুলিয়া দিতেছে। যেরূপ পদার্থে পদার্থে, তেমনি ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় বাঁধা-বাঁধি প্রকাশিত হওয়ায়, আগে যে সকল মানব-বুদ্ধিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল, সেইগুলিই মিলিত প্রতিপন্ন হইতেছে। মানবের ধারণা বা ধীশক্তি এবং বিজ্ঞান ফুটিয়া ফুটিয়া জগতের মহামিলনতত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে। কেবল ঘোষণা নয়, জগৎ শনৈঃ শনৈঃ সে দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মানব-সমাজ সম্বন্ধে এই মহামিলন কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহাই এখন বিবৃত করিতেছি। প্রকৃত পক্ষে মানব-সমাজ সম্বন্ধেই "মহামিলন" সত্যটি অতি পরিস্ফুট হইতেছে। দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, সমগ্র মানব সমাজ একটী রাজ্যে, একটী সমাজে, একটী পরিবারে, এমন কি একটী মানবে পরিণত হইতেছে। এই পরিণতিকেই আমি "মহামিলন" বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়রাজ্যে, জীবরাজ্যে, প্রাকৃতিক ক্রিয়া সকলের মধ্যেই "মহামিলন-তত্ত্ব" ফুটিয়া উঠিতেছে—অতীতের মিলন-তত্ত্ব প্রকটন করিয়া মিলনের নূতন ক্রিয়াও সম্পাদন করিতেছে। যাঁহারা পুরাতন বাদী, তাঁহারা সমগ্র জগতে কেবল পুরাতনের ব্যাখ্যা ও টীকা টিপ্পনী অবলোকন করেন; "ছিল"ই তাঁহাদের মূল মন্ত্র বা সাধনার বিষয়, ইতিহাস তাঁহাদের শাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র। তাঁহাদের নিকটে "মহামিলনও" কেবল অতীতের ব্যাখ্যা মাত্র। মহামিলন কিছু বাকী আছে, বা নূতন হইতেছে, অথবা আরো হইবে, তাঁহারা দেখিতে পান না এবং বিশ্বাস করেন না।

সমগ্র প্রকৃতি—জড় ও জীব-প্রকৃতি, মানব ও দেব প্রকৃতি—শনৈঃ শনৈঃ মহামিলনের পুণ্যক্ষেত্রে সন্নিকটবর্ত্তী, ঘনিবিষ্ট ও এক হইয়া যাইতেছে। এই মহামিলন জন্য প্রতিদিন প্রকৃতি নূতন হইতেছে, প্রতি পদার্থ ও প্রতি ক্রিয়া নূতন হইতেছে, প্রতি জীব নূতন ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, প্রতি মানব-সমাজে নূতন জ্ঞান, ভাব ও শক্তির জন্মলাভ হইতেছে; দৃশ্য বিশ্বের পরপারে—আত্ম-লোকেও নূতন যোগ, নূতন ধ্যান ধারণা, নূতন আলোক আবির্ভূত হইতেছে। এই মহামিলনের প্রভাবে কি দৃশ্যবিশ্ব, কি অদৃশ্য রাজ্য, সমুদয়ই নূতন হইয়া মিলনে একত্ব লাভ করিতেছে।

যেমন মানব-সমাজ মহামিলনে মিলিত হইয়া, এক হইয়া, নূতন সত্তা জ্ঞান প্রেম পুণ্য-শক্তি প্রভৃতি লাভ করিতেছে, তেমনি তাহাদের মধ্যে প্রতিজন, প্রতি সমাজ, প্রতি বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলিত হইয়া নূতন হইতেছে। নূতন হইয়া মিলিতেছে, আবার মিলিত হইয়াও নূতন হইতেছে। আবার আর একটির সঙ্গে মিলিতেছে, তার পরেও আবার নূতন হইতেছে। মিলিত হইয়া নূতন হওয়া সৃষ্টির প্রকৃতি বা ভগবৎ-ইচ্ছা।

এই নূতন হওয়ার নামই উন্নতি। সুতরাং সৃষ্টি চির উন্নতি-শীল—মিলিত হইবে, আরও উন্নত হইবে। উহার ভিতরে অবনতি নাই, মৃত্যু নাই—কেবলই বৃদ্ধি। উহার ভিতরে পুনরুক্তি নাই—কেবলই নূতন। যাহার চক্ষু ফুটিয়াছে, সে কেবলই নূতন দেখে; যাহার নূতন কর্ণ হইয়াছে, সে কেবলই নূতন বার্ত্তা শুনিতে পায়; যাহার জ্ঞানালোক অনন্তের পথে ছুটিয়াছে, সে কেবলই নূতন নূতন বিজ্ঞান-রাজ্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। তাহার নিকট সকলই নূতন ও অফুরন্ত, সুতরাং এ লীলা শেষ হইল বলিয়া তাহার ভয় বা মনঃক্ষোভ জন্মে না।

মিলনের ভিতর ভগবান্ নূতন সৃষ্টির উপাদান রাখিয়াছেন। যত মিলন, ততই নূতন সৃষ্টি। যেখানে মিলন নাই, সেখানে নূতন সৃষ্টি নাই। মিলন যেখানে অপরিস্ফুট, সেখানে নূতনত্বও অদৃশ্য বাষ্পবৎ, তাহাতে উন্নত সমাজের তৃপ্তি হয় না, সাধ মিটে না। ভগবানের গঠনে পৃথিবী ও জগৎ নিত্য বাড়িতেছে, উন্নত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন হইতেছে। মনুষ্য বা জ্ঞান-জীবী জীব যখন বিধাতার এই গঠনের সহায়তায় আত্ম-সমর্পণ করে, তখনই সে জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া বলে, "মহামিলনে আমি আত্ম-বিসর্জ্জন করিলাম, আত্মহারা হইলাম।" যখন চৈতন্য লাভ করে, তখন দেখে—এই বিসর্জ্জনটুকুর উপলব্ধিই তাহার সত্তা এবং এই বিসর্জ্জনোত্থ অমৃত পান করাই তাহার জীবন। তখন অবাক্ চক্ষে দেখিতে থাকে, এই মহামিলন কেবল প্রকৃতির নয়, ভগবান্ স্বয়ংই এই মহামিলনে বর্ত্তমান।

মহামিলনে ভগবান্ আপনার এক নূতন স্বরূপ প্রকাশিত করিতেছেন। ইঁহাকে "বিরাট পুরুষ" বলিলেও হয় না, অথচ

বিরাটত্ব ইঁহারই অঙ্গে বিলীন। ইঁহাকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিলেও হয় না, যদিও সমুদয় ইঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়া ইঁহাতেই স্থিতি করিতেছে। বিরাট সৃষ্টির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র—প্রত্যেকেরই সত্তা আছে, অথচ সকলেই মহামিলনে এক। "মহাপ্রলয়" সাধন দ্বারা ইহার আরম্ভ, "বিরাট পুরুষ" সাধন দ্বারা ইহার অনুভূতি এবং "মহামিলন" সাধন দ্বারা ইহার সত্তা বা প্রাণময় বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। সাধককে তিনটীই সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয়।

মহামিলনে সমস্ত জড়, জীব ও আত্মার সঙ্গে একত্ব উপলব্ধিই মহামিলনে সিদ্ধিলাভ। এই জন্য জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্ম্মভেদ উড়াইয়া দিয়া সব অনন্ত মিলনে একাকার হইবে—খণ্ড খণ্ড আকাশের অপগমে এক মহাকাশ প্রকাশিত হইবে। মহামিলনের সাধন সমস্ত জগৎ লইয়া—সমস্ত মানব জাতি লইয়া। কেবল একাকী ইহার সাধনে সিদ্ধিলাভ হয় না। এই মহামিলনের যুগে, এইজন্য সমগ্র মানব, অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে, বাহিরে ও অন্তরে, এক হইতে দৌড়াইতেছে। যাঁহারা বুঝিতেছেন, তাঁহারা আত্মস্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ এই মহামিলনের পরম স্বার্থে দান করিতেছেন; যাঁহারা বুঝিতেছেন না, তাঁহারাও অচেতন হইয়া, অবাক্ হইয়া, এই পরম স্বার্থের মহাস্রোতে তৃণখণ্ডবৎ ভাসিয়া যাইতেছেন। মহামিলনে এই পরম স্বার্থের উদ্ভব হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহা সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অমৃত—ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের মহাসঙ্ঘর্ষণে উত্থিত অমৃত—সকল জাতির, সকল বর্ণের ও সকল ব্যক্তির ইহাতে সমান অধিকার। এই মহামিলন বা নববিধানের পরম মিলন জগতের পরম স্বার্থ বা পরম সাধন, পরম শান্তি ও পরমানন্দ। নানা অবস্থায় ফেলিয়া ভগবান্ এই জাতীয় সাধনায় মানবকে এখন নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যে ভগবানের এই লীলা বা সাধনা দর্শন করে, সেও মুক্তিলাভ করে।

ভিখারীর যন্ত্র বাহুলানের জন্মকথা।

ভারতবর্ষে যত প্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে বাহুলীন বা বেহালা একটী অতি প্রাচীন যন্ত্র। আমরা ইহাকে ধনুর্যন্ত্র, তন্তযন্ত্র, বাহুলীন, ভিখারীর ও নালকমলের বেহালা নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। পুরাকালে এদেশের জনসাধারণ ইহাকে সারঙ্গী বলিত। সংস্কৃতে সারঙ্গ নামে ইহা প্রচলিত ছিল, যদিও সারঙ্গ নামে আর একটী যন্ত্র এদেশে প্রচলিত আছে, যাহা কেবল কোমলকণ্ঠী গায়িকাদের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহুলীনের সঙ্গে ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও তত যন্ত্র বলা হয়। ততযন্ত্র দুই প্রকার, ধনুস্তত অর্থাৎ ধনুর যন্ত্র, যাহা ছড়ের বা ছড়ির দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলীত্র বা মিরজাপের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অঙ্গুলীত্র-তত বা মিরজাপের যন্ত্র কহে। বাহুলীন তন্ত্রী-বিশিষ্ট ততযন্ত্র, ঐকতান ও সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বিকাশিত করিবার একমাত্র যন্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রবল-পরাক্রান্ত লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজা কর্ত্তৃক প্রথম ধনুস্তত যন্ত্র বা বাহুলীন ভারতে সৃষ্ট হয় ও তাহাকে রাবণাস্ত্রম নামে সাধারণে ব্যবহার করিত। রাবণাস্ত্রমের অনুকরণে রাবণা বলিয়া আর একটা যন্ত্রের অভ্যুদয় হয়, আর সেই সময়ে জনসাধারণ উহাকে দুইটী তন্ত্রে ব্যবহার করিত। তৎপরে অমৃতি নামে আর একটী ধনুর্যন্ত্র রাবণাস্ত্রম ও রাবণার আদর্শে তৎকালে উদ্ভূত হইয়াছিল। "কেমানজে জৌজ" (Kemangeh Gouze) নামে আর একপ্রকার ধনুর্যন্ত্র আরব দেশীয়েরা সেই সময়ে ব্যবহার করিত। ভারতীয় অমৃতি যন্ত্রের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, "কেমানজে জৌজ" অমৃতির অনুকরণ মাত্র। পারস্য অভিধানে "জৌজ" শব্দের অর্থ প্রাচীন ধনুর যন্ত্রকে বুঝায়, ভিয়াল বলিয়া তাহা লিখিত আছে। অমৃতির ও "কেমানজে জৌজের" সৌসাদৃশ্যের কারণ—তৎকালীন পারস্য দেশের সহিত এ দেশের সদ্ভাব এবং তাহার জন্যই এই অনুকরণ। দুইটী যন্ত্রই প্রায় একপ্রকার এবং নারিকেল খোলের দ্বারাই দুইটী প্রস্তুত করা হইত। কেমানজে জৌজের অনুকরণে যে ভিয়াল প্রস্তুত, তাহাতে আর কোন মতভেদ হইতে পারে না। কেবল দেশ ও কালভেদে এই আকৃতি ও নামের পরিবর্ত্তন বা অপলাপ মাত্র। কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেমানজে জৌজ যে ভিয়ালের পূর্ব্বে সৃষ্ট, তাহার প্রমাণ কি? ব্রুসেল মহানগরের সঙ্গীতাধ্যক্ষ এফ, জে, ফেটিস সাহেব তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইয়োরোপে কোন ধনুর্যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। আরও তিনি বিখ্যাত বেহালা-নির্ম্মাণকারক Stradivari সাহেবের জীবন-বৃত্তান্তে এবং ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি-বিষয়ক গ্রন্থে, যাহা জন বিশপ সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ, রীজ সাহেবকৃত Encyclopaediaর সহিত ইহার বিশেষ ঐক্য আছে। প্রাচীনকাল বলিতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বকালকে বুঝায়। তৎকালে অমৃতির অনুকরণে কেমানজে জৌজ সৃষ্ট হইয়াছিল, ঐ সময়ে ইয়োরোপে ইহার খোঁজ বা কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এমন অবস্থায় কেমানজে জৌজ হইতে ভিয়ালের প্রাচীনত্ব কোন প্রকারে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। • The Castle illustrate family paperএ, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, আগষ্ট মাসে, ৩২ খণ্ডে, ৬ ভলিমে লিখিত আছে, "রিবেক" বলিয়া যে এক প্রকার আরব দেশীয় ধনুর্যন্ত্র আছে, যখন অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা স্পেন দেশ জয় করেন, সেই সময় উক্ত যন্ত্র আরবেরাই প্রথমে ইয়োরোপে প্রচার করেন। Britania গ্রন্থেও এই ভাবে বর্ণিত আছে। রীজ সাহেবও তাঁর Encyclopaediaতে, ফরাসিরা "রিবেক" যন্ত্রকে ভাওলীন বলিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এই

ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে ওদেশে ঐ প্রকার ছড়ি বা কোন তৎসম একেবারেই ছিল না। রিবেক কেমানুজের অনুকরণে নির্ম্মিত এবং কেমানুজে আমাদের এ দেশীয় অমৃতির অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ আর্থার হুইটেন সাহেব ভারতীয় যন্ত্রের ভিতর বেহালার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এখন বাহুলীনের আদি উৎপত্তি-স্থান যে ভারতবর্ষ, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় আসিতে পারে না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রিবেক ও রবাবের অনুকরণে ইটালিতে ভিয়ালের প্রথম সৃষ্টি হয়, আর সেই সময় উহাকে তিনটী তন্ত্রের দ্বারা ব্যবহার করা হইত। রবাব আরব দেশীয় আর একপ্রকার আফগানি যন্ত্র বিশেষ। পাঠান রাজসভায় তাহা ব্যবহৃত হইত। রাগ রাগিণীর আলাপ সেতার ও বীণার ন্যায় ইহাতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আরবে ইহার প্রথম উদ্ভব হয়। দিল্লীর নিকট রামপুর নগরে ইহার প্রচুর প্রচলন আছে। রীজ সাহেব তাঁর Encyclopædiaয় বেহালার প্রথম অভ্যুদয়ের সময় নির্দ্দেশ বা নির্ণয় করেন নাই। ভাওলীন প্রাচীনকালে ইয়োরোপে ভিয়াল নামে ব্যবহৃত হইত। এফ, জে, ফেটিশ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছেন, "There is nothing in the West which has not come from the East." অর্থাৎ ইয়োরোপে বা প্রতীচ্যে এমন কিছু নাই, যাহা এ'সিয়া বা প্রাচ্য হইতে না আসিয়াছে। পূর্ব্বে কেমানুজে জৌজ শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। Isqubarth সাহেবকৃত Music Hand Book, page 265তে লেখা আছে, Germany ভাষায় বেহালাকে "Geize" বলে। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, যেমন ভিয়ালের পরিবর্ত্তে আমরা বেহালা শব্দ ব্যবহার করি, সেই প্রকার Germanyরা কেমানুজে জৌজের পরিবর্ত্তে জেজ শব্দ ব্যবহার করেন।

বাহুলীন অতি শৈশব অবস্থায় দুইটী তন্ত্রে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৎপরে ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সাত শত বৎসরের ভিতর শুনা যায়, এমন কি ২৫।৩০টী তন্ত্র দ্বারা শোভিত করিয়া, বহুরূপ পরীক্ষার দ্বারা ইহাকে পরীক্ষিত করা হইয়াছে। ইয়োরোপীয় মনীষিগণ ইহাকে যথার্থ স্বরূপে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ক্রমে বহু প্রকার শক্তি ও চেষ্টা-নিয়োগে নানা সংস্কার হয়। অবশেষে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে, ইটালি দেশের লামবর্ডির অন্তর্ভুক্ত সাল নামক নগরে, গ্যাসপার্ড নামক জনৈক শিল্পী নবাকৃতিতে চারিটী তন্ত্রের দ্বারা ইহাকে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাহাই অদ্যাবধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত যন্ত্রের ভিতর শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া King of the instrument এই খেতাবে ভূষিত হইয়া, সর্ব্বসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, বিশেষ আদরের যন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া আছে। আশ্চর্য্য এই, দুইখানি শুষ্ক নীরস কাষ্ঠের ভিতর এত মধুর প্রাণস্পর্শী দেব ভাব পূর্ণরূপে থাকিতে পারে, তাহা কয়জন হৃদয়বান্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? মানবের উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভব-শক্তি ধারণা করিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়; সামান্য নারিকেল খোল হইতে যাহার জন্ম, সেই বাহুলীন আজ সভ্য জগতের ভিতর কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, ভাবিলে পুলকিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। ভগবান্ তাঁহার মানব-সন্তানদের কত মনীষা ও সচ্চিন্তা দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, যাহা হইতে যুগে যুগে কত অদ্ভুত রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে, এবং যাহা স্মরণ করিলে অসীম বিস্ময়-সাগরে আপ্লুত হইয়া, তাঁহার চরণে আপনা আপনি মস্তক অবনত হইয়া আসে ও তাঁহার মহিমার গুণগান না করিয়া মানব নীরব থাকিতে পারে না।

প্রতীচ্যের বন্ধুরা আমাদের বাহুলীনকে সোহাগ করিয়া সাধারণে কত প্রকার নামে অভিহিত করিয়াছেন, বোধ হয়, তাহা অবগত হইলে অনেকের বিশেষ আনন্দ হইতে পারে। তন্নিমিত্ত সেই সমস্ত নাম কতক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রোম-বাসীরা Vidule, Viola, Violun, Violino, Violoncello, ইহা ব্যতীত অন্য সাধারণে Fidulli, Fidulu, Fidulla, Veilla, Fidel, Videl, Fidad, Fidd'e, ইংরাজগণ Violin, ও ইটালীবাসীরা ভিয়াল নামে তাঁহাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এদেশে ঐ শব্দের অপভ্রংশে সভ্য যন্ত্রের ভিতর বেহালা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাকে পরকীয় করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়াই, এদেশের জনসাধারণে সকলেই জানেন যে, বাহুলীন বিদেশীয় যন্ত্র; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। বোধ হয়, এত প্রমাণ সত্বে এখন কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, বাহুলীনের আদ্য জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ।

নিয়তির চক্র যদি না ইহাকে ঐ সুদূর দেশে লইয়া না যাইত, কে আজ উহাকে, সভ্য যন্ত্রের ভিতর King of the instrument খেতাবে ভূষিত হইয়া সমস্ত যন্ত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রভুত্ব করিতে দেখিত? দশে যাহাকে উচ্চস্থান দিবে ও উচ্চ শিখরে লইয়া যাইবে, তাহার গতি-রোধ কে করিতে পারে? এমতাবস্থায় উহাকে ভিখারীর যন্ত্র বা অন্য কোন অপনামে অভিহিত করা আর এখন শোভা পায় না। তাহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট সঞ্চিত হইয়াছে, এখন আর এ দেশীয় ভাবে অমর্য্যাদা ও অবহেলা করিলে চলিবেনা। সে তাহার স্থান ভগবৎ-কৃপায় নিজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। এখন তাহাকে উচ্চস্থান সকলকেই দিতে হইবে, কৃপণতা করিলে চলিবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

তপস্বিনী ক্ষীরোদমোহিনী বসু।

(শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক পঠিত)

শ্রীনববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্রের অনুগামী বিশ্বাসী ভক্ত পিতা শ্রীনৃত্যগোপাল মিত্রের তপস্বিনী ভগ্নী দেবী ক্ষীরোদমোহিনীর মহৎ জীবনের আদর্শ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ আজ এই সুগম্ভীর শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইতেছি; যদি এই মহা ভাগবত-শ্রবণ মণ্ডলীর কিঞ্চিন্মাত্র দেবজীবন-লাভের অনুরাগ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অমরধাম বাসী আত্মা তৃপ্তি লাভ করিবেন।

দেবী ক্ষীরোদমোহিনী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে, ১০নং নরসিংলেনস্থ আমাদিগের পৈত্রিক বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দননগরে খলিসানীর বসু পরিবারে মাত্র দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং ঠিক এক বৎসর পরেই তিনি বিধবা হইয়া পিতা মাতার গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

আমাদের দেশ জনাই বাক্সা গ্রামে প্রসিদ্ধ মিত্রবংশের পুরুষানুক্রমে বসবাস। তথায় তিনি ঠাকুমার সহিত নানাবিধ গৃহকর্ম্মে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিতেন। বাহির বাটীর দরদালানে যখন শিশু বালকেরা পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিত, পিসিমা তাহাদিগের আবৃত্তি শুনিয়া এবং পাততাড়ির লেখনী দেখিয়া তাঁহার প্রথম বর্ণপরিচয় হয়। সে যুগে পল্লিগ্রামের অন্তঃপুরবাসিনীরা অধিকাংশই ইহার অত্যধিক বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাইতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাহার পর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি আমার মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আরায় যান। তাঁহারা দুই জনেই প্রায় সমবয়স্কা থাকায়, উভয়ের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সৌহার্দ্দ্য ছিল; ক্রমে উহা আধ্যাত্মিক যোগে গভীর হইতে গভীরতর আকার ধারণ করিয়াছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাবার অন্তরে শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রতি গভীর অনুরাগ ও নববিধানে সুদৃঢ় বিশ্বাস ঘনীভূতরূপে নব ভাবের উদ্দীপনা করিতেছিল; কিন্তু আমাদিগের পিতামহের রুদ্র মূর্ত্তির জন্য তাহা বাহ্যিকভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারিতে ছিল না।

এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটী ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আমাদিগের পিতামহ মহাশয়ের তৎকালীন চিনাবাজারে কাগজের কারবার ছিল এবং তিনি Indian Mirror নামক আচার্য্যদেবের পরিচালিত সাপ্তাহিকের জন্য কাগজ সরবরাহ করিতেন। আমার বাবার নিকটে শুনিয়াছি, উক্ত সময়ে বাবা একদা কমলকুটীরে কাহারও চিকিৎসার জন্য গিয়াছিলেন; সেই সময় তাঁহাদিগের যখন গভীর প্রসঙ্গাদি হইতেছিল, তখন আমাদিগের পিতামহ মহাশয় প্রাপ্য টাকা আদায় কারণ যান। আচার্য্যদেব বাবার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ মৃদু হাস্য করিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত কাকা বাবুকে বলিলেন, "কান্তি! ঐ দেখ, মিত্র মহাশয় আসিতেছেন, উঁহাকে কিছু দিতে পারিলে ভাল হইত।" কাকাবাবু তৎপর নীচে নামিয়া তাঁহার প্রাপ্য দিয়া আসিলেন, বাবাও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। "মিত্র মহাশয়" বিদায় হইলে পুনরায় প্রসঙ্গাদি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। এমতাবস্থায় বাবা ঠাকুরদাদার অত্যধিক শাসন হইতে বিমুক্ত হইয়া, আরা নগরে যাইয়া, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একত্রে সাধন করিবার সুযোগ পাইতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদার, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ও সোদামী ভক্তির আধার ভাই অমৃতলাল প্রমুখ সাধুভক্তগণ প্রচার-কার্য্যে তথায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও চিরপ্রথানুযায়ী অবরোধ-প্রথা পূর্ব্ববৎ কঠোর ভাবেই চলিতেছিল। মা ও পিসিমা অভ্যাগত অতিথি-সেবার সমুদায় আয়োজন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের পরিচয় কিছুই পাইতেন না। শুধু নীরবেই সেবার ভারটুকু বহন করিয়া যাইতেন। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে,—

"তুমি, সাথে করে এনেছিলে সেবা ভরা প্রাণ—
আজি, মরণে দিয়া যে গেছ মহামূল্য দান।"

ক্রমে মা ও বাবা একত্রে উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। আর পিসিমা পৌত্তলিক বিধবা বলিয়া শুধু দূর হইতেই দেখিয়া তৃপ্ত হইতেন। স্তোত্রপাঠ তাঁহার সরল মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাই তিনি উঁহাদিগের আবৃত্তি শুনিয়া শিখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাধু-ভক্তদিগের পদধূলি বারম্বার আমাদিগের গৃহকে পবিত্র করিতেছিল; এমতাবস্থায় এই অল্পবয়স্কা অন্তঃপুরবাসিনী বিধবার প্রাণে ভক্তদর্শন ও ভক্ত-সেবার দারুণ পিপাসাস্রোত ভগবৎ-কৃপায় কিরূপে খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার আত্মজীবনী হইতে পাঠ করিতেছি।

আত্ম-জীবনী

ভক্ত-দর্শন, ভক্ত-সঙ্গ ও ভক্ত-স্পর্শ জীবের পরিত্রাণের প্রধান উপায় [illegible] তার যে অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি, তাহার সাক্ষ্য না [illegible] অপরাধ হইবে; তাই কয়েকটী বিষয় প্রকাশ [illegible] জানিয়া, লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ভক্তভাজন প্রেরিত দেব অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে কোনও পরিচয় আমার ছিল না। কেবল আমার শ্রদ্ধেয় দাদামহাশয়ের সঙ্গে মধুর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। আমি বিধবা হয়ে আমার দাদার নিকট থাকি। ১৮৯১ সনের ফাল্গুন মাসে দোলের সময় তিনি দাদাকে এক পত্র লেখেন যে, হায়দ্রাবাদ হইতে তাঁহারা স্বামী স্ত্রী আসিবেন ও দোল পূর্ণিমায় চৈতন্য-উৎসব করিবেন। তখন আমি একজন পৌত্তলিক হিন্দু, তাঁহাদের আগমন-সংবাদে ভয় ও ভাবনা হইল। কিন্তু ভগবানের কি অপূর্ব্বলীলা, তখন আমি কিছুই জানিতাম না; শুধু ভদ্রতার খাতিরে বাড়ীর অতিথি জানিয়াই

যথাসাধ্য সেবা করিতাম এবং সহানুভূতি দেখাইতাম। সেবা যে ধর্ম্ম, এ জ্ঞান তখন ছিল না। আমার মত ও বিশ্বাস এবং আচার ব্যবহার সকলি ভিন্ন রকমের ছিল; তখন আমি একজন কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু মহিলা। কিন্তু কি জানি, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার কখনও কোনও বিদ্বেষ ভাব ছিল না। ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা! এই ধর্ম্মের প্রতি প্রথম হইতেই আমার সহানুভূতি থাকায় ইহা ভালই লাগিত। আমি যখন শিব-পূজা করিতাম, তখন আমার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে (অমুর মাকে) বলিতাম, "তোমরা যে ব্রহ্ম-স্তোত্র পাঠ কর, আমার তাহা বড় ভাল লাগে, করিতে সাধ যায়;" কিন্তু তিনি বলিতেন, "মা বাবা পৌত্তলিক হিন্দু, তাঁরা তোমায় ছাড়িবেন কেন?" উত্তর শুনিয়া নীরব হইলাম।

এই সমস্ত ঘটনার পর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন প্রেরিত দেব—ভক্ত পিতা সস্ত্রীক হায়দ্রাবাদ হতে আবার আমাদের বাড়ী অসুস্থ শরীরে উপস্থিত হইলেন। পরদিন দোল পূর্ণিমা, চৈতন্য দেবের জন্মোৎসবের সব আয়োজন হইতেছে। ভক্ত পিতার দাড়িতে একটী বিষম ফোঁড়া উঠিয়াছিল—দাদা আমার চিকিৎসক—তিনি অস্ত্র-চিকিৎসা করিয়া ঔষধ পত্র দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেন। তাঁকে বাহিরের ঘরে শয্যায় শয়ন করাইয়া বলিলেন, "আপনি কদাচ উঠিবেন না।" বাহিরের উঠানে উপাসনা ও সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলে, পাছে তিনি উঠিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়া রোগ বৃদ্ধি করেন, সেই ভয়ে দাদা বাড়ীর ভিতর আঙ্গিনায় পূজার আয়োজন করিলেন। অন্দরে কীর্ত্তনারম্ভে যেমন মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল, আর ভক্তকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য; তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া, দাদার অনুরোধ ও মানা সত্ত্বেও মত্ত মাতঙ্গের মত উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তখন সকল যাতনা ভুলিয়া গেলেন, ফোঁড়ার বাঁধন খুলিয়া গেল, উহা হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল, তাঁর বক্ষঃস্থলকে ভাসাইয়া দিল; কিন্তু সে দিকে তাঁর দৃষ্টিপাত কোথায়, তিনি কীর্ত্তনে মাতিয়া গেলেন! ঘরের ভিতর হইতে সাধারণ দর্শকের মত আমি এই কীর্ত্তন দেখিতে ছিলাম। দেখিতে দেখিতে ভক্তের মুখশ্রীতে কি অপূর্ব্ব ব্রহ্ম অবতীর্ণ দেখিলাম, যাহার দ্বারা নিমেষের মধ্যে আমার অসার জীবনে মহাপরিবর্ত্তন আসিল, যে পরিবর্ত্তন আমার ভাগ্যে এ দর্শন বিনা কোনও কালে ঘটিত কিনা, কে জানে। আজও স্মরণে আমার দুর্ব্বল প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। ইহার পর দিন হতেই প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রাণস্পর্শী উপাসনায় যোগদান করিতে লাগিলাম। পরদিন বৈকালে ভক্ত পিতার সঙ্গে আমরা সকলে ডুমরাওণের মহারাজার বাগানে বেড়াইতে যাই। তথায় গিয়ে সেই বাঁধান ঘাটে তাঁর গভীর প্রার্থনায় যোগ দিয়ে আমার সারা জীবনের কুসংস্কার একেবারে চলিয়া যায়। পিতার নিকট যে কয়েকটি উপদেশ পাইলাম, তাহাতে আমার অবিশ্বাসী জীবনের অন্ধকার কাটিয়া গেল। তারপর দিন হতে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করি, আমার শিবমূর্ত্তি গড়িয়া পূজার আর আস্থা রহিল না; তখন আমার সাকার হরি নিরাকারে পরিণত হইলেন, এক পবিত্র নববিধানের আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। সে সময়ে আমার মনের অবস্থা এমন যে, মরা প্রাণকে নব আশায় সজীব করিয়া তুলিল। প্রতিদিনের উপাসনা নবশক্তি দিয়ে, নূতন ভাব দিয়ে, আমায় নূতন মানুষ গড়িতে লাগিল; তখন ভগবান্ ও তাঁর ভক্ত সন্তান ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর কাহারো সাহায্য পাই নাই।

কয়েক দিন পরে যখন ভক্তিভাজন পিতা করাচি চলিয়া গেলেন, তখন জগতে আমার ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র আর কেহ ছিলেন না। পিতা মাতা ভাই বোন সন্তানদের উপর স্নেহ ভালবাসা থাকেই, কিন্তু এই ভক্তের সহিত কি পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম-সম্বন্ধ! গুরু শিষ্যের সে প্রেম প্রকাশ করা যায় না, কাহারো সঙ্গে তুলনা হয় না। সে অহেতুক নৈসর্গিক প্রেম মানুষকে পাগল করে, মানবীয় শক্তি হরণ করে। তিনি আমায় কন্যার মত স্নেহ করিতেন, কিন্তু তখন চিঠিপত্র দিতেন না, আমিও উপদেশ-প্রার্থী হয়ে পত্রাদি লিখিতাম না। তিনি দাদাকে পত্রাদি দিয়া আমার সাধন-সিদ্ধির সংবাদ লইতেন। ইহার পরে ১৮৯২ সনে করাচি হতে মাঘোৎসবের সময় বাঁকিপুরে আসেন। সেই সময় দাদাকে মাঘোৎসবে সকলকে লইয়া বাঁকিপুরে যাইবার জন্য পত্র লেখেন এবং আমাকে রাজগৃহে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন উৎসবের পর বাঁকিপুর হইতে রাজগৃহে যাওয়া হইত। বাঁকিপুরে উৎসবে আমরা সকলেই যাই এবং উৎসবান্তে দাদা সপরিবারে আবার ফিরিয়া আসেন। আমি রাজগৃহ যাওয়া পর্য্যন্ত অঘোর-পরিবারে থাকি, ১১ই মাঘ সমস্তদিনব্যাপী উৎসবে মেয়েদের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে যাই। তখনও ধর্ম্মের বিশেষ কিছুই বুঝিতাম না। সে দিনকার উপাসনা ভক্ত পিতা করেন। বাঁকিপুর সমাজ আমার কাছে পুণ্যক্ষেত্র হইল, আত্মার মধ্যে কি এক অভাব অনুভব করে, ভয়ানক বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম, স্মরণে প্রাণ কম্পিত হয়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

জন্মোৎসব।

কলিকাতা—শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে, ১৯শে নভেম্বর, মঙ্গলবার, প্রাতে ৭।০ ঘটিকার সময়, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে (৭৮বি, অপার সার্কুলার রোডে) বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন,

ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে কমল-কুটীরে কল্পতরু হয়।

সন্ধ্যার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যদেবের জন্ম-তিথি উপলক্ষে এক স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "তব দয়া বিনে, এ পাপ জীবনে, সাধু ভক্ত জনে কেমনে চিনিব।" এই গানটি সুগায়ক শ্রীযুক্ত কুনালচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সুমধুরভাবে গীত হইলে সভার কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমে বেণী বাবু সময়োপযোগী একটী প্রার্থনা করেন। তার পরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রথম বক্তৃতা করেন। আচার্য্যদেব একজন God-intoxicated man ছিলেন, এই কথাটি তিনি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, যদিও কেশবচন্দ্রকে দেখবার তাঁর সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নি, তবুও তাঁর একটী মানস মূর্ত্তি অন্তর মধ্যে স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, কেশবচন্দ্র ভগবান্‌কে বহুনামে ডেকেছেন। এমন কি, হাফেজের মত তাঁকে হৃদয়-লুণ্ঠনকারীও বলেছেন। * কেশবচন্দ্র তাঁর "নবসংহিতায়" স্নানের বিধি যেরূপ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, নিজেও সেই ভাবে স্নান করতেন। কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, স্নেহময়ী বিশ্বজননী প্রতিদিন তাঁকে নাইয়ে দেন ও নিজ হাতে তাঁর গাত্র মার্জ্জনা করেন। সূর্য্য-কিরণ Prismএ পতিত হয়ে যেমন নানারকম পরিবর্ত্তন সংঘটন করে, সেই রকম ভগবৎকৃপা ভক্ত-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে নিমেষে নিমেষে অসংখ্য পরিবর্ত্তন সংসাধন করে। কেশবচন্দ্রের জীবন বর্ত্তমান যুগের এক অতুল সম্পত্তি। তারপরে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু বলেন। তিনি বলেন, আজকাল ভারতের রাজনৈতিক জগতে যেরূপ গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, তাতে সতত মনে হয়, কেশবচন্দ্র আজ জীবিত থাকলে ভারতের জাতীয় জীবনের এত দূর অবনতি হইত না এবং Sincere workerএর (খাঁটি স্বদেশ-সেবকের) সংখ্যা এত বিরল হইত না। তারপরে Rev. B. A. Nag ইংরাজীতে বলেন। তিনি বলেন, "যৌবনে যখন আমি গৃহ হইতে বিতাড়িত, পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়ে, ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম, একদিন এক বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া জীবনবেদ পাঠ করিতে লাগিলাম। চারিদিকে অনেকগুলি লোক জমিয়া গেল; তারা সকলেই চাষী ছিল। বইখানি তাদের এত ভাল লাগিল যে, তাহারা আমাকে সেখানে থেকে তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল; এমন কি, আমার সব ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।" কিন্তু বক্তার কলিকাতা আসবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর কলিকাতায় আসবার পূর্ব্বেই আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ হওয়ায় তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি যে এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেছেন, তার মূলে ও পথপ্রদর্শক কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলী পড়েই তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলীর বিশেষ বিশেষ স্থল উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, "He was a better christian than myself." তারপরে আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র ঘোষ কিছু বলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের দুইটী কার্য্যের উল্লেখ করেন—দেশাত্মবোধ ও সমন্বয়। তিনিই এদেশে দেশাত্মবোধের প্রথম প্রচারক। তিনিই প্রথমে সকল ধর্ম্মের কিরূপে সমন্বয় হতে পারে, তাহা জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী তরুণদিগকে, যাঁহারা দেশ-মাতৃকার পদে আত্মোৎসর্গ করতে চান, কেশবচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করতে বলেন। তৎপরে ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ "নববিধান কি" বেশ করে বুঝাইয়া দেন। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে শুধু তা নয়, সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মই সমান সত্য। শেষ বক্তা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন ঘোষ। তিনি কিছু লিখে এনেছিলেন, তাহাই পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনিও ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষের ন্যায় নববিধানের মূল মতের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। উপসংহারে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়।

ভাগলপুর—বিগত ১৯শে নভেম্বর, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬॥টার সময়, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে, ভাগলপুরে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে সংকীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনা হয়। কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভক্তিমান্ সুগায়ক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম যোগে জমাট কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি জীবনবেদ হইতে আচার্য্যদেবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পাঠ করেন। শ্রদ্ধেয় প্রচারক বরদাপ্রসন্ন রায় সময়োচিত একটী প্রার্থনা করেন। স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উক্ত জন্মোৎসবের কীর্ত্তনে আনন্দ সহকারে যোগদান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

মজঃফরপুর—গত ১৯শে নভেম্বর এখানে মহাত্মা কেশব চন্দ্রের শুভ জন্ম উপলক্ষে প্রভাতে ব্রহ্ম-উপাসনা অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় আলোকমালায়, ধূপ ধূনায়, ফুল চন্দনে গৃহ সজ্জিত করিয়া কয়েকটি সঙ্গীত হারমোনিয়ম সহযোগে গীত হয়। পরে অভাবিত রূপে অনেকগুলি সমবিশ্বাসী বন্ধু উপস্থিত হইয়া ভক্ত ব্রহ্মানন্দের শুভ জন্মকে পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনা ও পাঠাদি হইয়াছিল। জলযোগ পরমানন্দে হইয়া সমাপ্ত হয়।

ময়মনসিংহ—জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের সভাপতিত্বে গত ১৯শে তারিখ এস, কে, টাউনহলে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে এক জনসভা বসে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদার, কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন-কথার আলোচনা করেন।—(বসুমতী)

জন্মোৎসব উপলক্ষে নিবেদন।

নববিধানের নব ভক্ত, নবযোগী, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন প্রতি বৎসর নবজন্ম লাভ করিতেছেন; আমরা তাঁহার জন্মোৎসব করিয়া ধন্য হইতেছি। যত বার তাঁহার জীবন ও চরিত্র পাঠ ক'রে আলোচনা করি দেখি, কি অত্যাশ্চর্য্য জীবন, বিধাতা এই দিনে বঙ্গভূমি কলিকাতা নগরে জন্ম দিয়াছিলেন! সেই একটী জীবন হইতে কত শত জীবন গঠিত হইয়াছিল এবং হইতেছে; না জানি, আরও কত হইবে!

সেই জীবনের প্রভাবেই না অপূর্ব্ব বাগ্মিতা সমস্ত পাশ্চাত্য জনসংঘকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল! সেই জীবনের সংস্পর্শেই না সোদামা ভক্তির প্রবল স্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তকে প্লাবিত করিয়াছিল! সেই জীবনের স্পর্শেই না এক অপূর্ব্ব ত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা কলিকাতার প্রচার আশ্রমে দেখা গিয়াছিল! সেই জীবনের তেজ হইতেই না অঘোর-প্রকাশের গার্হস্থ্য-জীবন এত গভীর ও উচ্চ সাধনার এত উচ্চ আদর্শ দেখাইল! আর সেই জীবনের অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষার ফলেই না কত ত্যাগী, বৈরাগী, কর্ম্মী, যোগী ও ভক্তিমন্ত্রের সাধক নববিধান-মণ্ডলীকে গৌরবান্বিত করিয়া, দেশে দেশে আপনাদের অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া, দেবধামে তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন! আজ দেখি, সুদূর করাচি, পাঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ, ঐ মহাপ্রাণের, ঐ মহামানবের মহাকীর্ত্তি নানাভাবে নানা আকারে নূতনতর করে মহীয়ান্ করিতেছে।

ধন্য লীলাময়! তাঁহার অপূর্ব্ব দান এই কেশব-জীবন! এখন আমরা এই অপূর্ব্ব জীবনটিকে আত্মস্থ করিয়া, তিনি যা চাহিতেন, সেইরূপ হইতে যেন যত্নবান্ হই। নববিধানের জুবিলী উৎসব সমাগত। কেশবের অনুরাগী সকল ভাই ভগিনী, সন্তান সন্ততি, যাঁহার যে ক্ষমতা আছে তাহা লইয়া, এস, এই জন্মোৎসব হতে উৎসব আরম্ভ করি। শ্রীকেশবের ভক্তি-তীর্থ সোনার মুঙ্গেরে জুবিলী উৎসবের জয়-নিশান হাতে লইয়া, ভক্তি-প্রার্থী হইয়া, ভক্তি সাধন করিয়া, যেন মহামহোৎসবে প্রবেশ করিবার উপযুক্ততা লাভ করিতে পারি।

পরম ভক্ত শ্রীকেশবের জন্মে বঙ্গভূমি, ভারতভূমি ও এই বিপুলা ধরণী ধন্য হইয়াছে। তাঁহার জীবনে শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব লীলা ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার প্রিয় নববিধানকে যেন জীবনে গৌরবান্বিত করিতে পারি, আজিকার এই বিশেষ আনন্দময় দিনে বিশেষ নিবেদন।

ভাগলপুর, }
১৯।১১।২৯ } সেবিকা—নির্ম্মলা বসু।

শুভবিবাহ—গত ১৮ই নভেম্বর (২রা অগ্রহায়ণ), ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার বসুর দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অমল কুমার বসুর সহিত, ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র নন্দী রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী শীলার শুভ বিবাহ ঢাকায় নির্ম্মল বাবুর গেণ্ডারিয়াস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই দুর্গানাথ রায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর), বাবিলের স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর পৌত্রী, স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন বসুর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুকার সহিত, ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় কালী ভৈরব রায়ের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সতীপ্রনাথ রায়ের শুভ বিবাহ সীতারামপুরের নিকটবর্ত্তী এথোরায়, কন্যার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর কর্ম্মস্থলে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

ভগবান্ নবদম্পতিদিগকে স্বর্গের শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

পরলোক-গমন—গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১২ই অগ্রহায়ণ, কলিকাতায়, অমরাগড়ীর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী যাদুমণি রায় ৬২ বৎসর বয়সে, পরম জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ২৪শে কার্ত্তিক, তপস্বিনী ক্ষীরোদমোহিনী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ, ৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, তাঁহার প্রতিপালিত পুত্র চতুষ্টয় ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র, ডাঃ অমূল্যচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মিত্র ও নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় অধ্যেতার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে:—

কলিকাতা—নববিধান ব্রহ্মমন্দির ৪৲, নববিধান প্রচারাশ্রম ৪৲, আর্য্যনারী-সমাজ ২৲, ভগ্নি-সমিতি ২৲, বিধবাশ্রম ৪৲, সরযূ-ভবন ৪৲, নববিধান ট্রাষ্টফণ্ড ৪৲, নববিধান সমাজের পুস্তকাবলী মুদ্রাঙ্কণ ৫৲, ভিক্টোরিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ (রন্ধনে পটুতা) ৮৲, মূক ও বধির বিদ্যালয় ২৲, অন্ধ-বিদ্যালয় ২৲, আতুরাশ্রম ২৲, অনাথ আশ্রম ২৲; অমরাগড়ী নববিধান ব্রহ্মমন্দির ২৲, মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দির ও আশ্রম ৭৲, বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দির ২৲, রাজগৃহ বৌদ্ধাশ্রম ২৲, চন্দননগরে সঙ্ঘ ২৲, জনাই বাক্সা গ্রামে পথসংস্কার ৫৲, অরুণ নগরে অনুন্নত বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ ২৲, পরলোকগতা দেবীর ইচ্ছানুসারে শিশু-সেবা ২৫৲, মোট ৮৯৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ৪টা ভোজ, ১২ খানা শাদা থান ধুতি, ১০ খানা শাদা কম্বল ও গৈরিক উত্তরীয় বিতরণ করা হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে এবং তাঁহার প্রিয়জন পরিজনবর্গকে আশীর্ব্বাদ করুন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২০শে অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।